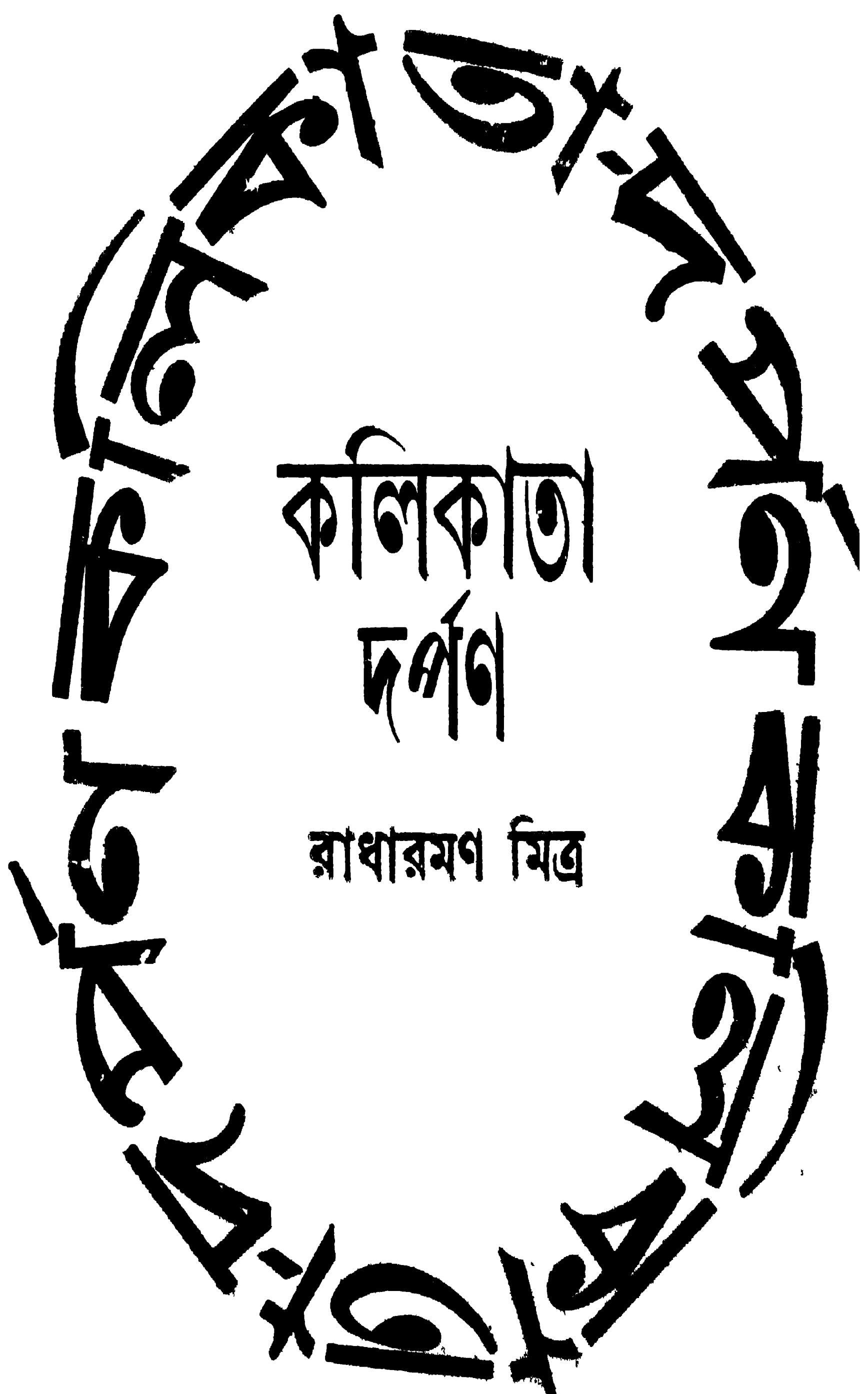


কলিকাতা দর্পণ

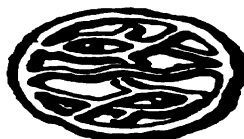
রাধারমণ মিত্র

কলিকাতা-দর্পণ

কলিকাতা-দর্পণ

॥ প্রথম পর্ব ॥

রাধারমণ মিত্র



সু ব র্ণ রে খা

KOLIKATA-DARPAN
by Radharaman Mitra

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫২

প্রচ্ছদপট : প্রবীর সেন

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯
মুদ্রাকর : মদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস ॥ ৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা ৬

উৎসর্গ

সমস্ত কলকাতা-প্রেমিককে

মুখবন্ধ

এই বইয়ে যা কিছু আছে, একটি বাদে, সব লেখাই 'এক্ষণ' পত্রিকায় আগে বেরিয়েছিল। আমার প্রথম লেখা যা এই পত্রিকায় বেরোয় তা হচ্ছে সুনীতিবাবুর লেখা 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি' প্রবন্ধের সমালোচনা। সেটি বেরিয়েছিল ১৩৭৬ সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। তার উত্তর-প্রত্যুত্তর বেরোয় আরো দুই সংখ্যায় (দ্র. 'গ্রন্থ-পরিচিতি')। তারপর সম্পাদক মশাইয়ের বারবার তাগিদ সত্ত্বেও প্রায় ৪ বছর আমার কোনো লেখা বেরোয় নি। পরে আমার লেখা বেরোয় ১৩৮২ সালের শারদীয় সংখ্যায়—'কলকাতার টুকিটাকি' নামে। তারপর থেকে প্রতি সংখ্যাতেই বেরোতে থাকে ঐ নামেই। এই পর্যায়ে শেষ লেখাটি বেরোয় ১৩৮৬ সালের শারদীয় সংখ্যায়।

কিন্তু পত্রিকায় যা বেরিয়েছিল, এই বইয়ে ঠিক তাই-ই নেই। অনেক কাটছাঁট, রদবদল করা হয়েছে। একেবারে ঢেলে সাজানো হয়েছে বলা চলে। ফলে লেখাগুলি নতুন চেহারা পেয়েছে।

যে-লেখাটি এই পত্রিকায় বেরোয় নি সেটি হচ্ছে 'গঙ্গার ঘাট'। 'ঐতিহাসিক' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তারই 'অফ-প্রিণ্ট' দিয়ে সম্পাদকরা ৩০০ কপি বই-আকারে বার করেন। কবে ফুরিয়ে গেছে, অনেকেই পড়তে চান কিন্তু পান না। তাই 'গঙ্গার ঘাট'ও এই সঙ্গে প্রকাশ করা হল। তবে সবচেয়ে বেশি মেরামত করা হয়েছে এই লেখাটিকে। একেবারে খোল-নল্‌চে সব পালটানো হয়েছে।

আর একটি লেখা, ড. সুকুমার সেনের কলকাতার ওপর লেখা প্রবন্ধের সমালোচনা, নতুন যোগ করা হল।

এই পর্যন্তই রইল 'কলিকাতা-দর্পণ'-এর প্রথম পর্ব। সুনীতিবাবুর সমালোচনা উপলক্ষে উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি থেকে শুধু আমার প্রত্যুত্তর অংশগুলি বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে সংযোজিত হবে। সম্প্রতি শারদীয় (১৩৮৭) এক্ষণ পত্রিকায় আমার নতুন লেখা (কলকাতার বাড়ি ও বাগানবাড়ি সম্পর্কে) বেরিয়েছে। এর পরিমার্জিত রূপটিও পাওয়া যাবে দ্বিতীয় পর্বে।

বর্তমান গ্রন্থের 'যোগাযোগ ব্যবস্থা : রেলপথ' অধ্যায়টি প্রথম রচনার সময় ইস্টার্ন রেলওয়ের পাবলিক রিলেশন্‌স বিভাগের অফিসার, আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান নারায়ণ দত্ত নানা বইপত্র ও সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আমাকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছিলেন। 'বিমান-পরিবহন'

অধ্যায়টি লেখার ব্যাপারে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের বৈমানিক-সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীবীরেন রায় মশাইয়ের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছেন শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ। আরো নানা ব্যক্তির কাছে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এক্ষণ পত্রিকা সাহস ক'রে বার না করলে আমার সুনীতিবাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা বেরতো না। অন্য কোনো পত্রিকা সাহস করত না বলেই আমার বিশ্বাস। তা ছাড়া এক্ষণ-এর তাগাদা ও জবরদস্তি ছাড়া আমার 'কলকাতার টুকিটাকি'ও লেখা হতো না।

'কলিকাতা-দর্পণ' প্রকাশন-ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি সব থেকে ঋণী দু-জনের কাছে—শ্রীমান ইন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীমান নির্মাল্য আচার্য। প্রথম জন গ্রন্থটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব না নিলে এবং দ্বিতীয় জন আদ্যন্ত সম্পাদনা ও মুদ্রণ-ব্যবস্থা পরিচালনা না করলে আজ এটির প্রকাশ অসম্ভব হতো।

এই গ্রন্থের নানা সম্ভাব্য ত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে সাধ্যমতো সংশোধিত হবে। একটি কথা এখানে বলা দরকার, কলকাতার যাতায়াত-ব্যবস্থায় ট্রাম চালু হওয়া প্রসঙ্গে। পরীক্ষামূলকভাবে ট্রাম যেদিনই চলা শুরু হোক, ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানির পরিচালনাধীনে আনুষ্ঠানিক-ভাবে তা শুরু হয় ১৮৮০ সনের ১ নভেম্বর।

বইটি পড়ে পাঠকদের জ্ঞান বিশেষ কিছু বৃদ্ধি হবে বলে আমার মনে হয় না। তবে তাঁদের যদি ভালো লাগে তাহলেই আমি খুশি হব ও আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

রাধারমণ মিত্র

সূচিপত্র



‘কলিকাতা’ নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫-এর (ইং ১৯৩৮) প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় “কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৩০ বছর পরে ‘দেশ’ পত্রিকার ২৫ ফাল্গুন, ১৩৭৪ সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধটি লেখকের সম্মতিক্রমে হুবহু পুনর্মুদ্রিত হয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি আমি বহুকাল পূর্বে পড়ি, এবং তখন আমার মনে কতকগুলি বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। আমি ঐ বিষয়ে পড়াশুনা ও চিন্তা করতে থাকি। শেষে আমার মনে হয় ‘কলিকাতা’ নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সুনীতিবাবুর সিদ্ধান্ত ভুল; শুধু মূল বিষয়েই নয়, ইতিহাসাদি আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়েই ভুল। এই ধারণা আমার কেন হল তার কারণগুলি এখন সুধীবৃন্দের সামনে উপস্থিত করলাম।

সুনীতিবাবুর প্রবন্ধটি দীর্ঘ, ‘দেশ’ পত্রিকার প্রায় সাড়ে-তিন পৃষ্ঠাব্যাপী। তার মধ্যে যেগুলি প্রধান বিষয় সেগুলি লেখকের ভাষায় (‘দেশ’ পত্রিকার পাঠ অনুসরণে) প্রথমে তুলে দিয়ে তার নিচে আমার বক্তব্য জানিয়েছি।

মূল প্রবন্ধের ক্রম যতদূর সম্ভব এই আলোচনায় অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। আপত্তিজনক উক্তিগুলি ভেঙে সাজানো ও সেগুলিকে ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

১

সুনীতিবাবু লিখেছেন : "আমরা সকলেই জানি, কলিকাতা শহর খুব প্রাচীন স্থান নহে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে কলিকাতার গৌরবের পত্তন।

১. ইহার কয়েক শতক পূর্বে কলিকাতার কোনও বিশেষ পরিচয় নাই।

২. তবে অনুমান হয়, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে, একটি বড় বা সমৃদ্ধ স্থান হিসাবে কলিকাতার নাম অন্ততঃ দক্ষিণ-বঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছিল,

৩. এবং ষোড়শ শতকে ইহার নাম বাঙ্গালার বাহিরেও পঁহুছাইয়াছিল।

৪. সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা বিখ্যাত স্থান হইয়া দাঁড়ায়।"

আমার বক্তব্য :

১. ১ ও ২ সংখ্যক উক্তি পরস্পরবিরোধী। দুই উক্তিই একসঙ্গে সত্য হতে পারে না।

২. ২-সংখ্যক উক্তি লেখক আরম্ভই করেছেন 'অনুমান হয়' এই বাক্যাংশ দিয়ে। কলকাতার সমৃদ্ধি ইতিহাসের ব্যাপার। এত গুরুতর একটি উক্তির সমর্থনে লেখক ইতিহাস থেকে একটি তথ্যও সংকলন ক'রে দেখাতে পারেন নি। ইতিহাস বিষয়ে অনুমান ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হলে গ্রাহ্য হতে পারে না। অনুমান নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমি পরে দেখাব লেখক অন্যত্র এই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

৩. ষোড়শ শতকে কলকাতার নাম বাংলার বাইরে কোথায় পৌঁছেছিল স্পষ্ট ক'রে লেখক তা বলেন নি।

৪. এই উক্তিটি অনৈতিহাসিক। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা একটা বিখ্যাত স্থান হয়ে দাঁড়ায় নি, একটা অখ্যাত নগণ্য গ্রাম মাত্র ছিল।

প্রথমত, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট তারিখে জোব চার্নক এখানে পদার্পণ ক'রে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজধানীর ভিত্তি স্থাপন করেন। কলকাতার সমৃদ্ধি তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। তখন কলকাতা ৩টি নগণ্য গ্রামের একটিমাত্র। ৮ বছর পরেও, অর্থাৎ ১৬৯৮ সনে যখন ইংরেজ কোম্পানি ঐ ৩টি গ্রামের খাজনা আদায়ের অধিকার খরিদ করে তখনো কলকাতা নগণ্য গ্রাম মাত্র ছিল।

দ্বিতীয়ত, জোব চার্নক মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে কলকাতায় নামেন নি,

নেমেছিলেন সুতানুটি গ্রামে, আর ঐ গ্রামেই তিনি বসবাস করেন। পরবর্তী 'টাউন' কলকাতায়, অর্থাৎ বর্তমান ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে তিনি থাকতেন এবং ঐখানেই তিনি মারা যান—এর আদৌ কোনো প্রমাণ নেই। বরং উল্টো প্রমাণ আছে। সেণ্ট জন গির্জার সংলগ্ন কবরখানায় তাঁর সমাধি-সৌধটি তাঁর মৃত্যুর দু'তিন বছর পরে তাঁর জামাতা মিঃ চার্লস আয়ার নির্মাণ করেন। চার্নকের মৃত্যুর পর থেকেই কোম্পানির কর্মচারিরা ডালহৌসি অঞ্চলে বাস করতে আরম্ভ করে এবং ঐ স্থানই তাদের কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে। চার্নকের আগমনের পূর্বেই যদি কলকাতা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে থাকত, তাহলে চার্নক কলকাতাতেই নামতেন, সুতানুটিতে নয়। সুতানুটিতে নেমেছিলেন এইজন্য যে সুতানুটি বরং তখন বিখ্যাত না হোক, একটা বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

তৃতীয়ত, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা যে কত নগণ্য স্থান ছিল তার আরো কতকগুলি প্রমাণ এখানে দিচ্ছি।

ক. কর্নেল হেনরি ইউল (Yule), যিনি এ. সি. বার্নেল (Burnell)-এর সঙ্গে *Hobson-Jobson* গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি ইংল্যাণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস ও অন্যান্য জায়গার দপ্তর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে ১৬৭৫ সনের ***English Pilot*** গ্রন্থে ও একটি পুরাতন মেরিন চার্টে (Marine chart) 'চুটানুটি' (Chuttanutte) ও 'গোবিন্দপুর' নাম পেয়েছেন। কিন্তু 'কলিকাতা' নাম পান নি। কোম্পানির পুরাতন কাগজপত্রে 'কলিকাতা' নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ যা তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন তার তারিখ—১৬ আগস্ট ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দ।

খ. শুধু তাই নয়। বিলেতের ইণ্ডিয়া অফিসে কলকাতার ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের (Factory Council) লেখা যেসব চিঠিপত্র আছে, সেসব চিঠির মাথায় ১৭০০ সনের ২৭ মার্চ পর্যন্ত কলকাতার নাম নেই; আছে 'চুটানুটি'-র নাম। ঐ বছরের ৮ জুন থেকে যেসব চিঠি লেখা হয় তাদের মাথায় আছে 'Calcutta' নাম এবং ঐ বছরের ২০ আগস্ট থেকে যেসব চিঠিপত্র লেখা হয়েছে, তাতে স্থানের নাম আছে 'Fort William in Calcutta'।

গ. ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মাত্র একটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া ব্যবসা ক'রে আসছিল। তার নাম ছিল লণ্ডন কোম্পানি (London Company)। ঐ বছরে ইংল্যাণ্ডের রাজা আর একটি ইংরেজ কোম্পানিকে ভারতবর্ষে একচেটিয়া ব্যবসা করার লাইসেন্স দেন। এই কোম্পানির নাম ইংলিশ কোম্পানি (English Company), ফলে ৪ বছর ধরে এই দুই কোম্পানির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। তাতে দুই কোম্পানিরই প্রচুর লোকসান হয়। শেষে কোম্পানি দু'টি বুঝল যে, মারামারি না ক'রে দুই কোম্পানি মিলে এক হয়ে যাওয়াই ভালো। ১৭০২ সনে মিলিত হবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল কলকাতায়। কিন্তু সেই চুক্তিপত্রে স্থানের নামের উল্লেখ আছে কলকাতা বলে

নয়, 'চুটানুটি' বলে।

ঘ. ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দের জন থর্নহিলের (Thornhill) চার্টে Kitherpore (খিদিরপুর)-এর উল্লেখ আছে। কলকাতার কোনো উল্লেখ নেই।

উপরের তথ্যগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কেন, অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকেও কলকাতা বিখ্যাত স্থান হয়ে ওঠে নি।

২

এরপর সুনীতিবাবু 'কলিকাতা' নামের প্রচলিত ৬টি বুৎপত্তির উল্লেখ করেছেন এবং সব ক'টিকেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে খারিজ ক'রে দিয়েছেন।

করুন, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। তবে আর একটি ব্যুৎপত্তি আছে, যেটি অন্য কোনো কারণে না হলেও নিছক ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে চিত্তাকর্ষক এবং ভাষাতাত্ত্বিকের সেটি খেয়াল রাখা উচিত।

সুনীতিবাবু বলেছেন : "সাধু বা পুরাতন বাঙ্গালার রূপ 'কলিকাতা', কলিকাতা-অঞ্চলে ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত কথিত বাঙ্গালার (চলিত-ভাষার) রূপ 'ক'ল্‌কাতা, ক'ল্‌কেতা (কোলকাতা, কোল্‌কেতা)'।"

'কলিকাতা'কে আমরা যেমন উচ্চারণ করি 'কোলিকাতা', 'কলকাতা'কেও আমরা সেইরকম উচ্চারণ করি 'কোলকাতা'। এখন, যে ব্যুৎপত্তির কথা বলছি সেই অনুসারে 'কোলিকাতা' = কোলি কা হাতা এবং 'কোলকাতা' = কোল কা হাতা। এর অর্থ 'কোলি' বা 'কোল' নামক জাতির গণ্ডি বা দেশ।

৩

এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন : "'কলিকাতা' নামটির ইতিহাস, পুরাতন পুস্তক ও কাগজ-পত্রে ইহার অবস্থান লইয়া বিচার করা যাউক।

[১] কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় বিপ্রদাস-কৃত মনসামঙ্গল কাব্যে। এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় ১৪৯৫ সালে (১৪১৭ শকে) রচিত হয় (বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬৪-৭৩)। …চাঁদ সদাগরের সিংহল-যাত্রা প্রসঙ্গে কলিকাতার উল্লেখ আছে (সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, পৃঃ ৭০)। কলিকাতার পাশ দিয়া গিয়া,…চাঁদ সদাগর কালীঘাটে গিয়া কালিকার পূজা করেন।

১৪৯৫-এর লেখা বইয়ের প্রমাণে,কলিকাতা ও কালীঘাট দুইটি পৃথক স্থান। কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা—আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ ধ্বনি পরিবর্তন, এবং প্রাচীন ও নবীন দুই রূপের এভাবে পাশাপাশি অবস্থান—ইহা অসম্ভব।"

আমার বক্তব্য : বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল নিয়ে দু'জন নামকরা সাহিত্যিক বিশেষ আলোচনা করেছেন। একজনের নাম সুনীতিবাবু নিজেই উল্লেখ করেছেন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-এ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের রচনাকাল ও ভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে শেষে মন্তব্য করেছেন.ঐ কাব্যে কলকাতা-সমেত গঙ্গাতীরবর্তী যতগুলি গ্রামের নামের উল্লেখ আছে সবগুলিই প্রক্ষিপ্ত, কারণ তাঁর মতে ঐ নামগুলি আধুনিক।

সুনীতিবাবু বাংলা ১৩৪৩ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন এবং একমাত্র তারই ওপর নির্ভর করেছেন। তাতে শ্রীযুক্ত সেন কী মত প্রকাশ করেছেন জানি না,কেননা সে প্রবন্ধ আমি পড়ি নি,কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সময় দাঁড়িয়ে নেই। সুকুমারবাবুর কলমও থেমে থাকে নি। বাংলা ১৩৪৩ সালের পরে তিনি 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনা করেছেন। সেই প্রামাণ্য ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের পূর্বার্ধের ইং ১৯৩৩ সনে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণে (পৃ. ১৮৪-২১৪) শ্রীযুক্ত সেন ঐ কাব্যে উল্লিখিত সপ্তগ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে কালীঘাট পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকায় নিম্নলিখিত স্থানগুলির নাম আছে : কুমারহট্ট, হুগলি, ভাটপাড়া, বোরো, কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়, গাড়ুলিয়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, জমিন, দিগঙ্গ, নিমাইতীর্থ, চাণক্য, বুড়নিয়ার দেশ, আকনা মাহেশ, খড়দহ, রিষড়া, সুখচর, কোন্নগর, কোতরঙ, কামারহাটি, আড়িয়াদহ, ঘুসুড়ি, চিত্রপুর, কলিকাতা, বেতড়, ধনগু, কালীঘাট। খড়দহের পাদটীকায় শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন : "এ বর্ণনা অনেকাংশেই প্রক্ষিপ্ত। খড়দহের প্রসঙ্গে আছে, 'খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দণ্ডবৎ'। নিত্যানন্দ এখানে আনুমানিক ১৫৩৫ সালের দিকে বাস করিয়াছিলেন। তাহার আগে নয়। সুতরাং অন্যথা অখ্যাত এই স্থানটি ১৪৯৫ সালে 'শ্রীপাট' অর্থাৎ বৈষ্ণব মহান্তের বাস হেতু তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।"

শুধু তাই নয়। অন্তত আরো একটি জায়গা শ্রীযুক্ত সেন-এর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—সেটি নিমাইতীর্থ। ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে নিমাই-এর বয়স ছিল ১০ বছর। সুতরাং সেই সময় তিনি বৈদ্যবাটীতে আসতেই পারেন না ; এসেছিলেন ঢের পরে,

পুরী যাবার পথে। তখনই এই স্থান তাঁর নামে তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। অতএব ১৪৯৫ সনে নিমাইতীর্থ ছিল না। শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন : "বিপ্রদাসের কাব্যের সবচেয়ে পুরাণো পুঁথি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের আগেকার নয়।" তা নয় হল,—কিন্তু 'কলিকাতা' নাম? শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন : "কলিকাতা নামও প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করি।"

এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন : "[২] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৮০-১৫৮৫?) কলিকাতা ও কালীঘাটের পৃথক্-পৃথক্ উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ সুপরিচিত।"

আমার বক্তব্য :

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য দু'জনেরই মত—সুনীতিবাবুর উল্লিখিত কালে ঐ কাব্য রচিত হয় নি, তার পরে হয়েছে।

সুনীতিবাবু নিজেও নিজের দেওয়া সাল সম্বন্ধে সন্দিহান। অন্যদিকে বাংলা ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অম্বিকাচরণ গুপ্ত 'কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য' এই শিরোনামায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি লিখেছেন : "আমরা দামুন্যা গ্রামের তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিতি করি·· প্রায় ৫০।৬০ খানি পুঁথি (চণ্ডীর—রা. মি.) আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের কোন-খানিতে ঐ (অর্থাৎ রচনার কাল-নির্দেশক—রা. মি.) শ্লোক দেখি নাই।" (দ্র. 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস')। এই উক্তির পর আমার মনে হয়, চণ্ডী-কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয়।

এখন দেখা দরকার, ঐ কাব্যে সত্যসত্যই কলকাতার নাম আছে কিনা। সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর সংগ্রহে সযত্নে রক্ষিত একখানি পুঁথি থেকে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত বলেছেন : "শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার চণ্ডীকাব্যের যে একটি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার পাঠ অনেকটা নির্ভরযোগ্য বটে।" (দ্র. 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস')। সরকার মশায়ের এই সংস্করণে 'কলিকাতা' ও 'কালীঘাট' কোনোটিরই উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়ত, বাংলা ১২৯৯ সনে (ইং ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে) মুদ্রিত 'বিশ্বকোষ'-এ লেখা 'কলিকাতা' প্রবন্ধের লেখক বলেছেন : "মুদ্রিত পুস্তকে থাকিলেও কবি-কঙ্কণ রচিত চণ্ডীমঙ্গলের যে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি দেখিলাম, তন্মধ্যেও 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ নাই।"

তৃতীয়ত, দ্বিজ মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্তের সমুদ্রযাত্রা বর্ণনা প্রসঙ্গে বরাহনগর, চিত্রপুর, কালীঘাট ইত্যাদি কাছাকাছি জায়গার উল্লেখ

থাকলেও, 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ নেই। অবশ্য কবি মাধবের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত। কেউ বলেন ১৫৭৯, কেউ বলেন ১৬৪৫, কেউ বলেন ১৬৪৭; আবার কারো মতে ১৬৬৪ সন। প্রথম তারিখের কথা ছেড়ে দিয়ে একেবারে শেষের তারিখকে রচনাকাল ধরলেও দেখা যাচ্ছে—১৬৬৪ সনেও দ্বিজ মাধবের চণ্ডীকাব্যে 'কলিকাতা'র নাম নেই।

সুতরাং মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হল না।

এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন: "[৩] ইহার পরে কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে—আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে। *Hobson-Jobson*-এ আইন-ই-আকবরীর প্রমাণ উদ্ধৃত আছে।

১. Blochmann ব্লখ্‌মান্ সাহেবের সম্পাদিত মূল ফারসী ('দেশ' পত্রিকায় ভুল ক'রে 'ফরাসী' ছাপা হয়েছে—রা. মি.) আইন-ই-আকবরীতে Klkt' (Kalkata বা Kalikata) রূপে নামটি পাওয়া যায়; আবার এই বইয়ের বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে পাঠান্তর আছে—Kln' = 'কল্‌না,'Klt' = 'কল্‌তা' Tlp' = 'তল্‌পা'। 'কল্‌কাতা' ও 'তল্‌পা' এই দুই পাঠভেদ সর্বপ্রাচীন দুই-খানি পুঁথিতে পাওয়া যায়।

২. 'কল্‌কাতা, Bkw' বকোয়া ও B'rbkpwr বারবকপুর', এই তিনটি মহাল সাতগাঁ সরকারের অধীনে ছিল।...

৩ তবে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীর সময়ে কলিকাতা যে একটি লক্ষণীয় স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে—

৪. ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইহা ভাগীরথীর তীরে উল্লেখযোগ্য গ্রাম বা ব্যবসায়-কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

আমার বক্তব্য:

১. ক. আমার মতো আনাড়ি ঐতিহাসিকের পক্ষে এ ব্যাপারে কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা হবে, তাই নিজের মত ব্যক্ত না ক'রে এ বিষয়ে বাংলাদেশের তথা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করব। কিন্তু তার আগে আমি সুনীতিবাবুর উদ্দেশে এইটুকু সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে, যেখানে এতরকম পাঠভেদ দেখা যাচ্ছে সেখানে অন্য পাঠ বাদ দিয়ে শুধু 'কলিকাতা'বা 'কলকাতা' পাঠ গ্রহণ করবার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে? যদি বলেন সর্বপ্রাচীন পুঁথিতে এই পাঠটি আছে, তাহলে 'তলপা' পাঠ গ্রহণ করতে আপত্তি কি, যখন তিনি নিজেই বলেছেন, এ পাঠটিও সর্বপ্রাচীন পুঁথিতে আছে?

খ. এখন স্যার যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন: "Calcutta is unlikely, I prefer the variant in

text Kalna."

মূল ফারসি আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মাত্র প্রথম খণ্ড ব্লথমান সাহেব ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সটীক অনুবাদ করেন কর্নেল এইচ. এস. জ্যারেট. (Jarrett) যথাক্রমে ১৮৯১ ও ১৮৯৪-৯৬ খ্রীস্টাব্দে। জ্যারেট-কৃত এই দুই খণ্ড অনুবাদ 'corrected and further annotated' হয়ে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৯ ও ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদের পাদটীকায় স্যার যদুনাথ ঐ মন্তব্য করেছেন।

২. যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় আইন-ই-আকবরীতে কলকাতার নাম আছে, সে কলকাতা কি একটি গ্রাম না মহল? আইন-ই-আকবরী বলছে 'মহল', সুনীতিবাবু ধরে নিয়েছেন 'গ্রাম'। (৩ ও ৪ অংশে তাঁর উক্তি দ্রষ্টব্য)। গণ্ডগোলের মূল এইখানেই।

বলা বাহুল্য, মহল (একবচনে 'মহল', বহুবচনে 'মহাল') ও গ্রাম এক জিনিস নয়। মহল গ্রামের চেয়ে অনেক বড়। কত বড় তার খানিক ধারণা হবে এই হিসেব থেকে : বাংলা 'সুবা'র মধ্যে মোট ২৪টি 'সরকার'ও ৬৮৭টি 'মহাল'ছিল। সরকার সাতগাঁর অধীনে তথাকথিত কলকাতা নিয়ে মোট ৫৩টি মহাল ছিল। সরকার সাতগাঁর মোট রাজস্ব ছিল ১৬,৭২৪,৭২৪ দাম; সরকার সাতগাঁর অধীনে কলকাতা (অথবা কলনা) বকোয়া ও বারবাকপুর—এই তিনটি মহালের মিলিত রাজস্ব ছিল ৯৩৬,২১৫ দাম।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, একটি 'মহল' একটি 'গ্রাম'-এর থেকে বহু, বহুগুণ বড় ছিল—পরবর্তীকালের প্রায় একটি 'পরগনা'র সমান। প্রকৃতপক্ষে, বহু পরবর্তীকালে 'মহল' কলকাতার বদলে একটি 'পরগনা'কলকাতার সাক্ষাৎ পাই। তথাকথিত কলকাতা মহলের মধ্যে কতগুলি গ্রাম ছিল ও তাদের কি কি নাম ছিল তা আইন-ই-আকবরীতে দেওয়া নেই।

৩. এই উক্তিটি ১/৩-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র। সমস্তটাই 'অনুমান'। আইন-ই-আকবরীর মতো অতবড় একটা ইতিহাসগ্রন্থ থেকে লেখক একটা প্রমাণও বার করতে পারেন নি।

৪. এই উক্তিটিও ১/২-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র। সুতরাং ১/২-এর সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সেই মন্তব্য এখানেও প্রযোজ্য। অধিক বলা অনাবশ্যক।

এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন :

৫. "কলিকাতা-শহরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিল হইতেছে একখানি পাথুরে দলিল। বহু কাল হইল, কলিকাতার অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী ইতিহাসবিৎ শ্রীযুক্ত Mesrobv J. Seth মেসরোভ সেথ্ মহাশয়, কলিকাতার আরমানী গির্জার সংযুক্ত গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধিফলকগুলির

মধ্যে একখানিতে নিম্নপ্রমাণে লিপি পাঠ করেন—'এই সমাধি-ফলক হইতেছে, দানশীল বণিক্ Sukias সুকিয়াস্-এর পত্নী Rezabeebeh রেজা-বীবা-র।' ইহাতে আরমানী সন-তারিখ দেওয়া হইয়াছে, হিসাব করিয়া খ্রীষ্টান বা ইংরেজী শকের ১৬৩০ (ভুল ক'রে ছাপা হয়েছে ১৬৩২—রা.মি.) অব্দ হয়।… ৬. এই লেখ হইতে জানা যায় যে, ১৬৩০ সালের দিকে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বশেষে ও শাহজাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে, কলিকাতায় আরমানী বণিক্-দের একটি কেন্দ্র ছিল, এবং এই কেন্দ্রে ইঁহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার আনিয়া বাস করিতেন। ইংরেজ Job Charnock যোব চার্নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রায় ৬০ বৎসর আগে—দুই পুরুষ আগে—আরমানীরা কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।"

আমার বক্তব্য :

৫. ক. কলকাতা শহরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিলখানি নিজেরই প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে, কলকাতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে না। যদি পাথুরে দলিলের গায়ে কলকাতার নাম লেখা থাকত, তাহলেই প্রমাণ হতো যে ১৬৩০ সনেও কলকাতা নামে এক গ্রাম বা শহর বাংলাদেশে ছিল। শোনা যায়, আমাদের কালীঘাটে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এককালে কতকগুলি রোমান বা গুপ্তযুগের (?) মুদ্রা পাওয়া যায়। তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, রোমানদের বা গুপ্তদের সময়ে কালীঘাট গ্রাম বিদ্যমান ছিল,বা ঐসব রোমানদের বা গুপ্তদের মুদ্রা কালীঘাটে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল।

খ. যে মেসরোভ সেথ্ ঐ দলিলখানি আবিষ্কার করেন তাঁরই ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৬৩০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো গ্রামে বা শহরেই আরমানি বণিকদের বাসবাস আরম্ভ হয় নি। পরবর্তীকালে সৈদাবাদ (মুর্শিদা-বাদের উপকণ্ঠ), চুঁচড়া, চন্দননগর, ঢাকা ও কলকাতা—বাংলাদেশের মাত্র এই ৫টি গ্রামে বা শহরে তাদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

মেসরোভ সেথ্ লিখেছেন : "Armenians formed their first settlement in Bengal in the year 1665 by virtue of a farman issued by Moghul Emperor Aurangzeb granting them a piece of land at Saidabad, with full permission to form a settlement there." সেযুগে মোগল সম্রাটগণ জমি ও অনুমতি না দিলে কোনো বিদেশীই ভারতের কোথাও বসবাস করতে পারত না।

চুঁচড়া সম্বন্ধে সেথ্ মশায় লিখেছেন : "The Armenians had attached themselves to their confreres in trade, the Dutch, at Chinsurah, in the year 1645 under the leadership of the famous

Margar family." এখানে সেথ্ সাহেবের ভাষা লক্ষণীয়। তিনি বলছেন না যে আরমানিরা ১৬৪৫ সনে চুঁচড়ায় বসবাস আরম্ভ করে। তা বললে তো তাঁরই আগেকার উক্তিকে খণ্ডন করা হয়। বলছেন তারা ঐ সনে ওলন্দাজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে, অর্থাৎ তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ভ করে। তাহলে নিশ্চয় তারা এই ব্যবসা বাংলার বাইরে থেকে চালাতো। বাংলা-দেশে আরমানিদের সর্বপ্রথম গির্জা ১৬৯৫ সনে চুঁচড়ায় নির্মিত হয়। সুতরাং ১৬৬৫ ও ১৬৯৫-এর মধ্যে কোনো সময়ে তারা চুঁচড়ায় বসবাস আরম্ভ করে।

আরমানিরা চন্দননগরে প্রথম কখন আসে, সেকথা সেথ্ সাহেব বলতে পারেন নি। মাত্র এইটুকু বলেছেন যে, চন্দননগরের ফরাসি কবরখানায় সব থেকে পুরনো আরমানি কবর আছে একজন বণিকের, যিনি মারা যান ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে।

সেথ্ সাহেবের মতে, ঢাকায় আরমানিরা বসবাস আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে বা তার পূর্বে আরমানিদের কলকাতায় বসবাস করার কথা অলীক কল্পনা মাত্র।

৬. ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দের কলকাতায় আরমানি বণিকদের একটি কেন্দ্র ছিল এবং এই কেন্দ্রে তারা স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস করত—একথা প্রথমে বলেন মেসরোভ সেথ্ সাহেব, তাঁকে অনুসরণ ক'রে সুনীতিবাবু এই প্রবন্ধে সেই কথা বলেছেন।

অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় Catchick Arakiel নামে এক ধনী আরমানি বণিক বাস করতেন। তিনি স্থানীয় আরমানি গির্জার অভ্যন্তরভাগ অলংকৃত করেন, গির্জার ঘড়ি-ঘরে যে ঘড়িটি আছে সেটি দান করেন, পুরোহিতদের বাসের জন্য বাড়ি তৈরি ক'রে দেন এবং গির্জা-সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রের চারিদিকে যে উঁচু পাঁচিল আছে সেই পাঁচিল নির্মাণ করিয়ে দেন। এঁরই পুত্র Agah Moses Catchick Arakiel কলকাতায় জন্মান অষ্টাদশ শতকে। তিনি ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে হক্‌সওয়ার্থ (Hawksworth) নামে এক সাহেবকে একখানি চিঠি লেখেন। হক্‌সওয়ার্থ সাহেব সেই চিঠিখানি *East Indian Chronologist* নামে এক পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। সেই চিঠিতে Arakiel সাহেব বলেছেন: "Shortly after the establishment of Calcutta by the English, the Armenians settled among them,...The site of the present Armenian Church was at that time their burying ground in which there are tombstones dated 80 years back and consequently older than the present church." বর্তমান আরমানি গির্জাটি তৈরি হয় ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে এবং তার সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে ঐ চিঠি লেখার সময় থেকে ৮০ বছর আগেকার, অর্থাৎ ১৭২০-২১ সনের সমাধি আছে।

১৬৩০ সনের রেজা বিবির কবর ছাড়া এই গোরস্তানে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় একটি কবর নেই। অন্য যেসব কবর আছে সবগুলিই অষ্টাদশ শতক ও পরবর্তী কালের। কেননা, ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে Kenanentch Phanoos নামে এক আরমানি নিজের সম্প্রদায়ের জন্য কবরস্তান করবার উদ্দেশ্যে ঐ জমি খরিদ করেন। ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে ঐ কবরস্তানের একপাশে Agah Nazar নামে অন্য একজন আরমানি গির্জাঘর তৈরি ক'রে দেন।

সপ্তদশ শতকের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কবর থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে ঐ সময়ে কলকাতায় আরমানিদের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। একটিমাত্র লোক দিয়ে তো আর উপনিবেশ হয় না! আরমানিরা কলকাতায় ১৬৩০ থেকে ১৭২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৯০ বছর স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস করল, অথচ তাদের মধ্যে আর একটি লোকও মরল না—এটা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? যদি মরত তবে নিশ্চয় কবর থাকত এবং যদি বাস করত নিশ্চয়ই মরত। সুতরাং ইংরেজ আসার দুই পুরুষ আগে কলকাতায় আরমানিদের উপনিবেশ ছিল—এটা একেবারে আষাঢে গল্প। কোন মোগল সম্রাট ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে বা তার পূর্বে আরমানিদের কলকাতায় বসবাসের অনুমতি দিলেন? সে অনুমতিপত্র কোথায়?

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে জোব চার্নকের কলকাতায় আসার পর যে আরমানিরা এখানে আসে তার আর একটি প্রমাণ দিচ্ছি।

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে Khojah Phanoos Kalanthar (বা Kalandar) নামে একজন বিখ্যাত আরমানি বণিক সুরাটে বাস করতেন। তাঁর এক ভাগ্নে ছিলেন। তিনি কলকাতার ইতিহাসে আরো বিখ্যাত। তাঁর নাম Khojah Israel Sarhad। মামা-ভাগ্নে দু'জনে মিলে ইংল্যাণ্ডে যান ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে। সেখানে তখন স্যার যোসিয়া চাইল্ড (Josiah Child) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টার-বোর্ডের চেয়ারম্যান। সেই সময়ে এই পদাধিকারীকে চেয়ারম্যান না বলে গভর্নর বলা হতো। বিলেতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের আরমানি সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুন তারিখে দু'টি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। কোম্পানির তরফে স্যার যোসিয়া চাইল্ড ও আরমানিদের তরফে খোজা ফানুস ও খোজা সরহদ স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় চুক্তিটির বয়ান ছিল এইরকম:

> The Honourable East India Company stipulated "that wherever forty or more of the Armenian nation shall become inhabitants of any of the garrisons, cities or towns belonging to the company in the East Indies, the said Armenians shall not only have and enjoy the free use and

exercise of their religion but there shall also be attached to them parcel of ground to erect a church thereon for the worship and service of God in their own way. And that we will also at our own charge, cause a convenient church to be made of timber which afterwards the said Armenians may alter and build with stone and solid material to their own good liking. And the said Governor and Company will also allow £ 50 per annum, during the space of seven years, for the maintenance of such priest or minister as they shall choose to officiate therein.

এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দু'বছর পরে জোব চার্নক ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে শেষবারের মতো কলকাতায় আসেন। তাঁর আসার ১৭ বছর পরে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে উপরে উদ্ধৃত চুক্তি অনুসারে ইংরেজ কোম্পানি বর্তমান আরমানি গির্জার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরমানিদের জন্য একটি কাঠের ছোট গির্জাঘর (chapel) তৈরি ক'রে দেন। আর পুরোহিতদের মাইনে বাবদ ৭ বছর পর্যন্ত ৫০ পাউণ্ড ক'রে বছরে দিয়ে যান। ১৭১৪ সনে এই সাহায্য বন্ধ হয়। এবং তার ১০ বছর পরে আরমানিরা ঐ কাঠের গির্জা পরিত্যাগ ক'রে ১৭২০ সনে কেনা কবরখানার হাতার মধ্যে পাকা গির্জাঘর তৈরি করে।

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে জোব চার্নকের আসার পর থেকে একটি-দু'টি ক'রে আরমানি বণিক কলকাতায় আসতে থাকে। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের আগে তাদের সংখ্যা চল্লিশেও পৌঁছায় নি। সুতরাং ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাস ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে সত্যিই ঐ সময়ে কলকাতায় তাদের একটি উপনিবেশ ছিল, তাহলে এটা কি আশ্চর্যের কথা নয় যে তাদের মতো ধনী ও ধর্মপ্রাণ জাত ৯৪ বছরের মধ্যেও নিজেদের জন্য একটা গির্জাঘর ও ৯০ বছরের মধ্যেও একটা গোরস্তান তৈরি করল না? প্রায় ১০০ বছর ধরে তারা রবিবারের উপাসনা করত কোথায়? মৃতের সৎকার করত কোথায়?

এতকিছু বলার পরেও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, ১৬৩০ সনের ঐ রেজা বিবির কবর সম্বন্ধে। ঐ কবরের ব্যাখ্যা কী? মেসরোভ সেথ্‌ সাহেব যাকে 'That renowned scholar' এবং 'Author of Early Annals of the English in Bengal' বলেছেন, সেই 'Late Professor C.R. Wilson' (উইলসন) কবরটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

Regarding the earliest grave of an Armenian in the Armenian churchyard in Calcutta, the tombstone is dated 11th

July, 1630 A. D. This has been taken as showing that the Armenians were established in Calcutta as early as 1630. The inference does not seem vaild. The instance is isolated. No other tombstones in the churchyard are dated earler than the 18th century. There is nothing to show that the stone is situ. It may well have been brought to Calcutta from elsewhere. An inscribed stone has recently been found in St. John's churchyard which must somehow have come from China. Even if the stone is in situ it does not prove the existence of an Armenian colony. In India a person must be buried where he dies. If an Armenian voyager died in a ship near Calcutta, it would be necessary to bury the body there.

কলকাতার 'পুরাতন প্রসঙ্গ' এখানেই সাঙ্গ হয় নি, 'দেশ' পত্রিকার আরো আধপৃষ্ঠা ধরে বিস্তৃত হয়েছে। তাতে আরমানিদের পরে পোর্তুগিজদের ও তাদের পরে ইংরেজদের কলকাতায় আগমন, ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে ঐ তিন জাতির কলকাতায় পাশাপাশি বাস ও বাণিজ্য-সম্পদের সমান অংশীদারী, ১৬৩৮খ্রীস্টাব্দে দিল্লি থেকে ইংরেজদের বাংলাদেশের অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে কতকগুলি বিশেষ সুবিধালাভ, ১৬৯৮ (ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে ১৭৯৮—রা.মি.) সনে বড়িষার সাবর্ণচৌধুরি জমিদারদের কাছ থেকে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম খরিদ, ১৬৯৯ সনে কলকাতা ইংরেজদের পুরো অধিকারে আসবার ফলে আরমানি ও পোর্তুগিজদের বাংলার বাণিজ্যে ও কলকাতায় প্রতিপত্তি হ্রাস, সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের সীমা ও ভৌগোলিক অবস্থিতি ইত্যাদি মামুলি ও সুপরিচিত বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এই বর্ণনায়ও কতকগুলি ভুল আছে। প্রথম: পোর্তুগিজদের পরে ইংরেজরা আসে নি, ইংরেজদের পরেই পোর্তুগিজরা এসেছে। দ্বিতীয়: আরমানি, পোর্তুগিজ ও ইংরেজ, এই তিন জাতির বাণিজ্য-সম্পদে সমান অংশীদারী কোনোদিনই ছিল না। পোর্তুগিজরা কলকাতায় ব্যবসা করল কবে? তারা তো ইংরেজদের সৈনিক হতো, কেরানি হতো, চাকর-বাকর হতো, এমনকি ক্রীতদাসও হতো। তাদের মধ্যে তো একমাত্র ব্যবসাদার Baretto ও De Suja পরিবার। এঁরা কলকাতার লোক নন। এসেছিলেন বোম্বাই থেকে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তৃতীয়: ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলাদেশের আন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে দিল্লি থেকে কোনো বিশেষ সুবিধালাভ করে নি। পরে করেছে। চতুর্থ: সাবর্ণচৌধুরীদের কাছ থেকে ইংরেজরা ৩টি গ্রাম খরিদ করে নি, ৩টি গ্রামের খাজনা

আদায়ের স্বত্ব খরিদ করে।

এইসব মামুলি ইতিহাস শুধু শোনাবার জন্যই শোনানো হয়েছে। অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কলকাতার পাথুরে দলিলের কথাও শুধু আরমানিদের ইতিহাস শোনাবার জন্যে পাড়া হয়েছে। বিপ্রদাস ও মুকুন্দরামের কাব্যের উল্লেখের তবু অর্থ বোঝা যায়। অর্থ হচ্ছে দেখানো যে 'কালীঘাট' নাম থেকে কলকাতা নাম হয় নি। নেতিবাচক প্রমাণ হলেও 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি-র সঙ্গে তার কিছুটা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আইন-ই-আকবরীর আলোচনা কি জন্য? তাতে তো কালীঘাটের নাম নেই। ঐ দু'টি কাব্য ও একটি ইতিহাসগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যদি লেখক প্রমাণ করতে পারতেন কলকাতায় সেইযুগে শামুক-পোড়া কলিচুনের উৎপাদন ও ব্যবসা এবং তজ্জনিত তার সমৃদ্ধি ও খ্যাতি ছিল, শুধু তাহলেই ঐ গ্রন্থগুলির আলোচনা সার্থক এবং প্রবন্ধের যা একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল তা সিদ্ধ হতো। তা না ক'রে লেখক আমাদের কতকগুলি প্রাচীন পুস্তকে 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ দেখিয়েছেন মাত্র। তিনি যেন ধরে নিয়েছেন শুধু এর দ্বারাই কলকাতার প্রাচীন সমৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রমাণ করা যায়। এ ধারণা (যদি তাঁর সত্যই থেকে থাকে) একান্তই ভুল। কোনো গ্রন্থে কোনো স্থানের উল্লেখ থাকলেই প্রমাণিত হয় না যে সে স্থান বিখ্যাত। মনসামঙ্গল কাব্যে 'জমিন', 'বুড়নিয়ার দেশ'-এর উল্লেখ আছে। কেউ তাদের নাম কখনো শুনেছে? আইন-ই-আকবরীতে তথাকথিত কলকাতার সঙ্গে 'বকোয়া' ও 'বারবাকপুর'-এর উল্লেখ আছে। এদের পরিচয় কেউ জানে? সুতরাং এইসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক আলোচনা একেবারে অবান্তর ও নিরর্থক। এই দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে লেখক একবারও একথা বলেন নি যে ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ বা তার আগে থেকেই কলকাতায় কলিচুন তৈরি হতো, নতুবা গ্রামের নাম কলকাতা হতে পারত না। একথাটি তিনি অনেক পরে এবং অন্য প্রসঙ্গে কথায় কথায় বলেছেন—"এখন হইতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত বৎসর পূর্বে" (৫/৮ দ্রষ্টব্য)। প্রবন্ধের প্রায় শেষে আর একটি বাক্যে এই কথারই অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—"সম্ভবতঃ প্রথমটায় এই গ্রামে শামুক-পোড়া (কাতা) চুন বা কলিচুন প্রস্তুতই ইহার লক্ষণীয় ব্যবসায় ছিল।"

এই সুদীর্ঘ আলোচনা লেখকের আসল প্রস্তাবের ভূমিকা মাত্র। এইবার তিনি "কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি"র কথা আরম্ভ করেছেন।

৪

সুনীতিবাবু লিখেছেন: ১. "'সুতানুটী' নাম সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সুতানুটীতে সুতার হাট বা বাজার বসিত—সুতার নুটী,

অর্থাৎ জড়াইয়া গোলাকার তাল বা পিণ্ড করিয়া রাখা সুতা, বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইত বলিয়া ঐ নাম।

২. হয়তো ঐ অঞ্চলের আদি নাম ছিল 'চিৎপুর', পরে চিৎপুরের অন্তর্গত বা সন্নিকটে যে 'সুতার নুটীর হাট' বসিত, তাহাই 'সুতানুটীর হাট' বা 'সুতানুটী-হাট' রূপে পরিচিত হয়, ও শেষে সংক্ষেপে হাট ও হাটের সংশ্লিষ্ট স্থানেরই নাম দাঁড়ায় 'সুতানুটী'।

৩. এই 'সুতানুটী' নামেরই অনুরূপ 'কলিকাতা' নাম।

৪. 'কলিকাতা'—একটি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ।

৫. ইহার অর্থ, 'কলি' বা কলিচুনের জন্য 'কাতা' বা শামুক পোড়া।

৬. সুতার নুটী বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন 'সুতানুটী' নাম, তেমনি কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা হইতে 'কলি-কাতা' নাম।

৭. পাথরিয়া চুন দক্ষিণ-বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়।

৮. এই চুন দেওয়ালে চুনকাম করিবার বা 'কলি ফিরাইবার' জন্যই প্রশস্ত, সেই জন্য ইহাকে কলিচুন বলে।

৯. শামুক-পোড়ানো চুন জৈব পদার্থের বিকার বলিয়া, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর অন্য ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবারা ঐ চুন দিয়া পান খাইতেন না।

১০. পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে সুলভ হওয়ার পূর্বে, ঐ কারণে পান খাওয়াই সদাচার-পালনের বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত।

১১. 'কলি'-শব্দ বাঙ্গালায় সুপরিচিত। 'কাতা' শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি।···উত্তর-বঙ্গে রাজশাহী জিলায়, শামুক পোড়াইয়া, তাহাতে জল দিয়া চুনে রূপান্তরিত করিবার পূর্বে, পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে 'কাতা' বলে। পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে বাঙ্গালাদেশে কোনও-কোনও অঞ্চলে 'বাথারী'ও বলে।···

১২. 'কলি' শব্দ (হিন্দুস্থানীতে 'কলী') দেওয়ালে লাগাইবার জন্য শামুক-পোড়া চুন অর্থে উত্তর-ভারতে সুপ্রচলিত। শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত।···

১৩. বাঙ্গলায় ও উড়িয়াতে 'কাতা, কতা' শব্দ 'নারিকেল-দড়ি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেও 'কাতা' শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। 'কলি' ও 'কাতা' অর্থাৎ কলিচুন ও নারিকেল-দড়ি, এই দুই জিনিসের নাম হইতে 'কলিকাতা' নামের উদ্ভব, এরূপ ব্যাখ্যা যদি কেহ করেন, তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া বলিবার কিছু নাই ;···

১৪. কিছু কাল পূর্বে আমি 'কাতা' শব্দকে চলিত বাঙ্গলা 'কাত' অর্থাৎ 'পার্শ্বদেশ' অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম ('কলির কাতা'—'কলিচুনের স্থান বা

আড়ত')। এখন সে ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে করি না।"

আমার বক্তব্য :

১. ১-এ আছে 'সুতানুটীতে সুতার হাট বা বাজার বসিত'। আবার ৬-এ আছে 'শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা'। আবার ৫/৮-এ আছে 'কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত'।

তিনটি জায়গায় ৪টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—হাট বা বাজার, আড়ত এবং কারখানা। 'আড়ত' শব্দটি দু'বার, অন্য ৩টি শব্দ একবার ক'রে ব্যবহার করা হয়েছে।

আজ থেকে ৪০০।৫০০ বছর আগেকার কথা বলা হয়েছে। অতদিন আগে বাংলাদেশের কোথাও কি বাজার, আড়ত কিংবা কারখানা ছিল? অন্তত সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিন গ্রামে ছিল না।

'হাট' বা 'বাজার'—এখানে বাজার কি হাটের সমার্থক শব্দ? অর্থাৎ হাট মানে যা, বাজার মানেও তা? তা কখনোই নয়। হাট একদিন মাত্র বসে, সেইদিনই ভাঙে। বাজার ভাঙে না, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। হাটে আড়ত থাকে না, বাজারে থাকে, কেননা আড়তও স্থায়ী। হাট প্রাচীনতর; বাজার, আড়ত, কারখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সমাজ ও শিল্প-বিবর্তনের আদিতে হাট, পরবর্তীকালে গঞ্জ, বাজার, আড়ত, কারখানা দেখা দেয়। ৪০০।৫০০ বছর আগে বাজার, আড়ত, কারখানা থাকা সম্ভব ছিল না। শুধু হাট থাকাই সম্ভব ছিল। সুতরাং সময়ের দিকে লক্ষ্য না রেখে ঐ শব্দগুলি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লেখা উচিত ছিল—শামুকের, চুনের, কাতা চুনের, শামুক-পোড়া কাতার হাট ছিল। সুতানুটি 'বাজার' কেউ কখনো শোনে নি, সকলেই শুনে এসেছে সুতানুটির 'হাট'।

২. 'হয়তো' সুতানুটি হাট অঞ্চলের 'আদি নাম ছিল চিৎপুর'। 'হয়তো' কেন? ঐ অঞ্চলের আদি নাম কোনোদিনই চিৎপুর ছিল না। চিৎপুর বাগবাজারের খালের পরপারে উত্তরদিকে আগেও ছিল, আজও আছে। যখন খাল ছিল না তখনো চিত্তেশ্বরীর মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চলকে চিত্তেশ্বরীপুর বা চিৎপুর বলা হতো। বর্তমান 'চিৎপুর রোড'-এর পার্শ্ববর্তী স্থান চিৎপুর নয়। চিৎপুর রোডের পুরো নাম Road to Chitpur, অর্থাৎ চিৎপুরে যাবার রাস্তা। এ রাস্তারও নাম আগে চিৎপুর রোড ছিল না, ছিল Pilgrim Path বা Road to Collegot) তীর্থযাত্রীদের রাস্তা বা কালীঘাটে যাবার রাস্তা)। সুতানুটি হাট চিৎপুরের অন্তর্গত তো ছিলই না, সন্নিকটেও ছিল না। চিৎপুর থেকে অনেক দূরে গঙ্গার ধারে ছিল। সুতানুটির হাট বসত হাটখোলায়। ঐ হাটের জন্যই হাটের স্থানের নাম হয়েছে 'হাটখোলা'।

৩. "সুতানুটী নামেরই অনুরূপ কলিকাতা নাম" হয়েছে—বলেছেন সুনীতিবাবু, এবং আরো দুই জায়গায়—৬ ও ৫/৮-এ ঐ উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

একটু আগেই দেখলাম 'বাজার', 'আড়ত', 'কারখানা'—এসব শব্দ ব্যবহার করা ভুল হয়েছে। ব্যবহার করা উচিত ছিল 'হাট' শব্দ। কিন্তু সুনীতিবাবু একবারও কলিচুন সম্পর্কে 'হাট' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। না করবার কারণ আছে। কেউ কখনো যেমন 'সুতানুটি বাজার'-এর কথা শোনে নি, তেমন 'কলিচুন বা কাতাচুনের হাট'-এর কথাও শোনে নি। কলিচুনের হাট ছিল না, তাই শোনে নি। থাকলে শুনত। সুতানুটি হাটের মতো যদি কলিচুনের হাট একটা থাকত তাহলে সুতানুটির অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ঐ হাটের নাম থেকে কলিকাতা নাম হতে পারত। সুতরাং যতবারই যতরকম ভাষাতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাপারটাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়ে থাক-না কেন, সে চেষ্টা সফল হয় নি। অতএব 'সুতানুটি' নামের অনুরূপ 'কলিকাতা' নাম হয়েছে, একথা আদৌ বলা চলে না।

৪. লেখক এখানে বলেছেন 'কলিকাতা' একটি খাঁটি বাংলা শব্দ। আবার ১২-তে বলেছেন "কলি শব্দ (হিন্দুস্থানীতে 'কলী')…ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত।" পরস্পরবিরোধী উক্তি এবং 'কলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি লেখক জানেন না, একথা অবিশ্বাস্য শোনায়।

আসলে শব্দটি 'কলি' নয়—'কলী'। এটি হিন্দুস্থানী শব্দ নয়, আরবি শব্দ—আরবি থেকে হিন্দুস্থানিতে এসেছে। পুরো শব্দটি Al-qualy। Al= the, qualiy=ash বা calcined ash। ইংরেজিতে শব্দটির রূপ Alkali। Potash, Soda ও Lime (চুন)—এই ৩টি Alkali। তুলনীয় ইংরেজি শব্দ Alchemy, Algebra, A[illegible]ohol।

'কলী' বা 'কলি' যদি আরবি শব্দ হয়, 'কলিকাতা' খাঁটি বাংলা শব্দ হতে পারে না। এটা মিশ্র (hybrid) শব্দ—[illegible]রবি 'কলি' ও বাংলা 'কাতা' মিলিয়ে বাংলায় 'কলিকাতা' শব্দ হয়েছে।

'কলী' বা 'কলি' শব্দ *Hobson-Jobson*-এ নেই।

৫. 'কাতা' শব্দ নিয়ে সুনীতিবাবু বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। নানা জায়গায় নানা মানে করেছেন,—যথা: ১. শামুকের আড়ত [দ্র. ৬], ২. চুনের কারখানা [দ্র. ৬], ৩. শামুকপোড়া [দ্র. ৫], ৪ [illegible] শুধু) চুন [দ্র. ১১), ৫. পোড়ানো শামুক [দ্র. ১১], ৬. নারিকেল-দড়ি [দ্র. ১৩], ৭. আড়ত [দ্র. ১৪]। সর্বশেষ অর্থটি এখন তিনি ত্যাগ করেছেন। সেটি ছেড়ে দিলেও একই 'কাতা' শব্দ ৬টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলে গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কোনো একটা সুস্পষ্ট মানে পাওয়া যায় না। 'কলি' শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করলে একটা কিম্ভূতকিমাকার বা জবড়জঙ্গ মানে দাঁড়ায়।

সুনীতিবাবু 'কলিকাতা' শব্দের তিন জায়গায় তিনরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যাখ্যা তিনটি উত্তরোত্তর বেশি ঘোরালো-প্যাঁচালো, লম্বা ও জটিল হয়ে উঠেছে। সেই তিনটি ব্যাখ্যা পরপর নিচে তুলে দিচ্ছি :

ক. "কলি বা কলিচুনের জন্য কাতা বা শামুকপোড়া।" [দ্র. ৫]

খ. "কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা।" [দ্র. ৬]

গ. "জোঙ্গড়া চুন, শামুক-পোড়া কলিচুনের ও অন্য চুনের কাজের জন্য 'কলি-কাতা' বা কলিচুন এবং কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত।" [দ্র. ৫/৮]

লক্ষণীয় যে, খ-এর অর্থ ক-এর অর্থের চেয়ে জটিল। আবার, গ-এর অর্থটি খ-এর অর্থের চেয়ে আরো জটিল ও ঘোলাটে ; ভাষা সেখানে এমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যে জট ছাড়িয়ে একটা সুস্পষ্ট মানে করাই দায়।

খ-চিহ্নিত ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে—"কলির বা চুনের ও কলিচুনের"। 'বা' এবং 'ও' শব্দের মানে কী ? 'বা'-এর পর শুধু 'চুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কেন ? 'কলি' মানে কি শুধু 'চুন' ? তাহলে পাথুরে চুনও কি কলি ? 'ও কলি-চুনের'ই বা কী অর্থ ? কোনো অর্থই তো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

গ-চিহ্নিত ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত 'ও অন্যচুন' কী ? পাথুরে চুন ?

যখন 'কাতা' শব্দেরই অর্থ পরিষ্কার করা দরকার, তখন ব্যাখ্যার মধ্যে 'কাতা-চুন' ও 'কাতার আড়ত' শব্দ ব্যবহার করা উচিত হয় নি। ক্ষণে ক্ষণে অর্থ পরিবর্তন না ক'রে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে 'কাতা' শব্দটিকে ব্যবহার করা উচিত ছিল।

৬. "পাথরিয়া চুন দক্ষিণ-বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়।"—লিখেছেন সুনীতিবাবু ১৯৩৮ সনে। অর্থাৎ ১৯৩৮ সনেও দক্ষিণবঙ্গে শামুক ও ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি হতো। 'রসপুর-কলিকাতা' ছাড়া আর কোথায় হতো ? এখন কি হয় না ? যদি না হয়, কলি ফেরানো হয় কোন চুনে ? যদি দক্ষিণবঙ্গে পাথুরে চুন হতো, তাহলেও কি শামুক ও ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি করবার দরকার হতো ? যেখানে পাথুরে চুন হয়, সেখানেও কি কলি ফেরাবার জন্যে শামুকপোড়া চুন দরকার হয় ?

৭. 'কলিচুন' মানেই কি শামুক ও ঝিনুক পোড়া চুন ? পাথুরে চুন কি 'কলিচুন' নয় ? সে চুন দিয়ে কি কলি ফেরানো যায় না ?

শামুক ও ঝিনুক পোড়ানো চুন, দেওয়ালে কলি ফেরানো ছাড়া অন্য কোনো কাজে লাগে না ? যদি লাগে, কি কি কাজে লাগে ?

৮. নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবারা শামুক পোড়ানো চুন না খেতে পারেন, আর সকলে খেতেন ? না, খেতেন না ?

৯. "পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে সুলভ হওয়ার পূর্বে…পান খাওয়াই সদাচার-পালনের বিরুদ্ধ" ছিল। কিন্তু সুলভ হওয়ার পরে কি হল? আর সদাচার-বিরুদ্ধ রইল না, এমনকি নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাদের পক্ষেও?

শামুক পোড়ানো চুন জৈব পদার্থের বিকার বলে নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবারা এই চুন দিয়ে পান খেতেন না, তা নয়। তাঁরা মোটেই পান খেতেন না। পাথুরে চুন দিয়েও না।। অল্পবয়স্ক বালক ও ছাত্ররাও পান খেত না। এদের ও বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হতো। পান খাওয়া বিলাস বলে গণ্য হতো। বিলাস ব্রহ্মচর্যের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হওয়ায় বর্জনীয় ছিল।

৬ থেকে ৮ উপবিভাগে পাথুরে ও শামুক চুনের উৎপাদন ও ব্যবহার, পাথুরে চুনের দক্ষিণবঙ্গে দুষ্প্রাপ্যতা, শামুক চুনের কলি ফেরাবার কাজে প্রশস্ততা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে। সেইজন্যে 'চুন' সম্বন্ধে এখানে কিছুটা বিস্তৃত আলো-চনা দরকার। তাহলে বোঝা যাবে, সুনীতিবাবু যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা কতখানি সত্য ও গ্রহণযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা আমি সাধ্যমতো সংক্ষিপ্ত করব।

চুন

চুনের আকর দু'রকম—১. শামুক, ঝিনুক, জোংড়া (বড় শামুক) ও প্রবাল (coral) এবং ২. চুনের পাথর। প্রথমগুলি পুড়িয়ে বাখারি চুন ও দ্বিতীয় জিনিসটি পুড়িয়ে পাথুরে চুন পাওয়া যায়।

বাখারি চুন (shell-lime)

বাখারি মানে শক্ত খোলা। সংস্কৃতে বল্কল—বাকল বা গাছের ছাল, তা থেকে মানে—কঠিন আচ্ছাদন বা বর্ম। বাংলাদেশে প্রবাল পাওয়া যায় না। এখানে শামুক, ঝিনুক, জোংড়ার শক্ত খোলা পুড়িয়ে এই চুন তৈরি হতো। শামুক ও ঝিনুক জলচর প্রাণী। মাদ্রাজে ডাঙার শামুকও পাওয়া যায়। তারা জঙ্গলে থাকে। ঝিনুক তিনরকম—একরকম ঝিনুক লোকে খায়, একরকম থেকে মুক্তো হয়, আর একরকম থেকে চুন হয়। শামুক ও চুনের ঝিনুক মিষ্টিজলের বিল, ঝিল, পুকুরেও হয়; আবার নোনা জলেও হয়। মিষ্টি জলের শামুক ধান-ক্ষেতেও পাওয়া যায়। মিষ্টিজলের শামুক-ঝিনুকের চেয়ে নোনাজলের শামুক-ঝিনুক আকারে অনেক বড় হয়। কলকাতার পাশে ধাপা বা লবণ হ্রদে ও সুন্দরবনে বড় বড় শামুক ও ঝিনুক প্রচুর হয়। শুনেছি, একসময়ে এই দুই জায়গার শামুক ও ঝিনুক পোড়া চুন কলকাতায় আমদানি হতো। পূর্বদিক থেকে আসত বলে এই চুনের প্রবেশদ্বার ছিল বেলেঘাটা। তাই বেলেঘাটা বহুকাল থেকেই চুনের আড়তের জন্যে বিখ্যাত। দ্রষ্টব্য যে, ধাপা বা সুন্দরবন

অঞ্চলে একসময়ে বাখারি চুন তৈরি হলেও সেখানে একটা গ্রামও নেই যার নাম 'কলিকাতা'।

আবার, ধাপা ও সুন্দরবনের চেয়ে ঢের বড় শামুক ও ঝিনুক হয় সমুদ্রের নোনা জলে। তাই, মাদ্রাজের করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের বাখারি চুন বহুদিন যাবৎ কলকাতার বাজার একচেটিয়াভাবে দখল করেছিল। মাদ্রাজে উৎকৃষ্ট পাথুরে চুন তৈরি হলেও কলকাতার সাহেবেরা Chunam বলতে মাদ্রাজের বাখারি চুনকেই বুঝত।

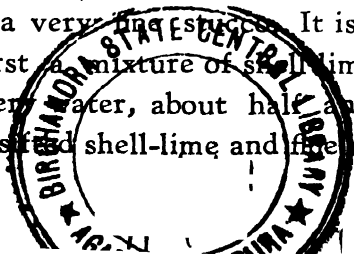
বাখারি চুন বিশুদ্ধ চুন। একে ইংরেজিতে rich বা fat lime বলে। এই চুনের ব্যবহার তিনরকম,—ক. পানের সঙ্গে খাবার জন্য, খ. ইমারতে পঙ্খের কাজ (stucco)-এর জন্য, গ দেওয়ালে চুনকাম করবার জন্য। বাখারি চুনের দাম পাথুরে চুনের দামের চেয়ে ৪।৫ গুণ বেশি। সেইজন্য এই চুন দেওয়ালে কলি ফেরাবার কাজে বিশুদ্ধ পাথুরে চুনের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে না।

পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজদের ভাগ্য ফিরে গেল। তারা চৌরঙ্গি অঞ্চলে ও এসপ্লানেড রো-তে নতুন নতুন বাড়ি তুলতে লাগল। একজন ইংরেজ লেখক সেই অবস্থা বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

> Palace rose upon palace with classic portico, column and balustrade, each simulating the glories of ancient Rome. Everywhere there was elegance and refinement. The insides of the houses similarly took on a new beauty with the introduction of 'chunam, a type of plaster made from powdered oyster shells brought from the Coromondol coast, which, when applied to the walls and staircases, gave a fine glossy finish nearly as beautiful as marble.—*Eastern Interlude: A Social History of the European Community in Calcutta* by R. Pearson.

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, 'চুনাম' অর্থে মাদ্রাজের উপকূল থেকে আনা ঝিনুক-চুনকেই বোঝাত ও তা দিয়ে বাড়ির দেওয়াল প্রভৃতিতে পঙ্খের কাজ করা হতো। মাদ্রাজের বাখারি চুন যে পঙ্খের কাজের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ছিল এবং একমাত্র বাখারি চুন ছাড়া অন্য কোনো চুন দিয়ে এই কাজ হতো না, সেকথা আর একটি প্রামাণিক পুস্তক থেকে পাচ্ছি। তাতে লেখা আছে :

> Madras *Chunam* is a very fine stucco. It is laid on in three coats, the first a mixture of shell-lime and sand, tempered with jaghery water, about half an inch thick; the second made of sifted shell-lime and fine sifted white



sand without jaghery, as it would colour the plaster. The third coating which receives the polish is prepared with great care; the finest and whitest shells being selected for the lime, and mixed with from ¼ to ⅙th of the volume of the finest white sand. —*Thomason Civil Engineering College Manual* (new series), No. 1a—Limes, Mortars and Cements: compiled by Capt. C. C. Moncrieff R. E., 4th edition: edited by Major A. M. Lang R. E., Roorkee.

Hobson-Jobson-এ আছে:

1750-60—The flooring is generally composed of a kind of loam or stucco, called chunam, being a lime made of burnt shells.—Grose

1809—The row of chunam pillars which supported each side...were of shining white. —Lord Valentia

এই পন্থের কাজই হয়ে দাঁড়ায় পরবর্তীকালে বাখারি চুনের প্রধান ব্যবহার। কিন্তু প্রাচীনকালে এর প্রধান ব্যবহার ছিল পানের চুন হিসেবে। *Hobson-Jobson*-এ প্রমাণ আছে:

1510—And they also eat with the said leaves (betel) a certain lime made from oyster shells which they call cionama.—Varthema

1673—The natives chew it (betel) with chinam (lime of calcined oyster shells).—Freyer

1689—Chinam is lime made of cockle-shells or lime stone; and Pawn is the leaf of a tree.—Ovington

দ্রষ্টব্য: *Hobson-Jobson*-এ চুন সম্বন্ধে যতগুলি উদ্ধৃতি দেওয়া আছে তাদের মধ্যে একটিতেও দেওয়ালে কলি ফেরাবার জন্য বাখারি চুনের ব্যবহারের উল্লেখ নেই।

পাথুরে চুন

আগেই বলা হয়েছে, চুনের পাথর পুড়িয়ে পাথুরে চুন হয়। চুনের পাথরের ইংরেজি রাসায়নিক নাম কার্বোনেট অফ ক্যালসিয়াম ($CaCo_3$), আর পাথুরে চুনের নাম অক্সাইড অফ ক্যালসিয়াম (CaO)। কোনো কোনো চুনের পাথরে চুনের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো থাকে। এরকম পাথরকে সালফেট অফ লাইন বা জিপসাম (Gypsum) বলে। জিপসাম পুড়িয়ে যে চুন হয়

তাকে প্লাস্টার অফ প্যারিস(Plaster of Paris) বলে। তা বড় বড় অট্টালিকার স্তম্ভ ও ভেতর-দেওয়ালের প্লাস্টার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। এরকম পাথর সচরাচর পাওয়া যায় না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চুনের পাথরে চুনের সঙ্গে কার্বোনিক অ্যাসিড মেশানো থাকে। যে পাথরে এক হাজার ভাগের মধ্যে ৪৩৬ ভাগ কার্বোনিক অ্যাসিড ও ৫৬৪ ভাগ চুন থাকে, তাকে বিশুদ্ধ পা৲র ও সেই পাথর থেকে যে চুন হয় তাকে বিশুদ্ধ চুন বলে। শাদা চা খড়ি ও রাজস্থানের মাকরানা মার্বেল পাথর বিশুদ্ধ চুনের পাথর।

আবার,কোনো কোনো পাথুরে চুনের সঙ্গে অ্যালুমিনা, সিলিকা, ম্যাগনেসিয়া, ম্যাঙ্গানিজ, অক্সাইড অফ আয়রন ইত্যাদি মেশানো থাকে। এইরকম পাথর অবিশুদ্ধ পাথর। কঙ্কর বা খোয়া,যা পুড়িয়েঘুটিং চুন হয় তা অবিশুদ্ধ পাথর। তার চুনও অবিশুদ্ধ চুন। অবিশুদ্ধ চুনে জল ঢাললে তা ক্রমশ পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। সেইজন্য এই চুনকে হাইড্রলিক (Hydraulic) চুনও বলা হয়। এই চুন ইমারতের গাঁথুনিতে ব্যবহার করা হয়। বিশুদ্ধ চুনে জল ঢাললে তা শক্ত হয় না, গলে যায়। এই চুনকেই rich বা fat চুন বলে। এই চুন পানে খাবার জন্য ও দেওয়ালে চুনকাম করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাখারি চুন ও বিশুদ্ধ পাথুরে চুন —দুইই rich বা fat চুন। সুতরাং বিশুদ্ধ পাথুরে চুন কলি ফেরাবার কাজে অনায়াসেই বাখারি চুনের বিকল্পে বা পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। এই চুনের দামও বাখারি চুনের দামের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ কম। সুতরাং খাঁটি পাথুরে চুন পেলে লোক অত দাম দিয়ে বাখারি চুন ব্যবহার করতে যাবে কেন?

পাথুরে চুন নানাপ্রকার। তার মধ্যে সিলেট চুন, কাটনি চুন, মাইহার চুন, বিসরা চুন ও সাতনা চুন প্রধান। এদের মধ্যে আবার ছাতক বা সিলেট চুন সর্বোৎকৃষ্ট চুন। আসামের খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এই চুনের পাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সিলেট চুনের বিশুদ্ধতা ও প্রাচুর্য সম্বন্ধে রবার্ট লিণ্ডসে (Robert Lindsay) সাহেব (যিনি ১৭৭৮-এ সিলেট জেলার কালেকটার ছিলেন) লিখেছেন :

> The mountiain was composed of the purest alabaster lime and appeared in quantity equal to the supply of the whole world....The only great staple and steady article of commerce (in the Sylhet district—R. M.) is chunam or lime. In no part of Bengal or even Hindustan, is the rock found so perfectly pure or so free of alloy, as in this province. Therefore, Calcutta is chiefly supplied from hence.

বাখারি চুন বাংলাদেশে এতই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল যে কলিচুন হিসেবে কচিৎ এ চুন ব্যবহৃত হতো। আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে বিশুদ্ধ ও প্রচুর শস্তা সিলেট চুন বরাবর ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ফার্মিঙ্গার (Archdeacon Firminger) সাহেব লিখেছেন :

> ...the lime referred to was Sylhet lime, and came from Khasi and Jaintia Hills which contain inexhaustible beds of limestone. Sir William Hunter states that from time immemorial a large part of the supply of Bengal has been derived from this source.—*Imperial Gazetteer of India*, vol. I, p. 348.

বাকি রইল একটি প্রশ্ন। সত্যসত্যই কলি ফেরাবার কাজে বাখারি চুনের পরিবর্তে বিশুদ্ধ পাথুরে চুন ব্যবহার করা চলে কিনা ও বাংলাদেশে ব্যবহার করা হতো কিনা। পূর্বোক্ত রুরকির *Thomason Civil Engineering College Manual*-এর মতো প্রামাণিক গ্রন্থে লেখা আছে :

> White-wash. The interior walls of Indian houses, as also in some cases the exterior, are generally white-washed in lieu of being painted or papered. 'White-wash' is merely a thin solution of slaked lime, with some ingredient, as gum, glue or rice-water, to render it adhesive to the walls....For 1000 superficial feet of ordinary white-wash are required 1' seers of stone-lime and ·05 chitacks of gum.

এই পুস্তক প্রকাশিত হয় একশো বছরেরও বেশি আগে ১৮৭৩খ্রীস্টাব্দে। এতে চুনকামের (white-wash) জন্য বাখারি চুনের উল্লেখমাত্র নেই। শুধু এই বইয়েই নয়, আমি সরকারি-বেসরকারি পুস্তক, পুস্তিকা, বিবরণ, রিপোর্ট, কাগজপত্র যথাসাধ্য খুঁজেও কলি ফেরাবার জন্যে বাখারি চুনের ব্যবহারের কথার, অথবা কলকাতায় যে এই চুন কস্মিনকালে তৈরি হতো, তার উল্লেখ পাই নি।

৫

তারপর সুনীতিবাবু লিখেছেন :

১. "কলিকাতা-গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তুত হইত, তাহার নিদর্শন আছে।

২. এখনকার বহুবাজার স্ট্রীট (অষ্টাদশ শতকে এই রাস্তা 'বৈঠকখানা স্ট্রীট' নামেও পরিচিত ছিল) খাস কলিকাতা-গ্রাম বা নগরের একটি প্রধান রাস্তা— পূর্ব হইতে পশ্চিমে শহরের মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল। এই রাস্তার উত্তর ধারে যে এক সময়ে চুনের কাজ হইত, কতকগুলি রাস্তা ও পল্লীর নামে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

৩. বহুবাজার স্ট্রীটের উত্তরে 'চুনাগলি' পল্লী, মেটে বা কালো ফিরিঙ্গীদের (অর্থাৎ পোর্তুগীস ও অন্য ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় খ্রীষ্টানদের) বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

৪. এখন যেখান দিয়া নূতন রাস্তা 'চিত্তরঞ্জন আভেনিউ' গিয়াছে, বহু-বাজারের উত্তরে সেই অঞ্চলে, অর্থাৎ চিৎপুর ও ছাতাওয়ালা গলির পূর্বে এবং আধুনিক কলেজ স্ট্রীট-এর পশ্চিমে মাঝামাঝি একটি স্থানে 'চুনারীতলা' (Chunarytollah)নামে একটি পল্লীর উল্লেখ, অষ্টাদশ শতকের কলিকাতার পুরাতন নকশা ও কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়।

৫. এই চুনারীতলা-তে 'চুনারী' বা চুনের কাজ করিত, এমন লোকেরা বাস করিত। এখন যেমন 'শাঁখারীটোলা'-তে একঘরও শাঁখারী নাই, তেমনি 'চুনারীতলা' হইতে চুনারীদের অস্তিত্ব অনেককাল হইল লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেও তাহাদের অধ্যুষিত পল্লীর নাম তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া বিদ্যমান ছিল এবং 'চুনাগলি'র রাস্তা ও পল্লীর নামে এখনও তাহাদের ব্যবসায়ের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

৬. চুনারীতলার আরও একটু পূর্বে,এখনকার কলেজ স্ট্রীট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মধ্যে লেডি ডাফরিন হাসপাতালের সন্নিকটে, বহুবাজার স্ট্রীট হইতে বাহির হইয়াছে 'চুনাপুখুর লেন'। এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

৭. সুতরাং, খাস কলিকাতা-গ্রামে, উত্তর হইতে দক্ষিণে মিলিত সুতানুটী ও কলিকাতা গ্রামদ্বয়ের মেরুদণ্ডস্বরূপ চিৎপুর রোড ও কসাইটোলা রোডের (এখনকার বেন্টিক স্ট্রীটের) পূর্বে কলিকাতা গ্রামের পূর্ব-সীমানায় বৈঠকখানা পর্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত ছিল, তাহার উত্তরে অনেকখানি জুড়িয়া—'চুনাগলি, চুনারীতলা ও চুনারীপুখুর' অঞ্চলগুলিকে আশ্রয় করিয়া—চুনের কাজ হইত।

৮. সুতানুটী গ্রাম যদি সুতার ব্যবসায়ের জন্য, তাঁতের কাপড়ের জন্য, (কলিকাতার আদি অধিবাসীদের মধ্যে তন্তুবায়-জাতীয় লোকেরা প্রধান ছিল, একথা স্মরণ করিতে হইবে) ক্রমে ঐ নাম পাইয়া থাকে, জোঙ্গড়া চুন, শামুক পোড়া কলিচুনের ও অন্য চুনের কাজের জন্য 'কলি-কাতা' বা কলিচুন এবং কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত হিসাবে, এখন হইতে সাড়ে

চারিশত-পাঁচশত বৎসর পূর্বে, দ্রব্যের নাম হইতে স্থানের নাম-স্বরূপ এই নাম গৃহীত হইয়া যাইতে কোনও বাধা নাই।"

আমার বক্তব্য :

১. প্রথমত, এত সময় থাকতে সুনীতিবাবু 'অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ' বেছে নিতে গেলেন কেন? ১৬৯০ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ তো কলকাতার ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বা প্রাগৈতিহাসিক যুগ। এ যুগের বিশেষ কোনো লিখিত বিবরণ বা কাগজপত্র নেই। সুতরাং কাগজপত্রের সাহায্যে তো প্রমাণ করবার উপায় নেই যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতা গ্রামে চুন তৈরি হতো।

দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকে চুন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে গেল! আগে সুনীতিবাবু আমাদের বলেছেন যে, দক্ষিণবঙ্গে ইং ১৯৩৮ সন পর্যন্ত বাখারি চুন তৈরি হতো (৪/৬ দ্র.)। কলিকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে। তা সত্ত্বেও, এখন জানলাম যে অন্তত কলকাতা গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঐ চুন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আড়াইশো বছরের কারবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন? কোনো গুরুতর কারণ না থাকলে এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারত না। কিন্তু সেই গুরুতর কারণটি বা কারণগুলি যে কী সুনীতিবাবু তা ঘুণাক্ষরেও আমাদের জানান নি।

তৃতীয়ত, 'অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ' পর্যন্ত বলতে তিনি ঠিক কোন সন পর্যন্ত ধরেছেন—তারও কোনো ইঙ্গিত দেন নি। সুতরাং যে যার খুশিমতো একটা সময় ধরে নিতে পারে। আমি তাঁর কথার আক্ষরিক মানে ক'রে ১৭৫০-৫১ সন ধরলাম।

২. "অষ্টাদশ শতকে এই রাস্তা (বহুবাজার স্ট্রীট) 'বৈঠকখানা স্ট্রীট' নামেও পরিচিত ছিল"– এই উক্তিটি বিভ্রান্তিকর। একটা শতক দীর্ঘ সময়। সুতরাং ঐ শতকের কোনভাগে—আদিতে, মধ্যে না শেষভাগে—বৌবাজার স্ট্রীটের বৈঠকখানা স্ট্রীট নাম ছিল? যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এসে সুনীতিবাবু কলকাতায় বাখারি চুন তৈরির ইতিহাসে দাঁড়ি টেনেছেন, সেই ১৭৫০-৫১ সনেও এই মেরুদণ্ডস্বরূপ 'বহুবাজার স্ট্রীট' বা 'বৈঠকখানা স্ট্রীট' এ দু'টো নামের কোনোটাই হয় নি।

ঐ বছরের মাত্র ৮-৯ বছর আগে ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার সর্বপ্রথম নকশা তৈরি হয়। তাতে শুধু ইংরেজ, পোর্তুগিজ ও আরমানি-অধ্যুষিত কলকাতাটুকু দেখানো হয়েছে। উত্তরে বর্তমানের আরমানি স্ট্রীট থেকে দক্ষিণে বর্তমানের হেস্টিংস স্ট্রীট পর্যন্ত, পূর্বে বর্তমানের চিৎপুর রোড থেকে পশ্চিমে গঙ্গার ধার পর্যন্ত, কলকাতার মাত্র এইটুকু অংশ চতুর্দিকে একটা কাঠের বেড়া বা বেষ্টনীর

(Palisades) মধ্যে দেখানো হয়েছে। একটি রাস্তারও নাম তাতে নেই। কিন্তু এই নকশাটি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২ এপ্রিল তারিখে আপজন (A. Upjohn) সাহেব আর একটি বৃহত্তর নকশার অংশ-রূপে এই নকশাটি প্রকাশ করেন। ঐ তারিখে আপজন সাহেব নিজের আঁকা বৃহত্তর কলকাতার আরো একটি নকশা প্রকাশ করেন। তার কথা আমি পরে বলছি।

আপজন-প্রকাশিত প্রথম যে নকশাটির কথা বললাম তার পুরো নাম—***Plan of the territory of Calcutta as marked out in the year 1742, exhibiting likewise the Military operations at Calcutta when attacked and taken by Seraj ud Dowlah on the 18th of June 1756.*** Printed and Published according to the Act of Parliament, by A. Upjohn. 2nd April 1794. অর্থাৎ এই নকশাটিতে দু'টি নকশা আছে—১৭৪২ সনের আদি কলকাতার ও ১৭৫৬ সনের বৃহত্তর কলকাতার—উত্তরে বাগবাজারের খাল থেকে দক্ষিণে Governapore (গোবিন্দপুর) পর্যন্ত মারাঠা খাতের অন্তর্বর্তী কলকাতা। এই ১৭৫৬ সনের নকশায় মাত্র একটি রাস্তারই নাম দেওয়া আছে—Avenue leading to the Eastward। এই রাস্তাটি পশ্চিমে বর্তমান চিৎপুর রোড থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্বে মারাঠা খাত পর্যন্ত চলে গেছে—অর্থাৎ বর্তমান 'বৌবাজার স্ট্রীট'। সুতরাং এই নকশা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৭৫০-৫১ সনে কেন, ১৭৫৬ সনেও বর্তমান বৌবাজার স্ট্রীটের নাম বৈঠকখানা স্ট্রীট ছিল না, বৌবাজার স্ট্রীটও ছিল না—ছিল Avenue leading to the Eastward।

১৭৪২ ও ১৭৫৬ সনের নকশা দু'টির মধ্যে ১৭৫৩ সনে ওয়েল্‌স (Lt. Wells) নামে একজন সৈনিক কলকাতার আর একটি নকশা আঁকেন। সেই নকশার নাম হচ্ছে—***Plan of Fort William and Part of the City of Calcutta.*** Surveyed by W. Wells, Lieutenant of the Artillery Company in Bengal, 1753। নামেই নকশার পরিচয়—পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম ও ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলটুকু মাত্র এতে দেখানো হয়েছে। এই নকশাতেও কোনো রাস্তার নাম সেই। মনে রাখতে হবে যে, ১৭৫৩ ও ১৭৫৬ সন আমাদের নির্ধারিত ১৭৫০-৫১ সনের সীমার বাইরে পড়ে যাচ্ছে।

ওয়েল্‌স-এর নকশার ৩১-৩২ বছর পরে মার্ক উড (Lt-Col. Mark Wood, ইনি Surveyor-General of India ছিলেন এবং এঁরই নামে কলকাতার সার্ভেয়ার-জেনারেলের অফিসের সামনের রাস্তার নাম উড স্ট্রীট হয়েছে) কলকাতার পুলিশ কমিশনারদের জন্যে ১৭৮৪-৮৫ সনে একটি বড় প্রমাণের কলকাতার নকশা তৈরি করেন। তাতে দেশি ও সাহেবি দুই পাড়াই দেখানো

হয়েছিল। মূল নকশাটি পুলিশ কমিশনারদের অফিসেই ছিল। সাধারণে এই নকশার কথা জানত না। তাই ঐ নকশা তৈরি হবার ৭-৮ বছর পরে ১৭৯২ সনে বেইলি (William Baillie) নামে এক ভদ্রলোক ওটিকে একটু ছোট ক'রে কমিশনারদের অনুমতি নিয়ে প্রকাশ করেন। এই নকশার নাম— ***Plan of Calcutta reduced by permission of Commissioners of Police from the original one executed by Lieutenant-Colonel Mark Wood in the year 1784 and 1785.*** Published in October 1792 by William Ballie.

মার্ক উড-এর নকশাতেই সর্বপ্রথম কলকাতার রাস্তার নাম পাওয়া যায় এবং এই নকশাতেই প্রথম 'বহুবাজার স্ট্রীট বা বৈঠকখানা স্ট্রীট'—এই নাম পাই। এই নকশায় চিৎপুর রোডের পূর্বে ও বোবাজার স্ট্রীটের উত্তরে মাত্র দু'টি রাস্তা ও দু'টি পাড়ার নাম দেওয়া আছে। রাস্তা দু'টি হল—Old Hurrenbury (হরিণবাড়ি) Lane ও Chhatawallah (ছাতাওয়ালা) Lane এবং পাড়া দু'টি Colootollah ও Chunarytollah। এই নকশায় 'চুনাগলি' ও 'চুনা-পুখুর লেন'—কোনোটারই নাম কিংবা অস্তিত্ব নেই। সুনীতিবাবুর ধারণা এগুলি অনেক পুরনো গলি—কয়েকশো বছরের পুরনো। আমরা নকশায় দেখছি যে, ১৭৮৪-৮৫ সন পর্যন্ত চুনাগলি ও চুনাপুকুর গলির জন্মই হয় নি।

৩. বাকি রইল Chunarytollah। নকশায় Colootollah ও Shakery-tollah আছে। Colootollah-র উচ্চারণ সুনীতিবাবু 'কলুতলা' করেন, না 'কলুটোলা' করেন? Shakerytollah-কে তিনি এই প্রবন্ধে শাঁখারিটোলা, Cossitollah-কে কসাইটোলা লিখেছেন। তবে Chunarytollah-কে 'চুনারীটোলা' না লিখে 'চুনারীতলা' লিখেছেন কেন? বোধ হয় তাঁর মনে তখন Dhurrumtollah-র নজির ছিল। কিন্তু এরও উচ্চারণ হওয়া উচিত 'ধর্মটোলা'। আমরা ভুল ক'রে উচ্চারণ করি 'ধর্মতলা'। ঠিক সেইরকম ভুল করি কালীতলা, মদনমোহনতলা, ষষ্ঠীতলা, শীতলাতলা ইত্যাদি সম্বন্ধে। এগুলো কোনো ঠাকুরের মন্দির মাত্র বোঝায় না, মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে যে পাড়া গড়ে উঠেছে, সেই পাড়াগুলিকে বোঝায়। 'টোলা' মানে 'পাড়া', 'টুলি' মানে 'ছোটপাড়া' (যথা, কুমারটুলি)। এ শব্দ দু'টি বাংলা 'টোল' শব্দের স্বগোত্র। যেখানে বহুলোক (বিশেষত একই পেশার) একত্রে বাস করে তার নাম 'টোলা'। যেখানে বহু ছাত্র একসঙ্গে বাস করে এবং সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করে—সেই জায়গাকে বলে 'টোল'। কলকাতায় অনেক পাড়া আছে, যাদের নাম কোনো বিশিষ্ট গাছ বা গাছের শ্রেণীর নামেব সঙ্গে 'তলা' শব্দ যোগ ক'রে করা হয়েছে; যেমন নেবুতলা, বটতলা, ঝাউতলা, বেলতলা, আমড়াতলা ইত্যাদি। যদিও গাছে 'তলা' থাকে, তবুও নেবুতলা ইত্যাদি নাম গাছের তলাকে বোঝায় না। ঐ

গাছ বা গাছের সারিকে কেন্দ্র ক'রে তার কাছে যে লোকের পাড়া বা টোলা গড়ে উঠেছে সেই টোলাকে বোঝায়। গাছের যদিও বা 'তলা' থাকে, দেবদেবী, যথা ধর্ম বা মনসা ইত্যাদির 'তলা'কল্পনা করা হাস্যকর। আবার, হিন্দি 'তালাও', (পুকুর) শব্দ অনুরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। 'তালাও'কে আমরা 'তলা' ক রে নিয়েছি প্রায় সবক্ষেত্রে। যেমন, 'বির্জী তালাও' অর্থাৎ বির্জী পুকুরকে আমরা বলি 'বির্জীতলা'। যদিও পুকুর মাত্রেরই একটা 'তল' বা 'তলা, থাকে, তাহলেও বির্জীতলার 'তলা' সে 'তলা' নয়। হিন্দি 'গোলতালাও' (গোলদীঘি)-কে আমরা 'গোলতলা' ক'রে নিয়েছি। ইংরেজিতেও সমান ভুল করা হয়েছে—বির্জী-তালাওকে লেখা হয়েছে Birjeetollah,অর্থাৎ বির্জী'টোলা'বা 'পাড়া'। তবুও এ নামের একটা অর্থ আছে। কিন্তু বির্জীতলার কোনো অর্থ হয় না, যদি না 'তলা' মানে 'টোলা' বা 'পাড়া' ধরা হয়।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক। বেইলি-র নকশা প্রকাশিত হবার দেড়বছর পরে আপজন-এর নকশা প্রকাশিত হয়। এটা অষ্টাদশ শতকের কলকাতার শেষ নকশা। শুধু কলকাতা নয়, মারাঠা খাতের বাইরের ও গঙ্গার ওপারে হাওড়ারও অনেকখানি অঞ্চল এতে দেখানো হয়েছে। এই নকশার নাম —*Calcutta and its environs from an accurate survey taken in the year 1792 and 1793,* by A. Upjohn. 2nd April মার্ক উড-এর নকশার চেয়ে এই নকশায় রাস্তার সংখ্যা স্বভাবতই বেশি। তবু এতেও 'চুনাগলি' ও 'চুনাপুকুর গলি'র নাম নেই। (সুনীতিবাবু ভুল ক'রে চুনাপুকুরের জায়গায় 'চুনারী পুকুর' লিখেছেন।) তখন এই দু'টো গলি তৈরি হযেছিল কিনা বলা শক্ত। কেননা, সংখ্যা বাড়ার দরুণ রাস্তা ও গলিগুলো ঘিজি-ঘিজি দেখানো হযেছে। যদি হযে থাকে ১৭৮৫ ও ১৭৯৩—এই দুই সনের মধ্যে কোনো সমযে হয়ে থাকবে। তবে না হওয়াই সম্ভব। হলে নিশ্চয়ই নাম থাকত। সুনীতিবাবুও বলেন নি যে এই দু'টি গলির নাম নকশায় আছে, যেমন বলেছেন চুনারিটোলার বেলায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত 'চুনাগলি' ও 'চুনাপুকুর গলি'র জন্মই হয় নি। অতবড় যে'সার্কুলার রোড',তার জন্ম মাত্র ১৭৮০খ্রীস্টাব্দে। অন্যে পরে কা কথা? কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট ও স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরি হয় ১৮১৭ সালের পর লটারি কমিটি-র (Lottery Committee) দ্বারা। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৬ সনের মধ্যে কলকাতার অধি-কাংশ রাস্তা তৈরি হয়। সর্বপ্রথম Surveyor of Roads কলকাতায় নিযুক্ত হন ১৭৬৬ সনে। অন্ধকূপে যেসব ইংরেজকে হত্যা করা হয়েছিল বলে ইংরেজ ইতিহাসবিদেরা বলে থাকেন তাঁদের দেহগুলো পুরনো দুর্গের ফটকের সামনে যে খানায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সে খানা বুজানো হয় ঐ ১৭৬৬ সনেই। কিন্তু

এসব ব্যাপার ১৭৫০-৫১ সনের অর্থাৎ আমাদের আলোচনা-সীমার অনেক পরের কথা, কোনোটিই আগে নয়।

সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা—এই তিন গ্রামের জমি, বাড়িঘর ও রাস্তার কোম্পানির তরফ থেকে প্রথম জরিপ হয় ১৭০৬ সনে, দ্বিতীয় ১৭২৬ সনে, তৃতীয় ১৭৪২ সনে ও চতুর্থ ১৭৫৬ সনে। ঐ চার সনে কলকাতার ছোট-বড় রাস্তার মোট সংখ্যা কত ছিল, যথাক্রমে তার সরকারি হিসেব নিচে উদ্ধৃত করছি—১৯০১ সনের আদম-সুমারির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্সাস অফিসার এ. কে. রায়-এর *A Short History of Calcutta*, 1902 থেকে :

খ্রীস্টাব্দ	বড়রাস্তা (স্ট্রীট)	গলি (লেন)	ছোটগলি (বাইলেন)
১৭০৬	২	২	০
১৭২৬	৪	৮	০
১৭৪২	১৬	৪৬	৭৪
১৭৫৬	২৭	৫২	৭৪

১৭৫৬ সন আমাদের আলোচ্য সময়-সীমার বাইরে পড়ে।

এখন দেখা যাক, 'চুনাবিটোলা' নাম কবে হল। ১৬৯০ থেকে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই ৬০-৬১ বছরের মধ্যে কলকাতার দেশি লোকেরা যার যেখানে খুশি বাস করেছে। বসবাসের কোনো বিধিনিষেধ বা আইনের কড়াকড়ি ছিল না। কারণ, বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে কলকাতায় বসবাস করানোই ইংরেজদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৭৫১ সন পর্যন্ত কলকাতার লোকসংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে গেল। তখন কড়াকড়ির দরকার হল। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে, অর্থাৎ সুনীতিবাবুর নির্দিষ্ট আলোচনায় নিদিষ্ট সীমার পরের বছর হলওয়েল (Holwell) সাহেব কলকাতার জমিদার হয়েই হুকুম জারি করলেন যে, এরপর থেকে দেশি লোকেরা যার যেখানে খুশি বাস করতে পারবে না। এক পেশাবলম্বী লোকেদের নির্দিষ্ট স্থানে একসঙ্গে বাস করতে হবে। এই আইন জারি হওয়ার পর থেকে, অর্থাৎ ১৭৫২ সন থেকে কলকাতায় 'পাড়া', 'টোলা' ও 'টুলি' ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। সুতরাং ১৭৫২ ও ১৭৮৪ এই দুই সনের মধ্যে কোনো সময়ে 'চুনারি-টোলা'র জন্ম হয়ে থাকবে। সুনীতিবাবুর ধারণা যে 'চুনারিটোলা' অনেক পুরনো পাড়া, সে ধারণা ভুল।

অতএব ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ কিংবা তার পূর্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ১৭৫০-৫১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ বছর ধরে কলকাতায় বাখারি চুন তৈরি হয়ে এসেছে—সুনীতি-বাবুর এ বিশ্বাস একেবারেই ভিত্তিহীন। যে তিনটি জায়গার নাম থেকে তাঁর এ বিশ্বাস জন্মেছে তার কোনোটিরই উৎপত্তি ১৭৫০-৫১ সনের মধ্যে হয় নি, পরে হয়েছে। ঐ তিনটি নামের জোরে যদি বলতেই হয় যে, এককালে কলকাতায়

'চুন' তৈরি হতো (দ্র. লেখক শুধু বাখারি চুনের কথাই বলেন নি 'অন্য চুন'-এর কথাও বলেছেন), তাহলে এও বলা উচিত যে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের অনেক পরে ইংরেজ আমলে ঐ ব্যবসার সূত্রপাত হয়। কিন্তু যেমন বাখারি চুন ছাড়া অন্য চুন হতো স্বীকার করলে তাঁর 'থিয়োরি' টেঁকে না, একথা স্বীকার করলেও তেমনি টেঁকে না।

কিন্তু সত্যিই কি 'চুনাগলি', 'চুনাপুকুর' ও 'চুনারিটোলা'—এই তিনটি নাম থেকে কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে যে চুন, বিশেষ ক'রে বাখারি চুন, তৈরি হতো তার প্রমাণ মেলে ? আমার মতে মেলে না। নাম তিনটির আদিতে 'চুনা' শব্দ থাকায় লেখক নামগুলি 'চুন' এই অর্থে নিয়েছেন। এইখানেই তাঁর বোঝবার ভুল হয়েছে। এক-একটি নাম নিয়ে বিচার করা যাক।

ক. 'চুনাগলি'তে কি হতো ? চুন তৈরি হতো, না বিক্রি হতো ? তা তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। মাত্র চুনের 'কাজ' হতো বলেছেন। এটা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

খ. শুধু 'চুন' শব্দ মাত্র বাখারি চুনকেই বোঝাবে কেন ? পাথুরে চুনকেও বোঝাবে না কেন ? তিনি নিজেও তো 'অন্য চুন' কথা ব্যবহার করেছেন। তাহলে 'চুনাগলি' নাম তো সে গলিরও হতে পারে যে-গলিতে চুনের পাথর পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হতো বা যেখানে পাথুরে চুন বিক্রি হতো ? আর যদি 'চুনা'র ইংরেজি হয় Chunam তাহলে চুনাগলিতে পাথুরে চুন কিংবা মাদ্রাজ প্রদেশের বিখ্যাত বাখারি চুনের আড়ত ছিল—এ মানে হতেও বাধা নেই।

গ. এর কোনোটাই কিন্তু আমার মতে আসল মানে নয়। সুনীতিবাবু আসল মানের কাছ ঘেঁসে গেছেন, কিন্তু ধরতে পারেন নি। তিনি নিজেই লিখেছেন : "চুনাগলি পল্লী, মেটে বা কালো ফিরাঙ্গীদের (অর্থাৎ পোর্তুগীস ও অন্য ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় খ্রীষ্টানদের) বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।" তিনি যাদের 'মেটে' বা 'কালো' ফিরিঙ্গি বলেছেন, তাদেরই বলা হয় 'চুনো ফিরিঙ্গি'। 'চুনো' মানে ছোট, খুদে, যেমন 'চুনোপুঁটি।' চুনো ফিরিঙ্গি মানে অত্যন্ত ওঁছা ফিরিঙ্গি। তাহলে চুনোগলি মানে হয় যে-গলিতে চুনো ফিরিঙ্গিরা বাস করত। এই ফিরিঙ্গিরা যে ঐ গলিতে বাস করত তা সর্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য।

ঘ. 'চুনারীটোলা'—সুনীতিবাবু 'চুনারী'র মানে করেছেন যারা 'চুনের কাজ করিত'। আবার সেই অস্পষ্টতা ! স্পষ্ট ক'রে বলা উচিত ছিল—যারা চুন তৈরি করত। কিন্তু যারা চুন তৈরি করে বাংলায় তাদের বলে 'চুনিয়া', যেমন যারা নুন তৈরি করে তাদের বলে 'নুনিয়া'। যারা চুন তৈরি করে তাদের আমরা ভুল করে 'চুনারি' বা 'চুনুরি' বলি। শব্দটি আসলে বাংলা 'চুনারি' নয়, হিন্দি 'চুনরি'। 'চুনরি' শব্দ হিন্দিতে বহুল প্রচলিত শব্দ, বহু হিন্দি গানে এই শব্দটি

পাওয়া যায়। 'চুন্‌রি'র দুই অর্থ : ক. রং-এ ছোপানো কাপড়, শাড়ি, ওড়না ইত্যাদি; খ. যারা এইরকম কাপড় রং-এ ছোপায়। এই কাজ যারা করে তাদের হিন্দিতে 'রাংরেজ'ও বলে (ইং dyer)। 'চুনারিটোলা'র মানে, যে-পাড়ায় রংরেজরা বাস করে।

৫. 'চুনাপুকুর গলি'—সুনীতিবাবু লিখেছেন: "এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।" কি থেকে তাঁর অনুমান হল? চুনাপুকুর নাম থেকে? কিন্তু চুনা মানে যদি চুন হয় তাহলে 'চুনাপুকুর' মানে কি হয়? হয়, যে পুকুরে 'চুন' জন্মায়। কোনো পুকুরেই চুন জন্মায় না বা তৈরি হয় না। যে পুকুরে যে প্রাণী বা উদ্ভিদ জন্মে, সেই প্রাণী বা উদ্ভিদের নাম থেকেই পুকুরের নাম হয়। যেমন, গোলপুকুর (গোলপাতা থেকে), কাশপুকুর, নলপুকুর, কৈপুকুর, শামুকপুকুর, ঝিনুকপুকুর ইত্যাদি। এমনকি পুকুরের পাড়ে কোনো গাছ জন্মালে, সেই গাছের নাম থেকেও পুকুরের নাম হয়—যেমন, তালপুকুর। কিন্তু সুনীতিবাবু এইরকম সোজা মানে না ক'রে ঘুরিয়ে চুনাপুকুরের মানে করেছেন—যে পুকুরে চুনের উপাদান-স্বরূপ শামুক বা ঝিনুক জন্মায়। অর্থাৎ 'চুন' শব্দের বাচ্যার্থ ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্যার্থ ধরে মানে করেছেন। এরকমভাবে পুকুরেরর নাম হয় না। অথচ চুনাপুকুরের একটা সরল ও সুবিদিত মানে আছে। সে মানে তিনি নেন নি। কথাটা 'চুনাপু'কুর নয় 'চুনো'পুকুর। 'চুনো' খাঁটি বাংলা শব্দ। চুনোগলির সম্পর্কে এর মানে আমরা আগেই পেয়েছি—'খুদে', 'ছোট'। 'চুনোপুকুর' মানে যে পুকুরে 'চুনোমাছ' বা 'চুনোপুঁটি' জন্মে।

৬. সুতরাং 'চুনাগলি', 'চুনাপুকুর' ও 'চুনারিটোলা'—কোনো নামেরই চুনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তবু যদি কেউ 'চুনা' শব্দের চুন অর্থই ঠিক মনে করেন, তাঁকে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রথম: সমস্ত কলকাতায় তো একটিমাত্র চুনাপুকুরের সন্ধান পাচ্ছি; সুতানুটিতে পাচ্ছি না, গোবিন্দপুরে পাচ্ছি না, মারাঠা খাতের মধ্যে অন্য কোনো গ্রামেও পাচ্ছি না। তাহলে কি বুঝতে হবে এই মাত্র একটা পুকুরের শামুক, ঝিনুক পুড়িয়েই সমস্ত কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামের চুনের প্রয়োজন মিটত? সেটা কি সম্ভব?

দ্বিতীয়: চুনুরিটোলায় অনেক চুনুরি থাকত। মাত্র একটা পুকুরের শামুক, ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি করতে এতগুলো লোক লাগত? আশ্চর্য!

তৃতীয়: কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও আশেপাশের গ্রামগুলোতে সত্যসত্যই কি এমন আর অন্য পুকুর ছিল না যেখানে শামুক বা ঝিনুক পাওয়া যেত? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের একটিরও নাম 'চুনাপুকুর' হল না কেন?

চতুর্থ : সারা বাংলাদেশে কি এমন একটি গ্রামও আছে যার মধ্যে দু'চারটে চুনাপুকুর নেই? যদি থেকে থাকে তাহলে কি সেইসব গ্রামে চুন তৈরি হতো না? যদি হতো, সেইসব গ্রামের নাম 'কলিকাতা হল না কেন?

পঞ্চম : ১৪৯৫ সাল থেকে (তার আগের কথা ছেড়েই দিলাম) ১৬৯০ সাল পর্যন্ত এই দু'শো বছরের মধ্যে কলকাতায় যে পরিমাণ কলিচুন তৈরি হয়েছে তা কী কাজে লেগেছে? ক'টা পাকাবাড়ির দেওয়াল চুনকাম করা হয়েছে? ঐ সময়ে কলকাতা ও আশপাশের গ্রামে ক'টা পাকাবাড়ি ছিল? সকলেই শুনে এসেছি, ১৬৯০ সালে যখন জোব চার্নক সুতানুটিতে আসেন, তখন সেখানে পাকাবাড়িও ছিল না। তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের মাটির চালাঘরে থাকতে হয়। গোবিন্দপুরেও কোনো পাকাবাড়ি ছিল না। মাত্র কলকাতায় ডালহাউসি অঞ্চলে সাবর্ণ-জমিদারদের একটিমাত্র পাকাবাড়ি ছিল। সেইটি ভাড়া নিয়ে চার্নক সরকারী কাগজপত্র সেই বাড়িতে রাখেন। উইলসন (C. R. Wilson) প্রমাণ করেছেন এ পাকাবাডিও ছিল না। তবু তা ছিল, সত্য বলেই ধরে নিলাম।

ইংরেজ আসার পর থেকে প্রধানত কলকাতায়, অল্পস্বল্প সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে পাকাবাড়ি পাকাবাড়ি তৈরি হতে থাকে। কোন সালে কত পাকা ও কত কাঁচাবাড়ি ঐ তিন গ্রামে ছিল তার সরকারী সংখ্যা পূর্বোক্ত এ. কে. রায়ের ***A Short History of Calcutta*** থেকে তুলে দিলাম :

খ্রীস্টাব্দ	পাকাবাড়ির সংখ্যা	কাঁচাবাড়ির সংখ্যা
১৭০৬	৮	৮,০০০
১৭২৬	৪০	১৩,৩০০
১৭৪২	১২১	১৪,৭৪৭
১৭৫৬	৪৯৮	১৪,৪৫০

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ আমাদের আলোচনা-সীমার বাইরে।

সুতরাং কলকাতায় ইংরেজ আগমনের সময় যখন মাত্র একটি পাকাবাড়ি ছিল, তখন তার পূর্বে ২০০ বছর ধরে এখানে কলি ফেরাবার জন্য কলিচুন তৈরি হয়েছে, একথা বলা বাতুলতা। আসল কথা, ইংরেজদের আসবার পর থেকে এখানে পাকাবাড়ি তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছে, আর তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। এইসব বাড়ি তৈরি করার জন্য চুনের প্রয়োজন হয়েছে ও ক্রমশ চাহিদা বেড়েছে। চুন সিলেট, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ থেকে আমদানি হয়েছে। কলকাতায় চুনের গোলা ও আড়ত বসেছে।

এই প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা। যে দু'টি গলি ও একটি পাড়ার নাম সুনীতিবাবু নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন—তাদের কোনোটিরই আদিতে 'কলি' শব্দ নেই, আছে 'চুনা' শব্দ। অন্যদিকে 'কলিকাতা' নামের আদিতে 'চুনা' বা

'চুন' শব্দ নেই, আছে 'কলি' শব্দ। শুধু 'চুন' শব্দ ব্যবহার করলে একমাত্র পাথুরে চুনকেই বোঝায়। অন্য চুন বোঝাতে হলে জোংড়া, শামুক, ঝিনুক, বাখারি ইত্যাদি শব্দ 'চুন' বা 'চুনা' শব্দের আদিতে বসাতে হয়। সুতরাং কলিকাতা নামের আদিতে 'কলি' শব্দ না থেকে 'চুনা' শব্দ থাকা উচিত ছিল—নামটি হওয়া উচিত ছিল চুনাটোলা, চুনাপাড়া, চুনাহাট বা চুনাগ্রাম—এর যে কোনো একটা। এমনকি 'চুনাকাতা'ও চলতে পারত। কিন্তু তা না ক'রে 'চুনা' শব্দের বাচ্যার্থ ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্যার্থ ধরে অর্থ 'কলিচুন' ক'রে চুনাপুকুর চুনাগলি ও চুনারিটোলা থেকে 'কলিকাতা' শব্দ নিষ্পন্ন করা কতখানি ভাষাতত্ত্বের নিয়ম-সম্মত, সুধীজনই তা বিচার করবেন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমার দ্বিতীয়টি জানা নেই।

৬

এরপর সুনীতিবাবু লিখেছেন: "'কলিকাতা' নামটি মাত্র কলিকাতা-মহানগরীতে নিবদ্ধ নহে—বাঙ্গালাদেশের দুই কোণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, 'কলিকাতা' নামে দুইটি গ্রাম আছে।...ঢাকা জেলার লোহজঙ্গ থানার অধীনে, এবং হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীনে এই দুই কলিকাতা গ্রাম। গত ১৯৩৭ সালের মে মাসে আমি ঐ দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পত্র লিখিয়া গ্রাম দুইটির সম্বন্ধে খবর আনাই। লোহজঙ্গ থানার শ্রীযুক্ত ক. মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে, উক্ত থানার প্রায় তিন মাইল উত্তরে 'কলিকাতা-ভোগদিয়া' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে· ইহার অধিবাসী-সংখ্যা মাত্র ৩।৪ শত, প্রায় সকলেই মুসলমান চাষী; ঐ গ্রামে চুনের কাজ হয় না। আমতা থানার সব্-ইন্স্পেকটর শ্রীযুক্ত অ. বন্দ্যোপাধ্যায় হাশয় লিখিয়াছেন, আমতা থানার বায়ুকোণে প্রায় আড়াই মাইল দূরে 'রসপুর-কলিকাতা' গ্রাম অবস্থিত। (এই গ্রামকে 'ছোট কলিকাতা' বলিতেও শোনা যায়)। সব্-ইন্স্পেকটর মহাশয়ের বিবরণ তুলিয়া দিতেছি:

> The village is situated on the northern bank of the river Damodar. Its population is about 1000, mainly cultivators. Lime is manufactured in this village from snail-shells (শামুক চুন) on an extensive scale so as to meet the local demands.

ঐ স্থানে তিনজন চুনারী মহাজনও আছেন, তাঁহাদের নামও দিয়াছেন।"

আমার বক্তব্য :

ক. আর দু'টো 'কলিকাতা' গ্রামের নাম শুনে সেখানে কলিচুন হয় কিনা সুনীতিবাবু দারোগাদের লিখে যাচাই করতে গেলেন, অথচ যে কলকাতা তাঁর এই আলোচনার প্রধান বিষয় সেই কলকাতায় সত্যসত্যই চুন তৈরি হতো কিনা তা কাগজপত্র থেকে স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করলেন না; শুধু ভাষাগত ব্যুৎপত্তির উপর ও তিনটি নামের উপর নির্ভর করেই সন্তুষ্ট হয়ে রইলেন। ব্যুৎপত্তি যাই বলুক, 'কলিকাতা' নামের গ্রাম থাকলেই যে সেখানে কলিচুন তৈরি হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। কলিচুন না তৈরি হলেও গ্রামের নাম 'কলিকাতা' হতে পারে, প্রমাণ 'কলিকাতা-ভোগদিয়া'। যদি একটিমাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারাও কোনো তত্ত্ব (theory) বা প্রকল্প (hypothesis) অপ্রমাণিত হয়, তাহলে সেই তত্ত্ব বা প্রকল্প দাঁড়াতেই পারে না। সুনীতিবাবু মোট তিনটি 'কলিকাতা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে এ পর্যন্ত দু'টির বেলায় তাঁর 'তত্ত্ব' মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বাকি আছে একটি—'রসপুর-কলিকাতা'। তার ব্যাপারটা আমরা পরে দেখব। আপাতত যদি ধরেও নিই যে এই শেষের 'কলিকাতা' সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্ব সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে সত্যমিথ্যার অনুপাত দাঁড়ায় ১ : ২। সুতরাং তাঁর তত্ত্ব গ্রাহ্য হতে পারে না।

যদি মাত্র 'কলিকাতা' নামের একটা যেমন-তেমন ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করাই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে 'কোল কা হাতা' বা 'কোলি কা হাতা' তো চমৎকার ব্যুৎপত্তি। কিন্তু সুনীতিবাবু কি এ ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করবেন? করবেন না, বলবেন কোলরা বা কোলিরা যে কলকাতায় বাস করত তার প্রমাণ কি? আমিও সুনীতিবাবুকে তাঁর ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সেই কথাই বলি। কলিচুন যে কলকাতায় হতো তার প্রমাণ কি? 'রসপুর-কলিকাতা' কোনো প্রমাণ নয়। সেখানে যা হতো এখানেও তাই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাহলে 'কলিকাতা-ভোগদিয়া'তেও হতো।

খ. 'রসপুর-কলিকাতা'—এখন এই গ্রামের ব্যাপারটা দেখা যাক।

'কলিকাতা-ভোগদিয়া'কে লোহজঙ্গ থানার দারোগা একটি গ্রাম বলেছেন। আমতা থানার দারোগাও বলেছেন 'রসপুর-কলিকাতা' একটি গ্রাম। গোড়ায় গলদ! এ দু'টি কখনোই একটি একটি গ্রাম হতে পরে না। তারা আলাদা অথচ পাশাপাশি গ্রাম। বাংলাদেশে এরকম যুগ্ম গ্রামের নাম বহু আছে। কোনো জেলায়, মহকুমায় বা থানায় একই নামের একাধিক গ্রাম থাকলে, একটি গ্রামকে অন্য গ্রাম থেকে পৃথক করবার জন্য যুগ্ম গ্রামের নাম ব্যবহার করা হয়। ভোগদিয়া গ্রাম ঐ অঞ্চলে নিশ্চয়ই একের বেশি আছে। সেইজন্য আলোচ্য ভোগদিয়াকে সনাক্ত করবার উদ্দেশ্যে তার পূর্বে তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম

'কলিকাতা' জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে কলিকাতা গ্রাম দিয়ে ভোগদিয়া গ্রামকে সনাক্ত করা হয়েছে। সেইরকম রসপুর ও কলিকাতা দু'টি আলাদা গ্রাম। এখানে কলিকাতা গ্রামকে সনাক্ত করার জন্য তার নামের আগে 'রসপুর' নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যে গ্রামকে দিয়ে নিকটবর্তী অন্য গ্রামকে সনাক্ত করা হয়, যে গ্রামের নাম প্রথমে বসে, সেটি সাধারণত অন্যটির চেয়ে বেশি বিখ্যাত। প্রথমটিতে ভোগদিয়ার চেয়ে কলিকাতা বেশি বিখ্যাত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রসপুর কলিকাতার চেয়েও বেশি বিখ্যাত। এই আলোচনা থেকে জানা গেল যে, রসপুর ও কলিকাতা এক গ্রাম নয়, দু'টি পাশাপাশি গ্রাম এবং কলি-কাতার চেয়ে রসপুর অনেক বেশি বিখ্যাত। প্রকৃতপক্ষেও তাই-ই। আমতা থানার দারোগা সাহেব যখন রসপুর-কলিকাতাকে 'this village' বলেছেন, তখন কলিকাতা না রসপুর কোন গ্রামে শামুক-চুন হতো এবং প্রায় ১০০০ চাষী কোন গ্রামে বাস করত বোঝা যাচ্ছে না। তিনি কি দু'টি গ্রাম একসঙ্গে ধরেছেন ? তাহলে তো বুঝতে হবে রসপুর ও কলিকাতা দুই গ্রাম মিলিয়েই ১০০০ বাসিন্দা এবং দুই গ্রামেই শামুক-চুন হতো। শামুক-চুনকে যদি কলিচুন বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে জিজ্ঞাস্য, রসপুরের নামও 'কলিকাতা' হল না কেন ?

আর একটি কারণে যুগ্ম গ্রামের নাম ব্যবহার করা হয়। যদি গ্রাম দু'টি স্বতন্ত্র মৌজা না হয়ে দু'টি গ্রাম মিলিয়ে এক মৌজা হয়। কলিকাতা-ভোগদিয়ার কথা জানি না। রসপুর-কলিকাতা বিভিন্ন মৌজা, এক মৌজা নয়।

শুধু দারোগাবাবুই রসপুর ও কলিকাতাকে এক গ্রাম বলে ধরেছেন তা নয়, এ অঞ্চলের সকলেই ধরে থাকে। রসপুর চাষীপ্রধান গ্রাম নয়, কলিকাতা চাষী-প্রধান। রসপুরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি বহু ভদ্র গৃহস্থের বাস। গ্রামে স্কুল আছে, বড় বড় পাকা বাড়ি আছে, দেবালয় আছে। এই গ্রামের খ্যাতি এত বেশি যে কলিকাতা গ্রামের নাম এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই জানে না। তারা কলিকাতাকে রসপুর গ্রামের অহিন্দু এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুপাড়া হিসাবেই জানে। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা আগে তাই ছিল, পরে স্বতন্ত্র মৌজা হয়।

গ. ১৯৩৭ সালে আমতা থানার দারোগাবাবু সুনীতিবাবুকে লেখেন, রসপুর-কলিকাতা গ্রামে স্থানীয় প্রয়োজন (local needs) মেটাবার জন্য শামুক-চুন প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় ("manufactured on an extensive scale")। অর্থাৎ ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত হতো। 'স্থানীয় প্রয়োজন'-এর মানে স্পষ্ট নয়। শুধু রসপুর-কলিকাতার প্রয়োজন, না সমগ্র আমতা থানার প্রয়োজন ? কোন কাজে এই চুন ব্যবহার হতো দারোগাবাবু তাও লেখেন নি। শুধু গোটাকতক গ্রামের পাকাবাড়ির দেওয়ালে কলি ফেরাবার জন্য লাগত ? সে তো অল্প চুনেই হয়। তার জন্য "extensive scale"-এ "manufacture" করবার প্রয়োজন

করে না। শুধু বাইরে চালান গেলেই "extensive scale"-এ চুন তৈরি করা দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু বাইরে চালানের কথা তিনি বলেন নি। তাঁর উক্তি স্ববিরোধী ও উদ্ভট মনে হয়।

এ বিষয়ে ও'মালি সাহেব (L. S. S. O'Malley I. C. S) ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক মনোমোহন চক্রবর্তী বি. সি. এস-প্রণীত ও ১৯০৯ সালে প্রকাশিত *Howrah District Gazetteer*-এর বিবরণ উদ্ধৃতি করছি :

Amta—It has long been an important centre of trade. Formerly it contained many salt and coal depots, being an entrepot for salt brought from Midnapore and coal brought from the Raniganj coalfield. The Damodar then formed a broad highway of commerce bearing hundreds of cargo boats.···The railways have killed the river-borne trade in salt and coal ; but on the other hand the trade in paddy and straw, carried partly by boats and partly by rail, has flourished ; and there are also large exports to Howrah of jute, vegetables and fish. Brown country paper used to be manufactured here but that industry has been crushed by the pressure of competition.

There are several important villages in the jurisdiction of Amta Thana, such as Raspur (রসপুর নয়, রাসপুর), Joypur, Panpur, Jhinkra and Narit. Other places which may be mentioned are Pandua.. the home of the well-known poet Bharat Chandra Rai ; Amrajuri with a charitable dispensary, Rautra, the home of Babu Jiban Krishna Rai, said to be the richest Kaibarta in the Sub-Division ; and Bhatora on the Rupnarain river with a police beat-house.

উপরের উদ্ধৃতিতে আমতা শহর ও আমতা থানার প্রধান প্রধান গ্রামের ও বাণিজ্য-দ্রব্যের উল্লেখ আছে। রসপুর বা রাসপুর গ্রামের উল্লেখ আছে, কিন্তু 'কলিকাতা' গ্রামের ও সেই গ্রামে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন শামুক-চুনের কোনো উল্লেখ নেই। এই গেজেটিয়ার দারোগাবাবুর চিঠি লেখার ২৮ বছর আগে প্রকাশিত হয়। তাহলে বুঝতে হবে, হয় গেজেটিয়ার প্রকাশের সময় পর্যন্ত কলিকাতা গ্রাম ও তার চুনের উৎপাদন এত নগণ্য ছিল যে গেজেটিয়ার-প্রণেতাদের কর্ণগোচর হয় নি, নয় গেজেটিয়ার প্রকাশিত হবার পরে কলিকাতা গ্রামে শামুক-চুন তৈরি আরম্ভ হয়। শেষেরটি হয়ে থাকলে শামুক-চুন

তৈরির সঙ্গে ঐ গ্রামের নামের কোনো সম্বন্ধ নেই। কারণ গ্রামটি তো আর ১৯০৯-এর পরে হয় নি!

ঘ. দুই দারোগাবাবুর চিঠিতেই একটি অত্যন্ত জরুরি কথা, যা গ্রামের নাম নির্ধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেই কথাটিই নেই। লোহজঙ্গের দারোগা জানিয়েছেন: "ঐ (কলিকাতা-ভোগদিয়া) গ্রামে চুনের কাজ হয় না।" অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে হতো না, কিন্তু জানা দরকার ছিল আগে কখনো হতো কিনা। তবেই 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তির সাহায্য হতো। ঠিক সেইরকম আমতার দারোগা জানিয়েছেন শামুক-চুন হয়। তার চেয়ে যা জানা দরকারী ছিল তা হচ্ছে, কতদিন থেকে হয়ে আসছে। যদি জানা যেত শহর কলকাতার আগে না হোক, একই সময় থেকে আসছে, তাহলে বোঝা যেত আমাদের কলকাতার পরে নয়, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, স্বতন্ত্রভাবে ঐ গ্রামের নাম 'কলিকাতা' হয়েছে কলিচুন থেকে। কিন্তু তা যে হয় নি তা প্রমাণিত হচ্ছে ঐ গ্রামের 'ছোট-কলিকাতা' নাম থেকে। অর্থাৎ 'বড়' কলিকাতা নাম থেকেই 'ছোট' কলিকাতা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

ঙ. সুনীতিবাবু নিজে কখনো 'রসপুর-কলিকাতা' গ্রামে গেছেন কিনা জানি না। আমি তিন-চার বার গেছি। প্রথম যাই বহু বছর আগে, তাঁর প্রবন্ধ পড়বার পরই। তারপরেও কয়েকবার গেছি। আমি অনুসন্ধান ক'রে কলিকাতা গ্রাম সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি তা এই।

আজ থেকে অনেক বছর আগে—অষ্টাদশ শতকের শেষ কিংবা উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে জনা-কয়েক ইংরেজ কলকাতা শহর থেকে এসে এই গ্রামে দামোদর তীরে কুঠি তৈরি করে। তখন এই গ্রাম রসপুর গ্রামেরই একটি পাড়া ছিল। মুসলমান ও তফশিলি-হিন্দুরা এই পাড়ায় বাস করত। কলকাতার খ্রীস্টান সাহেবরা তো হিন্দু-প্রধান রসপুর গ্রামে বাস করতে পারত না। সেইজন্য তারা এই পাড়ায় এসেছিল। কিসের কুঠি তারা বানিয়েছিল তা স্থানীয় অধিবাসীরা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারেন না। তবে তাঁরা প্রাচীনদের কাছ থেকে শুনেছেন যে নীলকুঠি। যে কুঠিই বানাক, সেই কুঠি নির্মাণের সূত্রেই তারা রাজমিস্ত্রি, ছুতারমিস্ত্রি প্রভৃতির সঙ্গে কয়েকঘর চুনিয়াকেও এই পাড়ায় আনে। যখন তাদের ব্যবসা জেঁকে ওঠে ও এই পাড়া সমৃদ্ধিশালী হয় তখন তারা এর নাম রাখে 'ছোট-কলিকাতা।' তখনই এই সাহেবপাড়া রাসপুর গ্রাম থেকে আলাদা হয়ে এক স্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত হয়। সুতরাং চুন তৈরির সঙ্গে ছোট-কলিকাতা নামের কোনো সম্বন্ধ নেই। আমি প্রথমবার যখন সে গ্রামে যাই তখন সেই বিরাট কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। শেষবার গিয়ে দেখি যে ভগ্নস্তূপ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। চুনিয়াদের বংশধর আর কেউ নেই। চুন তৈরি বন্ধ।

চ. ইংরেজরা ঘর ছেড়ে বিদেশে গিয়ে যেখানেই বসবাস করেছে সেই জায়গার নাম রেখেছে তারা যে গ্রাম, শহর, জেলা বা দেশ থেকে এসেছে সেই-সেই গ্রাম শহর ইত্যাদি নামে। শুধু সেইসব নামের আগে একটা New (নূতন) শব্দ বসিয়ে দিয়েছে, যেমন—New Britain, New Caledonia, New Cumberland, New England, New Glasgow, New Hampshire, New Ireland, New York ইত্যাদি। বর্তমানে ইংরেজদের অনুকরণেই আমরা 'নব-ব্যারাকপুর', 'নব-বৃন্দাবন' তৈরি করেছি। এদেশে কলকাতা থেকে ইংরেজরা গিয়ে বাংলার পল্লীতে বাস করলে সে পল্লীর 'নূতন কলিকাতা' নাম রাখত না, রাখত 'ছোট-কলিকাতা'। সুনীতিবাবু যদি নিজে গিয়ে ভোগদিয়া-কলিকাতার তথ্যানুসন্ধান করতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি রসপুর-কলিকাতার মতোই একটা ইতিহাস সে কলিকাতাতেও পেতেন। রসপুর-কলিকাতা তো অত্যন্ত অখ্যাত কলিকাতা। স্থানীয় লোকেরাও জানে না, হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারও জানে না। কিন্তু যে 'ছোট-কলিকাতা' প্রায় শত-বর্ষ ধরে বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে ছিল, তা ছিল নদীয়া জেলার 'সুখসাগর' গ্রাম—ওয়ারেন হেস্টিংস ও পোর্তুগিজ ধনকুবের জোসেক ব্যারেটার লীলা-নিকেতন। ১৮৫৯-৬০ সাল নাগাদ সে 'ছোট-কলিকাতা' গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে। শুধু তার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জেগে আছে 'সাহেব ডাঙ্গা' এই নামের আড়ালে।

মোট কথা, নাম একটি মনগড়া (arbitrary) চিহ্ন, যা বস্তু বা ব্যক্তি বা স্থানের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাকে অন্য বস্তু ব্যক্তি বা স্থান থেকে পৃথক ক'রে সনাক্ত করবার জন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামের সঙ্গে বাস্তবের মিল হয় না। হিন্দুদের নাম আগে প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামে রাখা হতো। যার নাম নারায়ণ বা শঙ্কর বা পার্থসারথি। সে সত্যিই নারায়ণও নয়, শঙ্করও নয়, পার্থ-সারথিও নয়। আজকাল ছেলেমেয়েদের অন্য নাম দেওয়া হয়। সেখানেও নামের অর্থের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। কানাছেলের নাম পদ্মলোচন-এর মতো কালোমেয়ের নাম শুক্লা হয়, আবার ফর্সা মেয়ের নামও কৃষ্ণা হয়। যার নাম অসীম বা অনন্ত সে সত্যিকার অসীম বা অনন্ত নয়।

স্থানের নামের ক্ষেত্রে এ অসংগতি আরো বেশি প্রকট ও ব্যাপক। বস্তুত ব্যক্তির নামের মানে তবু বোঝা যায়। স্থানের নামের মানে বহু ক্ষেত্রে বোঝাই যায় না। টালা, বড়িসা, বণ্ডেল, গর্চা, ধাপা, ধাপধাড়া, শালিমার ইত্যাদি নামের কি মানে? যেখানে স্থানের নাম যুগ্ম শব্দের দ্বারা গঠিত সেখানে হয় প্রথম শব্দটি বোঝা যায়, দ্বিতীয়টি বোঝা যায় না, যেমন বাজারসহু; নয় দ্বিতীয়টি বোঝা যায়, প্রথমটি বোঝা যায় না, যেমন গোঁদলপাড়া। আবার, যেখানে দু'টো

শব্দেরই মানে বোঝা যায় সেখানে গোটা নামটার অর্থ বাস্তবের সঙ্গে মেলে না, যেমন নারায়ণপুর বা বৈকুণ্ঠপুর (যদি ব্যক্তির নাম থেকে না হয়ে থাকে) সত্যিই বিষ্ণুর গোলোকধাম নয়। কলিকাতাও সেইরকম একটি নাম। 'কলি' ও 'কাতা' —এই দুই শব্দের টেনে-বুনে একটা অর্থ দাঁড় করালেও এটা সত্য নয় যে গোটা নামটা 'কলিকাতা' নামক স্থানের বাস্তব বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করছে।

তাঁরপ্রবন্ধের গোড়ায় সুনীতিবাবু লিখেছেন : "দেড় শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের রাজধানী হইবার গৌরব ছিল যে নগরীর, সেই কলিকাতা-নগরীর নামের ব্যুৎপত্তি এখনও (অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত—রা মি.) নিধারিত হইল না। ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়।" এই নির্ধারণ কার্যটি এ যাবত কেউ করতে পারেন নি বলে সুনীতিবাবু অনেক ভেবেচিন্তে কলি-চূন থেকে কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি হয়েছে—এই তত্ত্ব 'আবিষ্কার' করেছেন। কিন্তু সুনীতিবাবু বোধ হয় জানেন যে আজ থেকে অনেক বছর আগে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত 'বিশ্বকোষ'-এ কলিকাতা নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়। প্রবন্ধ-লেখকের নামের উল্লেখ না থাকলেও বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তিনি আর কেউ নন, মাইকেলের পরমবন্ধু পুরাতত্ত্ববিৎ ও এসিয়াটিক সোসাই-টির সহকারী সচিব গৌরদাস বসাক। তিনি এই প্রবন্ধে পূর্ব থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত প্রচলিত কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে চারটি মতবাদের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে কলিচুন থেকে কলিকাতা। এই মতবাদ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন : "কলিচূন হইতে কলিকাতা নাম হওয়া নিতান্ত উষ্ণ মস্তিষ্কের কথা, এরূপ প্রলাপবাক্যে কর্ণপাত করা যাইতে পারে না।"*

* 'বিশ্বকোষ'-এ কলিকাতা নামের এই উৎপত্তিব কথা আমাকে জানান অধ্যাপক ড. প্রদীপকুমার সিংহ। এব জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। —রা. মি.।



কলকাতার নানা এলাকা

এই অধ্যায়ে কলকাতার (হাওড়া-সহ) কয়েকটি অঞ্চল ও বিশিষ্ট কয়েকটি বাজার, রাস্তা, বাড়ি, অফিস ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। পরে অন্যান্য অধ্যায়েও অনুরূপ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এসব রচনা প্রথমে যে ক্রমানুসারে প্রকাশিত হয়েছিল, সেইভাবেই, কিন্তু পরিমার্জিত আকারে, গ্রন্থভুক্ত হল।

শালিমার

আফগানিস্থানে কান্দাহার দুর্গ ছিল পারস্য-সম্রাটের দখলে। এই দুর্গের অধ্যক্ষ মুজাফ্‌ফর হোসেন মির্জা উজবেগদের জ্বালায় অস্থির হয়ে দুর্গটি ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতসম্রাট আকবরের প্রতিনিধি শা বেগের হাতে বিনাযুদ্ধে সমর্পণ করেন। পারস্য-সম্রাট শা আব্বাস এই দুর্গ ১৬২২ সালের জুন মাসে মোগলদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাজাহান নানারকম কূটকৌশলে দুর্গের পারসিক শাসনকর্তা শা আলি মারদান্‌কে হাত ক'রে বিনা লড়াইয়ে কান্দাহার ফের দখল করতে সক্ষম হন। শা আলি মারদান্ বিশ্বাসঘাতকতা করায় পারস্য-সম্রাটের অধীনে তাঁর চাকুরি হারান। মোগল সম্রাট শাজাহান তাঁকে নিজের অধীনে চাকুরি দেন এবং বহু অর্থ ও সম্মান দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

শা আলি মারদান্ তখনকার দিনের সেরা সামরিক এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁকে দিয়ে সম্রাট শাজাহান দু'টি জগৎ-বিখ্যাত বাগান তৈরি করান—একটি লাহোরে আর দ্বিতীয়টি কাশ্মীরে। দু'টিরই নাম 'শালিমার বাগ'। এই ফারসি 'বাগ' শব্দটি কলকাতার লোকেরা আগেও পেয়েছেন, ইদানীং আবার নতুন ক'রে পাচ্ছেন—বাগবাজার, বাগমারি, আজাদ হিন্দ বাগ ও বি-বি-ডি বাগ ইত্যাদি নামের মধ্যে।

'শালিমার' শব্দের মানে করতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন, পারেন নি। শালিমার শব্দটির কোনো মানে নেই। এটি আরবি, ফারসি, উর্দু কিংবা হিন্দি শব্দ নয়। নির্মাতার নামের আদ্যক্ষর দিয়ে শব্দটি গঠিত হয়েছে, যথা—শা+আলি= শালি+মারদান্-এর 'মার' ('দান্' বাদ দিয়ে)।

আপত্তি হতে পারে যে, ইতিহাসে এই ব্যক্তিটির নাম পাওয়া যায় আলি মারদান্ খাঁ বলে। এটা ভুল। কোনো পারসিকের 'খাঁ' উপাধি হয় না। খাঁ উপাধি হয় তুর্কি, মোগল, পাঠান প্রভৃতির। প্রমাণ, সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি 'শা' বেগ। শা মানেই যে রাজা বা সম্রাট হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তির উপাধিও 'শা' হতে পারে। আবার 'শা' কোনো ব্যক্তির নামের অংশও হতে পারে। আলি মারদানের বেলায় এই হতে পারে যে, যতদিন পারস্য-সম্রাটের অধীনে চাকুরি করেছিলেন ততদিন 'শা' ছিলেন। মোগল সম্রাটের অধীনে চাকুরি নেবার ফলে হয় তিনি নিজেই 'খাঁ উপাধি নিয়েছিলেন, নয় মোগলরা দিয়েছিল। আর যদি একথা সত্যিই হয় যে গোড়া থেকেই তাঁর নাম আলি মারদান্ খাঁ ছিল, তাহলে বুঝতে হবে 'শালিমার'-এর প্রথম 'শা' অক্ষর তাঁর নাম নয়, সম্রাট শাজাহানের। এই নামের আড়ালে শুধু ভৃত্য নয়, প্রভু-ভৃত্য দু'জনেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। আলি মারদান্ খাঁর সমাধি লাহোরে আছে।

কলকাতার অপর পারে হাওড়ার দক্ষিণে, বোটানিক্যাল গার্ডেনের উত্তরে, ১৮ শতকের শেষদিকে একটি বড় ও অতি সুন্দর বাগান ছিল। এই বাগানটি করেছিলেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল রবার্ট কিড। তিনি নিজের বাগানেই স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন এক মুসলমান রমণী। কয়েকটি অল্পবয়সে মুসলমান গোলাম ও বাঁদীও ছিল তাঁর। তিনি উইলে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ক'রে যান আর নির্দেশ দিয়ে যান যে তিনি মারা গেলে তাঁর মৃতদেহ যেন তাঁর প্রিয় বাগানের মধ্যেই সমাধিস্থ করা হয়, ক্রিশ্চান কবরখানায় নয়। এর কারণ, তিনি জেনারেল স্যার ডেভিড অক্টারলনির ও ফরাসি জেনারেল মার্টিনের মতো আচারে-ব্যবহারে-রুচিতে প্রায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। লাহোর ও কাশ্মীরের বিখ্যাত মোগল বাগানের নামে তাঁর নিজের বাগানের নাম 'শালিমার গার্ডেন' রেখেছিলেন। এখন আর সে

বাগান নেই। এখন সেখানে শালিমার রোপ ওয়ার্কস, শালিমার পেণ্টস্ ইত্যাদির কারখানা হয়েছে। কাছেই রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শালিমার ইয়ার্ড। বাগান না থাকলেও ঐ অঞ্চলের নাম এখনো 'শালিমার' রয়ে গেছে। আর ঐ বাগানের সামনে গঙ্গার তীরের নাম এখনো রয়েছে 'শালিমার পয়েণ্ট'।

রামমোহনের আমহার্স্ট স্ট্রিটের ৮৫ নম্বর বাড়ি

এই বাড়ির গায়ে একটি পাথরের ফলকে ইংরেজিতে লেখা আছে যে এই বাড়িতে রামমোহন রায় ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাস করেছিলেন। আবার ১১৩ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতেও ঠিক ঐ কথাই লেখা আছে। লোকে এ দু'টিকেই রামমোহন রায়ের বাড়ি বলে বিশ্বাস ক'রে এসেছে। অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও স্বর্গীয় প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি-সম্পাদিত কুমারী সোফিয়া কোলেট-লিখিত রামমোহনের জীবনীতেও সেই কথা লেখা আছে। আমারও সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু একদিন এক বাংলা দৈনিক পত্রিকায় স্বর্গীয় তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের এক চিঠি ছাপা হয়। তাতে তিনি লেখেন যে তাঁর যতদূর জানা আছে, আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি রামমোহন রায় কেনেন নি বা তৈরি করেন নি। তৈরি করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল ৺রমাপ্রসাদ রায়। সম্পাদক দু'জনের মধ্যে কেউই তাঁকে লিখিতভাবে কোনো জবাব দেন নি। চট্টোপাধ্যায় মশাইয়ের ঐ কথা পড়ে আমি অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করি। শেষপর্যন্ত দেখি তপনমোহন বাবুর কথাই ঠিক।

রুস্তাক নামে এক সাহেবের 'দি নিউ ক্যালকাটা ডিরেক্টারি ফর দি টাউন অফ ক্যালকাটা…ফর ১৮৫৭' নামে এক ডিরেক্টারি আছে। সেটি মিলিটারি অর্ফান প্রেসে ছাপা হয়েছিল। তখনো থ্যাকারের ডিরেক্টারি বেরোয় নি। থ্যাকারের ডিরেক্টারি প্রথম বেরোয় ১৮৬৪ সালে। 'নিউ ক্যালকাটা ডিরেক্টারি'-তে আমহার্স্ট স্ট্রিটের এই ক'টা বাড়ির নম্বর ও মালিকের নাম দেওয়া আছে :

আমহার্স্ট স্ট্রিট (১৩০, বৌবাজার স্ট্রিট)

(রাস্তার পূর্বদিকে)

০ লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির একটি চ্যাপেল

২০ চার্চ মিশন ইনস্টিটিউশন

রেভা. টি. স্যাণ্ডি, মিশনারি, সি.এম.এস

" জে. লঙ. " "

" জে. ভন, " "

জে. এম. হাজরা, ক্যাটেকিস্ট

৩৫ আম্‌স হাউস

জি. স্ট্র্যাটফোর্ড, সুপারিনটেনডেণ্ট

৪৮ রমাপ্রসাদ রায়, সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল

নবাবদি ওস্তাগরের গলি

৪৯ চন্দ্র মুখার্জির বাজার

মানিকতলা স্ট্রিট (রাস্তার পশ্চিমদিকে)

৫৭ যুগলকিশোর দাসের গলি

৬০ নুনের চৌকি

৬৩ সুকিয়া স্ট্রিট

৭০ কুষ্ঠাশ্রম

১০৩ চাঁপাতলা ২য় গলি

চাঁপাতলা নতুন বাজার

ডিরেক্টারিতে পাকাবাড়ি ছাড়া কাঁচাবাড়ির উল্লেখ নেই। উপরের সবগুলি বাড়ি পাকাবাড়ি।

দেখা যাচ্ছে যে রাস্তার পূর্বদিকে রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ি ছিল। যদি রামমোহন আমহার্স্ট স্ট্রিটে কোনো বাড়ি কস্মিনকালে ক'রে থাকেন তো সেটা এই বাড়ি। আর পশ্চিমদিকে তাঁর তথাকথিত বাড়ির জায়গায় মাত্র একটি সরকারী নুনের চৌকি। সেখানে রামমোহন রায়ের বাড়ি থাকলে লেখা থাকত, হয় রাজা রামমোহন রায়ের নাম কিংবা তাঁর পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের নাম। তাছাড়া যুগলকিশোর দাসের গলি থেকে সুকিয়া স্ট্রিটের মধ্যে, অর্থাৎ বর্তমান 'রামমোহন রায়ের বাড়ি'র গোটা জায়গায় কোনো পাকাবাড়ি নেই, নুনের চৌকি ছাড়া।

রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ি ও চন্দ্র মুখার্জির বাজার—এ দুইয়ের মধ্যে নবাবদি ওস্তাগরের গলির উল্লেখ আছে, পরে তার নাম হয় আমহার্স্ট রো। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন নবাবদি ওস্তাগরের গলিতে ২ নম্বর বাড়িতে থাকতেন।

নিউ ক্যালকাটা ডিরেক্টারি ছাড়াও আমি পুরনো কলকাতার সার্ভে ম্যাপ দেখি—প্রথমটি এফ. ডবলিউ. সিম্‌স-এর ১৮৪৭-৪৯ সালের ম্যাপ; দ্বিতীয়টি আর. স্মিথ-এর ১৮৪৭-৫৩ সালের ম্যাপ। কোনোটিতেই রামমোহনের বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। 'রামমোহনের বাড়ি'র জায়গায় একটি খোলার বস্তি দেখানো আছে। রমাপ্রসাদ রায় মারা যান ১৮৬২ সালে। ডিরেক্টারি ও ম্যাপ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে ৮৫ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি রমাপ্রসাদ রায় ১৮৫৭ ও ১৮৬২ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে তৈরি করান। এইরকম কত অমূলক কথাই যে 'ইতিহাস' বলে চলে আসছে তার ইয়ত্তা নেই। আজ শ্রদ্ধেয় তপন-

মোহন চট্টোপাধ্যায় মশাই বেঁচে থাকলে তাঁর উক্তি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে 'জেনে তিনি কতই না খুশি হতেন !

বিদ্যাসাগরের বড়বাজারের বাসাবাড়ি

বালক ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় বড়বাজারের যে-বাড়ির এক-তলার একটি ঘরে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকতেন, যে-বাড়িতে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ ভাগবত সিংহ, তাঁর পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ ও কন্যা রাইমণি থাকতেন, যে-বাড়িতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবত সিংহের কাছে ২ টাকা মাইনেতে চাকুরি করতেন, সেই বাড়ি দয়েহাটা স্ট্রিটের ১৩ নম্বর বাড়ি। দয়েহাটা স্ট্রিটের নাম এখন দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড হয়েছে। আর বাড়িটির নম্বর হয়েছে ১৩-এ, ১৩-বি ও ১৩-সি। আমি এ বাড়ি আবিষ্কার করি। বাড়ির মালিক ও দু-একজন বাসিন্দা ছাড়া আর কেউ জানতেন না যে বিদ্যাসাগরের মশাই ছেলেবেলায় এই বাড়িতে বাস ক'রে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের কোনো জীবনীতেই এই বাড়ির নম্বর দেওয়া নেই।

মাইকেল মধুসূদনের বেনেপুকুর রোডের বাসাবাড়ি

২২ নম্বর বেনেপুকুর রোড। এই বাড়িতেই উত্তরপাড়া থেকে ফিরে এসে মাইকেল তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা, কন্যা শর্মিষ্ঠা ও শিশুপুত্র নিয়ে থাকতেন। এই বাড়িতেই মিঃ ফ্লয়েড-এর সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিয়ে হয়। আর, বিয়ের পরই এই বাড়ি থেকেই মধুসূদন প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটালে গিয়ে ভর্তি হন। এই বাড়িতেই ১৮৭৩ সালের ২৬ জুন হেনরিয়েটা মারা যান। এই বাড়িটিও আমার আবিষ্কার। মাইকেলের কোনো জীবনীতেই এ বাড়ির নম্বর লেখা নেই। এখন থ'কেন কিনা জানি না, আমি যখন এই বাড়িতে যেতাম তখন সেখানে কয়েক ঘর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বাস করতেন। আমিই তাঁদের বলি যে মাইকেল এ-বাড়িতে থাকতেন। তাঁরা কেউ একথা জানতেন না।

কেমন ক'রে আমি বিদ্যাসাগরের ও মাইকেলের বাড়ি আবিষ্কার করি সে কাহিনী আমি পরে বলব। আপাতত যে সমস্ত পাঠক কিছু খোঁজখবর রাখেন তাঁরা এই দু'টি বাড়ি সম্বন্ধে বলতে পারেন, এ আর নতুন কথা কী?

আগে হতেই তো তাঁরা অন্য লোকের লেখা পড়ে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল কোথায় থাকতেন জেনে গেছেন! ঠিক কথা। কিন্তু যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা হয় প্রত্যক্ষভাবে, নয় পরোক্ষভাবে আমার কাছ থেকেই জেনে লিখেছেন। একজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বের করতে পারেন নি। শেষে আমাকে ধরলে আমি তাঁকে নিয়ে গিয়ে সেই বাড়ি দেখাই। আর, অন্যজনের আত্মীয়ের কাছে আমি গল্প করি। তিনি তাঁর কাছ থেকে শুনে লিখে দিয়েছেন। দু'জনের কেউই আমার নাম উল্লেখ করেন নি, নিজেদের আবিষ্কার বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র বাড়ি

মাইকেলের বাড়ির খুব কাছেই—২ নম্বর বেনেপুকুর লেন। হুগলি কলেজ থেকে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে অবসর নিয়ে লালবিহারী কলকাতায় এসে এই বাড়িতেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। শেষজীবনে তিনি বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। বড় ছেলে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে রোমান ক্যাথলিকদের পাল্লায় পড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাতে তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পান। তাঁর অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে পড়ে যায় ও তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। এই বাড়িতেই তিনি ১৮৯৪ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে ৭০ বছর বয়সে মারা যান।

ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ি

১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি গরানহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে (এখন যেখানে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি রয়েছে) হিন্দু কলেজের (তখন কলেজ-বিভাগ হয় নি, মাত্র স্কুল-বিভাগ ছিল) পাঠারম্ভ হয়। ১৮১৯ সালে হিন্দু কলেজ ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়িতে উঠে আসে। তারপর ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট তারিখে এই বাড়ির সদর মহলের সামনাসামনি দু'টি ঘর ভাড়া নিয়ে রামমোহন রায় 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করেন। ১৮৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি এই বাড়ির উত্তর দিকে বর্তমান ৫৫ নম্বর আপার চিৎপুর রোডে পাকাবাড়ি তৈরি করিয়ে সেখানে ব্রহ্মসভা উঠিয়ে নিয়ে যান। এই বাড়িতে ব্রহ্মসভা-র দু'টি ঘর খালি পড়ে থাকে। পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ১৮৩০ সালে কলকাতায় এসে রামমোহন রায়ের সাহায্যে ঐ দু'টি খালিঘর ভাড়া নিয়ে ঐ সালের ১৩ জুলাই তারিখে তাঁর স্কুল

জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে এই স্কুল গরানহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে (যেখানে আগে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল) উঠে যায়। তারপর এই বাড়ি কেনেন সিঁদুরিয়া পটির ৺হরনাথ মল্লিক। ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ি আর নেই। তার জায়গায় এখন যে দোতলা বাড়ি রয়েছে তার নাম হচ্ছে 'মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান'। পুরনো নম্বর ৫১ আপার চিৎপুর রোড, বর্তমান নম্বর ২২৮ রবীন্দ্র সরণি। আগে হরনাথ মল্লিকের বাড়ির নম্বর ছিল ৩৪ থেকে ৩৮ আপার চিৎপুর রোড ও 'ব্রহ্মসভা' বা আদি ব্রাহ্মসমাজের নম্বর ছিল ৪৩ আপার চিৎপুর রোড।

কমল বসুর নাম সাধারণত কমললোচন বসু বলে ধরা হয়। কিন্তু হরিহর শেঠের মতে এঁর নাম ছিল রামকমল বসু। এঁর পিতা মানিকচন্দ্র বসু চন্দননগরের ফরাসি সরকারের অধীনে তহশিলদারের কাজ করতেন। সেই থেকে এঁদের চন্দননগরের পঞ্চাননতলায় বাস। হরিহর শেঠ লিখেছেন, ১৯২৪ সাল পর্যন্ত চন্দননগরের বাড়িতে কমল বসুর বংশধরেরা বাস করেছেন। কমল বসু ক্রিশ্চান ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন। তিনি মেসার্স ডি' সুজা অ্যাণ্ড কোম্পানি নামক বিখ্যাত পোর্তুগিজ বণিক কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করতেন বলে লোকে তাঁকে 'ফিরিঙ্গি কমল বোস' বলত, যেহেতু পোর্তুগিজদের আমরা 'ফিরিঙ্গি' বলে থাকি। সেইরকম মগেদের (বর্মিদের) সঙ্গে ব্যবসা করতেন বলে রামতনু পালিতকে লোকে 'তনুমগ' বলত।

পান্তীর মাঠ

১৬ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে এক প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছিল। ছিল বলাটা ভুল, এখনো আছে। তবে এখন আর কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে এ-বাড়িতে যাওয়া যায় না। সেদিকে অনেক বাড়িঘর হয়ে গেছে। এখন শিবনারায়ণ দাসের গলি দিয়ে ঢুকতে হয়। বাড়ির মাথায় লেখা আছে 'রাজ-মন্দির'। এ-বাড়ির মালিক ছিলেন জনৈক রাজকুমার দাস। এ অঞ্চলে তাঁর আরো কয়েকটি বাড়ি ছিল। তিনি বড়লোক ছিলেন। তিনি, যাঁর নামে গলি সেই শিবনারায়ণ দাসের পুত্র ছিলেন। এই বাড়ির একতলায় ১৯০৪ কি ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বদেশী যুগের বিখ্যাত 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি ক্লাব'। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যারিস্টার বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বি. সি. চাটুয্যে), ব্যারিস্টার রজত রায় প্রমুখ। ১৯০৫সালের জুন মাসে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এই দু'জনে মিলে এ বাড়ির দোতলায় একটি মেস করেন। এই মেসে থাকতেন পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী বাদে, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয় সরকার প্রমুখ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সেরা ছাত্র। এই মেসটি বছরখানেক চলেছিল।

এই বাড়িতেই ১৯০৬ সালের জুন মাসে 'শিবাজী-উৎসব' হয়। একতলার একটি ঘরে 'দেবী ভবানী'র সামনে হাঁটু গেড়ে পুজো করছেন এইরকম একটি শিবাজীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। এই উৎসব উপলক্ষে মহারাষ্ট্র থেকে তিলক, খাপার্দে, ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ নেতাদের আমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়েছিল। তাঁদের এই বাড়ির অন্য অংশে রাখা হয়েছিল।

এই বাড়ির সামনেই একটি বড় খোলা মাঠ ছিল। সেই মাঠকে লোকে 'পান্তীর মাঠ' বলত। কারণ সেটার মালিক ছিলেন রানাঘাটের বিখ্যাত জমিদার কৃষ্ণ পান্তী বা তাঁর কোনো বংশধর। কৃষ্ণ পান্তীর নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র পাল। প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত গরিব ছিলেন, পান বিক্রি করতেন বলে লোকে তাঁকে বলত 'পান্তী'। এই পান্তীর মাঠে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অসংখ্য সভা ও বক্তৃতা হয়েছে। এই মাঠেই শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে স্বদেশী মেলা বসেছিল, কৃষ্ণনগরের পুতুলনাচ প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছিল, অন্যদিকে বক্তৃতা ও লাঠিখেলারও। এখন পান্তীর মাঠের উপর বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেল হয়েছে।

কাশীপুরের কেলসল হাউস বা কেলসল গার্ডেন

ডিরোজিও-শিষ্য স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ যোসেফ নামে এক সওদাগরের অফিসে চাকুরি করতেন। যোসেফের অংশীদার ছিলেন আর এক সাহেব, টি.এস. কেলসল। যোসেফের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে কেলসল সাহেব যোসেফকে ছেড়ে দিয়ে রামগোপাল ঘোষকে অংশীদার ক'রে এক সওদাগরি অফিস খোলেন, নাম হয়—'কেলসল ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানি'। এই কেলসল সাহেব অত্যন্ত ধনী ছিলেন। কাশীপুরের রুস্তমজী পার্শি রোডে গঙ্গার ধারে এঁর এক বিরাট বাগান-বাড়ি ছিল। এখন বাগানটির জায়গায় একটা প্রকাণ্ড নোংরা মাঠ পড়ে আছে। কিন্তু বাড়িগুলি জরাজীর্ণ হয়ে অধিকাংশই ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবু এখনো যা আছে তা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখবার মতো। এই বাড়ির ফটকে একটি পাথরের উপর ইংরেজিতে লেখা ছিল : 'কলিকাতার সুপ্রিম আদালতের জজ স্যার রবার্ট চেম্বার্স ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৮খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রাসাদে বাস করেছিলেন।' এখন আর সে পাথরের ফলকটি নেই। রুস্তমজী পার্শি হচ্ছেন বিখ্যাত পার্শি ধন-

কুবের রুস্তমজী কাওয়াসজী। তাঁর এখানে কেলসল সাহেবের বাগানের উত্তর ধারে ষ্টিমার তৈরির ডক্ ছিল। সেজন্য রাস্তাটির নাম তাঁর নামে হয়েছে। এখন সেটি ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের ডক্ হয়েছে। এই বাগানবাড়িতে জজ চেম্বার্স ছাড়াও হিন্দু কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ স্বনামধন্য ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনও অনেকবছর বাস করেছেন। তিনি রোজ জুড়িগাড়ি ক'রে এখান থেকে হিন্দু কলেজে যাতায়াত করতেন। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ হিন্দু কলেজের সামনের বাড়ির (যার নাম পরে হয় 'অ্যালবার্ট হল') দোতলায় তাঁর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে রিচার্ডসন সাহেব কেলসল হাউস ছেড়ে দেন। অ্যালবার্ট হলের বাড়ির মালিক ছিলেন হিন্দু কলেজের ম্যানেজার ও কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন।

কেলসল হাউস পরে বড়বাজারের দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ শেঠের নাতি গোপাললাল শেঠও অগাধ ধনী ছিলেন। তিনি বড়বাজারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ঐ বাগানবড়িতে বাস করতেন।

কেলসল হাউস ছিল একটি আট-কোণা বাড়ি। এই বাড়িটি নাকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের দরকারে তৈরি করিয়েছিল।

ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজার

এখন ভবানীপুরে যেখানে যদুবাবুর বাজার (অনেক লোকে ভুল ক'রে বলে 'জগুবাবুর বাজার') সেখানে আগে এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ছিল। তার মালিক ছিলেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের জজ স্যার রবার্ট চেম্বার্স। তিনি ওখানেও থাকতেন। ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলে বিলেত থেকে যে ৪ জন জজ প্রথম নিয়োগপত্র পেয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে স্যার রবার্ট চেম্বার্স একজন। চেম্বার্সের এই বাগানবাড়িই পরে রানী রাসমণি কেনেন ও সেখানে বাজার বসিয়ে তাঁর দৌহিত্র ৺যদুনাথ চৌধুরীকে দান করেন। তাই থেকে এটা 'যদুবাবুর বাজার' বলে লোকের কাছে পরিচিত হয়ে আসছে। যদুনাথের মা কুমারী দাসী রানী রাসমণির দ্বিতীয়া কন্যা ও বাবা প্যারীমোহন চৌধুরী। কয়েক বছর হল ট্যাংরা রোডের নাম হয়েছে রাধানাথ চৌধুরী রোড। রাধানাথ চৌধুরী যদুনাথ চৌধুরীর বংশধর। ট্যাংরা ও চিংড়িঘাটা অঞ্চলে এঁদের বাস। এখনো হিউজেস রোডের উপরে এঁদের বিরাট বাড়ি বর্তমান।

ভবানীপুরের জলটুঙ্গি

এটি ছিল রসা রোডে বর্তমান ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস স্কুল ও পেট্রল পাম্পের উল্টোদিকে। এটিও একটি বড় বাগানবাড়ি ছিল। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এ বাগানের অনেকখানি গ্রাস ক'রে ফেলেছে। সামান্য একটু বাকি আছে। তা থেকে বাগানটি আগে কিরকম ছিল তার কোনোই ধারণা করা যাবে না। কেননা এখন সে পুকুরও নেই, আর জলটুঙ্গিও নেই।

এই বাগানের ভেতর একটি বড় পুকুর ছিল। আর চারধারে লম্বা লম্বা নারকেল গাছ ছিল। পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটি গোল ইমারত দাঁড় করানো হয়েছিল। এরই নাম ছিল 'জলটুঙ্গি'—ইংরেজিতে 'ওয়াটার প্যাভিলিয়ন'। এই টুঙ্গির তলার পরিধি ছিল ২৫ ফুট। জলের তলায় কয়েকটি পোক্ত খিলানের উপর মজবুত তক্তা বিছিয়ে তার উপর বাড়িটিকে খাড়া করা হয়েছিল। এর মেঝেতে কয়েকটি চোরা দরজা ছিল। তাদের যে-কোনো একটিকে তুললেই সিঁড়ি দেখা যেত। সেই সিঁড়ি বেয়ে জলে নেমে স্নান করা বা মাছ ধরা যেতে পারত। পুকুরের পাড় থেকে জলটুঙ্গি পর্যন্ত একটি তক্তা বিছানো জাঙাল ছিল। সেই জাঙালের উপর দিয়ে জলটুঙ্গিতে যেতে হতো।

এই জলটুঙ্গিটি তৈরি করেন এক সাহেব মিঃ হেনরি পিট্স ফরস্টার, তাঁর স্ত্রী এক জাঠ মহিলার গ্রীষ্মাবাসের জন্য। জনসাধারণ এই বাড়ির নাম দিয়েছিল Forster's Folly (ফরস্টারের আক্কেল সেলামি)। ফরস্টার সাহেব ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকুরিতে ঢোকেন। ১৭৯৪সালে সদর দেওয়ানি আদালতের রেজিস্ট্রার হন। তিনি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতেন ও এই ভাষা ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। ১৭৯৯ সালে বিরাট দুই খণ্ডে একটি ইংরেজি-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি অভিধান প্রকাশ করেন। তার ইংরেজি নাম 'এ ভোকা-বুলারি ইংলিশ অ্যাণ্ড বেঙ্গলি অ্যাণ্ড ভাইসি ভার্সা'। তিনি একটি সংস্কৃত ব্যাকরণও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। শেষপর্যন্ত তিনি কলকাতা টাঁকশালের মাস্টার (অধ্যক্ষ) হয়েছিলেন। এই দেশেই ১৮১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মারা যান।

কলকাতা কর্পোরেশনের ২ নম্বর জেলা অফিস

এখন মির্জাপুর স্ট্রিটে যেখানে কলকাতা কর্পোরেশনের ২ নম্বর জেলা অফিস রয়েছে, সেখানে ১৮২০ সাল নাগাদ একটি প্রকাণ্ড বাগান ছিল। তার ভেতর

কয়েকটি পাকাবাড়ি ছিল। এই বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন পোস্তার রাজা নার্সিং (নরসিংহ)-চন্দ্র রায়। এই বাগানের একটি বাড়িতে স্কুল সোসাইটির স্কুল, যার নাম পরে হেয়ার স্কুল হয়, ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪২ সালের ১ জুন তারিখে ডেভিড হেয়ারের কলেরায় মৃত্যু হয়। ১৮৪৩ সালের এপ্রিল মাসে রাজা নার্সিং এই স্কুলটিকে সেখান থেকে উঠে যেতে বাধ্য করেন। হেয়ার স্কুল প্রেসিডেন্সি কলেজের পেছনদিকে ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রিটে উঠে যায়। আর নার্সিংচন্দ্রের বাগানে হেয়ার স্কুলের খালি বাড়িটি দখল করে মতিলাল শীলের ফ্রি কলেজ। এই কলেজটি মতিলাল শীল ১৮৪৩ সালের ১ মার্চ নিজের বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজের বসতবাড়িতে একটা স্কুল-সমেত কলেজকে আর কতদিন রাখা যায়! তাই মতিলাল নার্সিংচন্দ্রকে ধরে পড়েন হেয়ার স্কুলকে তাঁর বাগানবাড়ি থেকে তুলে দেওয়ার জন্য। মতিলাল শীল একে ধনকুবের, তায় নার্সিংচন্দ্রের স্বজাতি। নার্সিংচন্দ্র মতিলালের কথা ফেলতে পারলেন না, বিশেষ ক'রে যখন হেয়ার সাহেব জীবিত নেই। তিনি এক অতি স্বল্পমেয়াদী নোটিস দিয়ে হেয়ার স্কুল তুলে দিলেন শীল্‌স ফ্রি কলেজকে ঠাঁই দেবার জন্য।

পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ সালে কলকাতায় আসা অবধি নার্সিংচন্দ্রের এই বাগানের আর একটি বাড়িতে বাস করেছেন ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। সেই মাসে হেদো পুকুরের পূর্বদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন-এর নিজস্ব পাকাবাড়ি তৈরি শেষ হয়ে গেলে গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ি থেকে তাঁর স্কুলটিকে নিয়ে তিনি সেখানে উঠে যান।

১৮৫৪ সালের ১৬ আগস্ট গরানহাটায় 'দি স্কুল ফর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' স্থাপিত হয়। গরানহাটায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঐ স্কুল হীরালাল শীলের কাছে আবেদন করে। হীরালাল শীল ১৩নং কলেজ স্ট্রিটে (রাস্তার পশ্চিমদিকে, কলুটোলা স্ট্রিটের ওপর, মাধববাবুর বাজারের ঠিক দক্ষিণেই) তাঁর পিতার যে ব্যারাকবাড়ি ছিল সেই বাড়িতে ঐ স্কুলকে বিনাভাড়ায় থাকতে দেন। ১৮৫৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে আর্ট স্কুল এই বাড়িতে উঠে আসে। হীরালাল শীল ইচ্ছা করলে মাসে ২০০ টাকা ভাড়া স্কুলের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। আর্ট স্কুল এখানে ১৮৬৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত থাকে। জুলাই মাসে ১৬৬ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটে উঠে যায়।

মতিলাল ও হীরালাল শীলের ব্যারাকবাড়িটি এখন নেই। তার জায়গায় মেডিক্যাল কলেজের শ্যামাচরণ লাহা চোখের হাসপাতাল (Eye Infirmary) ১৮৯১ সালে তৈরি হয়েছে। এখন আর চোখের হাসপাতাল এখানে নেই। বাড়িটি আছে এবং নানারকম অন্য রোগের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

১৮৬৭ সালে নার্সিংচন্দ্রের বাগানবাড়ি কিনে নেয় ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ,

যার পরে নাম হয় সেণ্ট পল্‌স কলেজ। পুরনো বাড়িগুলি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি আরম্ভ হয় ঐ বছরের মে মাসের শেষে। বাড়ি তৈরি শেষ হয় ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এখানে কলেজের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় ১৮৬৮ সালের ৩ এপ্রিল তারিখে। ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৫ সালের ১ জানুয়ারি ২৫ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। কলেজ ১৯০৭ সালে কলকাতা কর্পোরেশনকে এই জমি ও বাড়ি বেচে দিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটের বর্তমান বাড়িতে উঠে যায়। কলকাতা কর্পোরেশন এখানে তার ২ নম্বর জেলা অফিস খোলে ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে।

যে ২৫ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ ১৮৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বাড়িরই নিচের তলার একটি ঘরে ২০ বছর পরে ১৮৮৫ সালের ১ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মশাই 'কলিকাতা পুস্তকালয়' নামে একটি নতুন পুস্তকালয় স্থাপন করেন।

পামার বাজার, এণ্টালি

এখন এ বাজার নেই। কিন্তু এখনো একটা রাস্তার নাম আছে পামার বাজার রোড, মুনশিবাজারের দক্ষিণে। পামার অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে বিখ্যাত সওদাগরি হৌসের মালিক স্বনামধন্য মিঃ জন পামার, যাঁকে ইংরেজরা 'প্রিন্স অফ মার্চেণ্টস' উপাধি দিয়েছিল, তাঁর দুই ছেলে ছিল। ছোট ছেলের নাম ছিল ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক পামার। তিনি সৈন্যবিভাগে কাজ করতেন, থাকতেন শেয়ালদার কাছে বেলেঘাটা রোডে বিশ্বনাথ মতিলালের এক বড় বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে। তিনি খুব বিদ্বান ছিলেন এবং শীল্‌স ফ্রি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি এই বাজারটি বসান। তাই তাঁর নামে বাজারটির নাম হয় 'পামার বাজার'। বাজারটি ছিল রাস্তার পূর্বদিকে, যেদিকে মুনশিবাজার আজও রয়েছে।

মুনশিবাজার, এণ্টালি

এই বাজারের প্রতিষ্ঠাতা কে, তাই নিয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশ লোকের মতে প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মুনশি মহম্মদ আমির। আবার কিছুলোক বলেছেন, এর প্রতিষ্ঠাতা মুনশি আমির নয়, টাকির জমিদার মথুরানাথ মুনশি—কালীনাথ ও

বৈকুণ্ঠনাথ মুনশির ছোট ভাই। তাঁর উপাধি 'মুনশি' ছিল বলে বাজারের নাম মুনশিবাজার। এ মতের সপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, মথুরানাথ মুনশি বরানগরে পৈতৃকবাড়িতে না থেকে বেলেঘাটায় থাকতেন। এ অঞ্চলে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। এখানে তিনি অনেকরকম ব্যবসা করতেন। অতএব তাঁর পক্ষে একটা বাজার বসানো অসম্ভব নয়। অন্যপক্ষে জানা যায় যে, মুনশি আমিরও বেলেঘাটায় থাকতেন। তিনি বাঙালি মুসলমান ছিলেন। ২৪-পরগনা জেলার বারাসত ও বসিরহাটের মধ্যে দেগঙ্গার কাছে এক গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল।

বেলেঘাটায় কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিস

পূর্বে এই বিরাট বাড়িটি ভিজিয়ানাগ্রামের (বিজয়নগরমের) মহারাজার প্রাসাদ ছিল। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' নামে বইখানা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা 'কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা'র কথা নিশ্চয়ই ভোলেন নি। কালীপ্রসাদ দত্ত ছিলেন চূড়ামণি দত্তের পুত্র। রাজনারায়ণ বসু কালীপ্রসাদ দত্তকে হাটখোলার দত্ত বলেছেন, কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। চূড়ামণি দত্তের বাড়ি ছিল ২৪-পরগনা জেলার সাঁইবনা গ্রামে, যেখানে নন্দলালজীর মন্দির আছে। খড়দহের শ্যামসুন্দর, বল্লভপুরের রাধাবল্লভ ও সাঁইবনার নন্দলালকে একই দিনে (মাঘী পূর্ণিমায়) দর্শন করতে হয়। কারণ এই ৩টি বিগ্রহই নাকি একটি পাথর থেকে তৈরি। চূড়ামণি দত্ত সাঁইবনা থেকে কলকাতায় আসেন নবাব সিরাজদ্দৌলার কলকাতা দখলের পরে। কালীপ্রসাদ দত্তের নামে এক রাস্তা গ্রে স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে খানিকটা দক্ষিণে গিয়ে পশ্চিমে চিৎপুর রোডের দিকে ঘুরে গেছে। এই রাস্তার উপর চূড়ামণি দত্তের উঁচু বড় বাড়ি ছিল। সেই বাড়িকে লোকে 'বালাখানা' বলত। 'বালাখানা' এই ফারসি শব্দের মানেই হচ্ছে 'উঁচুবাড়ি'। এই সূত্রে 'ফৌজদারি বালাখানা'র নাম মনে আসা স্বাভাবিক। চূড়ামণি দত্তের বাড়ির নাম থেকে তাঁর বাড়ির কাছের একটি রাস্তার নামও ছিল বালাখানা স্ট্রিট। সেটা চিৎপুর রোডে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন আর বালাখানা স্ট্রিট নেই। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কৃপায় সে রাস্তা ও তার নাম লোপাট হয়ে গেছে। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব ও চূড়ামণি দত্তের মধ্যে খুব আকৃছা-আকৃছি ছিল। দু'জনে ছিলেন পরস্পরের প্রতিবেশী। একজন থাকতেন গ্রে স্ট্রিটের উত্তরে, অন্যজন দক্ষিণে। ছাতে উঠলে পরস্পরের বাড়ি দেখা যেত। এই চূড়ামণি দত্ত মহারাজা নবকৃষ্ণের আগে মারা যান। মৃত্যুর আগে তাঁর দেহকে এক বিপুল জনতা মহারাজার বাড়ির সামনে দিয়ে ঢাক ঢোল শিঙা ইত্যাদি বাজাতে বাজাতে ও তারস্বরে 'যম

জিনিতে যায় রে চূড়া, যম জিনিতে যায়' এই গান গাইতে গাইতে গঙ্গাযাত্রা করতে নিয়ে যায়। সম্পূর্ণ গানটি ৺হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা—সেকালের ও একালের' নামক ইতিহাসে দেওয়া আছে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসেও আছে।

চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধে মহারাজা নবকৃষ্ণের দল কলকাতার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের যেতে বারণ ক'রে দেন। কালীপ্রসাদ দত্ত বড় ফাঁপরে পড়ে রামদুলাল সরকারের শরণাপন্ন হন। রামদুলাল বড়িসার সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায়কে বলে সেখান থেকে তাঁর অনুগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের আনিয়ে কালীপ্রসাদকে পিতৃদায় থেকে উদ্ধার করেন। এই হল সংক্ষেপে 'কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা'।

বড়িসা থেকে যেসব ব্রাহ্মণ তাঁদের দলপতি সন্তোষ রায়ের (১৭১০-৯৯) সঙ্গে কালীপ্রসাদ দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করবার জন্য এসেছিলেন তাঁরা সকলেই দক্ষিণা নিতে অস্বীকার করায় কালীপ্রসাদ দত্ত কোনো সৎকাজে ব্যয় করবার জন্য ২৫ হাজার টাকা সন্তোষ রায়ের হাতে দেন। সন্তোষ রায় সেই টাকা দিয়ে কালীঘাটে বর্তমান কালীমন্দির তৈরি করতে আরম্ভ ক'রে মারা যান। তাঁর পুত্র রামদুলাল রায় সেই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে।

কালীপ্রসাদ দত্তকে একঘরে করবার কারণ ছিল এই যে, তিনি হিন্দু হয়ে ঘোরতর অহিন্দু আচরণ করেছিলেন। বিবি আনারো (রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন 'বিবি আনরো') নামে এক পরমাসুন্দরী মুসলমানী উপপত্নীকে নিয়ে তিনি নিজের বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে দিয়ে দিবারাত্রি তার সঙ্গেই থাকতেন, মুসলমানী পোশাক পরতেন, হিন্দুর অভক্ষ্য ভক্ষণ করতেন এবং সব রকমে মুসলমানদের মতো আচরণ করতেন। এত বাড়াবাড়ি হিন্দুসমাজ কী ক'রে বরদাস্ত করে! অবশ্য পিতার মৃত্যুর পর তিনি হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। কিন্তু তাতে গোঁড়া হিন্দু নেতাদের বিরোধিতা ঘোচে নি।

বেলেঘাটায় ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার প্রাসাদ বা বর্তমান কমার্শিয়াল ট্যাক্স ভবন এই কালীপ্রসাদ দত্তেরই বাগানবাড়ি ছিল। তিনি বিবি আনারোকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকতেন। এই বাগানবাড়িটি কালীপ্রসাদ দত্ত তাঁর উপপত্নীকে দান করেন। মুনশিবাজারের মালিক মুনশি আমির এই মহিলাকে পরে বিয়ে করেন ও এই বাগানবাড়ির মালিক হন। তিনি নিজেও এই বাড়িতে বাস করতেন। তিনি বা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোনো বংশধর এই বাগানবাড়িটি ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকে বিক্রি ক'রে দেন। এখন এই বাড়ি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পত্তি।

এই বাগানবাড়ির পূর্বদিকে দু-তিনখানা বাড়ির পর বেলেঘাটা রোডের উপর আর একটি বড় বাগানবাড়ি আছে। এটি মরহুম (মৃত) শেখ আমজাদ আলি

ও তস্য পুত্র মরহুম শেখ নবাব হোসেনের (অপুত্রক) ওয়াকফ্-করা সম্পত্তি।
শোনা যায় এঁরা দু'জন মুনশি আমিরের বংশের লোক।

বিবি আনারো লখনৌ থেকে এসেছিলেন ও ধর্মে ছিলেন শিয়া। আনারো তাঁর আদরের নাম, আনার (ডালিম) বা আনারকলি (ডালিম ফুল) থেকে নামটি হয়েছে। লাহোরের আনারকলি, যুবরাজ সেলিম যাঁর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন ও সম্রাট আকবর যাঁকে জীবন্ত সমাধি দিয়েছিলেন, তিনিও অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। বেনেপুকুর রোডের উপর রাস্তার পুবধারে বিবি আনারো এক ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার দেখাশোনা ও খরচ-খরচার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ টাকা ও জমিজমাও দিয়ে যান। ফটকের দক্ষিণে দেয়ালে লাগানো এক সাদা পাথরের উপর বিবি আনারো-র কীর্তিকথা লেখা ছিল। এখন আর সে পাথরখানি নেই। আর বাইরে থেকে দেখে ইমামবাড়াকেও চেনবার জো নেই।

এ পর্যন্ত 'বিবি আনারো' আমাদের কাছে একটি নাম মাত্র ছিলেন। এখন অতি সামান্য হলেও তাঁর কিছুটা পরিচয় পেলাম। জানলাম তিনি নিছক কল্পনা বা কিংবদন্তি নন।

ক. ১৮৩৪ সালের ৫ এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল : "কিয়ৎকাল হইল কোনও প্রধান বংশোদ্ভব পরমমান্য জনৈক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ত্বক চ্ছেদন পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করত আনারো নাম্নী মুসলমান রমণীকে বিবাহ করেন। মুসলমানগণ তাঁহার ইজ্জতালী খাঁ নাম রাখেন। তিনি উক্ত যবনী স্ত্রীর সঙ্গে রোজা, নামাজ ইত্যাদি পালন পূর্ব্বক বহুকাল সংসার ধর্ম্ম করেন। অতঃপরঐ খাঁ সাহেবের কোনওপৈতৃক প্রাচীন ভৃত্য নূতন ধনী হইয়া তাঁহার সহিত পানাহার করিয়া পুনরায় খাঁ সাহেবকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করেন।"

খ. "রাজা নবকৃষ্ণের সহিত চূড়ামণি দত্তের ও কুমারটুলির অভয়চরণ মিত্রের মোকদ্দমা হয়। সে মোকদ্দমা প্রিভি কাউনসিল পর্যন্ত পৌঁছায়। অবশেষে চূড়ামণি দত্তের জয় হয়।"

গ. ১৮৩৩ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল : "পূর্ব্বে কলকাতায় দুইটি সামাজিক দল ছিল—৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের একটি দল ও ৺মদনমোহন দত্তের একটি দল। রামদুলাল সরকার মদনমোহন দত্তের দলভুক্ত ছিলেন।"

রামদুলাল সরকারের মদনমোহন দত্তের দলে থাকাই স্বাভাবিক ছিল, কেননা তাঁর সমস্ত বৈষয়িক উন্নতির মূলে ছিলেন মদনমোহন দত্ত। সেই জন্যই কালীপ্রসাদ দত্ত পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপারে রামদুলাল সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। এ থেকে আরো প্রমাণ হয় যে, কালীপ্রসাদ দত্ত হাটখোলার দত্ত ছিলেন না। যদি তিনি হাটখোলার দত্ত হতেন তাহলে তাঁকে তৃতীয় ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হতো না।

কনভেণ্ট রোড, এণ্টালি

লোয়ার সার্কুলার রোড ও ধর্মতলা স্ট্রিটের মোড় থেকে মৌলালির মোড়—এই-টুকু জায়গার মধ্যে থেকে এণ্টালি অঞ্চলের ৩টি প্রধান রাস্তা বেরিয়েছে। একটি উত্তরের রাস্তা (নর্থ রোড), একটি মধ্যের রাস্তা (মিড্‌ল রোড), আর একটি দক্ষিণের রাস্তা (সাউথ রোড। নর্থ রোড ও মিড্‌ল রোড বেরিয়ে সোজা পুবদিকে চলে গেছে, সাউথ রোড মিড্‌ল রোড থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়েছে। সাউথ রোডের নাম পাল্টে হয়েছে ডাক্তার সুরেশ সরকার রোড, মিড্‌ল রোডের নাম মিড্‌ল রোডই আছে, নর্থ রোডের নাম বদলে গিয়ে হয়েছে কনভেণ্ট রোড। কলকাতা কর্পোরেশনের স্টোর অফিসের ও কারখানার গা ঘেঁষে খানিক দূর যাবার পর কনভেণ্ট রোড থেকে একটি গলি বেরিয়ে খানিকটা উত্তরে গিয়ে পুবদিকে মোড় নিয়েছে। এ গলির নাম ক্যানাল স্ট্রিট। আবার উল্টোদিকে ধর্মতলা স্ট্রিটের মোড় থেকে সামান্য উত্তরে সার্কুলার রোড থেকে একটা গলি বেরিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এই গলির নাম ক্রিক রো। ইংরেজি ক্রিক ও ক্যানাল শব্দ দু'টির একই মানে—'খাল'। এককালে এই দু'টি গলির মধ্য দিয়ে যে একটা খাল বয়ে যেত তার স্মৃতি এই গলি দু'টির নাম আজও বহন করছে।

অনেকদিন আগেকার কথা, ইংরেজরা তখনো কলকাতায় আসে নি। অতএব তখনো স্ট্র্যাণ্ড রোড হয় নি। স্ট্র্যাণ্ড রোডের জায়গায় ছিল গঙ্গানদী। পরবর্তী কালের হেস্টিংস স্ট্রিটের উপর দিয়ে, বেণ্টিংক স্ট্রিট পার হয়ে, ধর্মতলা স্ট্রিটের উত্তর দিক দিয়ে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে ক্রিক রো ও লোয়ার সর্কুলার রোড পার হয়ে কনভেণ্ট রোড ও ক্যানাল স্ট্রিটের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে উত্তর-পূর্ব দিকে বয়ে গিয়ে বেলেঘাটার খাল দিয়ে ধাপা হয়ে বিদ্যাধরী নদীতে পড়ত। তখন বিদ্যাধরী বড় নদী ছিল, মাতলা নদীতে গিয়ে পড়ত। এখন মজে গেছে। চুনাপটি বা সাউথ শেয়ালদা রোড থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত এখন যে খালটা আছে সেইটে সেই প্রাচীন খালের সামান্য অংশমাত্র। ইংরেজরা বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট তৈরি করার তাগিদে পশ্চিম দিকথেকে শুরু ক'রে একটুএকটু ক'রে ভরাট করতে করতে পূর্বদিকে চুনাপটি পর্যন্ত বুজিয়ে সেখানেই থেমে গেছে, আর এগোয় নি। এই কাজ করতে তাদের অনেক সময় লেগেছে। হেস্টিংস স্ট্রিট থেকে আরম্ভ ক'রে সার্কুলার রোড পর্যন্ত বুজিয়ে তারা অনেকদিন চুপচাপ বসে ছিল, আর পূর্বদিকে এগোয় নি। সার্কুলার রোডের পূর্বদিক যেহেতু কলকাতার সীমার বাইরে ২৪-পরগনার মধ্যে পড়ে, আর এদিকের লোকজনেরা গরিব ও তাদের বসতিও খুব কম—এই কারণে কর্তাদের আর ধর্মতলা স্ট্রিটের মোড় থেকে সাউথ

শেয়ালদা রোড পর্যন্ত অংশটা তাড়াতাড়ি বোজাবার চাড় হয় নি। খালের ঐ অংশটা না বোজানো অবস্থায় ছিল ১৮৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬০-৬১ সালে খালটা তাড়াতাড়ি বুজোতে হল দু'টি কারণে। প্রথম, বেলেঘাটা থেকে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হল বলে। এই লাইনটি ছিল কলকাতা থেকে দক্ষিণে যাবার সর্বপ্রথম রেল লাইন, নাম ছিল ক্যালকাটা অ্যাণ্ড সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে (Calcutta and South-Eastern Railway)। তখন শেয়ালদা হয় নি। একমাত্র স্টেশন ছিল বেলেঘাটা স্টেশন। খাল বোজাবার দ্বিতীয় কারণ হল, কলকাতার মাটির নিচে পাকা ড্রেন তৈরির কাজ আরম্ভ হওয়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ডেপুটি ভগবানচন্দ্র বসু ও তাঁর পুত্র আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু বহুকাল ক্যানাল স্ট্রিটের একটি বাড়িতে বাস করেছিলেন।

নর্থ রোড পূর্বে গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি আছে। তাতে জমি আছে ১০০ বিঘে ও বাড়ি আছে অনেকগুলি। এটি লোরেটো সম্প্রদায়ভুক্ত রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের মঠ-বাড়ি। সন্ন্যাসিনীদের মঠকে ইংরেজিতে 'কনভেণ্ট' বলে। রাস্তার পাশে এই কনভেণ্ট থাকায় নর্থ রোডের নাম পাল্টে গিয়ে হয়েছে 'কনভেণ্ট রোড'।

লোরেটো সন্ন্যাসিনীরা আয়ারল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় প্রথম আসেন ১৮৪১ সালের ৩০ ডিসেম্বর। তাঁদের আসবার আগেই তাঁদের বাসের জন্য 'লোরেটো হাউস' কেনা হয়েছিল। এই সন্ন্যাসিনীরা গোড়ায় মিড্‌লটন রো-র এই 'লোরেটো হাউসে' থাকতেন। সেখান থেকে তাঁদের একদলকে চন্দননগরে ও আর এক-দলকে শ্রীরামপুরে পাঠানো হয়, মেয়েদের স্কুল ও অনাথ আশ্রম চালাবার জন্য। ১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে তাঁদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয় ও মূল লোরেটো হাউসে না পাঠিয়ে এই বাগানবাড়িতেই থাকবার হুকুম হয়। এঁরা চন্দননগর থেকে তাঁদের পরিচালিত মেয়েদের স্কুল ও অনাথ আশ্রম এখানে উঠিয়ে আনেন। শ্রীরামপুরের সন্ন্যাসিনীরা কিছু আনতে পারেন নি, কারণ তাঁরা সেখানে কিছু গড়তে পারেন নি। তার আগে থেকেই কলকাতায় লোরেটো হাউসের সন্ন্যাসিনীরা এখানে একটি অনাথা মেয়েদের আশ্রম ও একটি বিধবা আশ্রম চালাচ্ছিলেন। কিন্তু এই সন্ন্যাসিনীরা এখানে থাকতেন-না, লোরেটো হাউসেই থাকতেন, রোজ সেখান থেকে যাতায়াত করতেন। ১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে এই বাগানবাড়ি আজ পর্যন্ত চন্দননগর ও শ্রীরামপুর-ফেরত লোরেটো সন্ন্যাসিনীদের কনভেণ্ট হয়ে রয়েছে।

কিন্তু এই বাগানবাড়ি গোড়ায় এই সন্ন্যাসিনীদের ছিল না, ছিল একজন ধনী আর্মানি বণিকের। আর্মানিরা ক্রিশ্চান হলেও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ক্রিশ্চান নন। তাঁদের সম্প্রদায় ও ধর্মগুরু আলাদা। তবে সব নিয়মেরই ব্যতি-ক্রম থাকে। খুব অল্পসংখ্যক আর্মানি রোমান ক্যাথলিক। পোর্তুগিজ গির্জার

পাথরের মেঝেতে কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক আর্মানির নাম খোদাই করা আছে। আমাদের এই আর্মানি সওদাগরটিও রোমান ক্যাথলিক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মিঃ ফাত্-উল্লাহ্ আস্ফার। তিনি পোর্তুগিজ গির্জার কাছেই একটি বড় বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটি তাঁরই ছিল। তিনি তাঁর বসতবাড়িটি পোর্তুগিজ পাদ্রিদের বসবাসের জন্য দান করেছিলেন। এখন ১০০ বিঘে জমি-সমেত যে বাগানবাড়িতে এণ্টালি কনভেণ্ট রয়েছে সেই বাগানবাড়িও এই আর্মানি বণিকের ছিল। তখন এর ভেতর বাড়ির সংখ্যা কম ছিল। তিনি এই বাগানবাড়ি তৎকালীন ভিকার অ্যাপস্টোলিক (পোপের প্রতিনিধি, তখনো কলকাতার জন্যে কোনো বিশপ বা আর্চ বিশপের পদ সৃষ্টি হয় নি) মনসেনিয়ার ক্যারু-কে সেণ্ট জন্স কলেজের জন্য বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে দেন। ১৮৪৪ সালের ১জানুয়ারি সেণ্ট জন্স কলেজ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ আস্ফারের পুত্র জনও এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছেলের পড়া শেষ হলে মিঃ আস্ফার এই বাগানবাড়ি মাত্র ২৭ হাজার টাকায় ক্যারু-কে বেচে দেন। মিঃ আস্ফার মারা যান ১৮৫২ সালের ৯ মে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জন আরো ৩ হাজার টাকা কমিয়ে দেন। ১৮৫৩ সালের ১ আগস্ট থেকে এই বাগানবাড়ি ভিকারের অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের সম্পত্তি হয়ে যায়। ১৮৪৯ সালের অক্টো-বর মাসে সেণ্ট জন্স কলেজ এখান থেকে উঠে পার্ক স্ট্রিটে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাড়িতে যায়। তারপর চন্দননগর ও শ্রীরামপুরের লোরেটো সন্ন্যাসিনীরা সমস্ত বাগানবাড়িটা দখল করেন।

মিশনারিজ অব চ্যারিটি(Missionaries of Charity) নামক মহিলা সেবা-সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী মাদার টেরিসা ১৯২৮ সালে আলব্যানিয়া থেকে কলকাতায় এসে এণ্টালির লোরেটো কনভেণ্টে যোগ দেন ও এখানকার মেয়েদের হাইস্কুলের অধ্যক্ষা হয়ে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ২০ বছর কাজ করেন। পাশেই মোতিঝিলের বিরাট বস্তি। দিনের পর দিন বস্তিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়।। তিনি ১৯৪৮ সালে মহামান্য পোপের কাছে 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' নামক সেবাসংঘ প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। পোপ অনুমতি দিলে তিনি ঐ সালেই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ

এইমাত্র যে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের কথা বলা হল সে বর্তমান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ নয়। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ দু'বার হয়েছে। আগে একটা

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলকাতায় হয়েছিল, সেটা উঠে যায়। বর্তমান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজটি দ্বিতীয়।

প্রথম একদল ইংরেজ জেস্যুইট কলকাতায় আসেন ১৮৩৪ সালের ৮ অক্টোবর। তাঁরা পোর্তুগিজ চার্চ স্ট্রিটে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই প্রথম সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে পুরনো ৩ নম্বর পার্ক স্ট্রিটের এক ভাড়াবাড়িতে কলেজটিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কলেজটিকে আবার ১৮৪১ সালের জানুয়ারি মাসে ২৮ নম্বর চৌরঙ্গি রোডের ভাড়াবাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। ভিকার অ্যাপস্টোলিক ক্যারু-র সঙ্গে এই জেস্যুইটদের বিরোধ বাধায় তাঁরা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ তুলে দিয়ে ১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে চলে যান। ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্যারু বর্তমান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাড়ি, যেটাতে আগে 'সাঁ সুসি' থিয়েটার ছিল, আর যার পুরনো নম্বর ছিল ১০ ও ১১, এবং বর্তমান নম্বর ৩০ পার্ক স্ট্রিট, সেই বাড়িটি কেনেন ও পরের মাসে তাঁর নিজের স্থাপিত সেণ্ট জন্‌স কলেজকে এণ্টালির বাগানবাড়ি থেকে এই পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে তুলে নিয়ে আসেন। ১৮৫৫ সালের ২ নভেম্বর কলকাতায় ক্যারু-র মৃত্যু হয়। আর তারপর ঐ সালেই সেণ্ট জন্‌স কলেজ উঠে যায়। নতুন ক'রে আবেদন করার ফলে বেলজিয়ান জেস্যুইটরা ভারতবর্ষে এসে কাজ করতে রাজি হন। ১৮৫৯ সালের ২৮ নভেম্বর তারিখে একদল বেলজিয়ান জেস্যুইট কলকাতায় এসে পৌছান। তাঁরা ১৮৬০ সালের ১৬ জানুয়ারি বর্তমান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর আর একটা বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালে সেণ্ট জন্‌স কলেজ নাকি উঠে যায় নি। কোনোরকমে টিকে ছিল। ১৮৬০ সালের ১৬ জানুয়ারি সেণ্ট জন্‌স কলেজের নাম বদলে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ রাখা হয়েছে মাত্র। যদি তাই-ই হয়ে থাকে তাহলেও এটা ঠিক যে বর্তমান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ আগের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ নয়।



মন্দির মসজিদ গির্জা ও অন্য প্রসঙ্গ

বর্তমান অধ্যায়ে কলকাতার মন্দির মসজিদ ও গির্জা প্রসঙ্গে শ্রীবিনয় ঘোষ ও ডেভিড ম্যাক্‌কাচন সাহেবের দু'টি প্রবন্ধের সমালোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে 'এক্ষণ' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত "ভারত-শ্রমজীবী" পত্রিকার সম্পাদকীয় টীকায় শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের দু-একটি ভুলের (মুদ্রণ ও তথ্যগত) দিকে পাঠকের আকর্ষণ করা হয়েছে।

'দেবগণের কলকাতায় আগমন' : শ্রীবিনয় ঘোষ

'এক্ষণ' পত্রিকার শারদীয় ১৩৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিনয় ঘোষের 'দেবগণের কলকাতায় আগমন' শীর্ষক কলকাতার মন্দির মসজিদ ও গির্জা সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধের কিছু বিস্তৃত সমালোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রবন্ধটি সামান্য পরিবর্জিত আকারে তাঁর 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' (আশ্বিন, ১৩৮২) গ্রন্থে "মন্দির মসজিদ গির্জা" নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমার আলোচনায় তাই উভয় প্রকাশনার ('এক্ষণ' ও 'ইতিবৃত্ত') পৃষ্ঠা সংখ্যাই প্রদত্ত হল।

শ্রীবিনয় ঘোষের অন্যান্য লেখার মতো এই প্রবন্ধটিও আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম এই আশা নিয়ে যে এতে আমার অজানা অনেক কিছু নতুন তথ্য

হয়ত পাব। কিন্তু পড়ে নিরাশ হলাম। প্রবন্ধটির দু'টি অংশ—একটি শাঁস ও একটি ছোবড়া। শাঁস বা সার অংশে তাঁর নিজের একটা কথাও পেলাম না। হিন্দুদের মন্দির, মুসলমানদের মসজিদ ও খ্রীস্টানদের গির্জা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা শ্রীপঞ্চানন রায়ের বই 'বাংলার মন্দির', ডেভিড ম্যাক্‌কাচনের (David McCutchion) 'The Temples of Calcutta' নামক প্রবন্ধ, ড. সিদ্দিকির (Dr. M. K. A. Siddiqui) বই *Muslims of Calcutta* ও ইংরেজদের দু-একটি মামুলি লেখা ও 'গাইড বুক'-এর প্রতিধ্বনি মাত্র, অবিকল মাছিমারা কেরানির মতো তিনি তাঁদের নকল করেছেন। অথচ তিনি কলকাতা সম্বন্ধে একজন প্রামাণিক পণ্ডিত (authority), অনেকদিন থেকে কলকাতা নিয়ে গবেষণা ক'রে আসছেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার কি এই ফল ? গ্রন্থনির্দেশে তিনি লিখেছেন (এক্ষণ, পৃ ১৬৯) : "কলকাতা শহরে পরিক্রমা এবং সরেজমিনে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যই এই প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন।" (ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৯১)। কিন্তু প্রবন্ধের মধ্যে তার তো বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না। বরং প্রবন্ধ পড়ে এই কথাই মনে হল, ঘরে বসে পরের বই নকল করেই তিনি আপন কর্তব্য শেষ করেছেন। এ লেখার মূল্যই বা কী, আর সার্থকতাই বা কী বোঝা গেল না। মন্দিরের আকার, গঠন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে (এখানেও ম্যাক্‌কাচনের প্রতিধ্বনি), কিন্তু যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা তাঁদের সম্বন্ধে একটা কথাও নেই। ক'টা দেওবন্দী ও কটা ব্রেলভী মসজিদ আছে কলকাতায় তা জেনে আমাদের কী লাভ ? যে ক'টি গির্জার নাম দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, কোনটা কোন সম্প্রদায়ের, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কতগুলি গির্জা ইত্যাদি খবর যদি দিতেন, ঢের বেশি উপকার হতো। ধর্মতলার ইউনিয়ন চ্যাপেলের (Union Chapel) নাম করা হয়েছে, কিন্তু বলা হয় নি এই চ্যাপেল কোন সম্প্রদায়ের বা কেন এর 'ইউনিয়ন চ্যাপেল' নাম। এই তো গেল শাঁস অংশের কথা।

কিন্তু প্রবন্ধের অন্য অংশে, অর্থাৎ ছোবড়া অংশে বিনয়বাবু পুরো নিজের মৌলিকতা বা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। সে অংশ হল প্রবন্ধের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট। অর্থাৎ ল্যাজা-মুড়ো। লেখক ভূমিকার শেষে বলেছেন : "দেবগণের কলকাতায় আগমনের এই বৃত্তান্ত নিতান্তই নীরস যেহেতু ঐতিহাসিক তথ্যাশ্রিত বিবরণমাত্র। লেখকের অনুরোধ, পাঠকবৃন্দ এই বিবরণের মধ্যে কোনো সাহিত্যিক আস্বাদ আশা করবেন না।" (এক্ষণ,পৃ১৪৯)। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের মতো যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ রচনা বিনয়বাবুর উদ্দেশ্য নয়, সাহিত্যিকের মতো রসরচনা বা রম্যরচনা করাই উদ্দেশ্য। শাঁস অংশে যার একান্ত অভাব ছিল ছোবড়া অংশে অতিরিক্ত পরিমাণে তা পূরণ করবার চেষ্টা করেছেন। তার ফল হয়েছে আশ্চর্য। মায়াবী যাদুকরের মতো

বিনয়বাবু রসালো শাঁসকে করেছেন নীরস, আর নীরস ছোবড়াকে করেছেন রসে ভরপুর। অসাধারণ কৃতিত্ব বটে! তবে যে রস দিয়ে ছোবড়াকে ভরেছেন সে রস মধুর রস নয়, অম্লরস—পচনক্রিয়ার শেষ পরিণতি। তাঁর বোধহয় বিশ্বাস যে তিনি উচ্চাঙ্গের রসিকতা করেছেন, কিন্তু আমাদের পড়ে মনে হয়েছে যে উচ্চাঙ্গের দূরের কথা, খেলো রসিকতাও হয় নি, যা হয়েছে তার নাম রুচিবিকার। স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত গানটি 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর। ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর'—যেটি বাগেশ্রী রাগে গেয়, সেই গানটি যদি কোনো গায়ক টপ্‌পা, ঠুংরি, কিংবা গজলের ঢঙে গায় তাহলে সে-গান শুনে শ্রোতাদের মনে যে ভাব হওয়া স্বাভাবিক, আমার ধারণা পাঠকমাত্রেরই শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধের এই অংশ পড়ে মনে সেই ভাবেরই উদয় হবে। অলম অতি বিস্তরেণ। তবে 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এই 'ল্যাজা-মুড়ো' অংশ বর্জ্জিত হয়েছে।

এবার মূল প্রবন্ধের কয়েকটি উক্তির উপর সামান্য টীকাটিপ্পনি ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করব।

১. এক্ষণ-এর ১৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক বলেছেন: "কিন্তু গোবিন্দ-রামের নবরত্ন মন্দির সম্বন্ধে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' (১৩১৮ সং) গ্রন্থে উল্লেখ আছে: 'চিৎপুর রোডের ধারে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে।' (৬১৩ পৃষ্ঠা)"।—ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৭৪।

এই পাদটীকা পড়ে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে যে শহর পরিক্রমা ও সরে-জমিনে অনুসন্ধানের দাবি সত্ত্বেও বিনয়বাবু এ মন্দির দেখেছেন কিনা। যদি দেখে থাকতেন একথা বলতে পারতেন না। কারণ ১৯১১ সালেও যে-নবরত্ন ছিল আজও তাই আছে। শুধু আকারে ছোট ও অন্যরকম হয়েছে। ম্যাক্‌কাচন সাহেবও তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন: "Today there is indeed a tall nava-ratna temple on what·· appears to be the site of the original Mitter Pagoda."।

২. এক্ষণ-এর ১৫৩ পৃষ্ঠার ২৯-৩০ লাইনে: "নন্দরাম স্ট্রীটের রামেশ্বর শিবমন্দির (১৮৫৪ সালে নন্দরাম সেন নির্মিত)···"—ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৭৫-৭৬।

প্রথমত, নন্দরাম স্ট্রিট নামে কলকাতায় কোনো গলি নেই, আছে নন্দরাম সেন স্ট্রিট। দ্বিতীয়ত, এ মন্দির ১৮৫৪সালে নন্দরাম সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। একথা মন্দিরের গায়ে কোথাও লেখা নেই। এ লাইন তাঁর কলম দিয়ে বেরুলো কি ক'রে ভাবতেও অবাক লাগে। এত কলকাতার ইতিহাস চর্চা ক'রে শেষ পর্যন্ত বিনয়বাবুর ধারণা হল নন্দরাম সেন উনিশ শতকের লোক! আমি অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এটা ম্যাক্‌কাচন সাহেবের ভুল। বিনয়বাবু অন্ধের মতো ঐ সাহেবকে অনুসরণ করেছেন। তৃতীয়ত, যে-তারিখ মন্দিরের

গায়ে লেখা আছে—১২৬১ সনের ১১ই চৈত্র—ইংরেজি হিসাবে তা হয় ১৮৫৫ সাল, ১৮৫৪ সাল নয়। বিনয়বাবু যে মন্দিরে গিয়ে অনুসন্ধান করেন নি, এ ভুলটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিদেশী যদি এরকম ভুল ক'রে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ম্যাক্‌কাচন সাহেব 'বাংলায় ভ্রমণ' বইটিকে তাঁর প্রবন্ধে 'বাংলায় ব্রাহ্মণ' (Banglay Brahman) বলে উল্লেখ করেছেন। সাহেব যদি ভুল ক'রে থাকেন তাহলে আমরাও কি সেই ভুল করব ?

৩. এক্ষণ-এর ১৫৮ পৃষ্ঠার ২৮-২৯ লাইনে : "···চিৎপুরের বৃহত্তম নাখোদা মসজিদ (কচ্ছি মুসলমান স্থাপিত) ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় স্থাপিত হয়।"—ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮১।

"চিৎপুরের বৃহত্তম নাখোদা মসজিদ"—এটা কেমনতর বাংলা হল ? নাখোদা মসজিদ কি কেবল চিৎপুরের বৃহত্তম মসজিদ, না সারা কলকাতার ? বিনয়বাবু জানেন কি যে, ১৯২৬ সালে বর্তমান নাখোদা মসজিদ তৈরি হবার আগে ঠিক ঐ জায়গায় আর একটি ছোট নাখোদা মসজিদ ছিল ? সেটি ভেঙে সেই জায়গায় এই বড় মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে ! সে মসজিদের উল্লেখমাত্র নেই কেন ? সে মসজিদ কে বা কারো তৈরি করেছিল ?

৪. এক্ষণ-এর ১৫৯ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে মসজিদের গায়ে ইংরেজি লেখাটি কলকাতার ইতিহাসের বই থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই লেখাটি মসজিদের গায়ে কোনখানে আছে : "···in commemoration of the Honourable Court of Directors, granting him the arrears of his stipend in 1840" ? —ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮২। ব্যাপারটা কী হয়েছিল বিনয়বাবু জানেন কি ? যদি জানেন খোলসা ক'রে বলেন নি কেন ?

৫. এক্ষণ-এর ১৬১ পৃষ্ঠার ২৪ লাইনে : "দরগা হল পীরের কবরস্থান, আস্তানা ও খান্‌কা পীর-ফকিরের স্থান।"—ইতিবৃত্ত, ৬৮৪।

পাঠকদের জ্ঞান দেবার জন্য এই বাক্যটি শ্রীবিনয় ঘোষ যদি না লিখতেন তো ভালো হতো। পাঠকদের জ্ঞান এ পড়ে এক বিন্দুও বাড়ে নি। তিনি শুধু নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পীর, ফকির, দরগা, খান্‌কার পার্থক্য যত সোজা মনে করেছেন তত সোজা আদৌ নয়, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। ভালো ক'রে পাঠকদের বোঝাতে হলে একটা প্রবন্ধ লেখার দরকার হয়ে পড়ে, এক লাইনে সারবার বিষয় নয়।

•

৬. এক্ষণ-এর ১৬১ পৃষ্ঠার ২৫ লাইনে আছে : "কলকাতা শহরে প্রায় ১৩টি আস্তানা দরগা এবং ৬টি খান্‌কা আছে (সিদ্দিকি, ১৯৪৪)।"— ইতিবৃত্ত, ৬৮৪। ডক্টর সিদ্দিকি পুরো ১৩টি আস্তানা খান্‌কার কথা বলেছেন, 'প্রায়' ১৩টি বলেন নি। বিনয়বাবু 'প্রায় ১৩টি' লিখলেন কেন ? এর অর্থ কী ?

৭. এক্ষণ-এর ১৬২ পৃষ্ঠার ২০-২১ লাইনে : "যেমন চিৎপুরের 'সোনা গাজী'

('সোনাগাছি' বিকৃত নাম,)।"—ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৫। 'সোনাগাছি' যেমন বিকৃত নাম 'সোনাগাজী'ও তেমনি বিকৃত নাম। নামটা আসলে সোনা (সুবর্ণ) নয়, আরবি 'সনা', মানে প্রশংসা, স্তব, স্তুতি। পীরের পুরো নাম হচ্ছে—গাজী সনা উল্লাহ্ শাহ'।

৮. এক্ষণ-এর ১৬২ পৃষ্ঠার ২৫ লাইনে : "বাস্টিড, কটন, ব্লেশিনডেন, ফার্মিঙ্গার প্রভৃতির প্রাচীন কলকাতার বিবরণ-পুস্তকে ('ইতিহাস' নয়) কলকাতা শহরের মন্দির অথবা মসজিদের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই বলা চলে।"—ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৫।

হরি হরি! বিনয়বাবু কি কটনের বই দেখেন নি? যদি দেখে থাকেন তবে কি ক'রে একথা বললেন? কটনের *Calcutta Old and New* গ্রন্থের ১৮শ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে 'Some Temples and Shrines'। এই অধ্যায়ে তিনি নিম্নলিখিত হিন্দুদের মন্দির এবং মুসলমানদের মসজিদ ও দরগার কথা ইতিহাস-সহ উল্লেখ করেছেন :

১. কালীঘাটের কালীমন্দির
২. রামনাথ মণ্ডলের রাধানাথের নবরত্ন মন্দির (মেহেরপুরে)
৩. বৌবাজারের ফিরিঙ্গি কালীমন্দির
৪. চিৎপুর রোডের সিদ্ধেশ্বরী মন্দির
৫. কেণ্ডারডাইন লেনের ত্রৈলোক্যরাম পাকড়াশির ৩টি শিবমন্দির
৬. নিমতলার আনন্দময়ী কালীমন্দির
৭. ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির
৮. ধর্মতলার প্রিন্স গোলাম মহম্মদের মসজিদ
৯. শেয়ালদার কুতুবুদ্দিন সরকারের মসজিদ (ভুল ক'রে কটন সাহেব কুতুবুদ্দিনকে 'কিতাবুদ্দিন' লিখেছেন)
১০. চিৎপুরের ভোঁসড়ি শাহের মসজিদ ও দরগা
১১. সার্কুলার রোডের মানিকপীরের দরগা
১২. ক্লাইভ স্ট্রিটে জুম্মা পীরের দরগা
১৩. হেস্টিংসে রজব আলীর দরগা
১৪. কাশিয়াবাগানে উজির আলী আসফ জা-র কবর। (ইনি লখনৌর গদিচ্যুত নবাব, পীর নন।)
১৫. বদ্রীদাস মুকিমের জৈন মন্দির
১৬. ঐ মন্দিরের দক্ষিণে চন্দ্রপ্রভুর মন্দির
১৭. ঐ মন্দিরের পূর্বে মহাবীরের মন্দির ও দাদাজী গুরু ও খুসালজীর মণ্ডপ (Pavillion)।

এতগুলি হিন্দু ও জৈন মন্দির ও মুসলিম মসজিদ ও দরগার বিস্তৃত বিবরণ

থাকা সত্ত্বেও শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন যে, কটনের পুস্তকে কলকাতা শহরের মন্দির অথবা মসজিদের কোনো উল্লেখ নেই! কিমাশ্চর্যম অতঃপরম্!

৯. এক্ষণ-এর ১৬৪ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে: "...যদিও আর্মেনিয়ান গির্জার প্রাঙ্গণে জনৈক Mrs. R. Sookeas-এর কবরের উপর ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ খোদিত আছে।" —ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৭।

এটা বিনয়বাবুর চোখে দেখে লেখা, না পরের কাছে শুনে বা পড়ে লেখা? চোখে দেখে লিখলে এ ভুল করতেন না। লাইনটা আগাগোড়াই ভুল। কবরের উপর Mrs. R. Sookeas বলে কোনো মহিলার নাম কিংবা ১৬৩০খ্রীস্টাব্দ বলে কোনো সাল খোদাই করা নেই। যা আছে তা এই: "This is the tomb of Rezabeebeh, the wife of the late charitable Sookeas, who departed from this world on the 21st day of Nakta in the year 15."

দেখা যাচ্ছে, Mrs. R. Sookeas নেই, ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দও নেই। আছে—Rezabeebeh ও ১৫ সাল। বিনয়বাবু Rezabeebeh-কে Mrs. R. Sookeas এবং ১৫ সালকে ১৬৩০ সাল কী মন্ত্রবলে করলেন?

১০. এক্ষণ-এর ১৬৪ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনে: "চার্নকের সমাধি-ফলকে খোদিত ১৬৯২-৯৩ সাল, তাঁর কন্যা আয়ার (Eyre) ও ক্যাথারিনের (Catherine) ফলকে ১৬৯৬-৯৭ ও ১৭০০-০১।"—ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৭।

এটিও নিজের চোখে দেখে লেখা নয়। বই পড়ে বা নোট থেকে লেখা। নচেৎ এমন ভুল হতো না।

সমাধি-ফলকে জোব চার্নক এবং তাঁর দুই কন্যা Mary Eyre ও Catherine White—প্রত্যেকের মৃত্যুর তারিখ যথাক্রমে এইভাবে লেখা আছে—১০ জানুয়ারি ১৬৯২, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৬৯৬-৯৭ ও ২১ জানুয়ারি ১৭০০। বিনয়বাবু একজনেরও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেন নি। ধরে নিলাম হয়ত মৃত্যুর তারিখ দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাই দেন নি। কিন্তু সালের বেলায় এমন কাণ্ড কি ক'রে ঘটল? চার্নকের মৃত্যু-সাল লিখেছেন ১৬৯২-এর জায়গায় ১৬৯২-৯৩ ও ক্যাথারিনের ১৭০০-র জায়গায় ১৭০০-০১। মাত্র মেরি আয়ার-এর সালটা ঠিক হয়েছে—১৬৯৬-৯৭। এখন বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা প্রত্যেকের মৃত্যুর জোড়া সাল দিয়েছেন কেন? আবদুল আলি (A. M. F. Abdul Ali) প্রভৃতির লেখায় পেয়েছেন বলে দিয়েছেন, না অন্য কারণে? আর জোড়া সালেরই বা অর্থ কি? কোনো লোক তো দু-বছর পর পর বা দু-বছর ধরে মরতে পারে না! চার্নক ও ক্যাথারিনের বেলায় যদি তাঁর ভুল হয়েছে বলে স্বীকারও করেন, মেরি আয়ারের দু'টো বছর (১৬৯৬-৯৭) তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই জোড়া বছরের রহস্য তিনি দয়া ক'রে আমাদের জানাবেন কি?

১১. এক্ষণ-এর ১৬৪ পৃষ্ঠার ২৬ লাইনে : "পুবদিকে ছিল কোম্পানির বারুদখানা, মধ্যে ছিল প্রাচীন ও গভীর একটি পরিখা"—ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৮। বারুদখানা ঠিক আছে। কিন্তু এর মধ্যে একটি গভীর পরিখা পেলেন কোথা থেকে বিনয়বাবু? আমার তো ধারণা কলকাতার কোনো ইতিহাসে বা বিবরণ-গ্রন্থে একথা নেই। আমি যতদূর জানি তাতে এই আছে যে, সেণ্ট-জন গির্জার যেটা 'ভিকারেজ' (vicarage) অর্থাৎ পাদ্রির থাকবার বাড়ি, ঐ বাড়ি হবাব আগে সেখানে একটা ছোট পুকুর ছিল। পুকুর ও পরিখা কি এক জিনিস?

১২. এক্ষণ-এর ১৬৫ পৃষ্ঠার ২৯-৩০ লাইনে: "১৮৪০-এর দশকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে এই গির্জায়। কবি মধুসূদন দত্ত, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩, এই 'ওল্ড মিশন চার্চে, খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেণ।"—ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৯।

এই গির্জার নাম 'ওল্ড মিশন চার্চ' নয়—'ওল্ড বা মিশন চার্চ'। ১৭৬৭ সালের মে মাসে এই গির্জার ভিত্তি স্থাপন ও ১৭৭০ সালের ২৩ ডিসেম্বর দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। প্রথম থেকেই গির্জার নাম ছিল 'মিশন চার্চ'। কাবণ এই গির্জার প্রতিষ্ঠাতা পাদ্রি কিযারন্যাণ্ডার (Kiernander) দক্ষিণ-ভাবতে প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারি ছিলেন। আর মিশন-কাজ করবার জন্যই, অথাৎ বোমান ক্যাথলিকদের ও পৌত্তলিকদের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মে দীক্ষিত করব্যব জন্যই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। এবিষয়ে তিনি একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন। কারণ সে সময়ে কোনো মিশনারিকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার এলাকার মধ্যে আসতে বা থাকতে দিত না। এই গির্জা প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পরে সেণ্ট জন গির্জা প্রতিষ্ঠিত হলে মিশন চার্চের নাম হল 'ওল্ড চার্চ', আর সেণ্ট জন চার্চের নাম হল 'নিউ চার্চ'। তখন থেকেই এই গির্জাকে বলা হতে লাগল Old or Mission Church।

সত্য বটে, গির্জার ফটকের গাযে এক মার্বেল পাথরে 'Old Mission Church. Founded 1770' লেখা আছে, কিন্তু স্বাধীনতার পরে কোনো সময়ে এই পাথরটিকে বসানো হয়েছে। তার আগে ঐ জায়গাতেই আর একটি পাথরে লেখা ছিল 'Old or Mission Church. Foundation laid 1767, completed 1769'। এই পাথরটি বহুকাল ছিল। তাতে নির্মাণকার্য শেষ হবার তারিখ ভুল লেখা থাকার দরুণ বোধ হয় ঐ পাথরটি খুলে ফেলে বর্তমান পাথরটি লাগানো হয়েছে। কিন্তু তারিখের ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আর একটি দারুণ ভুল করা হয়েছে—নামের ভুল, Old or Mission Church-এর জায়গায় Old Mission Church লেখা হয়েছে!

১৯৪৫ সালে এই গির্জার ১৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারক-গ্রন্থ গির্জার কর্তৃপক্ষগণ প্রকাশ করেন। তার নাম ছিল *One Hundred and Seventy Five Years of the Old or Mission Church*। আমি এ বিষয়ে ঐ গির্জার বর্তমান যাজক আচার্য এস.কে. মণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি অনুসন্ধান ক'রে

এক চিঠিতে আমাকে লিখেছেন : "Thanks very much for calling on us the other day. You are quite correct in saying—Old or Misson Church."। এই গির্জার দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে আর একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। তাতেও গির্জার নাম লেখা হয়েছে Old or Mission Church। Old Misson Church নামটা ঠিক বলে তখনই মানা যেত, যদি দেখানো যেত যে কলকাতায় New Mission Church নামে আর একটা গির্জা আছে বা ছিল। যেহেতু এই নামের কোনো গির্জা নেই বা ছিল না, সেইহেতু Old Mission Church নামটা ভুল।

১৩ এক্ষণ-এর ১৬৩ পৃষ্ঠার ২৭ লাইনে: "সারা বাংলা প্রেসিডেন্সির 'Parish Church'-এর মর্যাদার উত্তরাধিকারী সেণ্ট জন্‌স গির্জা…"—ইতিবৃত্ত, পৃ ৬৮৬-৮৭।

সেণ্ট জন গির্জার নাম মাত্র Parish Church ছিল না। প্রেসিডেন্সি চার্চও ছিল ১৭৮৭ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ২৭ বছর। ১৮১৪ সালে টমাস মিডলটন কলকাতার বিশপ নিযুক্ত হলে এই গির্জার নতুন নাম হল Cathedral Church। ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত এই গির্জা Cathedral Church থাকে। ১৮৪৭ সাল থেকে ইংরেজ শাসনের শেষপর্যন্ত সেণ্ট পল্‌স চার্চ ক্যাথিড্রাল চার্চ ছিল।

শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধের সমালোচনা এখানেই শেষ হল।

'কলকাতার মন্দির' : ডেভিড ম্যাক্‌কাচন

ম্যাক্‌কাচন (McCutchion) সাহেব 'The Temples of Calcutta' নামক তাঁর প্রবন্ধে (*Bengal Past and Present*, Jan-June, 1968) যে ৩১টি মন্দিরের উল্লেখ করেছেন, এখন আমি মাত্র কয়েকটির সম্বন্ধে বা তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। যখন মন্দির নিয়েই আলোচনা হচ্ছে তখন সে-প্রবন্ধেরও কিছু আলোচনা হওয়া দরকার। বিশেষত, সেই প্রবন্ধই মন্দির সম্পর্কে শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন।

১. প্রথম, নন্দরাম সেনের রামেশ্বর শিবের মন্দির।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার তারিখ লেখা আছে একেবারে মন্দিরের চূড়োয়—নিচে থেকে এত উঁচুতে যে মই লাগিয়ে উপরে উঠে না দেখলে নিচে থেকে পড়া যায় না। আগে এইটেই মন্দিরের গায়ে একমাত্র তারিখ ছিল, এখন নিচের দিকে সবশুদ্ধ পাঁচটা ফলকে পাঁচটা তারিখ লেখা আছে—দু'টি ফলক আছে বাঁদিকে,

দু'টি মধ্যে ও একটি ডানদিকে। একটি ফলকে মন্দিরের মাথায় যে তারিখ লেখা আছে সেই তারিখই দেওয়া আছে—১০৬১ সনের ৩১শে চৈত্র নন্দরাম সেন কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজি হিসাবে এই তারিখ হয় ১৬৫৫ সালের এপ্রিল মাস। বাঁদিকের আর একটি ফলকে লেখা আছে—১২৬১ সনের ১১ই চৈত্র। ইংরেজি হিসাবে এ তারিখ হয়—১৮৫৫ সালের ২৩ মার্চ। এটি মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ নয়। আর যে তারিখ আছে ৩টি ফলকে সেগুলিও মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ নয়, অন্য তারিখ; যেমন, তুলসী-মঞ্চ প্রতিষ্ঠার তারিখ, নন্দরামের দু'জন বংশধর জগৎচন্দ্র ও জয়ন্তীচন্দ্রের কল্যাণ-কামনার তারিখ।

তাহলে মন্দিরের গায়ে আমরা মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ একটি মাত্রই পাচ্ছি—১৬৫৫ সালের এপ্রিল মাস। আর একটি তারিখ, যা আগেই বলা হয়েছে মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ নয়, তা হল ১৮৫৫ সালের মার্চ মাস। ম্যাক্‌কাচন সাহেব এই দু'টি তারিখ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন: "One reading of the original date plaque states that this was built in 1854 by Nandaram Sen, but a modern inscription puts this in 1654."—অর্থাৎ সাহেবের মতে ১৮৫৪ সালটাই নন্দরাম সেন কর্তৃক মন্দির-প্রতিষ্ঠার আসল তারিখ; আর ১৬৫৪ সালটা হালে লাগানো হয়েছে, এটা আসল তারিখ নয়। সাহেব বাংলা বছরের হিসেব না জানার দরুণ ১৬৫৫ ও ১৮৫৫-কে ১৬৫৪ ও ১৮৫৪ পড়েছেন। দু'টোই ভুল তারিখ। আর ১৮৫৪ (১৮৫৫) সালটা, যা মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখ নয় তাকে ভুল ক'রে মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাল ধরে আসল সাল ১৬৫৪ (১৬৫৫)-কে নকল সাল বলেছেন। এটি গুরুতর ভুল। সাহেব নিশ্চয়ই জানতেন না নন্দরাম সেন কোন সময়ের লোক। জানলে কখনোই এ ভুল করতেন না।

এ মন্দির যে নন্দরাম সেন তৈরি করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি ১৭ ও ১৮ শতাব্দীর লোক, ১৯ শতাব্দীর ন'ন। ১৬৯৯ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে উন্নীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, কলকাতায় একজন প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর ৪জন সদস্য-সমেত একটি কাউনসিল থাকবে। প্রথম সদস্য হবেন Accountant (হিসাবরক্ষক) দ্বিতীয় সদস্য Warehouse Keeper (মাল-গুদাম রক্ষক) তৃতীয় সদস্য Marine Purser (নৌ-বিভাগের হিসাবরক্ষক)। এবং চতুর্থ সদস্য Receiver of Calcutta Revenues (কলকাতার খাজনা-আদায়কারী)। চতুর্থ সদস্যের নাম তখনো জমিদার (Zaminder) হয় নি। এই কাউনসিল কাজ শুরু করে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে।

প্রথম Receiver of Revenues হন শেলডন (Ralph Sheldon)। সাহেব মানুষ, ব্যবসা করতে এসেছেন, ব্যবসা বোঝেন, জমিদারির বা খাজনা-আদায়ের ব্যাপার মোটেই কিছু বোঝেন না। তাই একজন এদেশীয়কে খাজনা-

আদায়ের কাজে নিযুক্ত করতে হল। তাঁর নাম নন্দরাম সেন, দেগঙ্গার লোক, জাতিতে কায়স্থ। তিনি নামে শেলডন সাহেবের সহকারী, কিন্তু কাজে সর্বেসর্বা। কয়েকবছর পরে কাউনসিলের সদস্য-সংখ্যা ৪ থেকে বাড়িয়ে ৮ করা হয়। তাদের মধ্যে সপ্তম সদস্যের আখ্যা ছিল 'জমিদার'। কিন্তু তখনো একা 'জমিদার' কলকাতার জমির খাজনা ও অন্যান্য কর আদায়ের জন্য দায়ী ছিলেন। এই ব্যবস্থা ১৭২০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। নন্দরাম সেনের পর জগৎ দাস ও রামভদ্র নামে দু'জন কলকাতার সহকারী খাজনা-আদায়কারী হয়েছিলেন।

১৭০০ সালে যখন নন্দরাম সেন কলকাতার সহকারী খাজনা-আদায়কারী নিযুক্ত হন তখন তিনি নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলেন না নিশ্চয়ই। অন্তত ৩০ বছর বয়স হয়ে থাকবে। তাহলে তাঁর জন্ম ১৬৭০ সালে হয়েছিল ধরতে হয়। তাই যদি হয় তাহলে তিনি ১৬৫৫ সালে মন্দির তৈরি করেন কি ক'রে? তখনো তো তাঁর জন্ম হয় নি। আর যদি ধরা যায় যে ১৬৫৫ সালেই তিনি মন্দির তৈরি করে-ছিলেন তাহলে তাঁর বয়স হয়েছিল কত? যদি কমসম করেও ২৫ বছর ধরা যায় তাহলে বলতে হয় তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৩০ সালে। ১৭০০ সালে যখন সরকারী চাকুরি পান তখন তাঁর বয়স হয়েছিল এই হিসেবে ৭০ বছর। এই বয়সে কে তাঁকে চাকুরি দেবে? তারপর দেখতে হবে তিনি কতদিন বেচে ছিলেন। গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র ও রঘুনাথ মিত্রের পুত্র রাধাচরণ মিত্রের (মৃত্যু ১৭৭৫) এক দালিল (দানপত্র) জাল করার অপরাধে শহর কলকাতার General Quarter Session-এ ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে বিচার হয়ে ২৭-২-১৭৬৫ তারিখে আসামীর ফাঁসির হুকুম হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলকাতার ৯৫ জন প্রধান নাগরিক ২৯-১-১৭৬৬ তারিখে প্রেসিডেণ্ট ও গভর্নর John Spencer ও তাঁর কাউনসিলের কাছে এই বলে দরখাস্ত করেন যে রাধাচরণের ফঁসির হুকুম অন্যায়-ভাবে বিলাতি আইন অনুসারে দেওয়া হয়েছে। এদেশে বিলাতি আইন প্রযোজ্য নয়। এ দেশের আইন অনুযায়ী রাধাচরণের বিচার হলে মাত্র কিছু জরিমানা হতো। অতএব প্রেসিডেণ্ট ও কাউনসিল যেন রাধাচরণের এদেশীয় আইন অনু-সারে পুনর্বিচারের আদেশ দেন। তা সম্ভব না হলে মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের নিকট অবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাধাচরণের ফাঁসি যেন মুলতুবি রাখা হয়। এই ৯৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে নন্দরাম সেন ছিলেন অন্যতম। তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৭৬৬ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। ১৬৩০ সালে জন্ম হয়ে থাকলে ১৭৬৬ সালে তাঁর বয়স হয়েছে ১৩৬ বছর, যেটা অসম্ভব মনে হয়। আর যদি ১৬৭০ সালে তাঁর জন্ম হয়ে থাকে তাহলেও ১৭৬৬ সালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। সেটাও সম্ভব বলে মনে হয় না। যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন, যতদিন না তাঁর সঠিক জন্ম-সাল জানা যাচ্ছে ততদিন ১৬৫৫ সালকে মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় বলে নির্দ্বিধায় মানতে পারা যায় না। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে

কোথাও একটা হিসেবের গণ্ডগোল আছে।

২. দ্বিতীয়, গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির।

গোবিন্দরাম মিত্র ১৭৩০ সালে চিৎপুর রোডে ঐ মন্দির তৈরি করেন। ১৭৩৭ সালে ১০ সেপ্টেম্বরের (মতান্তরে ১১সেপ্টেম্বরের) মহাঝড়ে ও ভূমিকম্পে ঐ মন্দির ভেঙে পড়ে। ঐ ঝড়ে কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম গির্জা St. Anne's Church-এর চূড়াও ভেঙে পড়ে। গোবিন্দরামের মন্দিরের চূড়া ছিল অকটার-লনি মনুমেণ্টের চেয়েও উচুঁ। মনুমেণ্টের চূড়া বিভিন্ন হিসেব মতো ১৫২ ফুট থেকে ১৫৮ ফুট উঁচু। গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দিরের চূড়া ছিল ১৬৫ ফুট উঁচু।

যাঁরা বলেন গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির কালীমন্দির ছিল, তাঁদের মতে ঐ মন্দির ভেঙে গেলে গোবিন্দরাম মিত্রের প্রপৌত্র অভয়চরণ মিত্র (মৃত্যু :৮১৮ সাল) ঐ মন্দিরের উল্টোদিকে মন্দির তৈরি ক'রে ঐ কালীকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন, যাঁকে এখন সিদ্ধেশ্বরী কালী বলা হয়। আর যাঁরা বলেন গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির ছিল শিবমন্দির, তাঁদের মতে ঐ সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির বনমালী সরকার তৈরি করেছিলেন।

১৭২০ সালে প্রথম 'জমিদার' পদ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রেসিডেণ্টের কাউনসিলের সদস্য ন'ন এমন একজন কোম্পানির কর্মচারীকে স্বতন্ত্রভাবে কলকাতার খাজনা ইত্যাদি আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্টার্নডেল (Sterndrale) সাহেব লিখেছেন যে কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যাবার দরুণ তিনি বলতে অক্ষম—কলকাতার প্রথম জমিদার কে হন। ঐ ১৭২০ সালেই একজন ডেপুটি-জমিদার বা কালো-জমিদারের পদও সৃষ্টি করা হয়। প্রথম কালো-জমিদার নিযুক্ত হন গোবিন্দরাম মিত্র। তিনি ১৭২০ থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত প্রায় একটানা ৩৬ বছর দোর্দণ্ডপ্রতাপে কলকাতা শাসন করেন। লোকে তাঁকে যমের মতো ভয় করত। সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল, কোথায় ছিলেন, জানা যায় না। তবে এটা জানা যায় যে, কলকাতা দখলের পরেই নবাবের হুকুমে তাঁর বাড়ির সামনে ও যেসব জায়গায় তাঁর সম্পত্তি ও মালপত্র রাখা ছিল তাদের সামনে শান্ত্রী-পাহারা বসানো হয়েছিল, যাতে ক'রে সেসব কেউ লুঠ ক'রে না নিযে যেতে পারে, যেমন বসানো হয়েছিল উমিচাঁদের বড়ির সামনে। ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করবার পর তিনি ফিরে আসেন ও ডেপুটি-ফৌজদার বা পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৭২-৭৩ সালেও জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে।

সিরাজের আক্রমণের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও কলকাতার ইংরেজ, আর্মানি, গ্রীক ও এদেশী নাগরিকদের ধনসম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তা পূরণের জন্য নবাব মির্জাফর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেন। এদেশীয় লোকদের ভাগে যে টাকাটা পড়েছিল তা বিতরণ করবার জন্যে ১৩ জন হিন্দু-মুসলমান কলকাতার প্রধান নাগরিক কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন। একজন

মুসলমান নাগরিকের নাম ঐ ১৩ জনের ভেতরে থাকলেও তিনি এক পয়সাও পান নি। সুতরাং কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১২ জন মাত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম ছিল গোবিন্দরাম মিত্রের ও তাঁর পুত্র রঘু মিত্রের। এই ১২ জন কমিশনার সবশুদ্ধ ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৭ শত ৬০ টাকা পেয়েছিলেন। তার মধ্যে গোবিন্দরাম ও রঘু মিত্র পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। আর এই ১২ জন কমিশনার অন্য দেশী গরিব লোকদের মধ্যে যে টাকা ভাগ ক'রে দেবার ভার পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৯ জনের কোনো পাত্তা নেই। মাত্র ৩ জন—গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক ও রতু সরকার—মোট ৭৩ হাজার ৪ শত ৫৩ টাকা ১২ আনা তাঁদের আশ্রিত, অনুচর ও পেটোয়াদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেন। গোবিন্দরাম মিত্রের পেটোয়া-সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল—১২জন। ত'রপর শোভারাম বসাকের ৯ জন ও রতু সরকারের মাত্র ৩ জন। এই ২৪ জন বাদে অন্য কেউ বা অন্য কারো লোক এক পয়সাও পায় নি।

গোবিন্দরাম মিত্র কুমারটুলি মিত্র বংশের আদি পুরুষ। তিনি ১৭২০ সালে ডেপুটি-জমিদার বা কালা-জমিদারের পদে নিযুক্ত হন। ব্যারাকপুরের কাছে চন্দনপুকুরে বা চন্দনপুরে তাঁর আদি বাস ছিল। সেখান থেকে কলকাতায় আসেন। বহু বছর কালা-জমিদার হিসেবে মাসে ৩০ টাকা বেতন পেয়ে এসেছেন। শেষের দিকে ঐ বেতন বেড়ে মাসে ৫০ টাকা হয়েছিল।

আপার সার্কুলার রোডের ধারে পূর্বদিকে অর্থাৎ ২৪-পরগনার দিকে তাঁর এক মস্ত বাগানবাড়ি ছিল, তার নাম ছিল নন্দনবাগান। এখনো ঐ অঞ্চলে একটা রাস্তা নন্দনবাগান স্ট্রিট—গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানের স্মৃতি রক্ষা করছে। এই বাগানের দক্ষিণ গায়েই অপেক্ষাকৃত ছোট উমিচাঁদের বাগানবাড়ি ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন ১৭৫৬ সালে প্রথমবার কলকাতা আক্রমণ করেন তখন তাঁর সেনাপতি মীরমদন এই বাগানে ছাউনি করেছিলেন। হলওয়েল সাহেবকে বন্দী ক'রে এই বাগানে তাঁর কাছে আনা হয়। ১৭৫৭ সালে সিরাজের দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণের সময় নবাব স্বয়ং এই বাগানে ছিলেন। ১৭৪২ সালে যখন মারাঠা খাত খোঁড়া হয় তখন গোবিন্দরামের ও উমিচাঁদের বাগানবাড়িকে বাঁচাবার জন্য খাতকে ঐ দুই বাগানের তিন পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানের উত্তর ধার দিয়ে পুবমুখে গিয়ে ঐ দুই বাগানের পেছন দিয়ে দক্ষিণ মুখে গিয়ে উমিচাঁদের বাগানের দক্ষিণ ধার দিয়ে পশ্চিম মুখে এসে ঐ খাত সার্কুলার রোডে পড়ত। ঐ দুই বাগানের তিনদিকে খাত ছিল। শুধু সামনের দিকে (পশ্চিম দিকে) কোনো খাত ছিল না। সেই কারণে আজও এই দুই বাগান ২৪-পরগনার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ২৪-পরগনার মধ্যে গণ্য না হয়ে কলকাতার মধ্যে গণ্য হয়। এই বাগানের পরিধির মধ্যে কোনো মামলা-মোকদ্দমা হলে শেয়ালদা বা আলিপুর কোর্টে না হয়ে

সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টে হয়।

নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের দক্ষিণে যে জোড়াবাগান স্কোয়ার আজকাল দেখা যায় (প্রবাদ, এখানে বৈষ্ণবচরণ শেঠের পাশাপাশি দু'টি বাগান ছিল), আগে সেখানে জোড়া কেন একটাও বাগান ছিল না। গঙ্গার ধার থেকে একটা রাস্তা সোজা পুবমুখে গিয়ে সার্কুলার রোডের কাছে এসে দু'মুখো হয়ে, একটা মুখ গেবিন্দরাম মিত্রের বাগানে, আর একটা মুখ উমিচাঁদের বাগানে গিয়ে শেষ হতো। তাই থেকে এই পথকে বলা হতো Road to Jorabagan। পথটা যেখানে গিয়ে শেষ হতো সেখানে ছিল জোড়াবাগান। কালক্রমে লোকে সেকথা ভুলে গিয়ে পথটা যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, সেই জায়গাটাকে বলতে আরম্ভ করল 'জোড়াবাগান'।

গোবিন্দরাম মিত্রের নন্দনবাগানবাসী বংশধরদের মধ্যে কাশীশ্বর মিত্র ছিলেন সব থেকে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন প্রিন্সিপাল সদর আমিন ও ছোট আদালতের জজ। আর এক শাখা নন্দনবাগানের বাস তুলে দিয়ে কাশীর চৌখাম্বা মহল্লায় গিয়ে বাস করেন। তাই থেকে তাঁদের পরিচয় 'চৌখাম্বার মিত্র' বলে। তাঁদের মধ্যে বরদাদাস মিত্র, প্রমদাদাস মিত্র প্রভৃতি এক সময়ে কাশীতে খুব সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

গোবিন্দরাম মিত্রের নামে একটা ছড়া আছে :

বনমালি সরকারের বাড়ি,
গোবিন্দরামের ছড়ি,
উমিচাঁদের দাড়ি,
হুজুরিমলের কড়ি।

আবার এই ছড়ার রকমফেরও আছে :

নন্দরামের ছড়ি,
উমিচাঁদের দাড়ি,
নকু ধরের কড়ি,
মথুর সেনের বাড়ি।

উমিচাঁদ ও হুজুরিমল পাঞ্জাবের লোক ও ধর্মে শিখ ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত ধরের ডাক নাম ছিল নকু ধর। ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির কাছ থেকে খেলাত পান। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ৯ লক্ষ টাকা ধার দেন। এঁর একমাত্র কন্যা পার্বতী দাসীর সঙ্গে মহানাদের রঘুনাথ রায় (পাল)-এর বিবাহ হয়। তাঁদের পুত্র মহারাজা সুখময় রায় (পাল) পোস্তা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাদ, মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রথম জীবনে নকু ধরের কাছে চাকুরি করতেন। নকু ধরই তাঁকে ক্লাইভের মুনশি ক'রে দেন।

মথুর সেন বা মথুরামোহন সেন ছিলেন জয়মণি সেনের পুত্র, জাতিতে সুবর্ণ-বণিক। তিনি পেশায় পোদ্দার ছিলেন, ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। তাই লোকে বলত 'ব্যাংকার মথুর সেন'। তিনি ডাভটন নামে এক জেনারেলের খাজাঞ্চি ছিলেন। যশোর জেলায় মথুর সেনের ৭টা নীলের কুঠি ছিল। প্রথম বর্মাযুদ্ধের সময় (১৮২৪-২৬) তিনি গভর্নমেণ্টকে ১৬ লক্ষ টাকা ধার দেন। তিনি নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ৩ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে ১৬ বিঘে জমির উপর চার ফটকওয়ালা এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি করেন লাট-ভবনের অনুকরণে। সেইজন্য ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁর উপর চটে যান ও হুকুম দেন একটা গেট সর্বদাই বন্ধ রাখতে। তাঁর বাড়ির সীমানা ছিল উত্তরে গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, দক্ষিণে নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, পূবে গৌর লাহা স্ট্রিট ও পশ্চিমে মথুর সেন গার্ডেন লেন। এই বাড়ি পরে ৺যতুলাল মল্লিকের বংশধরদের সম্পত্তি হয়। এখনো তাঁদের সম্পত্তি আছে কিনা আমার জানা নেই। এই বাড়িতে 'ডাফ কলেজ' বা 'ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন' ১৮৪৪-এর মাচ থেকে ১৮৫৭-র মার্চ পর্যন্ত মোট ১৩ বছর ছিল। পশ্চিম পাশে নিজস্ব বাড়ি তৈরি হলে কলেজ সেখানে উঠে যায়। ডাফ কলেজ উঠে গেলে মথুর সেনের বাড়িতে (৬৮ নম্বর নিমতলা ঘাট স্ট্রিট) কলিকাতা নর্মাল স্কুল ও তার আনুষঙ্গিক কলিকাতা মডেল স্কুল ৮৩ নম্বর আপার চিৎপুর রোড থেকে (যেখানে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পড়েছিলেন) উঠে আসে ও ১৯০১ সাল পর্যন্ত থাকে। ১৯০১ সালে এইখানে আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে প্লেগ দেখা দেয়। একজন ছাত্র প্লেগে মারা যায়। আতঙ্কের জন্য স্কুল কয়েক মাস বন্ধ থাকবার পর ১৯০২ সালের জুন মাসে ২৮ নম্বর কনভেণ্ট রোডে উঠে যায়।

ডাফ কলেজের নিজস্ব বাড়িতে (৭৪ নম্বর নিমতলা ঘাট স্ট্রিট) ২৮টা ঘর ছিল। তাতে ১০০০ থেকে ১২০০ ছাত্র বসতে পারত। তাছাড়া ৩টি হল্‌ ছিল, ২টি হল্‌-এ গ্যালারি ছিল; একটা গ্যালারিতে ৪৫০, আর একটা গ্যালারিতে ৭০০ ছাত্র বসতে পারত। এছাড়া ছিল লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি। এই বাড়িতে এখন জোড়াবাগান থানা রয়েছে। বনমালী সরকারের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু মথুর সেনের বাড়ি হীনদশায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর বাড়ির কাছেই একটি ঠাকুরবাড়ি ও ফুলের বাগান মথুর সেন তৈরি করিয়েছিলেন। প্রথমটি এখনো আছে, দ্বিতীয়টি নেই, যদিও তার নামটি এখনো বেঁচে আছে—মথুর সেন্‌স গার্ডেন লেন। এই গলির ৮ নম্বর বাড়িতে মথুর সেনের বংশধর ও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও সাহিত্যিক প্রিয়নাথ সেন বাস করতেন। এখনো সেই বাড়ির উপর লেখা আছে 'প্রিয়নাথ ভবন'।

ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করবার পর মাত্র একটি 'জমিদার' কলকাতায় নিযুক্ত হন। তাঁর নাম মিঃ কলেট (Collet)। তিনি ১৭৫৮ সালের নভেম্বর

মাস পর্যন্ত 'জমিদার' পদে কাজ করেন। তারপরে তাঁর উত্তরাধিকারীর পদের নাম 'জমিদার' না হয়ে হল 'কালেক্টার'। প্রথম কালেক্টার হলেন ফ্র্যাংকল্যাণ্ড (Willam F. Frankland)। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় ১৮ জুন রাতে দু'জন ইংরেজ পুরুষ সর্বপ্রথম দুর্গ থেকে পালিয়ে জাহাজে গিয়ে ওঠেন মহিলাদের পৌঁছে দেবার ছুতো ক'রে, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন এই বীরপুঙ্গব উইলিয়ম ফ্র্যাংকল্যাণ্ড! কিন্তু দেখা যায় এই কাপুরুষ তার জন্য কোনো শাস্তি না পেয়ে বরং পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৭৫৮-৫৯ সালে তিনি ফের কলকাতার কালেক্টারের চাকুরিটা শুধু ফিরে পেলেন না, তাঁর পদোন্নতিও হল—তিনি কাউনসিলের তৃতীয় সদস্য হলেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, গোবিন্দরাম মিত্র প্রবল প্রতাপে কলকাতা শাসন করতেন। প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে গোবিন্দরাম মিত্রের কাজ ছিল খাজনা, কর ইত্যাদি আদায় করা ডেপুটি-জমিদার হিসাবে, লোককে শাসন করা নয়, তাহলে তিনি জবরদস্ত শাসনকর্তা হলেন কি ক'রে? তার উত্তর এই যে, সেকালে মোগল ফৌজদারের অধীনে প্রত্যেক জমিদারের দু'টি ক'রে আদালত থাকত—একটি খাজনা আদায়-তহশিলের কাছারি। কোনো প্রজার খাজনা বা অন্য দেনা বাকি পড়লেই তাকে কাছারিতে ধরে নিয়ে এসে আটক ক'রে রাখা হতো। কিংবা অন্য নানারকম শারীরিক শাস্তি দেওয়া হতো টাকা আদায় করবার জন্য। দ্বিতীয় কাছারিটি ছিল দেওয়ানি ও ফৌজদারি কাছারি। এই কাছারিতে এ-দেশীয় প্রজাদের মধ্যে সবরকমের দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার করতেন জমিদার হিন্দু ও মুসলমান ও আইন অনুসারে। তাছাড়া চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, জখম ইত্যাদি ফৌজদারি অপরাধেরও বিচার করতেন জমিদার মুসলিম আইন অনুসারে। সেইজন্য জমিদারদের অধীনে আলাদা পুলিশ থাকত। তাদের বলা হতো জমিদারী পুলিশ। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোম্পানির সব আদালতেই ফৌজদারি অপরাধের বিচার হয়ে এসেছে মুসলমান আইন অনুসারে। মুসলমান আইন অনুসারে এদেশীয় প্রজাদের ফৌজদারি অপরাধের বিচার শেষ হয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিজের হাতে এদেশের শাসনভার নেবার পর।

১৬৯৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই ৩টি গ্রামের জমিদারী-স্বত্ব অর্থাৎ খাজনা আদায়ের স্বত্ব কিনে নেবার পর বাংলার নবাব অন্যান্য জমিদারের মতো ইংরেজ জমিদারকেও ঐ তিন গ্রামের মধ্যে দু'টি কাছারি ও পুলিশ রাখার অনুমতি দেন। কিন্তু যেহেতু ইংরেজ জমিদাররা হিন্দু ও মুসলমানের দেওয়ানি কিংবা ফৌজদারি কোনো আইনই জানতেন না, তার উপর ঘন ঘন জমিদার বদল হতো, সেইজন্য তাঁরা ডেপুটি-জমিদারের উপর সবরকম বিচারের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই কারণেই

গোবিন্দরাম মিত্র ডেপুটি-জমিদার হিসেবে দেশী প্রজাদের উপর পুরো শাসন-ক্ষমতা পান। কলকাতার জমিদারের এই দুই কাছারি স্থাপিত হবার ২৭।২৮ বছর পরে ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজার পরোয়ানা-বলে কলকাতায় ৪টি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে Mayor's Court—দেওয়ানি মামলার জন্য, ও আর একটা Court of Quarter Sessions—ফৌজদারি মামলার জন্য। তৃতীয় আদালত ছিল ছোট দেওয়ানি আদালত—Court of Requests, পরে এই আদালতের নাম হয় Small Causes Court। চতুর্থ আদালত ছিল আপিল আদালত। এই ৪টি আদালতেই বিচার হতো ইংল্যাণ্ডের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন অনুসারে। গোবিন্দরাম মিত্রের নাতি রাধাচরণ মিত্রের দলিল জাল করবার অপরাধে বিচার হয়েছিল Court of Quarter Sessions-এ এবং বিলেতি আইনে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল।

৩. তৃতীয়, চিৎপুরে চিত্তেশ্বরী (বা চিত্রেশ্বরী) মন্দির।

অনেকের মতে 'চিত্তেশ্বরীপুর' থেকে 'চিৎপুর' নাম হয়েছে। আর এক কিংবদন্তি যে চিত্তেশ্বরী দেবী 'চিতু' নামে এক ডাকাতের প্রতিষ্ঠিতা দেবী। এই দেবীর সামনে নাকি নরবলি দেওয়া হতো। বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা যে চিৎপুর রোডই আসল চিৎপুর। সেটা ভুল ধারণা। বাগবাজারের খালের উত্তর থেকে চিৎপুর আরম্ভ হয়ে 'গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরি' পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। আগে চিৎপুর ও কাশীপুর থানা প্রায় পাশাপাশি ছিল। চিৎপুর রোডের পুরো নাম Road to Chitpore—চিৎপুর যাবার রাস্তা।

মনোহর ঘোষ ওরফে মহাদেব ঘোষ চিৎপুরে চিত্তেশ্বরীদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার তারিখ ম্যাক্‌কাচন সাহেব ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। এ তারিখ তিনি কোথা থেকে পেলেন? মন্দিরের মাথায় লেখা আছে ১৬১০ খ্রীস্টাব্দ। এই তারিখই ঠিক বলে মনে হয়। মনোহর ঘোষ ছিলেন হুগলি জেলার আখনার ঘোষ। ইনি ছিলেন প্রথমে রাজা টোডরমলের গোমস্তা, পরে হন মুহুরি। শেষে সুবর্ণরেখা নদীতীরে বাস করেন। মোগল-পাঠান যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সুবর্ণরেখা ত্যাগ ক'রে চিৎপুরে এসে বাস করেন। সেই সময়ে চিত্তেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ডাকাতদের অত্যাচারে চিৎপুর ত্যাগ ক'রে ব্যারাকপুরের পাশে চন্দম (চন্নন) পুকুরে গিয়ে বাস করেন। গোবিন্দরাম মিত্রেরও আদিনিবাস এই চন্দনপুকুরে ছিল। রাধাকান্ত ঘোষও (একমতে ইনি মনোহর ঘোষের পুত্র, অন্যমতে ভ্রাতুষ্পুত্র) চন্দনপুকুরে বাস করতেন।

সে সময়ে চিৎপুর-কাশীপুর অঞ্চলে যে ডাকাতরা থাকত তার প্রমাণ এই যে, কাশীপুর রোডের উপর বামনদাস মুখুজ্যের ঠাকুরবাড়ির উত্তরে এক বড় বাড়িতে

বরানগর বা কাশীপুর থানার অধীন এক পুলিশের ফাঁড়ি ছিল। ঐ ফাঁড়ির রাস্তার দিকের একটি ঘরে এক পাথরের শিবঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাইরে লেখা ছিল 'রঘু ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত মহাদেব'। তার চেয়েও বলবৎ প্রমাণ এই যে ৺অর্ধেন্দ্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মশাইয়ের বনহুগলিতে যে বাগানবাড়ি ছিল সে বাগানবাড়িও রঘু ডাকাতের সম্পত্তি ছিল। এই কথা তাঁর 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' নামক গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। আমি এখানে তা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

আমার পিতামহ ৺অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলীর পুণ্যেতে আমরা পেয়েছিলাম প্রকাণ্ড একটি বাগান। দশবিঘা জমির উপরে তিনটি পুকুর ও একটি দোতলা বাড়ি ছিল সে বাগানে। আর ছিল প্রচুর নানারকম ফুল ও ফলের গাছপালা। জায়গাটি হোল ৩১ নম্বর গোপাললাল ঠাকুর রোড, বনহুগলি, চব্বিশ পরগনা। বরানগরের কাছে।

দলিলে দেখেছি ক্রেতা অবিনাশচদ্র গঙ্গোপাধ্যায় (আমার পিতামহ), আব বিক্রেতা রঘুনাথ সর্দার অর্থাৎ তখনকার কালের বিখ্যাত 'বোঘো ডাকাত'। শুনেছি বাগান বিক্রিব অনেক পরেও তাব বংশের ছেলে নাতিরা আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমরাও ছেলেবেলায তার এক নাতিকে দেখেছিলাম—দীর্ঘাঙ্গ. মাথায ঝাঁকড়া চুল, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি। আমাদেব বাগানের গেট থেকে বাড়ী পর্যন্ত তিনশ' ফুট রাস্তা ঐ লাঠির উপর ভর দিযে কয়েকটি লাফেতে অতিক্রম করে সে আসত।

চিতু ডাকাতের কিংবদন্তির কথা আগেই বলেছি।

মনোহর ঘোষেব মৃত্যু হয ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে। পূর্বোক্ত রাধাকান্ত ঘোষের পুত্র বারানসী ঘোষ ২৪-পরগনার কালেক্টার গ্ল্যাডুইন সাহেবের দেওয়ান ও জোড়াসাঁকোব শান্তিরাম সিংহের জামাই ছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকোয় নিজের বাসের জন্য প্রকাণ্ড এক বাড়ি তৈরি করেছিলেন। যে রাস্তায় এ বাড়ি ছিল তার নাম বারানসী ঘোষের স্ট্রিট। এ রাস্তাটি পশ্চিমে চিৎপুর রোড থেকে পূর্বে কর্নওয়ালিপ স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন আর সমস্ত রাস্তার নাম বারানসী ঘোষ স্ট্রিট নয। চিৎপুব রোড থেকে সেনট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত পশ্চিমের অংশের নাম এখনো বারানসী ঘোষ স্ট্রিট রযেছে। কিন্তু সেনট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট পর্যন্ত পুবের এই অংশের নাম হয়েছে তারক প্রামাণিক রোড। চন্দনপুকুরে থাকতেন বলে বারানসী ঘোষ ব্যারাকপুরেব কাছে গঙ্গার স্নানঘাট ও ৬টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্নানঘাটের চাদনির গায়ে এক পাথরের ফলকে একথা লেখা আছে।

মনোহর ঘোষের পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ পিতার মৃত্যুর পব বর্ধমানে গিয়ে বাস করেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা শিখে ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ কুঠিতে ৭০ বছর কাজ করেন। এঁর পুত্র বলরাম ঘোষ, যাঁর নামে শ্যামপুকুরে রাস্তা আছে।

কিন্তু তিনি কস্মিনকালে কলকাতায় বাস করেন নি, চিরকাল চন্দননগরে বাস করেছেন। বাণিজ্যে সংগতিপন্ন হয়ে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ৯৫ বছর বয়সে মারা যান।

বলরাম ঘোষের প্রথম দুই পুত্র রামহরি ঘোষ ও শ্রীহরি ঘোষ পিতার মৃত্যুর পর চন্দননগর ছেড়ে শ্যামপুকুরে এসে বাস করেন। প্রায় ২০ বিঘে জমি নিয়ে মস্ত বাড়ি, বাগান ও পুকুর তৈরি করেন।

শ্রীহরি ঘোষ মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন। বহু অর্থ উপার্জন করেন। চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর কলকাতায় এসে শ্যামপুকুরের বাড়িতে না থেকে আলাদা এক বাড়ি ক'রে বাস করেন। যে রাস্তায় বাড়ি করেন তার নাম এখনো হরি ঘোষ স্ট্রিট। বহু অনাথ, দুঃখী, নিঃসম্বল লোককে, ছাত্র ও আত্মীয়স্বজনকে বাড়িতে আশ্রয় ও অন্নবস্ত্র দিয়ে পুষতেন বলে লোকে তাঁর বাড়িকে 'হরিঘোষের গোয়াল' বলত। তিনি মানুষ মাত্রকেই সহজে বিশ্বাস করতেন। তার ফল হাতে-নাতে পেয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাঁকে ঠকায়। কলকাতার বাড়ি গাঙ্গুলিদের বেচে দিয়ে তিনি শেষজীবনে কাশীবাসী হন ও সেখানে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাঁর দেহান্ত হয়। তাঁর কলকাতার বাড়ি এখনো আছে।

হেদোর উত্তর ধারে যে মস্ত বড় মোটা মোটা থামওয়ালা বাড়ি আছে তার মালিক ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৩) বলরাম ঘোষের বংশধর। তিনি হিন্দু কলেজে পড়তেন। ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। সেগুলি *Shair and other Poems* নাম দিয়ে ছাপিয়ে বার করেন। *Hindu Intelligencer* নামে এক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। সে কাগজ সিপাহি বিদ্রোহের সময় উঠে যায়। তাছাড়া তিনি প্রায় ৩০০ বাংলা গানও রচনা করেছিলেন।

৪-৫. চতুর্থ ও পঞ্চম মন্দির।

ম্যাক্‌কাচন সাহেব বলেছেন, কালীঘাটে নকুলেশ্বর শিবের মন্দির একজন শিখ ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে তৈরি করিয়ে দেন, আর মধুসূদনের মন্দির উদয়নারায়ণ মণ্ডল ঐ একই বছরে (১৮৪৩) তৈরি করেন। মধুসূদনের মন্দির যে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল, এ খবর ম্যাক্‌কাচন সাহেব কোথা থেকে পেলেন? মন্দিরের গায়ে কোনো পাথরে একথা লেখা নেই, সেবায়েতরাও জানেন না।

সাহেব মধুসূদনের মন্দির তৈরির তারিখ দিলেন, কিন্তু কাছেই ছিল শ্যাম রায়ের মন্দির। তার তৈরির তারিখ দেওয়া তো দূরের কথা উল্লেখমাত্র করলেন না। কটন সাহেব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Calcutta Old and New*-তে লিখেছেন: "বাওয়ালির উদয়নারায়ণ মণ্ডল শ্যামচাঁদের মন্দির তৈরি করেন ১৮৪৩ সালে, আর তারা সিং নামে একজন পাঞ্জাবী সওদাগর নকুলেশ্বরের বর্তমান পাথরের মন্দির তৈরি করেন ১৮৫৪ সালে।"—কার কথা সত্য, কটন সাহেবের, না ম্যাক্‌কাচন সাহেবের?

৬. ষষ্ঠ মন্দির, বৌবাজারের সিদ্ধেশ্বরী বা ফিরিঙ্গি কালীমন্দির।

কটন সাহেব তাঁর বইতে লিখেছেন: "শ্রীমন্ত ডোম নামে এক ব্যক্তি এই কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর মৃত্যুসময় পর্যন্ত ৭০ বছর ধরে এই কালীর পূজারীর কাজ করেন। শ্রীমন্ত ডোম এই অঞ্চলের বসন্ত রোগীদের চিকিৎসা করতেন। মন্দিরের ভেতর কালীমূর্তির পাশেই এক শীতলার মূর্তিও রাখা আছে। এই অঞ্চলের ফিরিঙ্গি বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রীমন্ত ডোমের খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি হয়। ফিরিঙ্গিরা বসন্ত রোগ থেকে সেরে উঠলে এই কালীর কাছে পুজো পাঠিয়ে দিত। সেইজন্য এই কালীর নাম হয় ফিরিঙ্গি-কালী।"—অনেকের ধারণা, এ কালী কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কিংবা তাঁর ঠাকুর্দা (তাঁরও নাম ছিল অ্যান্টনি, অনেকের ভুল ধারণা তিনি অ্যান্টনি বাগানের মালিক ছিলেন) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেইজন্য একে ফিরিঙ্গি-কালী বলা হয়। এটা ভুল ধারণা। বর্তমানে কালীর সেবায়েত ব্রাহ্মণ।

ম্যাক্‌কাচন সাহেব লিখেছেন: "এই মন্দিরের গায়ে হালেব এক পাথরে এর প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দ বলে লেখা আছে।"—কিন্তু তা লেখা নেই। লেখা আছে ৯০৫, ৯০৫ বঙ্গাব্দ। এর ইংরেজি সাল হয় ১৪৯৮, ১৪৯৭ নয়।

মন্দিরের বয়সটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। ১৪৯৮ সালে কলকাতা শহরের ও বৌবাজার পাড়ার অস্তিত্ব ছিল কি? আশ্চর্য, এই তারিখ সম্বন্ধে শ্রীবিনয় ঘোষ কোনো মন্তব্য করেন নি। তাহলে কি বুঝতে হবে মৌনং সম্মতি লক্ষণম্? আর 'সরেজমিনে তদন্ত' করলে ১৪৯৭ সালটা যে ভুল এটা কি তাঁর নজরে পড়ত না?

৭. ম্যাক্‌কাচন সাহেব লিখেছেন: "এ. কে. রায়ের *A Short History of Calcutta* অনুসারে বৈষ্ণবদাস শেঠের পুরাতন ঠাকুরবাড়ি (গোবিন্দজীর মন্দির—রা. মি.) ১৯০১ সালেও টাঁকশালের পিছনে বর্তমান ছিল।"

১৯০১ সালে কেন, ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তারপর সে ঠাকুরবাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। গোবিন্দজী আর ওখানে নেই। কোথায় আছেন জানতে পারি নি।

৮. ম্যাক্‌কাচন সাহেব লিখেছেন: "ঠনঠনিয়ার সাবেক কালীমন্দির ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে তৈরি হয়।"

কিন্তু বর্তমান মন্দিরের গায়ে এক পাথরে ১১১০ সাল লেখা আছে। অর্থাৎ এই পাথরের প্রমাণে কালীমন্দির তৈরি হয়েছিল ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে, ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে নয়।

৯. ম্যাক্‌কাচন সাহেব লিখেছেন: "টালিগঞ্জে ঘোষবাবুদের তৈরি পাঁচটি আটচালা শিবমন্দিরের মধ্যে চারটি এক জায়গায় আর একটি একটু আলাদা আছে। এই আলাদা মন্দিরটি বলরাম ঘোষ তৈরি করেন।"

কিন্তু মন্দিরের মাথায় পাথরে যে নাম লেখা আছে তা বলরাম ঘোষ নয়—বাররাম ঘোষ বা বাবুরাম ঘোষ, যদিও বাবুরামের দ্বিতীয় ব-এর তলায় উ-কারের *চিহ্ন নেই।*

১০. ম্যাক্কাচন সাহেব লিখেছেন : "৭৮ নম্বর টালিগঞ্জ রোডে রাধামোহনের মন্দির আছে।"

রাধামোহনের মন্দির নেই, রাধা-মদনমোহনের মন্দির আছে।

১১. ম্যাক্কাচন লিখেছেন : "৯৩ নম্বর টালিগঞ্জ রোডে যে গোপালজীর ও শিবমন্দির আছে তা বিহারীলাল মণ্ডল ১৮৪৫ সালে তৈরি করেন।"

বিহারীলাল মণ্ডল তৈরি করেন নি। করেছিলেন প্যারীলাল মণ্ডল—১৮৪৫ সালে নয়, ১৮৪৭ সালে।

১২. সাহেব লিখেছেন : "৯৩ নম্বর টালিগঞ্জের প্রায় ১০০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে যে আটচালা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে তা ১৮৪৫ সালের কাছাকাছি ব্যানার্জিবাবুরা তৈরি করেন।"

ব্যানার্জিবাবুরা তৈরি করেন নি, করেছিলেন মণ্ডলবাবুরা। কিন্তু তাঁরা ঐ মন্দিরের মধ্যে কোনো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন নি। ঐ খালি মন্দির ব্যানার্জি-বাবুরা মণ্ডলবাবুদের কাছ থেকে কিনে নেন এবং ১৯৪৯ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ তার ভেতর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩. টালিগঞ্জে ঘোষেদের পাচটি আটচালা শিবমন্দিরের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে আর একটি ঐ ধরনের বড় শিবমন্দির আছে, সাহেব তার উল্লেখ করেন নি।

১৪. সাহেব লিখেছেন : "বড়িসার বৈদ্যপাড়ায় আর তিনটি আটচালা শিব-মন্দির আছে, তাদের একটা একেবারেই ভেঙে গেছে।"

বড়িসার বৈদ্যপাড়া শখের বাজারের পাশেই। ঐ ৩টি মন্দির বৈদ্যপাড়ায় নেই, আছে শখের বাজার থেকে প্রায় দেড় মাইল পূর্ব-দক্ষিণে চুয়াবন বা চৌয়াবন গ্রামে। কাদম্বরী রায় নামে কোনো বৈদ্যজাতীয়া মহিলা ঐ মন্দির ৩টি প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির সম্পর্কে আলোচনা আপাতত এখানেই শেষ হল।

'ভারত-শ্রমজীবী' প্রসঙ্গে*

'এক্ষণ' শারদীয় সংখ্যা ১৩৮২-তে 'ভারত-শ্রমজীবী' পত্রিকার পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় দু-একটি সামান্য ভুল আমার চোখে পড়েছে, সেগুলি দেখিয়ে দেওয়া দরকার মনে করি।

প্রথম ভুল, ২২ পৃষ্ঠার ২ লাইনে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম-তারিখ লেখক দিয়েছেন, ২ এপ্রিল ১৮৪০। জন্ম-তারিখ ২ এপ্রিলের জায়গায় হবে—২ ফেব্রুয়ারি। শশিপদবাবুর সমাধি-ফলকে ও 'নবযুগের সাধনা'য় ২ ফেব্রুয়ারি লেখা আছে।

দ্বিতীয় ভুল, ২৩ পৃষ্ঠার প্রথম পাদটীকায় Sitanath Tattvabhusan-এর জায়গায় Sivanath Tattvabhusan ছাপা হয়েছে। এটা ছাপার ভুল।

তৃতীয় ভুলটি সত্যিই গুরুতর। ২২ পৃষ্ঠার ১৫ লাইনে তিনি লিখেছেন: "সেই সময়ে বরানগরের কামারপাড়া, আড়িয়াদহ ও কুঠীঘাটাতে বোর্নিও কোম্পানির চটকল ছিল।" অনবধানতাবশত এই ভুলটি হয়েছে। এক জায়গায় একটি চটকল হওয়াই কি সহজ ব্যাপার! কাছাকাছি তিনটি জায়গায় তিনটি চটকল থাকা এক অভাবনীয় ঘটনা। যে কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের 'নবযুগের সাধনা' নামক পুস্তক থেকে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেখানে আমার যতদূর মনে পড়ে একথা নেই। এই লেখা আছে যে ঐ তিনটি জায়গায় বরানগরের বোর্নিও কোম্পানির শ্রমিকদের সংঘ বা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের আড্ডা বা দলকে কানাই-বাবু চটকল ধরে নিয়েছেন।

৪

পূর্বানুস্মৃতি ও পরিপূরণ

আমি শারদীয় সংখ্যা (১৩৮২ সাল) 'এক্ষণ'-এ প্রথমে লিখেছিলাম (বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তা সামান্য সংশোধন করেছি) :

> ১৮৫৪ সালের ১৬ আগস্ট গরানহাটায় 'দি স্কুল ফর ইনডাস্ট্রিয়াল আর্ট' স্থাপিত হয়। গরানহাটায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঐ স্কুল হীরালাল শীলের কাছে আবেদন করে। হীরালাল শীল বিনা ভাড়ায় ঐ স্কুলকে নিজের বাগানবাড়িটি ছেড়ে দেন। ১৮৫৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে আর্ট স্কুল এই বাগানবাড়িতে উঠে আসে। হীরালাল শীল ইচ্ছা করলে মাসে ২০০ টাকা ভাড়া স্কুলের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। (পৃ ১৯৯)।

একথা আমি কল্পনা থেকে লিখি নি। এক সমসাময়িক সংবাদপত্র—'সম্বাদ-ভাস্কর'-এর ৭ই অগ্রহায়ণ ১২৬১ (ইং ২১ নভেম্বর ১৮৫৪) তারিখের নিম্নলিখিত সংবাদটির উপর নির্ভর ক'রে লিখেছিলাম :

> হিন্দু কলেজের দক্ষিণদিগে যে বাটীতে শীল কলেজ হইয়াছিল বাবু হীরালাল শীল মহাশয় শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য ঐ বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছেন। উক্ত বাড়ীর মাসিক ভাড়া দুইশত টাকা, বাবু তাহা গ্রহণ করিবেন না।

হিন্দু কলেজের দক্ষিণদিকে শীল কলেজ হয়েছিল নার্সিংচন্দ্রের বাগানবাড়িতে, অন্য কোনো বাড়িতে নয়। আমার ভুলের উৎস এইখানে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন বা সমসাময়িক দলিল, যা আমরা প্রায় সকলেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিই, তা সবসময়ে নির্ভরযোগ্য নয়।

কার উপর নির্ভর করা যায়? যোগেশচন্দ্র বাগল মশাই অত্যন্ত সাবধানী লেখক। তিনি কিরকম ভুল করেছেন দেখুন। আর্ট স্কুল গরানহাটায় কতদিন ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দু'জায়গায় দু'রকম দিয়েছেন। Calcutta Government College of Art and Craft-এর শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থে তিনি লিখেছেন: "The school was removed from Garanhata to late Motilal Seal's building then known as Seal's College at Colootola, in the middle of November, 1854," (পৃ ২)। এখানে তিনি 'সম্বাদভাস্কর'-এর সংবাদকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। আবার 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র' নামক পুস্তকে লিখেছেন (পৃ ১৩৪): "১৮৫৮ সন পর্যন্ত শিল্প বিদ্যালয় গরানহাটায় অবস্থিত ছিল। ইহার পর ১৮৫৯ সনে কলুটোলা, এখন যেখানে মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু চিকিৎসালয় অবস্থিত, সেখানে একটি বাড়ীতে বিদ্যালয় উঠিয়া আসে। এখানে বিদ্যালয়টি চারি বৎসর (১৮৫৯-৬৩) ছিল।"—পাঠক তাঁর কোন লেখাটিকে সত্য বলে গ্রহণ করবেন? আরো কথা আছে। এই বইয়ে তিনি নিজে বলেন নি যে কলুটোলার বাড়িতে শীল কলেজ ছিল, কিন্তু শতবার্ষিকী-গ্রন্থে সেকথা বলেছেন। বলেছেন বটে, কিন্তু গায়ের জোরে বলেছেন। কেননা শীল কলেজ ঐ বাড়িতে কোনোদিনই ছিল না।

আরো ভুল দেখবেন? ১৯২৭ সালে সংকলিত *Presidency College Register*-এ 'Ex-students of Hindu College' নামক অধ্যায়ে লেখা হয়েছে (পৃ ৪৫৬): "Rajnarayan Datta. Pleader Sadar Dewani Adalat. Father of Michael Madhusudan Datta. Macaulay praised him as a writer of very good English."। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত *Presidency College Centenary Volume*-এ 'Students of the Hindu college' নামক অধ্যায়ে লেখা আছে (পৃ ৩০৮): "Rajnarayan Dutta. Good writer in English."। শতবার্ষিকী-গ্রন্থের এই অধ্যায়ের লেখক স্পষ্টতই খুব বুদ্ধিমান লোক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই রাজনারায়ণ দত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত হতে পারেন না। কারণ মাইকেলের পিতা ইংরেজি যৎসামান্য জানতেন, ফার্সি খুব ভালো জানতেন, তাই সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করতেন। তবে, এ রাজনারায়ণ দত্তকে সনাক্ত করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। থাকলে করতেন। শুধু তিনি কেন, আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেন নি।

ইনি হচ্ছেন অ্যাটর্নি ৺বলাইচাঁদ দত্তের (১৮৪৯—জুলাই ১৯০৬) পিতা। বলাইচাঁদ দত্তের বাড়ি ছিল ২৭ নম্বর কলুটোলা স্ট্রিটে। ঐ অঞ্চলে বলাই দত্ত স্ট্রিট এখনো আছে। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত (১৮২৪-৯১) জাতিতে সুবর্ণ বণিক। তিনি হিন্দু কলেজে সিনিয়র স্কলার ছিলেন। হেয়ার সাহেব ও ডি.

এল. রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র। ১৮৪১ সালে 'Osmyn' কাব্য ও ১৮৪৩ সালে 'Chuckerbutty Faction' নামে এক প্রহসন রচনা করেন।

আর একটা অবিশ্বাস্য ভুল করেছেন পরম শ্রদ্ধেয় ৺রাজনারায়ণ বসু মশাই। তিনি তাঁর 'আত্মচরিতে' (পৃ ৩৭) লিখেছেন :

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। কলিকাতার হাটখোলার দত্ত বাটী আত্মরস হয়। স্বর্গীয় অভয়াচরণ দত্ত মহাশয় আমার শ্বশুর ছিলেন · ইঁহার জেঠতুত ভাই কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয়। কালীপ্রসাদ দত্তের বিষয় আমি আমার 'সেকাল ও একাল' পুস্তকে লিখিয়াছি। মেদিনীপুর জেলায় নারাজোলের মধ্যে কোতবপুর জমিদারী ইহাদিগের দুই-জনের নামে ছিল। ইহা হইতে তখনকার বিখ্যাত কালীপ্রসাদী হেঙ্গামা উপস্থিত হয়।

রাজনারায়ণবাবুর মতো লোক কি ক'রে এরকম মারাত্মক ভুল করলেন, ভেবে অবাক হতে হয়। সকলেই জানেন যে, যে-কালীপ্রসাদ দত্তকে নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছিল তিনি ছিলেন চূড়ামণি দত্তের পুত্র। তাঁর নামে গ্রে স্ট্রিটে রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ির উল্টোদিকে এক রাস্তা আছে। হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্তের নামে কোনো গলি নেই। চূড়ামণি দত্তের বাড়ি উঁচু ছিল বলে তার নাম ছিল বালা-খানা। কাছেই ছিল বালাখানা স্ট্রিট। আর রাজনারায়ণের জ্যেঠশ্বশুর কালী-প্রসাদ দত্তের পিতার নাম চূড়ামণি দত্ত নয়, রামহরি দত্ত। সব চেয়ে বড়কথা এই যে সমস্ত হাটখোলা দত্তবংশে একটি লোকেরও চূড়ামণি দত্ত নাম নেই।

গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের এক দানপত্র জাল করার অপরাধে ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে বিচার হয়ে ফাঁসির হুকুম হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ২৯-১-১৭৬৬ তারিখে কলকাতার যে ৯৫ জন প্রধান নাগরিক স-কৌন্সিল গভর্নরের কাছে পুনর্বিচারের কিংবা দণ্ড স্থগিতের আবেদন করেন তাদের মধ্যে চূড়ামণি দত্তও ছিলেন।

আরো একটি ভুল আছে। সুবল মিত্রের অভিধানে সংস্কৃত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক মহাপণ্ডিত ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের গ্রামের নাম দেওয়া আছে ২৪-পরগনার অন্তর্গত 'মুচাদি' গ্রাম। এই অভিধান প্রকাশের অনেক বছর পরে ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) রচনা করেন। সেই বইয়ে তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের গ্রামের নাম লিখেছেন 'মুচাদিপুর'। 'মুচাদি' ও 'মুচাদিপুর'—দু'টো নামই ভুল। কেরামতিটা সম্পূর্ণ সুবলচন্দ্র মিত্রের—তিনি 'মুচাদি' নাম আবিষ্কার করেছেন। এ-ব্যাপারে ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনোই বাহাদুরি নেই—তিনি কেবল সুবল মিত্রের উপর একটু রং চড়িয়ে 'মুচাদি'কে 'মুচাদিপুর' করেছেন। ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'মুচাদিপুর লিখেছেন তখন আর যায় কোথায়? তারপর থেকে সব অভিধান,

সব কোষগ্রন্থেই লেখা হয়ে আসছে 'মুচাদিপুর'। অথচ গ্রামের সঠিক নাম বার করা মোটেই শক্ত ছিল না, বা আজো নয়। মোট কথা, সুবল মিত্র বা ব্রজেনবাবু দু'জনের কেউই তর্কপঞ্চাননের গ্রামে তো যানই নি, সে-গ্রাম কোথায় তাও জানতেন না। সে গ্রাম মোটেই দূরে নয়। বড়িসা শখের বাজারের মোড় থেকে উত্তর-পূর্বে এক থেকে দেড় মাইলের মধ্যে। যে কোনো লোক একদিন একটু কষ্ট ক'রে গিয়ে খোঁজ করলেই জানতে পারেন গ্রামের নাম 'মুচাদিপুর' না—মুরাদপুর। এটিকে ছাপার ভুল বলা যায় না।

আর একটি ভুল হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান নিয়ে। তিনি ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে ১৮৭২ সালে জন্মেছিলেন। কিন্তু ১৮৭২ সালে মনোমোহন ঘোষের থিয়েটার রোডে কোনো বাড়িরই নাম পাওয়া যায় না স্ট্রিট ডিরেক্টারিতে। শুধু একটি বাড়ি পাওয়া যায় ১৩ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে ২৪-পরগণার দিকে। তখন লোয়ার সার্কুলার রোডের পশ্চিম ও উত্তর দিককে বলা হতো শহরের দিক, আর পূর্ব ও দক্ষিণ দিককে বলা হতো ২৪-পরগনার দিক। ১৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ির বর্তমান নম্বর হচ্ছে ২৩৭। এইটিই মনোমোহন ঘোষের বাড়ি ছিল। এই বাড়িতেই শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়েছিল। এই বাড়ি পরে ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মশাই কেনেন ও এই বাড়িতেই তিনি বাস করতেন। মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি এই বাড়ি বিক্রি ক'রে দেন। কেনেন ৺নলিনীরঞ্জন সরকার। তিনি পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলে তার জায়গায় একেবারে নতুন বাড়ি তৈরি করেন। নাম দেন 'রঞ্জনী'। মনোমোহন ঘোষ ১৮৯৬ সালে মারা যান। ঐ সালের ডিরেক্টারিতে থিয়েটার রোডে মাত্র একটি বাড়ি মনোমোহন ঘোষের বলে উল্লেখ আছে। সেটা হচ্ছে ১৭ নম্বরের বাড়ি। কিন্তু সে-বাড়ি থিয়েটার রোডের পশ্চিমে নয়, পূবে, রডন স্ট্রিট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যে। সুতরাং ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ি কখন মনোমোহন ঘোষের হল?

শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য এ. বি. পুরানি ইংরেজিতে অরবিন্দের এক বড় জীবনী লিখেছিলেন। তাতে তিনি শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়ি ১২ নং লোয়ার সার্কুলার রোড বলে উল্লেখ করেছেন, আমার মনে পড়ে। বইখানি আমার অনেকদিন আগে পড়া, হাতের কাছে নেই যে মিলিয়ে দেখব। আর সে বই নাকি এখন পাওয়া যায় না। যদি সে বই কারো কাছে থাকে তো তিনি মিলিয়ে দেখতে পারেন আমার ধারণা ঠিক কি ভুল। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যমণ্ডলীর কাছে আগে থাকতে ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

৺সজনীকান্ত দাসও *Calcutta Municipal Gazette*-এ মনোমোহন ঘোষের বাড়ি ও শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান সম্বন্ধে লিখেছিলেন। তিনিও শ্রীঅরবিন্দের

জন্মস্থান মনোমোহন ঘোষের বাড়িকে ১২নং লোয়ার সার্কুলার রোড (২৪-পরগনার দিক) বলে উল্লেখ করেছিলেন। এ. বি. পুরানি (আমার ধারণা অনুসারে) ও সজনীকান্ত দাস দু'জনেই একমত যে, শ্রীঅরবিন্দের জন্মস্থান লোয়ার সার্কুলার রোডে, থিয়েটার রোডে নয়। এঁদের দু'জনের মত আমার মতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তফাত মাত্র এই যে, আমি বলেছি বাড়ির নম্বর ১৪, তাঁরা বলেছেন ১২। জানি না তাঁরা ১২নং কোথা থেকে পেলেন। আমার ডিরেক্টারিতে তো আছে ১৪ নম্বর।

মনোমোহন ঘোষের ও পরে ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর বাড়ি সম্বন্ধে শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী মশাই আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর বড় ছেলে ৺রণেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে বহুবার তাঁদের বাড়িতে গেছেন। মনোমোহন ঘোষের বাড়িটা লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর ঠিক রাস্তার ধারে ছিল না, এখন যেমন 'রঞ্জনী' আছে। একটা সরু প্রাইভেট গলিরভেতরদিকে বাড়িটা ছিল। নলিনীরঞ্জন সরকার সে বাড়টা কিনে একেবারে ভেঙে ফেলে দিয়ে নিজের বাড়ি তৈরি করেন ঠিক রাস্তার ধারে।

আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পৃ ৫৮) সেণ্ট জন্স কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ প্রসঙ্গে 'সাঁ সুসি' থিয়েটারের কথা বলেছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, স্যার রাসবিহারী ঘোষের কলকাতার বাড়ি ও তোরকোনা গ্রামের বাড়ি—দু'টো বাড়িরই নাম 'সাঁ সুসি'।

চৌরঙ্গি রোড ও থিয়েটার রোডের মোড়ে দক্ষিণদিকে ১৮১৩ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত একটি কাঠের তৈরি থিয়েটার ছিল—নাম 'চৌরঙ্গি থিয়েটার'। তখনকার কালে কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী লিচ্ (Mrs. Esther Leach) মাত্র ১৭ বছর বয়সে ২৭-৭-১৮২৬ তারিখে এই থিয়েটারে প্রথম অভিনয় করেন। ৩১-৫-১৮৩৯ তারিখে এই থিয়েটার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। থিয়েটারের জমি দ্বারকানাথ ঠাকুর ৩০,১০০ টাকায় কিনে নেন। এই থিয়েটারের জন্যই পাশের রাস্তাটির নাম হয়েছে থিয়েটার রোড।

তারপর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক স্টকেলার (Stocqueler)-এর সাহায্যে শ্রীমতী লিচ্ অনেক টাকা চাঁদা তুলে (লর্ড অকল্যাণ্ড ১ হাজার টাকা ও সাধারণে ১৬ হাজার টাকা দিয়েছিলেন) ৮০ হাজার টাকা খরচ ক'রে ১০ নম্বর পার্ক স্ট্রিটে 'সাঁ সুসি' থিয়েটার তৈরি করেন। থিয়েটার-বাড়ি তৈরি শেষ হয় ১৮৪০ সালের মে মাসে ও তার উদ্বোধন হয় ৮-৩-১৮৪১ তারিখে।

২-১১-১৮৪৩ তারিখে শ্রীমতী লিচ্-এর পোশাকে আগুন ধরে যাওয়ায় তিনি সাংঘাতিকভাবে পুড়ে যান। তাঁকে ধরাধরি ক'রে পুব পাশের ১১ নম্বর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বাড়িতে তিনি থাকতেন। অধিকাংশ লোক ভুল ক'রে

এই বাড়িকে বর্তমান ৩২ নম্বর রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপের বাড়ি বলে সনাক্ত করেছেন। কিন্তু সেটা ভুল। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ১১নং বাড়ি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ কিনে নেয়। ১০ ও ১১ নম্বর বাড়ি মিলিয়ে বর্তমান ৩০ নম্বর পার্ক স্ট্রিটের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হয়েছে। ঐ ১১ নম্বর বাড়িতে ১৫ দিন পরে শ্রীমতী লিচ. ১৮-১১-১৮৪৩ তারিখে মারা যান। তাঁর দেহ ভবানীপুরের সৈন্যদের গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। কারণ তাঁর পিতা ও স্বামী দু'জনেই ছিলেন সৈনিক। কিন্তু এখন সে সমাধির কোনো চিহ্ন নেই। তাঁর এক ছোট মেয়ে মারা যায় ১৮২৮ সালে। তাঁর এক পাকা চারকোণা কবর আছে, তার ওপরে একটা ফলকও লাগানো আছে। শ্রীমতী লিচ.-এর আর এক মেয়ে ছিল, তার নাম এস্থার Esther (Alice ?) Leach। ১৮৪৪ সালে ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে ওল্ড বা মিশন চার্চে তার বিবাহ হয়।

শ্রীমতী এসথার লিচ.-এর মৃত্যুর পর এই থিয়েটার একটি ফরাসি কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া হয়। তারা এই মঞ্চে শেষ অভিনয় করে ২৪-৪-১৮৪৪ তারিখে। ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বড় পাদ্রি ক্যারু (Carew) এই থিয়েটার ২৭, ৫০০ টাকায় কিনে নিয়ে এই বাড়িতে সেণ্ট জন্স কলেজ নিয়ে আসেন। সেণ্ট জন্স কলেজই পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হয়। সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু এপ্রিল ১৮৪৪ ও সেপ্টেম্বর ১৮৪৯-এর মধ্যে 'সাঁ সুসি'-র কী অবস্থা ছিল? অত্যন্ত শোচনীয়। মাঝে মাঝে সাহেব-সুবোর দল এই রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে দু'চারদিন অভিনয় করতেন। তারপর আবার বন্ধ হয়ে যেত। এমনি একটি সাহেব কোম্পানি এই রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে শেক্সপিয়রের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় করে ১৮৪৮ সালে। এই নাটকে বৈষ্ণবচরণ আঢ্য নামে এক বাঙালি শখের অভিনেতা দু'রাত্রি—১৭ আগস্ট ও ১২ সেপ্টেম্বর—ওথেলোর ভূমিকায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। আশ্চর্য খবর!

কে এই বৈষ্ণবচরণ আঢ্য? আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর হদিশ দিতে পারেন নি, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ও নয়। এই দুই রাত্রির অভিনয়ের পরে তিনি কি চিরতরে এই মরধাম থেকে বিদায় নিলেন, না চিরকালের জন্য জন-অরণ্যে হারিয়ে গেলেন? দীর্ঘকাল ধরে খোঁজাখুঁজির পর আমি এই ভদ্রলোকের হদিশ বার করেছি। ইনি 'সাঁ সুসি' থিয়েটারে অভিনয় করবার ১১ বছর পরে ১৮৫৯ সালে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, যাদবচন্দ্র পালিত, পতিতপাবন সেন, মাধবচন্দ্র ধাড়া ও গঙ্গাচরণ সেনের সঙ্গে একযোগে শংকর ঘোষের লেনে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করেন, যা দু'বছর পরে ১৮৬১ সালে আদি স্কুল থেকে আলাদা হয়ে ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি নাম নেয়।

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ছিলেন ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের সম্পাদক ও মাধবচন্দ্র ধাড়া কোষাধ্যক্ষ। মাত্র এই দু'জনে ১৮৬১ সালে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি

নামে একটা আলাদা স্কুল স্থাপন করেন। বাকি ৪ জন প্রতিষ্ঠাতা, তার মধ্যে বৈষ্ণবচরণ আঢ্যও একজন, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলে থেকে যান। বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের একটিমাত্র পুত্র ছিলেন—বিনোদবিহারী আঢ্য। তিনি ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার জেলেটোলা স্ট্রিটে বাস করতেন। বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের নাম থেকেই জানা যায় তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক ছিলেন। তাঁর পরবর্তী ইতিহাস আমার অজানা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পৃ ৫৩-৫৪) আমি 'কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা' উপলক্ষে বিবি আনারোর কথা বলেছি এবং আরো বলেছি যে বেনেপুকুর রোডে তিনি একটি ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে সে-সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য দিচ্ছি।

১৮৩৩ সালে তিনি সেই ইমামবাড়া ও তৎসংলগ্ন জমি ইত্যাদি ইংরেজি ভাষায় একটি দলিল সম্পাদন ক'রে ওয়াকৃফ করেন। ১৯৩৫ সালে ঐ ওয়াকৃফ-সম্পত্তি ওয়াকৃফ-আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি করা হয়। ঐ দলিল থেকে বিবি আনারো সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। তাই সম্পূর্ণ দলিলটি নিচে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি ('ওয়াকিফ' শব্দের অর্থ ওয়াকৃফ-কারী বা ওয়াকৃফ-কারিণী):

Wakf Estate of Bibi Fazlunnessa alias Bibi Anaro.

The wakif is daughter of Khairuddin Khan, son of Mulla Hayat Khan, both deceased, resident of Mouza Jamnagar in the district of 24 parganas.

By a wakf deed dated 30. 9. 1833 she appointed Hazi Mirza Mehdi, Merchant of Ispahan, resident of Calcutta, as executor, Mutwalli and representative of herself.

Her Imambara premises in Dihi Mouza Entally, municipal No. 31, 31/1 and 32, Baneapukur Road, Thana Baneapukur, comprised an area of $2\frac{1}{2}$ bighas and contained the Imambara building, the Karbala, a tank and pucca godowns, consisting of about $1\frac{1}{4}$ bigha and the rest of the land tenanted. Gross income (in 1935) Rs. 3208/10/- yearly.

The whole premises are surrounded by pucca boundary walls. Eastarn boundary contiguous to the land of Mr. Ladamer, western boundary company's public road, northern boundary garden of Narain Bose and southern

boundary adjoining the land and tank of Abhaycharan.

She made wakf of the above property for the observance of Taziadari during the first 10 days of Mohurrum and for the accommodation of Muinineen(orthodox Mahamedans) therein. Mr. Palmer, merchant, borrowed Rs. 10,000 from the wakif and executed a handnote for the amount. Rs. 1512/13/-as have been realized by her. The rest of the amount should be realized from the saheb by the Mutwalli.

Mutwalli (in 1935) – Muhammad Kazim Shirazi, 10 Portuguese Charch St.

বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (পৃ ৪৪) আমি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বড়বাজার দয়েহাটার বাড়ি কি ক'রে আবিষ্কার করেছি তা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এখন সেটা বলছি।

আমি ছেলেবেলা থেকেই বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পরম ভক্ত। তাঁর জীবনী পাঠ করবার পর থেকে তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় বড়বাজারে কোন বাড়িতে থাকতেন তা দেখবার প্রবল ইচ্ছা জাগে। কিন্তু জীবনীতে মাত্র গলির নাম দয়েহাটারই উল্লেখ ছিল, বাড়ির নম্বর দেওয়া ছিল না। আমি প্রায়ই দয়েহাটা গলিতে যেতাম, উদ্দেশ্য যদি বাড়িটা বার করতে পারি। কিন্তু শুধু যাওয়া-আসাই সার হতো। তখন বয়স কম ছিল, লোককে ভালো ক'রে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হতো না, বিশেষত ও অঞ্চলের লোকেরা ছিল সব কারবারী। এইরকম ক'রে ভ্রাম্যমাণের বৃথাভ্রমণে বহুবছর কাটে।

একদিন গিয়েছি। তখন আমাদের স্বাধীনতা হয় নি মনে আছে। এর আগে যতবারই গেছি একটা অতি পুরনো বড় বাড়িকে আমার বরাবরই সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু কোনোদিনই তার ভেতরে ঢোকবার সাহস হয় নি। সেদিন যা থাকে বরাতে বলে ঢুকলাম। দেখলাম সামনেই একজন বছর ৪৪।৪৫-এর বাঙালি যুবা এক গদির উপর বসে আছেন। তাঁর কাছে এক গ্লাস খাবার জল চাইলাম, তেষ্টা পেয়েছে এই ছুতো ক'রে। তিনি এক গ্লাস জল দিলেন। খেয়ে সেখানে বসে পড়লাম – যেন একটু জিরোতে চাই এইভাবে। বসে তাঁকে বললাম, "এটা তো দেখছি অনেক কালের পুরনো বাড়ি, কারা এখানে থাকেন?" উত্তর হল – "এ বাড়িতে আমরা অনেক ঘর ব্যবসাদার আছি অনেকদিন থেকে।" বলেই একটু থেমে বললেন, "আজ আমরা সব মুখ্যু কারবারী থাকি। কিন্তু এই বাড়িতে এককালে বিদ্যাসাগর মশাই থেকে গেছেন।" আমি তো চমকে

উঠলাম। তাহলে আমার অনুমান মিথ্যে নয়। বললাম, "আপনার বয়স তো কম, আপনি কেমন ক'রে জানলেন?" তিনি বললেন, "আগে এই গলিতে এক-জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল এই গলিতেই। তিনি বছর কয়েক হল সেই বাড়ি বিক্রি ক'রে অন্যত্র চলে গেছেন। কিন্তু তিনি অনেক কাল আমাদের সঙ্গে কাজ-কারবার করেছেন। প্রায়ই আমাদের গদিতে আসতেন। সম্প্রতি কয়েকমাস আসছেন না। কেন, বুঝতে পারছি না। তাঁর অনেক বয়স হয়েছে, ৯০ বছর কি তারও বেশি। তিনি ছেলেবেলা থেকে বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে খুব ভাব ছিল ভদ্রলোকের। বিদ্যাসাগর মশাই বড় হয়েও মাঝে মাঝে এদিকে আসতেন, এই বাড়িতে বসে লোকজনদের সঙ্গে আলাপ করতেন। আর এলেই সেই বৃদ্ধের ডাক পড়ত। তিনিই আমাদের বলেছেন যে বিদ্যাসাগর মশাই এই বাড়িতে ছেলেবেলায় ছিলেন।"

সেদিন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। পরে বাড়ির মালিক গোপেশ্বর মল্লিক মশাইয়ের কাছ থেকেও যাচাই ক'রে নিয়েছি যে কথাটা সত্য।

এখন এ বাড়ি সম্বন্ধে আর একটু তথ্য দিচ্ছি। এই বাড়ির মালিক ছিলেন গুরুচরণ মল্লিক—বড়বাজারের গৌরচরণ মল্লিকের নাতি ও তাঁর তৃতীয় পুত্র জগমোহন মল্লিকের বড় ছেলে। তিনি ১৮৩২ সালে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। ১৮-৩-১৮২৪ তারিখে গুরুচরণ মল্লিক তাঁর এই বাড়িতে সাহেব লোকদের ভোজ দেন। ১৮২৯ সালের জানুয়ারি মাসে এই বাড়িতে বাগবাজার ও জোড়াসাঁকো দুই দলের কবির লড়াই হয়। বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বাগবাজারের দলকে জয়মাল্য দেন। বীরনৃসিংহ মল্লিক ছিলেন বৈষ্ণবদাস মল্লিকের পুত্র। গুরুচরণ মল্লিকের মৃত্যুর পর কোনো এক সময়ে এই বাড়ি বৈষ্ণবদাস মল্লিকের বংশধরদের হাতে যায়। বর্তমান মালিক শ্রীযুত গোপেশ্বর মল্লিক মশাই বৈষ্ণবচরণ মল্লিক বংশের সন্তান। তিনি সজ্জন লোক এবং প্রাচীন ইতিহাসে তাঁর আগ্রহ আছে। এই বাড়ির নাম 'রামদয়াল কাটরা'। উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ জমিদার ভাগবত সিংহ কিংবা তাঁর পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ এই বাড়ির মালিক ছিলেন না, ভাড়াটে ছিলেন।

এখন মাইকেলের বাড়ি কী ক'রে বার করলাম সেই গল্প বলি। অনেকদিন আগে খোঁজ করতে করতে গৌরদাস বসাকের বাড়ি বার করি। কেননা গৌর-দাস বসাক ও রাজনারায়ণ বসু ছিলেন মাইকেলের পরম বন্ধু। আর, মাইকেল হচ্ছেন আমার আর একজন 'হিরো'। গৌরদাস বসাক, কি রাজনারায়ণ বসু কেউই মাইকেলের জীবনী লিখলেন না; যদিও মাইকেল চেয়েছিলেন এই দু'জনের কেউ-না কেউ তাঁর জীবনী লেখেন। কিন্তু দু'জনেই মাইকেল-জীবনী লেখবার অনেক মাল-মশলা সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন—একজন খুব গোছালো-

ভাবে, আর একজন একটু অগোছালোভাবে। এবং এই মালমশলা মুক্তহস্তে দান ক'রে দু'জনেই অন্য দু'জনকে দিয়ে মাইকেলের জীবনী লেখালেন—রাজনারায়ণ বসু যোগীন্দ্রনাথ বসুকে দিয়ে ও গৌরদাস বসাক নগেন্দ্রনাথ সোমকে দিয়ে। এসব অবান্তর কথা হয়ে গেল। মোদ্দা কথা হল, গৌরদাস বসাকের বাড়ি বার করলাম। তখন সে-বাড়ির মালিক গৌরদাস বসাকের প্রপৌত্র গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসাক। প্রথম আলাপেই তাঁর সঙ্গে এমনি জমে গেল যে মাসে অন্তত দু'বার তাঁর বাড়ি আমাকে'পায়ের ধুলো'দিতেই হতো। না গেলে সঙ্গে সঙ্গে'পত্রাঘাত'। এমন স্নেহের বাঁধনে তিনি আমাকে বেঁধেছিলেন যে সে-বাঁধন কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব হতো। কিন্তু তিনি নিজেই সে-বাঁধন ছিঁড়ে একদিন অকালে চলে গেলেন—স্ত্রী, ৪ কন্যা ও একমাত্র পুত্র কল্যাণকুমারকে রেখে।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ আমাকে গৌরদাস বসাকের গ্রন্থাগার ও তাঁর সযত্নে রক্ষিত যাবতীয় সংগ্রহ দেখিয়েছিলেন। একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে দেতলার বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি, এমন সময় তিনি হঠাৎ বাড়ির ভেতর গিয়ে একটা কি জিনিস হাতে ক'রে নিয়ে এলেন আমাকে দেখাবার জন্য। দূর থেকে দেখে মনে হল যেন ছোট চৌকো ফ্রেমে বাঁধানো কার একখানি ফটোগ্রাফ। কিন্তু হাতে নিয়েই চমকে উঠলাম। এ জিনিস কখনো দেখব বলে আশা করি নি। এটি মাইকেলের মেয়ে শর্মিষ্ঠার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র। সমস্তটাই ছাপানো। শুধু নিমন্ত্রিতদের নামের জায়গাটা ফাঁক—মাইকেল নিজের হাতে তাঁদের নাম লিখে দেবেন সেইজন্য। এই নিমন্ত্রণ-পত্রটি সযত্নে বাঁধিয়ে নিজের শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছিলেন গৌরদাস বসাক। কী গভীর বন্ধুপ্রীতি!

সেই নিমন্ত্রণ-পত্রটির ব[illegible] অনুবাদ করলে কিছুই থাকে না। তাই ইংরেজি পত্রটি আগাগোড়া এখানে তুলে দিচ্ছি :

Mr. and Madame Mich[illegible]l M. Dutt present their compliments to Babu Gour Das Bysack and request the pleasure of his company to witness the Nuptials of their only daughter Henrietta Eliza Sermista to William Walter Evans Floyd, at St Paul's Cathedral, on Wednesday, the 7th proximo, at [illegible] m. and thence to their residence, 22 Beniapukur Road.

Cake and Wine.

Calcutta
29th April, 1873.

এই চিঠিতে শুধু 'Babu Gour Das Bysack'—শব্দ ক'টি মাইকেল নিজের হাতে লিখেছেন।

এই পত্রটি থেকে দু'টি জিনিস জানা যায়—প্রথম, তাঁর বেনেপুকুর রোডের বাড়ির ঠিকানা; দ্বিতীয়, শর্মিষ্ঠার বিবাহের তারিখ—৭ মে, ১৮৭৩। মাইকেলের কোনো জীবনীতেই এ দু'য়ের একটাও নেই। শর্মিষ্ঠার বিয়ের তারিখ না-থাকাটা শুধু দুঃখের নয়, লজ্জারও বিষয়। শর্মিষ্ঠার বিয়ের একমাস উনিশ দিন পরে হেনরিয়েটা ও একমাস বাইশ দিন পরে মাইকেল মারা যান।

আমি ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়েই (পৃ ৪২-৪৩) প্রমাণ করেছি যে ৮৫ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি, যা এ পর্যন্ত রামমোহন রায়ের বাড়ি বলে চলে আসছে, তা রামমোহন রায়ের বাড়ি নয়। অবশ্য এ-প্রশ্ন প্রথম তোলেন ৺তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। এ-বিষয়ে তাঁর দু'টি বক্তব্য নিচে তুলে দিচ্ছি :

১. রামমোহনের আত্মীয়স্বজন ও বংশের মধ্যে এই কথাই প্রচলিত আছে যে বাড়িটি আসলে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের, রামমোহনের মৃত্যুর অনেক পরে তৈরি। এর একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ১৮৫২ সনে মারা যাবার পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় রাধাপ্রসাদের ওয়ারিশানদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পৈতৃক যৌথ বিষয়-সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার এক মামলা দায়ের করেন। ঐ মামলায় যৌথ সম্পত্তির সব ফর্দ দেওয়া ছিল। তাতে ঐ বাড়ির কোনো উল্লেখ ছিল না।

২. রামমোহন মানিকতলার বাংলো বাড়ি ২৫ বিঘে জমি ও ফলের বাগান-সমেত Mendes সাহেবের কাছ থেকে কেনেন। রামমোহনের বিলাতে যাবার সময় এই বাগানবাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু বিক্রি হয় নি। রামমোহন বিলাতে থাকাকালীন ৩।৪ টা Agency House কলকাতায় ফেল হয়। তাতে তাঁর অনেক টাকা মারা যায়। তাঁর বিলাতের খরচা পাঠান বন্ধ হয়। তখন বিলাতে তাঁর খরচ যোগাবার জন্য তাঁর মানিক-তলার বাড়ি এক আর্মেনিয়ান সাহেবের কাছে বিক্রি করা হয়। গভর্নমেণ্ট বহু পরে ঐ জমি ও বাড়ি কিনে পুলিশ অফিস করেছেন। মানিকতলার বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পর রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় আমহার্স্ট স্ট্রিটের পূর্ব-দিকে লম্বা বাড়ি তৈরি ক'রে সেখানেই থাকেন। পরে ঐ বাড়িগুলি রাম-মোহনের কাছারি বাড়ি বলে পরিচিত হয়। রমাপ্রসাদ রায় বড় উকিল হয়ে ধনশালী হলে আমহার্স্ট স্ট্রিটের পশ্চিম দিকের বড় বাড়ি তৈরি করেন যাতে এখন ধরণীমোহন রায় বাস করছেন।

এতদিন ৮৫ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটের তথাকথিত রামমোহন রায়ের বাড়ির গায়ে পাথরের ফলকে যে লেখাটি ছিল—"Here lived Raja Rammohan Roy from 1814 to 1830 A. D."—সে লেখাটি তুলে ফেলে দিয়ে একটি নতুন ফলক লাগিয়ে তাতে লিখে দেওয়া হয়েছে—This house was the family residence of Raja Rammohan Roy. Founder of, the

Brahmo Samaj. Born 1772, died 1833."। কিন্তু লেখা বদলালেই প্রমাণ হয় না যে এই বাড়ি রামমোহন রায়ের সময়ে ছিল, কিংবা তিনি এই বাড়ি কিনেছিলেন বা তৈরি করিয়েছিলেন।

বুধবার ৮ই পৌষ ১৩৩২ (ইং ২৩ ডিসেম্বর ১৯২৫) সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১১ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল :

বিদ্যাসাগর দুহিতাদের সাহায্য

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ

ডাঃ কুমারী বিধুমুখী বসু পরলোকগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যাদের জন্য সংগৃহীত শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদের ৪৫০০ শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগৎ ২৫৭ টাকা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত টাকার সুদ হইতে শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী এবং শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে মাসিক সাহায্য দেওয়া হইবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই কার্য্যের ভার গ্রহণের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং তিনি উহার সদস্য হওয়ার জন্য বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক পি. সি. মিত্র, বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল জে. আর. ব্যানার্জ্জী এবং শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসুকে আহ্বান করিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজে এই অর্থ ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ ও কমিটির অন্যতম সদস্য হইবেন।

কুমুদিনী দেবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় কন্যা। তাঁর বিবাহ হয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৭২ সালের আষাঢ় মাসে। শরৎকুমারী দেবী বিদ্যাসাগরের চতুর্থ ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যা। এঁর বিবাহ হয় কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৭৭ সালের বৈশাখ মাসে।

বিদ্যাসাগরের কন্যা কুমুদিনী চট্টোপাধ্যায়ের ৩ পুত্র—যোগীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, ও উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ৪ কন্যা—রাজরানী, হরিবালা, সুশীলা ও চারুশীলা। অন্য কন্যা শরৎকুমারী চট্টোপাধ্যায়ের মাত্র ২ পুত্র—হরিমোহন ও রামমোহন চট্টোপাধ্যায়।

—(দ্র. 'বিদ্যাসাগর', সন্তোষকুমারী অধিকারী)



পথ-পরিক্রমা : একটি অঞ্চল

এবার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্ব ফুটপাথ ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বলা বাহুল্য, আমাদের লক্ষ্য শুধু পথ নয়!

১ নং বাড়ি : মেছোবাজার স্ট্রিটের ঠিক উত্তরেই একটা পুরনো বাজার আছে। আগে এটা এক ইহুদি সাহেবের বাজার ছিল।

২ নং বাড়ি : মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার (২৩-১১-১৮২২—মার্চ ১৯০৪) বাড়ি। এই বিশাল রাজবাড়ি তৈরি করেন স্যার তারকনাথ পালিতের পিতা ৺কালিকিংকর পালিত। লাহাবাবুরা এই বাড়ি পালিত মহাশয়ের কাছ থেকে কেনেন।

৩ ও ৪ নং বাড়ি : সুবর্ণবণিক দ্বারকানাথ দত্ত বেনিয়ানের বাড়ি।

তারপর বেচু চাটুজ্জের গলি।

৭ নং বাড়ি : এই বাড়ির একতলায় সরলা দেবীর (৯-৯-১৮৭২—১৮-৮-১৯৪৫) 'লক্ষীভাণ্ডার' ও রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' (১৯০৫) কাগজের অফিস ছিল।

৯ নং বাড়ি : 'মহতাশ্রম', অনেকদিনের বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত বোর্ডিং ছিল। মালিক ছিলেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। তিনি কয়েকটি কয়লাখনির মালিক ও খুব ধনী ছিলেন। ১৮৯৪-৯৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়বার সময় হরিনাথ দে-র পিতা

এই বাড়ি ভাড়া ক'রে তাঁকে দিল্লির ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে এখানে রাখেন।

১০ নং বাড়ি : 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের (১৮৪০ ?—৯-২-১৮৯৪) বাড়ি। শেষের দিকে দেনার দায়ে তাঁকে বাড়ি বন্ধক দিতে হয়েছিল। এই বাড়িতে ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ 'মহিলা আর্ট স্টুডিও' নামে ফটোগ্রাফির দোকান খোলেন। তারপর ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র বিলেত থেকে এম. ডি., এফ. আর. সি. এস. পাশ ক'রে আসার পর ১৯০৫ সালে যখন ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঘোষের সঙ্গে তাঁর ব্রাহ্মমতে দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় তখন তিনি এই বাড়িতে বাস করতেন। তারপর এ-বাড়িতে বিশ্বভারতীর গ্রন্থবিভাগ ছিল, যা এখন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে রয়েছে।

তারপর শংকর ঘোষের লেন।

১২ নং বাড়ি : এই বাড়িতে সাহিত্যিক ৺প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর (১-১-১৮৯০—১৩-১০-১৯৬৪) পিতা মহেশচন্দ্র আতর্থী থাকতেন।

১৩ নং বাড়ি : এটি একটি শুধু বিরাট বাড়ি নয়, ঐতিহাসিক বাড়ি। ১৮৫৯ সালে শংকর ঘোষের লেনে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৬১ সালে পরিচালকদের মধ্য থেকে একটা দল বেরিয়ে এসে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি নাম দিয়ে আর একটা স্কুল স্থাপন করেন এই বাড়িতে। তখন এই বাড়ির মালিক ছিলেন গোবিন্দ গুপ্ত। সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্ত, কুঞ্জলাল গুপ্ত, হীরালাল গুপ্ত, ব্যারিস্টার মতিলাল গুপ্ত ও শ্যামলাল গুপ্ত-র পিতা ছিলেন চন্দ্রশেখর গুপ্ত। চন্দ্রশেখর গুপ্ত-র পিতা গোবিন্দ গুপ্ত। অর্থাৎ, গোবিন্দ গুপ্ত হলেন বিহারীলাল গুপ্ত-র পিতামহ। এঁদের নিবাস ২৪-পরগনা জেলার গরিফা গ্রামে। এই গ্রামে কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অনেক বিখ্যাত লোকের বাস ছিল। পরে লাহাবাবুরা গুপ্তদের কাছ থেকে এই বাড়ি কিনে নেন। কিন্তু লাহাবাবুরা দুই নম্বর বাড়ির মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা কিংবা তাঁর পুত্রগণ নন। ঠনঠনে লাহা বংশের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ৺মধুমঙ্গল লাহা। তাঁর পুত্র ৺রাজীবলোচনের ৩ পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ বা বটকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণের বংশধর মহারাজা দুর্গাচরণ, রাজা হৃষীকেশ প্রমুখ। কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের ৩ পুত্র—অভয়াচরণ, দেবীচরণ ও রামচরণ। মধ্যম দেবীচরণের আবার ৩ পুত্র—শশিভূষণ, রাসবিহারী ও বিপিনবিহারী। মেজ ও ছোট ভাই—রাসবিহারী ও বিপিনবিহারী লাহা এই ১৩ নম্বর বাড়ির মালিক ছিলেন। তাই এই বাড়িকে 'লাহাবাবুদের বাড়ি' বলা হয়।

এই বাড়িতে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি' ১৮৬১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত থাকে। ১৮৯৪ সালে ৩০নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে যায়, সেখান থেকে পরের বছর (১৮৯৫) ১৩ নং সিমলা স্ট্রিটের বর্তমান বাড়িতে আসে। ১৮৯০-৯৪ সনে কোথায় ছিল জানি না।

এই বাড়িতে ১-৪-১৮৭২তারিখে নবগোপাল মিত্র ন্যাশন্যাল স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলে সকালে ও বিকালে শিক্ষাদান করা হতো। এইসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো : ড্রয়িং ও মডেলিং, সংগীত, ব্যায়াম, এঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভেয়িং, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, অশ্বারোহণ ও বন্দুক ছোঁড়া। তখনো অস্ত্র-আইন পাশ হয় নি। এই স্কুলে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাই ব্যায়ামবীর ব্যারিস্টার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস ব্যায়াম শিক্ষা করতেন।

এই বাড়িতে ১৫-৯-১৮৭২ তারিখে নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভার অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সভার সভাপতি হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসু নিজে এই বক্তৃতা সম্পর্কে বলেছেন : "ঐ বক্তৃতা ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস ভবনে করা হয়। এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্রাহ্ম ঐ বাটীতে বাস করিতেছেন। আমি যখন বক্তৃতা করি তখন উহাতে 'হিন্দু ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন' (নামটা ভুল হয়েছে—রা. মি.) হইত। যেদিন বক্তৃতা করা হয় সেদিন লোকে লোকারণ্য। · সেইদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার অনেক মহোদয় বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন। ···বক্তৃতা করিবার সময় করতালি ঐ বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যেসকল শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই কেবল দিয়াছিলেন এমত নহে, বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান শ্রোতারা পর্যন্ত উহা দূর হইতে শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন।"

ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি উঠে গেলে ১৮৯০ সালে এই বাড়িতে তার জায়গা দখল করে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়। বার-বাড়ির একতলায় স্কুল, দোতলায় মেয়েদের বোর্ডিং। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় যে ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে-বিষয়ে দ্বিমত নেই, প্রতিষ্ঠার মাস বা তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর (৩১-১-১৮৪৭—৩০-৯-১৯১৯) চেষ্টায়। অবশ্য তাঁকে সাহায্য করেন আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস (নভেম্বর ১৮৪১—ডিসেম্বর ১৮৯৭), উমেশচন্দ্র দত্ত (১৬-১২-১৮৪০—১৯-৬-১৯০৭) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২০-৪-১৮৪৪—২৭-৬-১৮৯৮)। একমতে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মদিনে ৩১ জানুয়ারি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পাড়ার বরদানাথ হালদারের বাড়িতে আরম্ভ হয়,

পরে ১৫ মে সামনের ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে যায়। দ্বিতীয় মতে, ১৫ মে তারিখেই ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে প্রথম স্থাপিত হয়। আর একটা মত, অক্টোবর মাসে ঐ বাড়িতে স্থাপিত হয়। আমার ধারণা শেষের মতটি ভুল।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ৫৬ নং মির্জাপুর স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে যায়। আগে এই বাড়িতে থাকতেন কর্নেল ইউ. এন. (উপেন্দ্রনাথ) মুখার্জি—স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় জামাই। ভাস্কর মুখার্জি এই বাড়িতে জন্মান। তারপর এই বাড়িতে থাকেন স্যার আবদুল্লা আল্ মামুন সারওয়ার্দি (Sir Abdulla Al Mamun Sarhawardy)। এই বাড়ি থেকে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় আবার উঠে যায় তার পূর্বদিকের ব্যারিস্টার বরদা বোসের বাড়িতে। সেখান থেকে আবার সার্কুলার রোডের বর্তমান স্কুলবাড়িতে। কিন্তু একটা বইয়ে দেখছি—১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় উঠে যায় ৭০ নং হ্যারিসন রোডের বাড়িতে, সেখান থেকে সার্কুলার রোডের বাড়িতে। জানি না কোনটি ঠিক।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় থাকতেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পাড়ার একটা বাড়িতে। ১৮৮৩ সালে তিনি প্রথম দু'জন মহিলা গ্রাজুয়েটের (চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু) অন্যতম কাদম্বিনী বসুকে (৮-৫-১৮৬১—৩-১০-১৯২৩) বিবাহ করেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চোধুরী (১২-৫-১৮৬৩—২০-১২-১৯১৫) ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামের কালীনাথ রায় ওরফে শ্যামসুন্দর মুনশির পুত্র। মা জয়তারা দেবী (১৮৩৭- ৯২০ খ্রী., ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যু)। উপেন্দ্রকিশোর পিতার তৃতীয় সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র। পূর্বনাম কামদারঞ্জন। পাঁচবছর বয়সে জ্ঞাতিকাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরীর দত্তক পুত্র হবার পর নতুন নাম হয় উপেন্দ্রকিশোর। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ঐ বছরই বোধ হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে ১৮৮৫ সালে দ্বারকানাথের প্রথম পক্ষের কন্যা বিধুমুখী গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। দ্বারকানাথের দুই বিবাহ—কাদম্বিনী বসু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দ্বারকানাথের পিতার নাম কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায়, মাতার নাম উদয়তারা দেবী।

মনে হয়, দ্বারকানাথের ব্রাহ্মসমাজ পাড়ার বাড়িতেই উপেন্দ্রকিশোরের বিবাহ হয়। তারপর দ্বারকানাথ ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ভেতর-বাড়ির তেতলায় এসে সস্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। আর প্রায় একই সময়ে উপেন্দ্রকিশোরও বিধুমুখী ও তাঁর বিকলাঙ্গ রুগ্ন ছোটভাই সতীশকে নিয়ে এই বাড়িরই

দোতলায় এসে বাস করতে আরম্ভ করলেন। এ বিষয়ে সন-তারিখ কারো কাছ থেকেই পাবার উপায় নেই। আমি যেমনটা বুঝেছি তেমনটা লিখলাম। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বলে ও নারীদের সবরকম অধিকার ও উন্নতির জন্য লড়াই করতেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'অবলাবান্ধব'। অবলাবান্ধব ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন বলে হিন্দুরা এই বাড়িকে বলত 'অবলা ব্যারাক'। 'ব্যারাক' বলবার কারণ এই যে বহু হিন্দুসন্তান ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর হিন্দুসমাজ থেকে এবং পৈতৃক বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে এই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর উক্তি আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি: "এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্রাহ্ম ঐ বাটীতে বাস করিতেছেন।"

এই বাড়িতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ঘরের পাশেই একটি কি দু'টি ঘর নিয়ে থাকতেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক 'কুলিকাহিনী'র লেখক, সংস্কৃত পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচায বিদ্যারত্ন। খুব কম লোকেই জানেন যে, এই রামকুমার বিদ্যারত্ন মাইকেল মধুসূদনের সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। একদিনের ঘটনা। মাইকেল তখন জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জের উত্তরপাড়া লাইব্রেরির দোতলায় বাস করছেন এবং মুহুর্মুহু রক্তবমি করছেন। ডাক্তার, বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁকে মদ ছাড়তে বলছেন। একদিন তার পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন গেছেন কলকাতা থেকে তাঁকে দেখতে। সেটা ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকের কথা। পণ্ডিত মশাইও অবস্থা দেখে মাইকেলকে মদ ছাড়তে বলেন। সেইকথা শুনে মাইকেল বললেন, "পণ্ডিত, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। তুমি আর কখনো ওকথা বোলো না। বললে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না।" রামকুমার নিরুত্তর রইলেন।

এই রামকুমার বিদ্যারত্ন ভবঘুরে ছিলেন। তিনি কোতরঙ্গের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক অচলানন্দ পরমহংসের কন্যা জ্ঞানদা দেবীকে বিবাহ করেন। তান্ত্রিক পিতা কন্যাকে বহুকাল ব্রাহ্ম স্বামীর ঘর করতে দেন নি। একদিন জামাই লুকিয়ে শ্বশুর বাড়িথেকে স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে আসেন। তাঁর ৩টি কন্যা হয়েছিল—বড় সুষমা, মেজ সুরমা, ছোট রমা। ১৮৮৮ সালে রামকুমারের স্ত্রী মারা যান—তখন মেজ মেয়ের বয়স ৩ বছর ও ছোট মেয়ের বয়স ১ বছর। বড়মেয়ে বোর্ডিংএ থেকে লেখাপড়া করত। মেজমেয়ে সুরমাকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাতে ও ছোট মেয়ে রমাকে শিবনাথ শাস্ত্রীর হাতে সঁপে দিয়ে রামকুমার সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে যান—নাম নেন স্বামী রামানন্দ ভারতী। বড় হলে সুষমার বিয়ে হয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে। সুরমাকে (১৫-৯-১৮৮৫—২২-৮-১৯৫২) নিজের সংসারে মানুষ ক'রে উপেন্দ্রকিশোর নিজের ছোট ভাই ব্রাহ্ম প্রমদারঞ্জনের (১৯-৬-১৮৭৫—

৩০-৪-১৯৪৭) সঙ্গে বিয়ে দেন ১৯০৫ সালে। প্রমদারঞ্জন সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইণ্ডিয়া অফিসে চাকুরি করতেন। এঁদেরই কন্যা প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদার (জন্ম ১৯০৮)। রমাকে (জন্ম ১৮৮৭) মানুষ করেন শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিয়ে দেন উপেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে।

এই ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতেই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের (ডাকনাম জংলী) জন্ম হয় ২০-৮-১৮৯০ তারিখে। এই বাড়িতেই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ২৭-৬-১৮৯৮ তারিখে।

উপেন্দ্রকিশোর এই বাড়িতে থাকেন প্রায় ১০ বছর—১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই বাড়িতে জন্ম হয় তাঁর ৩ কন্যার—সুখলতা (অক্টোবর ১৮৮৬—৯-৭-১৯৬৯), পুণ্যলতা (১৮৮৯—২১-১১-১৯৭৪) ও শান্তিলতার (১৮৯৩-১৯১৪) এবং ২ পুত্রের—সুকুমার রায় (৩১-১০-১৮৮৭—১০-৯-১৯২৩) ও সুবিনয় রায়ের (১৮৯১-১৯৪৫)।

১৮৯৫ সালে উপেন্দ্রকিশোব ব্যবসার সুবিধার জন্য কাছেই শিবনারায়ণ দাসের গলির একটা অপেক্ষাকৃত বড় বাড়িতে উঠে যান। এই বাড়ির নম্বর নিয়ে গণ্ডগোল আছে। শ্রীমতী লীলা মজুমদার পুণ্যলতা দেবীর কাছে শুনে লিখেছেন ৭ নম্বর বাড়ি। প্রভাত গাঙ্গুলি আমাকে বলেন ৩২-৩৩ নম্বর বাড়ি। শ্রীমতী লীলা মজুমদার আরো লিখেছেন ১৯০০ সালে উপেন্দ্রকিশোর শিবনারায়ণ দাসের গলি ছেড়ে ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে যান। কিন্তু আমি দেখছি শ্রীমতীর কোনো কথাই ঠিক নয়, এমনকি শ্রদ্ধেয় প্রভাত গাঙ্গুলির কথাও ঠিক নয়। অবশ্য প্রভাত গাঙ্গুলির মনে সন্দেহ ছিল, তাই ৩২ কি ৩৩ নম্বর বলেছিলেন। কিন্তু আমি বাংলা ১৩০৮ সনের (ইং ১৯০১ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত) পি. এম. বাগচির ডিরেক্টারি পঞ্জিকাতে দেখছি উ ন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিবনারায়ণ দাসের গলির ৩৮।১ নম্বর বাড়িতে রয়েছেন এবং রয়েছেন ১৯০২ সাল পর্যন্ত না হলেও ১৯০১ সাল পর্যন্ত। একথা আজ পর্যন্ত কেউ লেখেন নি বা বলেন নি যে উপেন্দ্রকিশোর শিবনারায়ণ দাসের গলিতে প্রথমে ৭ নম্বর বাড়িতে, তারপর সেই গলিরই অন্য একটি বাড়িতে ছিলেন। মাত্র একটি বাড়িতেই ছিলেন বলে সকলে বলেছেন। তা যদি হ ়াহলে সে বাড়ি নিশ্চয়ই ৭ নম্বর বাড়ি নয়, ৩৮।১ নম্বর বাড়ি। তাছাড়া, এই ডিরেক্টারিতে দেখছি যে ঐ সনে ৭ নম্বর বাড়িতে বাস করছেন কেদারনাথ বসু। এই ৩৮।১ নম্বর বাড়িতে উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে সুবিমল (১৮৯৮-১৯৭৩) জন্মান।

উপেন্দ্রকিশোরের আর এক ছোট ভাই কুলদারঞ্জন (১৮৭৩-১৯৪৮ বা ১৯৫০) ব্রাহ্ম হন। তিনি চিরকাল উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে একত্রে থেকেছেন।

বিবাহ করার পর স্ত্রীকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য আলাদা সংসার পেতেছিলেন এবং স্ত্রী-বিয়োগের পর আবার ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদার সংসারে ফিরে আসেন। উপেন্দ্রকিশোর যখন ৩৮।১ নম্বর শিবনারায়ণ দাসের গলিতে থাকেন, তখন কুলদারঞ্জন থাকতেন ঐ গলিরই ২ নম্বর বাড়িতে। তিনি ব্রাহ্ম নবীন রায়ের কন্যা স্বর্ণকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের ছোট বোন মৃণালিনীর বিবাহ হয় আনন্দমোহন বসুর দাদা হরমোহণ বসুর পুত্র হেমেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে, যিনি এইচ. বোস নামে বেশি বিখ্যাত। তিনি 'কুন্তলীন' তেল, 'দেলখোস' এসেন্স ও 'তাম্বুলীন' পানের মশলা আবিষ্কার করেন। নানান জায়গায় তখন তাঁর এই বিজ্ঞাপনটি দেখা যেত :

কেশে মাখো কুন্তলীন, অঙ্গবাসে দেলখোস।
পানে খাও তাম্বুলীন, ধন্য হোক এইচ. বোস॥

—এই বিজ্ঞাপনের দু'টি পাঠান্তর আছে, যথা :

ক. কেশে মাখো কুন্তলীন, রুমালেতে দেলখোস।
পানে খাও তাম্বুলীন, ধন্য হোক এইচ. বোস॥

খ. কেশে মাখো কুন্তলীন, পানে খাও তাম্বুলীন।
অঙ্গবাসে দেলখোস, ধন্য হোক এইচ. বোস॥

প্রথম পাঠটি দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী ও বিমলাকান্ত রায়-চৌধুরী। দ্বিতীয় পাঠটি দিয়েছেন আমার ত্রিবেণী-নিবাসী বন্ধু শ্রীসুধাংশু অধিকারী।

৬৩ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটে তাঁর কুন্তলীনের দোকান ও প্রেস ছিল। তিনি সেই প্রেস থেকে 'কুন্তলীন' নামে পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাতে শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখককে 'কুন্তলীন পুরস্কার' দিতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্দির' নামে প্রথম গল্প বেনামীতে এই কুন্তলীন পত্রিকায় বেরোয় ও পুরস্কার পায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও এক গল্প লিখে কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এইচ. বোস 'কুন্তলীন' আবিষ্কার করেন ১৮৯৬ সালে। তিনি দাবি করতেন বিলিতি 'Macasser Oil' থেকে কুন্তলীন উৎকৃষ্ট। ৬ আউন্স শিশিতে তিন রকম সুগন্ধী তেল পাওয়া যেত।

মিষ্টি গন্ধ—দাম ১৲
পদ্ম গন্ধ—দাম ১৷৹
গোলাপ গন্ধ—দাম ২৲
(দ্র. ২৫-৭-১৮৯৬ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।)

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী মশাই আমাকে এইচ. বোসের আর একটি কৃতিত্বের কথা জানিয়েছেন। এইচ. বোস গ্রামোফোনের গোল (disc) রেকর্ড আবিষ্কারের

আগে, অন্তত এদেশে আসার আগে চোঙ্গা (cylinder) রেকর্ডে অনেক গান তুলেছিলেন,বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের। আমি একথাটি জানি। সেরকম চোঙ্গা রেকর্ডে ছেলেবেলায় গানও শুনেছি। সেযুগে গানের কলকে গ্রামোফোন বলা হতো না, বলা হতো ফনোগ্রাফ, বাংলায় 'কলের গান'।
যখন উপেন্দ্রকিশোর শিবনারায়ণ দাসের গলিতে ৩৮।১নম্বর বাড়িতে থাকতেন, তখন এইচ. বোস সস্ত্রীক থাকতেন ঐ গলির ৬ নম্বর বাড়িতে। পরে তিনি টাকাকড়ি ক'রে ৫২ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটে নিজের বাড়ি ক'রে বাস করেন। তাঁর সবসুদ্ধ ১৪টি ছেলেমেয়ে হয়েছিল।
উপেন্দ্রকিশোরের দাদা, মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ (১৯০৯-২৫) ও বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার জনক সারদারঞ্জন রায় ১২-২-১৮৫৮—১৫-৭-১৯২৫) ও উপেন্দ্রকিশোরের পরের ছোটভাই মুক্তিদারঞ্জন রায়, মেট্রোপলিটান কলেজের গণিতের অধ্যাপক ও বড় ক্রিকেট খেলোয়াড়—এই দুই ভাই ব্রাহ্ম হন নি। সারদারঞ্জন রায় ছিলেন এম.এ. বিদ্যাবিনোদ। গণিতে এম.এ., কিন্তু অসাধারণ ভালো সংস্কৃত জানতেন। গণিত ও সংস্কৃত—দুই বিষয়ই পড়াতেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর অন্য তারিখও পাওয়া যায়—যথা, জন্ম ২৪-৫-১৮৫৮ ও মৃত্যু ১-১১-১৮৫৮ তারিখে। মৃত্যু হয় দেওঘরে। তিনি ৬৭ বছর বয়সেও ক্রিকেট খেলতেন ও গড়ের মাঠে দৌড়তেন। আলিগড়, ঢাকা ও মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। শেষোক্ত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত।
মুক্তিদারঞ্জন রায় এম. এ.। মেট্রোপলিটান কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। মৃত্যু হয় ১৯৩৪ সালে। গায়ে অসম্ভব জোর ছিল। দাদার মতো ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল মশাই বলেছেন—সারদারঞ্জন ও মুক্তিদারঞ্জন ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, তাঁদের এক হাতে ছিল বই, অন্য হাতে ব্যাট।
এই দুই ভাই বিবাহের পূর্বে এবং বিবাহের পরেও একসঙ্গে ছিলেন। কিন্তু দুইজনের স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় দাদার উপদেশে মুক্তিদারঞ্জন শেষকালে আলাদা থাকতেন। সারদারঞ্জন থাকতেন আমহার্স্ট রো-তে এবং মুক্তিদারঞ্জন আলাদা হয়ে ছিলেন প্রথমে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে ও পরে বিপ্রদাস স্ট্রিটে। উপেন্দ্রকিশোরের গড়পারের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর বিধুমুখী মুক্তিদারঞ্জনের বাড়িতে গিয়ে থাকেন ও সেখানেই মারা যান। মুক্তিদারঞ্জনের স্ত্রীর নাম ছিল কুণ্ডলিনী।
অনেক পরের কথা আগে বলে ফেললাম। এখন ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের লাহাবাবুদের বাড়িতে ফিরে আসা যাক। আগেই বলেছিএই বাড়িতে উপেন্দ্র-

কিশোরের শ্বশুর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭-৬-১৮৯৮ তারিখে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছেলেমেয়ে নিয়ে ৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের সদ্য-প্রাপ্ত নিজস্ব বাড়িতে উঠে যান। তাঁরা উঠে গেলে 'ভারত সংগীত সমাজ' ১৮৯৯ সালে ঐ বাড়িতে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি থেকে উঠে আসে। তারপরে পশ্চিম দিকের পরিচিত বাড়িতে (২০৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে) উঠে যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতসংগীত সমাজ' সর্বপ্রথম স্থাপন করেন কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে। অল্পদিন পরেই দলাদলি আরম্ভ হলে ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে স্থানান্তরিত করেন। বিপক্ষীয়রা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে 'সংগীত সমিতি' স্থাপন করে। তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

এইমাত্র বললাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কাদম্বিনী দেবী পুত্রকন্যা নিয়ে ৬ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের সদ্য-প্রাপ্ত বাড়িতে উঠে যান। 'সদ্য-প্রাপ্ত' বলবার কারণ এই। ৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ি ও মুরারি পুকুরের বাগানবাড়ির (যার নাম পরে 'বোমার বাগান' হয়) মালিক ছিলেন মুচি হেমচন্দ্র দাস। তিনি মস্ত ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। মণিপুরের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। ১৮৯১ সালে মণিপুরের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসির পর মণিপুরের কাছ থেকে তাঁর কয়েক লক্ষ টাকার পাওনা আদায় না হওয়ায় তাঁর ব্যবসা ফেল হয়। তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ৬ হাজার টাকা ধার করেছিলেন। শোধ করতে না পেরে তাঁর বসতবাড়ি (৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন) দ্বারকানাথকে লিখে দেন। নিজে মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে গিয়ে বাস করেন। পরে এই বাগানবাড়ি শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ (কে. ডি. ঘোষ) তাঁর কাছ থেকে কেনেন।

১৯০১ সালে উপেন্দ্রকিশোর ৩৮।১ নম্বর শিবনারায়ণ দাসের গলি থেকে উঠে ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে বাস করেন। এই বাড়ির পূর্ব অংশের নিচে 'কান্তিক প্রেস'ও দোতলায় 'ভারতী' পত্রিকার অফিস ও আড্ডা ছিল। পশ্চিম অংশের একতলায় ছিল উপেন্দ্রকিশোরের প্রেস ও দোতলার দক্ষিণ অংশে তিনি সপরিবারে থাকতেন। শ্রীমতী লীলা মজুমদার লিখেছেন, থাকতেন দোতলায় ও তেতলায়। এই বাড়িতে এসে উপেন্দ্রকিশোর নিজের ব্যবসার নাম দেন 'ইউ রয় অ্যাণ্ড সন্স।' ওখান থেকেই তিনি ১৯১৩ সালে 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানে তিনি কতদিন ছিলেন? শ্রীমতী লীলা মজুমদার বলেছেন, ১৯১৪ সালে উপেন্দ্রকিশোর গড়পারে বাড়ি ক'রে উঠে যান। প্রভাত গাঙ্গুলি বলেছেন, তিনি ১৯১৪ সালের শেষ পর্যন্ত সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে ছিলেন। এই বাড়িতেই সুরমা, সুখলতা, পুণ্যলতা, শান্তিলতা ও সুকুমার রায়ের বিয়ে হয়। সুরমার বিয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। সুখলতার বিয়ে হয় উড়িষ্যার বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা মধুসূদন রাওয়ের পুত্র ডাঃ

জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে, পুণ্যলতার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে, শান্তিলতার হেমন্তকুমারী চৌধুরীর পুত্র প্রভাতচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে, সুকুমার রায়ের ঢাকার সাধু কালীনারায়ণ গুপ্ত-র নাতনি, স্যার কে.জি. গুপ্তের ভাগনি, জগৎ দাসের কন্যা সুপ্রভা দাসের সঙ্গে। এঁরই ছোটবোন বিখ্যাত গায়িকা কনক দাস।

এই বাড়িতে সুরমার বড়ছেলে প্রভাতরঞ্জন ও বড়মেয়ে সুলেখার জন্ম হয়। ভাই কুলদারঞ্জন স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক পুত্র করুণারঞ্জন ও দুই কন্যা মাধুরীলতা ও ইলাকে নিয়ে এই বাড়িতে এসে দাদার সঙ্গে থাকেন।

এখান থেকে ১৯১৪ বা ১৯১৫ সালের গোড়ায় উপেন্দ্রকিশোর ১০০ নম্বর গড়পার রোডে নিজের নকশা অনুযায়ী বাড়ি তৈরি ক'রে উঠে যান। সেই বাড়ির পূর্বদিকে ছিল এক স্কুল—এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশন ও পশ্চিমদিকে মূকবধির বিদ্যালয়েরখেলার মাঠ। এই বাড়িতে থাকতেই সুবিনয় রায়ের বিবাহ হয় মধ্যপ্রদেশের ডাক্তার লক্ষ্মী চৌধুরীর কন্যা পুষ্পলতার সঙ্গে। সুবিনয় জিওলজিক্যাল সার্ভে(Geological Survey of India)-তে কাজ করতেন। এই বাড়িতেই উপেন্দ্রকিশোর ২০-১২-১৯১৫ তারিখে মারা যান। এই বাড়িতেই ১৯২১সালে শ্রীমান সত্যজিৎ রায়ের জন্ম হয় এবং এই বাড়িতেই সুকুমার রায় ১০-৯-১৯২৩ তারিখে মারা যান। কারবার ইউ. রয় অ্যাণ্ড সন্স ও 'সন্দেশ' পত্রিকা হস্তান্তরিত হয়। সুবিনয় রায় কিছুদিন 'সন্দেশ' চালান। তারপর বছর দুয়েকের মধ্যে গড়পারের বাড়িও বিক্রি হয়ে যায়। এখন সে-বাড়িতে রয়েছে এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশন।

ঘুরতে ঘুরতে অনেকদূর চলে . :য়েছি। ফের কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ফেরা যাক।

২০নং বাড়ি : এখন এখানে আর্য সমাজে' কন্যা বিদ্যালয় আছে। এই জায়গায় আগে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর অফিস, মজুমদার লাইব্রেরি ও কান্তিক প্রেস ছিল। পরে কান্তিক প্রেস এখান থেকে উঠে ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে যায়।

এরপর শিবনারায়ণ দাসের গলি।

২২নং বাড়ি : ফণীন্দ্রনাথ পালের 'যমুনা' পত্রিকার অফিস ছিল।

এরপরেই সুকিয়া স্ট্রিট (বর্তমানে কৈলাস বসু স্ট্রিট)। এবার রাস্তা পার হয়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ধরে দক্ষিণমুখে যাওয়া যাক।

২০৯নং বাড়ি : ভারত সংগীত সমাজ। এই সমাজ ১৮৯৯ কিংবা ১৯০০ সালে ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে এখানে উঠে আসে তা আগেই বলা হয়েছে।

এই বাড়িতে ১৯০৫ সালে 'জাতীয় বয়ন বিদ্যালয়' (National Weaving School স্থাপিত হয়।

১৬-১০-১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের দিন বিকালবেলায় বাগবাজারে ৺পশুপতি বোসের বাড়ির মাঠে এক বিরাট সভা ক'রে স্বদেশী তাঁত চালাবার জন্য জাতীয় ফণ্ডে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সভাতেই ৫০ হাজার টাকা ওঠে, পরে আরো ২০ হাজার টাকা তোলা হয়। এই টাকা দিয়ে ভারত সংগীত সমাজের এই বাড়িতে ১০-১২-১৯০৫ তারিখে জাতীয় বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের পৌত্র বাবু প্রভাসচন্দ্র মিত্র।

বিখ্যাত ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত ও অন্যান্যরা এইকাজে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন। প্রায় ৪০০ চরকা তৈরি করা হয়, অনেক ঠক্‌ঠকি তাঁত ও কয়েকটা হ্যাটার্সলি তাঁত কেনা হয়। প্রায় ৪০০ ভদ্রলোকের ছেলে চরকার সুতোকাটা ও তাঁতে কাপড়বোনা শেখবার জন্য এই স্কুলে ভর্তি হয়। তারা মনে করেছিল চরকায় সুতো কেটে ও তাঁতে কাপড় বুনে তারা রোজ ২।৩ টকা রোজগার করতে পারবে। চারমাস পরীক্ষার পরে দেখা গেল চরকায় সুতো কেটে রোজ দু'আনার বেশি রোজগার করতে পারে না। আর, যারা কাপড় বোনায় দক্ষ হয়েছিল তারাও প্রতিদিন আট আনার বেশি রোজগার করতে পারত না। সুতরাং ৪।৫ মাস পরেই সমস্ত ছাত্র চলে গেল। চরকা ও তাঁত পড়ে রইল। তারপর গালচে বোনার চেষ্টা হয়েছিল। তাতেও লাভ হল না। কাজে কাজেই বয়ন বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। চরকা ও তাঁত বিক্রি ক'রে চার-পাঁচশো টাকার বেশি পাওয়া যায় নি।

এই বাড়িতেই পরে 'বংশ পরিচয়'-এর লেখক ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার বাস করতেন ও এখান থেকেই ৩ খানা পত্রিকা সম্পাদন করতেন। পত্রিকাগুলির নাম—প্রজাপতি, মজলিস ও শ্রীরামপুর। 'প্রজাপতি' অফিস ও প্রেস এই বাড়িতেই ছিল।

২১০নং বাড়ি : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পাড়া। এই পাড়ার জমি খরিদ করেন আনন্দ-মোহন বসু কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবারের বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরি করবার উদ্দেশ্যে। এই পাড়ায় নিম্নলিখিত বাড়িগুলি আছে—

১ম বাড়ি॥ গুরুচরণ মহলানবিশের ২১০।১ নম্বর। এই বাড়িতে তাঁর ওষুধের দোকান ছিল। এঁর দ্বিতীয় পুত্র ৺প্রবোধ মহলানবিশ সে-দোকান তুলে দিয়ে ডাঃ নীলরতন সরকারের সঙ্গে মিলে চৌরঙ্গি রোডে এক খেলাধূলার সরঞ্জামের দোকান খোলেন 'কার-মহলানবিশ' নামে। এই 'কার' শব্দটি এসেছে 'সরকার'-এর শেষ দুই অক্ষর থেকে। প্রবোধ মহলানবিশ ছিলেন

স্যার নীলরতন সরকারের ভগ্নীপতি। তিনি ডাঃ সরকারের ভগ্নী নীরদকামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। এঁদেরই পুত্র জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

কার-মহলানবিশের মতো আদিতে 'কার' শব্দযোগে আরো দু'টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কলকাতায় ছিল। একটি ছিল অনেক আগে 'কার-টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি'। দ্বারকানাথ ঠাকুর উইলিয়াম কার (Carr), উইলিয়াম প্রিন্সেপ-আদি কয়েকজন ইংরেজকে অংশীদার ক'রে এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। আর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল কার-মহলানবিশের প্রায় সমসাময়িক—'কার তারক অ্যাণ্ড কোম্পানি'। প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল—তারক সরকার। এখানে 'কার' কোনো ইংরেজের উপাধি নয়, তারক সরকারের নিজেরই বংশোপাধির শেষাংশ—(সর) কার তারক। তারক সরকারের বাড়ি ছিল বিডন স্ট্রিটে। এঁর ৩ ছেলে—বিপিনবিহারী, নলিনবিহারী ও পুলিনবিহারী সরকার। বড় ছেলে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে সাহেব পাড়ায় বাড়ি ক'রে বাস করেন। মেজ-ছেলে পৈতৃক বাড়ি পান। তিনি কলকাতার শেরিফ, কলকাতা মিউনিসি-প্যালিটির কমিশনার এবং আরো অনেক কিছু হয়েছিলেন। এঁর নামে গ্রে-স্ট্রিটের উত্তরে একটি গলি আছে—নলিন সরকার স্ট্রিট। ছোট ছেলে পৈতৃকবাড়ি ছেড়ে মানিকতলা স্ট্রিট ও মদন মিত্র লেনের মোড়ে বাড়ি করেন।

২য় বাড়ি ॥ ২১০।১-বি নম্বর। জগৎলক্ষ্মী নার্সের। তাঁর স্বামী বিপিনবিহারী রায়।

৩য় বাড়ি ॥ ২১০।১।১ নম্বর। ক্ষীরোদ রায়চৌধুরীর। ইনি ছিলেন কটকের নামমাত্র উকিল, আসলে কটক কলেজের অধ্যক্ষ।

৪র্থ বাড়ি ॥ ২১০।২ নম্বর। হরকুমার রায়চৌধুরীর।

৫ম বাড়ি ॥ ২১০।২ বি নম্বর। নীলমণি ধরের। তাঁর জামাতা ভবসিন্ধু দত্ত (সুবর্ণ বণিক) এই বাড়িতে থাকতেন।

৬ষ্ঠ বাড়ি ॥ ২১০।২।১ নম্বর। অধর মজুমদারের।

৭ম বাড়ি ॥ বিপিন রায়ের ভাই কেদারনাথ রায়ের। বাড়ির নম্বর ২১০।৩।১। এই বাড়িতে থাকতেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লোকনাথ মৈত্র (কাশীর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের পিতা এবং নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর হোমিওপ্যাথি শিক্ষক) এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই বাড়িতেই ছিল শেষোক্তের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর অফিস। এই দুই পত্রিকা বৈশাখ ১৯০৮ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৯২৪ পর্যন্ত এই বাড়ি থেকেই বেরোয়। প্রবাসী-র নিজস্ব প্রেস স্থাপিত হয় ১৯২৪ সনের আষাঢ় মাসে ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে। তখন থেকে পত্রিকা দু'খানি এই শেষের ঠিকানা থেকে বেরোতে থাকে। রামানন্দবাবুও এই

বাড়িতে উঠে যান। এই ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থাকতেন এবং এই বাড়িতেই বেঙ্গল কেমিক্যাল (Bengal Chemical & Pharmaceutical Works) স্থাপিত হয়।

৮ম বাড়ি ॥ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাড়ির নম্বর ২১০।৩।২। এই বাড়িতে তিনি 'দেবালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। সীতানাথ (দত্ত) তত্ত্বভূষণ এই বাড়ির তেতলায় থাকতেন।

৯ম বাড়ি ॥ দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর। ২১০।৪ নম্বর বাড়ি। এখানেই তাঁর 'নব্যভারত' পত্রিকার অফিস ছিল। 'নব্যভারত' প্রেস ছিল ১।১ নম্বর শংকর ঘোষ লেনে।

১০ম বাড়ি ॥ দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর। পরে প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর (দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর পুত্র, ব্যারিস্টার ও শ্রমিকনেতা)। এই বাড়ির নম্বর ২১০।৫, নাম 'আনন্দ আশ্রম'।

বরদানাথ হালদার এই বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী নং ২১০।৪ ও ২১০।৫—এই দুই বাড়িরই মালিক ছিলেন। বরদানাথ হালদার ছিলেন বাসন্তী দেবী ও ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদারের পিতা। তিনি আসামের বিজনি এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন।

২১১ নং বাড়ি: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির, পেছনে উঠোন, তার পেছনে প্রচারাশ্রম, যেখানে পরে শাস্ত্রীমশাইয়ের সাধনাশ্রম হয়। এখন ঐ বাড়ির নাম 'শিবনাথ স্মৃতিভবন'। তার একতলায় 'সাধনাশ্রম', দোতলায় 'মহিলা ভবন'। এই সমস্ত জমিও আনন্দমোহন বসু কেনেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির করবার জন্য।

এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণের একটু ইতিহাস দেওয়া যাক। ২৪-৩-১৮৭৮ তারিখে কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির ত্যাগ ক'রে চলে আসবার পর 'সমদর্শী' ও 'সমালোচক'-এর দল (অর্থাৎ যাঁরা পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন) ঐ মন্দিরের পাশেই ব্রাহ্ম ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে কিছুদিন উপাসনা করেন। কিছুদিন বাদে ৪৫ নম্বর বেনেটোলা লেনের একটি ভাড়া-করা বড় ঘরে সাপ্তাহিক উপাসনা চলতে থাকে।

১৫-৫-১৮৭৮ তারিখে টাউন হলের এক সভায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' থেকে আলাদা এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, যার নাম পরে দেওয়া হয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই উপাসনার জন্য মন্দির তৈরির চেষ্টা শুরু হয়। জমি কেনবার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ হাজার টাকা দেন এবং অনেকে নিজের এক মাসের আয় দান করেন। ঐ টাকা দিয়ে জমি কিনে ১৮৭৯ সনের মাঘোৎসবের দিন (২৩-১-১৮৭৯) মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন শিবচন্দ্র দেব।

৬-১-১৮৭৯ তারিখে ১৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটে 'সিটি স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে সেটি সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মদের সবরকম কাজের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই স্কুলের একটি ঘরে ব্রাহ্মসমাজের অফিস উঠে আসে। তাছাড়া এখানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনও হতে থাকে।

মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সময় আনন্দমোহন বসুর শ্বশুর ভগবানচন্দ্র বসু ছুটিতে ছিলেন। তিনি এই মন্দির তৈরির ভার নিলেন। রুরকি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করা বড় এঞ্জিনিয়ার বাবু নীলমণি মিত্র বিনা পয়সায় প্ল্যান ইত্যাদি ক'রে দেন।

১৮৮০ সনের মাঘোৎসব আধা-তৈরি মন্দিরের মধ্যেই করা হয়। আশা করা গিয়েছিল যে ১৮৮১ সনের মাঘোৎসব সম্পূর্ণ-তৈরি মন্দিরের মধ্যেই হবে। কিন্তু ১৮৮০ সনের আগস্ট মাসে দেখা গেল যে বাকি কয়েক মাসের মধ্যে বাদবাকি কাজ শেষ হওয়া মুশকিল। তার ওপর ভগবানচন্দ্র বসু অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

তখন কমিটি গুরুচরণ মহলানবিশ ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ওপর আগামী মাঘোৎসবের আগেই মন্দির তৈরি করার ভার দেন। শাস্ত্রীমশাই যখন ভবানীপুর সাউথ-সুবারবন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, তখন ২৪-পরগনার ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়েছিল। রাধিকাপ্রসাদ ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাকা। শাস্ত্রীমশাই মুখুজ্জে মশাইকে গিয়ে ধরলেন। তাঁর সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে ঠিক সময়েই মন্দির তৈরি হয়ে গেল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির তৈরি করতে ৪৫ হাজার টাকা খরচ পড়েছিল :

১৮৮১ সনের ১০ই মাঘ (ইং ২২-১-১৮৮১) ৪৫ নম্বর বেনেটোলা লেন থেকে নগরকীর্তন ক'রে এসে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। সাধনাশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন ডাঃ পি. কে. রায় ২৫-১-১৯২১ তারিখে এবং লাইব্রেরি ও মহিলাভবন-এর ভিত্তি স্থাপন করেন লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ৩০-১-১৯২৫ তারিখে।

তা তো হল, কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে ঐ জায়গায় কী ছিল? স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, ১৮৬০-৭০ সনে ওখানে ঠনঠনের ঘোষেদের পুকুর ছিল। ঘোষেদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে অনেক-বার তাঁরা এই পুকুরে মুখ ধুয়েছেন। পুকুর ভরাট হয়ে মাঠ হলে ন্যাশনাল নবগোপাল মিত্র জিমন্যাস্টিকের আখড়া খোলেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) এই আখড়ায় বার-এর খেলা শিখতেন।

এখানে যে নবগোপাল মিত্রের জিমন্যাস্টিকের আখড়া ছিল তা প্রমাণিত হয় এই থেকে যে এখানে ২৩-১-১৮৭৯ তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের

ভিত্তি স্থাপনের পরেও ১৫-২-১৮৭৯ তারিখে রাজা বদনচাঁদের টালার বাগানে হিন্দুমেলায় যোগ দিতে যাবার জন্য এখান থেকে মিছিল বেরোয়। "বেলা সার্দ্ধ নবম ঘটিকার সময় ২১১ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীট হইতে মহা সমারোহে মেলাস্থলে যাত্রা আরম্ভ হয়। পতাকা, আশাসোঁটা লইয়া এবং জাতীয় কীর্ত্তন করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাতা এবং হিতসাধকগণ বরাবর মেলার স্থানে গমন করেন। এতদ্দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত ও অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ বাটীর গবাক্ষাদি হইতে দেখিতে থাকেন।"

রাজা বদনচাঁদ ওরফে রাজা বৈদ্যনাথ রায়। মূল রিপোর্টেই টালার বাগান বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা ভুল। হবে কাশীপুরের বাগান। কাশীপুর গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরি রোড ও ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডের মোড়ে এখনো সেই বাগানবাড়ি আছে। টালায় রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কোনো বাগান ছিল না।

২১২নং বাড়ি : সার্জন মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের (২৭-৫-১৮৬৭ — ৫-১০-১৯৩৪) নিজের বসতবাড়ি ছিল। Lister Anti-septic & Dressing Co. Ltd. নামক কারবারে লোকসান খেয়ে দেনা শোধ করবাব জন্য এই বাড়ি বিক্রি ক'রে তিনি ১০নং নিউ পার্ক স্ট্রিটে বাড়ি করেন। সেই বাড়িতেই তিনি মারা যান।

২১৪নং বাড়ি : ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র ক্যাম্বেল স্কুলে সার্জারি শিক্ষক হয়ে বহরমপুর থেকে কলকাতায় এসে এই বাড়িতে থাকেন।

২১৬ নং বাড়ি : এ বাড়িতে অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল (জে. এল.) ব্যানার্জি ও ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার জামাই গিরিজা মুখার্জি থাকতেন। এই বাড়িতে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য অল্পদিন ছিলেন। চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার এম. এন. (মণীন্দ্রনাথ) বোস, যিনি পরে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তাঁরও চেম্বার এই বাড়িতে কিছুদিন ছিল। ইনি ছিলেন অ্যাটর্নি ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভাইপো।

২১৭ নং বাড়ি : এই বাড়িটি চিহ্নিত ক'রে রেখে দেওয়া উচিত। এই বাড়িতে অনেকজন খ্যাতনামা ডাক্তার বিভিন্ন সময়ে বাস ক'রে গেছেন। যথা— স্যার নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র ও নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

২২৩ নং বাড়ি : শিল্পী ভবানীচরণ লাহার বাড়ি। এ বাড়ি তিনি তৈরি করেন নি, করেছিলেন তাঁর পিতামহ শ্যামাচরণ লাহা (১৮২৫-৯১)। শ্যামাচরণের পুত্র চণ্ডীচরণ লাহা। চণ্ডীচরণের পুত্র ভবানীচরণ লাহা। শ্যামাচরণ লাহার দেওয়া ৬৫ হাজার টাকায় মেডিক্যাল কলেজের পুরনো চোখের হাসপাতাল বাড়ি ১৮৯১ সনে তৈরি হয়। নতুন চোখের হাসপাতাল বাড়ি ১৯২৬ সনে

তৈরি হবার পর থেকে সেই বাড়িতে কান, নাক, গলা, বুক, চামড়া ও দাঁতের রোগীদের বহির্বিভাগ রয়েছে।

আমাদের কর্নওয়ালিস স্ট্রিট পরিক্রমা এখানেই শেষ হল।

এখন ঢোকা যাক শিবনারায়ণ দাসের গলির ভেতর। এই গলির ২ নং, ৬ নং ও ৩৮।১ নং বাড়ির ও তাদের বাসিন্দাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। এখন বাদ-বাকিদের কথা বলা যাক।

প্রথমেই যাঁর নামে গলি সেই শিবনারায়ণ দাস কে ছিলেন তা জানা দরকার। এই দাসবংশ জাতিতে কায়স্থ। এঁদের প্রত্যেকের নামের দ্বিতীয় অংশ 'নারায়ণ'—কুমার বা নাথ নয়। এর একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। আমি আগে 'রাজমন্দির'-এর কথা বলেছি। ঐ বাড়ির নিচের তলায় 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি ক্লাব' (Field and Academy Club) ও ওপরতলায় মেস ছিল তাও বলেছি। ঐ বাড়ির সামনে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ওপর ফাঁকা পান্তীর মাঠ ছিল। সেই মাঠ দিয়ে ঢুকলে এই বাড়ির নম্বর ছিল ১৬ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিট। সেদিকটা ছিল এই বাড়ির সামনের দিক। আর শিবনারাযণ দাসের গলিতে এর পেছন দিক। পেছনদিকে এই বাড়ির নম্বর হচ্ছে—৮ শিবনারায়ণ দাসের গলি। বাড়ির নাম 'রাজমন্দির' রাখবার কারণ এই যে বাড়িটি তৈরি করেছিলেন ও তাতে বাস করতেন রাজনারায়ণ দাস। এই রাজনারায়ণ দাস ছিলেন শিবনাবায়ণ দাসের পুত্র। এই বংশ বরাবরই মস্ত ধনীবংশ। এঁদের এ অঞ্চলে অনেক ্াবর সম্পত্তি ছিল। ১৮৮৫ সনের আগেই রাজনারায়ণ দাস মারা যান। তাঁর পুত্র মহেন্দ্রনারাযণ দাস। তিনি রাজমন্দিরের, পান্তীর মাঠের ও শংকর ঘোষের লেনে ্ চুর জমির মালিক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মশাই ১৮৮৫ সনে এঁর কাছ থেকে শংকর ঘোষের লেনে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও কলেজের বাড়ি তৈরি করবার জন্য ১ বিঘে ১১ কাঠা জমি ৩০ হাজার টাকায় খরিদ করেন। এই জমি বিক্রির পরেও এই জমির উত্তরে ও পুর্বে মহেন্দ্রনারাযণ দাসের আরো অনেক জমি ছিল। ১৯০৬ সনেও তিনি বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যা্ অ্যাটর্নি ও কংগ্রেস নেতা ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসুর শ্বশুর। মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ব্রজেন্দ্রনারাযণ দাস—ভূপেন্দ্রনাথের শ্যালক—অসম্ভব ঢ্যাঙা লোক ছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি শ্যামবাজারে ভগ্নীপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে আড্ডা দিতেন, কিন্তু থাকতেন ঐ বাড়ির উল্টোদিকে যে টানা লম্বা বাড়ি আছে সেই বাড়িতে। তিনি পাটের ব্যবসা করতেন। তাহলে এঁদের বংশ পরম্পরা এইভাবে পাচ্ছি—প্রথম শিবনারায়ণ দাস, তাঁর পুত্র রাজনারায়ণ দাস, তাঁর পুত্র ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দাস।

হিন্দু কলেজ ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ কলেজ লাইব্রেরির হলের দেওয়ালে একটি বড়, সুন্দর শাদা পাথরের ফলক বসিয়ে তার ওপর পাঁচ জন লোকের নাম খোদাই ক'রে রেখেছেন এই জন্য যে, এই ৫ জন সবচেয়ে বেশি টাকা দান ক'রে হিন্দু কলেজ স্থাপন সম্ভব করেছিলেন। সুতরাং এই পাঁচজনই হিন্দু কলেজর স্থাপয়িতা। তাঁদের নাম এই :

১. হিজ হাইনেস বর্ধমানের মহারাজা।

বর্ধমানের মহারাজার নাম লেখা নেই। ১৮১৬ সনে বর্ধমানের মহারাজা ছিলেন তেজচন্দ্র বাহাদুর। কিন্তু তিনি দেশীয় রাজ্যের সামন্তরাজা ছিলেন না, খুব বড় হলেও জমিদার মাত্র। জমিদারের উপাধি 'হিজ হাইনেস' হতে পারে না। অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের মহাপণ্ডিত কর্তৃপক্ষগণ এতবড় একটা ভুল কী ক'রে করলেন!

২. বাবু গোপীমোহন ঠাকুর।

স্বনামধন্য পুরুষ, পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

৩. বাবু জয়কিষণ সিংহ।

ইংরেজি কায়দায় 'জয়কিষণ' লেখা হয়েছে। নাম জয়কৃষ্ণ। ইনি জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশের আদি পুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পুত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ। মৃত্যু ১৮২০।

৪. রাজা গোপীমোহন দেব।

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পোষ্যপুত্র ও রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা।

৫. বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস।

এই গঙ্গানারায়ণ দাস কে? কোনো হিন্দু কলেজের ছাত্র, হিন্দু কলেজের ইতিহাস লেখক কিংবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস লেখক এই ব্যক্তি সম্পর্কে একটি কথাও লেখেন নি। এমন কি, তিনি কে—এই প্রশ্নও তোলেন নি। সকলেই চুপ। কেন? কারণ তাঁরা জানেন না। ইনি এই শিবনারায়ণ দাসের পূর্বপুরুষ। আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। খুব ধনী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে আর ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছিলেন। তাছাড়া আঠারো শতকের শেষ ভাগের দু'টো দলিল থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে সম্পূর্ণ সাহেবপাড়া লালদীঘি অঞ্চলে যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাঙালির স্থাবর সম্পত্তি ছিল তাঁদের মধ্যে ইনি একজন। একটি দলিলের তারিখ ১৩-১২-১৭৮৬। এই দলিল থেকে জানা যায় ঐ তারিখে বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস ডালহৌসি স্কোয়ারে পুরাতন দুর্গের অদূরে গঙ্গার ধারে এক সাহেবের ৬৪ কাঠা জমি-সমেত একটি দোতলা বাড়ি

বন্ধক রেখে সাহেবকে ২০ হাজার টাকা ধার দেন। দ্বিতীয় দলিলের তারিখ ১০-১১-১৭৮৭। এই দলিলে দেখা যায়, ফিলিপ মিলনার ডেকার্স (যার নামে ডেকার্স লেন) ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে ৪ বিঘে ১০ কাঠা জমি-সমেত একটি বসতবাড়ি বাবু গঙ্গানারায়ণ দাসকে বিক্রি করেছেন।

গঙ্গানারায়ণ দাসের পুত্রের নাম কমলাকান্ত দাস। মাত্র এঁরই নামের দ্বিতীয় অংশে 'নারায়ণ' শব্দ নেই। কমলাকান্ত দাসের পুত্র শিবনারায়ণ দাস। কিন্তু আমাদের লেখকেরা ব্যক্তিবিশেষের নামের আদি ও অন্ত্যপদ সম্বন্ধে যতটা সতর্ক, মধ্যপদ সম্পর্কে ততটা সতর্ক থাকেন না। ফলে মধ্যপদ অনেক সময়েই ভুলভাবে লেখা হয়। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে, মহেন্দ্রনারায়ণ ও ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দাসকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথ দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ দাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'রাজমন্দির' বাড়িটির বর্তমান নম্বর ৮।এ, শিবনারায়ণ দাস লেন। বিদ্যাসাগর কলেজ, বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজ ও বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ— এই ৩টি কলেজের কর্তৃপক্ষ শংকর ঘোষের গলির বর্তমান কলেজ বাড়িগুলিতে স্থান সংকুলান হয় না বলে অতিরিক্ত স্থানের ব্যবস্থার জন্য জমি-সমেত এই জীর্ণ 'রাজমন্দির' বাড়িটি ১৯৩৩ সালে কেনেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে বাড়ি-ভাঙা হয় নি বা তার জায়গায় নতুন বাড়ি তৈরি হয় নি।

রামদুলাল দে সরকারের মতো গঙ্গানারায়ণ দাসের পুরো উপাধি ছিল গঙ্গানারায়ণ দাস সরকার। রামদুলালের বংশধরেরা যেমন 'সরকার' উপাধি ত্যাগ করেছেন, গঙ্গানারায়ণের বংশধরেরাও তেমন 'সরকার' উপাধি ত্যাগ করেছেন। লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ এঁকে শুধু গঙ্গানারায়ণ দাস বলেছেন, আবার কেউ কেউ গঙ্গানারায়ণ সরকার বলেছেন।

ইনি প্রথমে অনেক ইংরেজ রাজকর্মচারীর অধীনে চাকুরি করেছিলেন। শেষে চাকুরি করতেন পামার কে ম্পানিতে। থাকতেন জোড়াবাগানে। চৌরঙ্গি রোডের দক্ষিণ প্রান্তের পূর্বদিকে এঁর বাগান, বস্তি ও বাজার ছিল।

এবার দেখা যাক শিবনারায়ণ দাসের লেনে কোন বাড়িতে কে বা কারা থাকতেন।

৮নং বাড়ি : 'রাজমন্দির'। এখানে জুন ১৯০৫ থেকে জুন ১৯০৬ পর্যন্ত ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৫-৬-১৮৬৫—১৯৪৮) ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১১-২-১৮৬১—২৭-১০-১৯০৭) ছাত্রদের মেস চালান। ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সতীশ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভক্ত ছাত্রদের মেস রাজমন্দিরের বিপরীত দিকে ৩৮।২ নম্বর বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যান। এই মেসে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ,

বিনয়কুমার সরকার ছাড়াও সতীশচন্দ্র গুহ ও কৃষ্ণদাস সিংহরায় (যিনি পরে গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়েছিলেন) থাকতেন। এই বাড়িতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ১৯০৮ সালের শেষ পর্যন্ত।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও ঐ সময়েই (১৯০৬ জুলাই) ২৩নং বাড়িতে উঠে যান। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে না গিয়ে ঐ গলির ১১ নম্বর বাড়িতে উঠে যান। এখানে তিনি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখন এই বাড়ির নম্বর হয়েছে ১১-এ ও ১১-বি। তিনি বেদের পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর ছাত্র ছিলেন। হুগলি জেলার বিঘাতি গ্রামে স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েন, কিন্তু সাজা পান নি। তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। ভবিষ্যতে আমরা অন্যত্র তাঁর দেখা পাব।

১২নং বাড়ি: রামচন্দ্র মিত্রের (১৮১৪-৭৪)। তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা পেয়ে হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার অধ্যাপক হন। বীটন সোসাইটির (Bethune Society) আজীবন সম্পাদক ছিলেন। 'পশ্বাবলী' নামে মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন। কিছুদিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরিতে এঁর একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি আছে। ১৯০১ সালে এই বাড়িতে তাঁর দুই নাতি শরৎচন্দ্র মিত্র ও চারুচন্দ্র মিত্র থাকতেন।

১৬নং বাড়ি: এই বাড়িতে থাকতেন নন্দলাল ভট্টাচার্য কবিরত্ন অথবা বিদ্যারত্ন ও কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যার্ণব (অথবা বিদ্যাভূষণ), এম. এ.। কৈলাসচন্দ্র ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির শিক্ষক, পরে ডাফ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। এই বাড়িতেই 'সোমপ্রকাশ' প্রেস ছিল। তিনি এখান থেকে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা করতেন।

নন্দলাল ভট্টাচার্য কবিরত্ন ছিলেন স্বনামধন্য মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভ ভট্টাচার্যের (১৮৭২-১৯৩৮) পিতা। দুর্লভ ভট্টাচার্য ২০ বছর মৃদঙ্গাচায মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে পাখোয়াজ বাজানো শেখেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বাড়ির সামনেই 'মুরারি সম্মেলন' নামে বার্ষিক সংগীত সম্মেলন প্রবর্তন ক'রে ৩৩ বছর তা চালান। পাথুরেঘাটায় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে পাখোয়াজ বাজাতে বাজাতে তিনি মারা যান।

এখন এই বাড়ি পাঁচভাগে ভাগ হয়ে গেছে—এ, বি, সি, ডি, ই। দুর্লভ ভট্টাচার্যের পুত্র হরেন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। নাতি শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য থাকেন ১৬-সি নম্বরে। ১৬-ই-তে ছিল টোল। সেখান থেকেই 'সোমপ্রকাশ' বেরুত।

এই ভট্টাচার্য পরিবারের আদি নিবাস ছিল সাঁতরাগাছির ভট্টাচার্য পাড়ায়। এই বংশের হলধর ন্যায়রত্নের পুত্র নন্দলাল ভট্টাচার্য। তিনি ১৬নং শিবনারায়ণ

দাস লেনের কাশীনাথ তর্কবাগীশের কন্যাকে বিবাহ ক'রে শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর ৬ পুত্র ও ২ কন্যা। পুত্রদের নাম—ভূতনাথ, কৈলাসচন্দ্র, আশুতোষ, সন্তোষচন্দ্র, বৈদ্যনাথ ও দুর্লভচন্দ্র। যথাক্রমে কৈলাসচন্দ্র দ্বিতীয় ও দুর্লভচন্দ্র কনিষ্ঠপুত্র।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ২৩-৮-১৮৮৬ তারিখে মারা যান। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর সোমপ্রকাশ প্রেস ও পত্রিকা দুই-ই কিনে নিয়ে এই বাড়ি থেকেই সোমপ্রকাশ সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ করতেন।

১৮নং বাড়ি : এখানে থাকতেন সাহিত্যিক হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৬৪-১৯২৬)। তাঁর দেশ মজিলপুর। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'রায় সাহেব' উপাধি পেয়েছিলেন। অনেকগুলি বই লিখেছেন, যথা—'রাণী ভবানী', 'বঙ্গের শেষ বীর', 'প্রতিভাসুন্দরী' ইত্যাদি।

২৩নং বাড়ি : এই বাড়ির কথা আগে কিছুটা বলা হয়েছে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই বাড়িতে 'সন্ধ্যা' প্রেস এনে এখান থেকেই শেষ 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ৩০-৮-১৯০৭ তারিখে 'সন্ধ্যা' অফিসে খানাতল্লাসি হয়। পত্রিকার সম্পাদক উপাধ্যায় ও মুদ্রাকর হরিচরণ দাস ও ম্যানেজার সারদাচরণ সেনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। প্রথম দু'জন সে সময়ে অফিসে না থাকাতে পুলিশ শুধু ম্যানেজারকে ধরে নিয়ে যায়। ৩০-৯-১৯০৭ তারিখে সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব পুলিশকে ডেকে পাঠান ও এই বাড়িতেই মুদ্রাকরের সঙ্গে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ২৭-১০-১৯০৭ তারিখে ক্যাম্বেল হাসপাতালে ধনুষ্টঙ্কার রোগে তিনি মারা যান।

ব্রহ্মবান্ধবের গ্রেপ্তারের পর তাঁর শিষ্য মানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'সন্ধ্যা'র দ্বিতীয় মুদ্রাকর ও প্রকাশক হয়ে এই বাড়ি থেকেই কিছুদিন 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

৩১নং বাড়ি : যদুনাথ সেন বরাটের। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার আলমপুর গ্রামে মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর বিখ্যাত উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও তাঁর ছোটভাই হেমেন্দ্রনাথ সেনের (এঁর নামে কলকাতায় হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট আছে, রূপবাণী সিনেমার বিপরীত দিকে) পৈতৃক নিবাস। বৈকুণ্ঠনাথ ও হেমেন্দ্র সেনের বংশগত উপাধি সেন-বরাট। এঁদের সঙ্গে যদুনাথের জ্ঞাতি সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়।

যদুনাথ ছিলেন আদিযুগের শিবপুরে কলেজ থেকে বি. ই. পাশ-করা এঞ্জিনিয়ার। পাতিপুকুরে যশোর রোডের ওপর রাস্তার পূর্বদিকে তাঁর এক বিচিত্র ধরনের বাগানবাড়ি আছে। এমন বাগানবাড়ি কলকাতা শহরে বা তার আশেপাশে দ্বিতীয়টি নেই। এক পুকুরের ধারে বাড়ি, প্রবেশপথের

দু'ধারে দু'টি চারকোণা দোতলা 'টাওয়ার'। কবেকার তৈরি, কিন্তু এখনো টিঁকে আছে। আরো কতদিন থাকবে কে জানে। আমরা ছেলেবেলা থেকে একভাবেই দেখে আসছি।

এবার গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে যাওয়া যাক।

৬নং বাড়ি : ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এল. আর. সি. পি. (এডিন.), এল. আর. সি. এস. (গ্লাসগো), ডি. এফ. পি. এস. (ডাবলিন)।

৭নং বাড়ি : বিখ্যাত পাখেয়াজী মুরারিমোহন গুপ্ত (১৮২৪—২৭-৩-১৯০৪)। শ্রীরামপুর কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক। রাম চক্রবর্তী ও নিমাই চক্রবর্তীর কাছে বাজনা শেখেন। দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্যের গুরু।

১১নং বাড়ি : রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২৪-৫-১৮১৩—১১-৫-১৮৮৫)। বাড়ির বর্তমান নম্বর ১১-ই।

কৃষ্ণমোহনের মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ শান্তিরাম সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাস করতেন বেচু চাটুর্যের স্ট্রিটে। কৃষ্ণমোহনের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণের কন্যা শ্রীমতী দেবীকে বিয়ে ক'রে শ্বশুরবাড়িতেই বাস করতেন। সেখানে তাঁর ভুবনমোহন, কৃষ্ণমোহন ও কালীমোহন—এই ৩ পুত্র ও ১ কন্যার জন্ম হয়। এত বড় সংসার নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকা অসম্ভব হওয়ায় জীবনকৃষ্ণ শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে এই বাড়িটি তৈরি ক'রে পুত্রকন্যা নিয়ে এখানেই বাস করতে থাকেন। সুতরাং এই বাড়ি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি। কৃষ্ণমোহনের দাদা ভুবনমোহন খ্রীস্টান হন নি। কৃষ্ণমোহন ১৭-১০-১৮৩২ তারিখে রেভারেণ্ড ডাফ সাহেবের কাছে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন। অল্পদিন পরেই তিনি 'চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড' ত্যাগ ক'রে 'চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডে' যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত এই শেষোক্ত চার্চেই ছিলেন ও নিজের ছোটভাই কালীমোহনকেও খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

ঘটনাচক্রে কৃষ্ণমোহন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। যদি ঘটনাটি না ঘটত তাহলে হয়ত তিনি হিন্দুই থেকে যেতেন। ঘটনাটি শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় বিবৃত করছি। তিনি লিখেছেন : "১৮৩১ সালের ২৩ আগষ্ট তাঁহার (ডিরোজিওর—রা. মি.) শিষ্যগণ এক মহাবিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। সে সময় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে ডিরোজিওর শিষ্যদলের একটা আড্ডা ছিল। উক্ত দিবস কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার যুবক বন্ধুগণ সেখানে জুটিলেন। তখন তাঁহাদের সর্বপ্রধান সৎ-সাহসের কর্ম্ম ছিল মুসলমানের রুটি ও বাজার হইতে সিদ্ধকরা মাংস আনিয়া খাওয়া। সেইরূপ আহারের পর হাড়গুলি পার্শ্বস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়া দিয়া যুবকদল চীৎকার করিতে

লাগিলেন, 'ঐ গোহাড়, ঐ গোহাড়।' আর কোথায় যায়! সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার মার শব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। যুবকদল যিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন করিলেন। তৎপরে প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধরিয়া বসিল—'আপনার দৌহিত্রকে বর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব না।' ব্রাহ্মণ স্বীয় দৌহিত্রের প্রতি কোপে অধীর হইয়া গেলেন। বেচারা কৃষ্ণমোহন এ সকলের কিছুই জানেন না। তিনি সায়ংকালে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর আশ্রয় পাইলেন না।"

ঘটনাটি ঘটেছিল এই ১১-ই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িতে। হিন্দু কলেজ থেকে বেরোবার পর হেয়ার সাহেব কৃষ্ণমোহনকে তাঁর স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। ঘটনার সময় তিনি হেয়ার স্কুলে ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। পাশে যে-গৃহস্থের বাড়িতে হাড় ফেলা হয়েছিল তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিনাদোষে পৈতৃকবাড়ি থেকে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হয়ে কৃষ্ণমোহন সাহেবদের দলে ভিড়তে ও তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার ফলে বছরখানেক বাদে খ্রীস্টান হওয়া তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল। হিন্দুসমাজ তাঁর প্রতি অবিচার না করলে, একটু সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হলে তিনি হয়তো হিন্দুসমাজ ত্যাগ করতেন না।

শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই লিখেছেন কৃষ্ণমোহনের একটিমাত্র ভগ্নী ছিল। তাঁর বিয়ে হয়েছিল শিবনারায়ণ দাস লেনের হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর পুত্র মন্নুলাল চট্টোপাধ্যায় পরে গভর্নমেণ্টের বড় কর্মচারী হয়েছিলেন।

আমার বন্ধু ৺প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে একটি অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। শাস্ত্রীমশায়ের কথা সত্য হলে তাঁর কথা সত্য হয় না। কিন্তু প্রভাতবাবুর কথা সহজে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি দেখেছি প্রভাতবাবুর মতো ব্রাহ্ম পরিবারদের খবর আর কেউ রাখতেন না, এবং সে খবরে ভুল থাকত ক্বচিৎ। তিনি বলেছিলেন যে, সিভিলিয়ান ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা করপোরেশনের চিফ একসিকিউটিভ অফিসার ৺যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জে. সি. মুখার্জি, ডাকনাম 'রাজা')— এই দু'জনের পিতা ও ভাগলপুরের উকিল ৺নিবারণ মুখোপাধ্যায়ের মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নী ছি ...এবং নিবারণবাবু ও তাঁর দুইপুত্র ১১-ই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িতে অনেকদিন কাটিয়েছেন। তবে কি কৃষ্ণমোহনের দুই ভগ্নী ছিলেন? একজনের বিয়ে হয়েছিল হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, আর একজনের নিবারণ মুখোপাধ্যায়ের পিতাব সঙ্গে! ব্যাপারটা সত্য বলে বিশ্বাস করতে আরো বেশি ইচ্ছে হয় এইজন্য যে প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নিজে এই বাড়ির খুব কাছেই বাস করতেন। তামাম মুলুকের

হাড়হদ্দ খবর যে রাখে, সে পাড়ার খবর রাখে না, এটা কি হতে পারে? যাই হোক, ব্যাপারটা অনুসন্ধানযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতদিন পরে অনুসন্ধান ক'রে কি কিছু ফল হবে? এখন এমন কে জীবিত আছেন যিনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন? বোধহয় কেউই নেই। সুতরাং ব্যাপারটা রহস্যময়ই রয়ে গেল।

১৩।২ নং বাড়ি: মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৪-৭-১৮৫৪—৪-৬-১৯৩২)। জন্ম শিবনারায়ণ দাসের লেনে। পিতা মধুসূদন গুপ্ত পরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে এই বাড়ি করেন। বি. এ. পাশ ক'রে বিভিন্ন স্কুলে তিনি হেডমাস্টার ছিলেন, তার মধ্যে শ্যামবাজার (তখন শ্যামপুকুরে ছিল) মেট্রোপলিটান স্কুলেরও। সিটি, রিপন ও মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনা করেন। 'মাস্টার মহাশয়' নামে পরিচিত। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' রচনা করেন। তার লেখক 'শ্রীম' ইনিই। শেষে ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রিটে মর্টন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। এখন সেখানে হিন্দু অ্যাকাডেমি (১৯৩২ থেকে) রয়েছে।

১৮নং বাড়ি: যার নামে গলির নাম সেই গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ি। গুরুপ্রসাদ অনেক আগের লোক। তিনি সুপ্রিম কোর্টের কোনো ইংরেজ অ্যাটর্নি বা ব্যারিস্টারের 'বাবু' অর্থাৎ কেরানি বা মুহুরি ছিলেন।

২৩।১।১ নং বাড়ি: যদুনাথ বসুর বাড়ি। যদুনাথ ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর জ্ঞাতিভাই। এঁরা দু'জন একই বংশের সন্তান। পৈতৃক নিবাস বৈরাগীপুকুর, ২৪-পরগনা। কলকাতায় এসে ১৮৪৯ সালে হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৫৪ সনে ৮ টাকার একটি বৃত্তি পান। পরের বছরও ঐ বৃত্তি পান। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৫৬ সনে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন ও দু'বছরের জন্য ২৫ টাকার একটি বৃত্তি পান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা ১৮৫৭ সনে নেওয়া হয়। তিরিশটি স্কুল থেকে মোট ২৪৪ জন ছাত্র এই পরীক্ষা দেয়। ১১৫ জন প্রথম বিভাগে ও ৪৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। কেউ তৃতীয় বিভাগে পাশ করে নি। মোট ১৬২ জন পাশ করে। যদুনাথ পাশ করেন প্রথম বিভাগে।

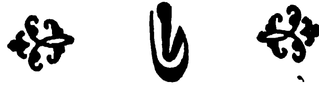
পরের বছর ১৮৫৮ সনের এপ্রিলের গোড়ায় প্রথম বি. এ. পরীক্ষা নেওয়া হয়। ১৩ জন পরীক্ষায় বসতে অনুমতি পান, মাত্র ১০ জন পরীক্ষা দেন। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুও ছিলেন। ১০ জনই ফেল করেন। ছ'টা বিষয়ের মধ্যে শেষ দু'জন পাঁচটা বিষয়ে খুব বেশি নম্বর পান, কিন্তু একটা বিষয়ে পাশ নম্বরের চেয়ে কিছু কম নম্বর পান। সিণ্ডিকেট তাঁদের অন্যান্য বিষয় থেকে নম্বর কেটে নিয়ে ঐ একটা বিষয়ে ৭ নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে পাশ করিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র হন দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম ও যদুনাথ ঐ

বিভাগে দ্বিতীয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই গ্রাজুয়েট।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়া মাত্র ছোটলাট স্যার, ফ্রেডারিক হ্যালিডে দু'জনকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তো সকলেই জানেন, এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। যদুনাথের কথা বিশেষ কেউ জানেন না। তাই সংক্ষেপে তাঁর সম্পর্কে বলছি। যদুনাথ ২৩-৯-১৮৫৮ তারিখে ফরিদপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজে যোগ দেন। ৩৩ বছর চাকুরির পর ১৮৯১ সনে নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হয়ে অবসর নেন। তারপর নিজের গ্রামে গিয়ে কয়েক বছর চাষবাস করেন। ২-৫-১৯০২ তারিখে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের এই বাড়িতে মারা যান।

৪৮ নং বাড়ি : 'অমূল্য নিকেতন'। এই বাড়িতে ডাঃ অমূল্যচন্দ্র বসু এম. বি. থাকতেন। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের (Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd.)এবং বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা। সমাজসংস্কারক, জনসেবক ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। জন্ম ১৮৬২, মৃত্যু ১৮৯৮।

ডাক্তার বসু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের শেষ অসুখের সময় পুত্রের মতো তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ৺কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (গড়পারের ডাক্তার তুলসীচরণ ভট্টাচার্যের পিতা, এঁদের দেশ হরিনাভি) লিখেছেন : "(বিদ্যাসাগরের) রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাক্তার অমূল্যচরণ ('চন্দ্র' হবে—রা. মি.) বসু ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থার জন্য কল ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া বন্ধ করিলেন।"



কয়েকটি প্রশ্ন ও জোব চার্নক

২ নভেম্বর ১৯৪৫ তারিখের 'স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রে পি. টি. নায়ার নামে এক দক্ষিণ-ভারতীয় ভদ্রলোক একটি প্রশ্ন তুলে বলেছেন মেয়র্স কোর্ট (Mayors Court) তো বরাবর সাহেবপাড়ায় ছিল, তবে উত্তর-কলকাতায় একটা রাস্তার নাম ওল্ড মেয়র্স কোর্ট হল কী ক'রে ?

চমৎকার প্রশ্ন। একজন বাঙালির পক্ষেই এ-প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, কোনো বাঙালি এ প্রশ্ন তুললেন না, তুললেন একজন অবাঙালি ভারতীয়। এঁর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা করতে হয়।

এর জবাব : উত্তর কলকাতার যে-গলিটার নাম আগে কম্বুলিয়াটোলা লেন ছিল, তারই একটা অংশের নাম রাখা হয়েছে—ওল্ড মেয়র্স কোর্ট। এ-নামটা একেবারেই ভুল। ইংরেজদের মেয়র্স কোর্ট কোনোদিনই সাহেবি পাড়া ছেড়ে শুধু এ অঞ্চলে কেন, কোনো দেশী পাড়াতেই থাকে নি। তবে ভুলটা হল কেন ? একটা ভুল সাদৃশ্যের জন্য। কম্বুলিয়াটোলা লেনের এই অংশের নাম যদি একান্তই মেয়র্স কোর্ট রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তাহলে নামটা 'ওল্ড' মেয়র্স কোর্ট না রেখে 'ইণ্ডিয়ান' মেয়র্স কোর্ট রাখা উচিত ছিল। কেন, তা বলছি।

এই গলির পূর্ব-দক্ষিণে মহারাজা নবকৃষ্ণের আদি বাড়ির অর্থাৎ পোষ্যপুত্র রাজা গোপীমোহন দেবের ও তাঁর পুত্র রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ির পেছন দিক, সামনের দিক রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট। মহারাজা নবকৃষ্ণ ক্লাইভ, হেস্টিংস প্রমুখ ইংরেজ শাসনকর্তাদের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন যে কোম্পানির এক-আধটা

নয়, সাত-সাতটা দপ্তরের ভার একা তাঁর ওপরেই তাঁরা দিয়েছিলেন। সেই দপ্তরগুলি এই :

১. মুনশি দপ্তর, অর্থাৎ ফার্সি সেক্রেটারির দপ্তর।

২. আর্জবেগী দপ্তর, অর্থাৎ সাধারণ লোকের কাছ থেকে আর্জি বা দরখাস্ত, যা তারা কোম্পানি বাহাদুরকে করত, তা নেবার অফিস।

৩. কোম্পানির বেনিয়ান ও রাজনৈতিক দেওয়ানের দপ্তর।

৪. কোম্পানির ধনাগার বা খাজনাখানা।

৫. ২৪-পরগনার মাল আদালত বা রাজস্ব কোর্ট।

৬. ২৪-পরগনার তহশিল দপ্তর, অর্থাৎ কালেক্টারের কাছারি।

৭. জাতিমালা কাছারি, অর্থাৎ কোনো লোকের জাত সম্পর্কে সন্দেহ বা আপত্তি উঠলে সেই লোকের প্রকৃত জাত কী, তা সাক্ষীসাবুদ ডেকে বিচার ও মীমাংসা করবার আদালত।

এই সবগুলি দপ্তরের কাজ মহারাজা নবকৃষ্ণ চালাতেন তাঁর নিজের শোভাবাজার রাজবাড়িতে বসেই। সাহেবপাড়ায় তাঁদের অফিস থাকলেও তিনি সেখানে যেতেন না। ওপরের সাতটি দপ্তরের মধ্যে ৫ ও ৭ নম্বর দপ্তর রীতিমতো আদালত। আর মহারাজা একাই তাদের জজ। কিন্তু শেষের আদালতটি অর্থাৎ 'জাতিমালা কাছারি' একটু অন্য ধরনের আদালত ছিল। এই আদালতের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

সে যুগটা, অর্থাৎ কোম্পানির আমলের গোড়ার দিকটা সামাজিক ডামাডোলের সময় ছিল। বর্ণকৌলীন্য তার সাবেকি মর্যাদা হারাচ্ছে—কাঞ্চনকৌলীন্য তার জায়গায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সুতরাং তখন বাঙালির কাছে, বিশেষত কলকাতায়, জাতের সমস্যা একটা বড সমস্যা হয়ে উঠেছিল। চট্ ক'রে কোনো লোকের জাত ঠিক করা যেত না। লোকে সাধারণত নিজেদের জাত ভাঁড়াত ও অন্যদের জাত মারবার চেষ্টা করত। ক্ষমতাশালী বা ধনীলোকেরা ব্রাহ্মণ কুলাচার্যদের কিছু দক্ষিণা দিয়ে তাদের শত্রুপক্ষীয়দের জাতিচ্যুত করত, অর্থাৎ উঁচুজাত থেকে ঠেলে নিচুজাতে নামিয়ে দিত। আবার ঐ শ্রেণীর লোক নিচু জাতের হলে ব্রাহ্মণ ও ঘটকদের 'সন্তুষ্ট ক'রে উঁচুজাতে উঠে যেত। দলাদলি, পরস্পরের জাত মারামারি তখন একটা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুদের জাতের বিচার করবার জন্য একটা রীতিমতো কাছারি (আদালত, কোর্ট) সৃষ্টি ক'রে তার নাম রেখেছিলেন 'জাতিমালা কাছারি' (Caste Court)।

যেমন মেয়র্স কোর্ট-এ একজন প্রেসিডেণ্ট (মেয়র) ও ৯জন সদস্য (Alderman) থাকতেন, তেমনি জাতিমালা কাছারিতে একজন সভাপতি বা প্রধান জজ ও কয়েকজন সাহায্যকারী জজ (বা Assessor) নিযুক্ত হতেন। উচ্চ, নীচ

সব জাতেরই আক্রোশ ব্রাহ্মণদের ওপর থাকায় এই আদালতের কোনো বিচারকই ব্রাহ্মণ হতে পারতেন না। মহারাজা নবকৃষ্ণ এই আদালতের প্রথম ও প্রায় যাবজ্জীবন প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। মাত্র দু'একবার কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্তবাবু, এই কাছারির সভাপতি বা প্রধান জজ হয়েছিলেন। লক্ষণীয় যে দুই প্রেসিডেণ্টই অব্রাহ্মণ—একজন মৌলিক কায়স্থ, অন্যজন তিলি।

আগেই বলেছি এই জাতিমালা কাছারি, যার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ, আর যা তাঁর বাড়িতে বসত, সেটা অনেকটা মেয়র্স কোর্ট-এর ধাঁচে ছিল। তাই কলকাতা কর্পোরেশন কম্বুলিয়াটোলা লেনের খানিক অংশের, যা শোভাবাজারের রাজবাড়ির পেছনে পড়ে তার, বোধহয় স্থানীয় বাসিন্দাদের আবেদনক্রমে 'ইণ্ডিয়ান' মেয়র্স কোর্ট নাম না দিয়ে ভুলক্রমে নাম দিলেন ওল্ড মেয়র্স কোর্ট।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এক অনামী লেখক কলকাতা সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করেছেন। সেগুলির উত্তর দিচ্ছি। তাঁর প্রথম প্রশ্নের উত্তর সবশেষে দেব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: সান্‌কিভাঙার মোড় কোন জায়গাটা? কেন তার এই নাম?

[পাঠকগণকে প্রথমেই বলে রাখি, তাঁরা যেন এই 'মোড়' শব্দটির ওপর মোটেই গুরুত্ব না দেন। 'মোড়' শব্দটা প্রশ্নকর্তার বড় প্রিয় শব্দ, মুদ্রাদোষও বলতে পারেন। এর পরেই পাবেন 'চড়কডাঙার মোড়', 'ডিঙিভাঙার মোড়'। মোড়-এর কোনো অর্থই নেই এসব জায়গায়।]

উত্তর: যখন 'সান্‌কিভাঙা' নাম প্রচলিত ছিল তখন মেডিক্যাল কলেজের পশ্চিম অংশে ইডেন হসপিটাল তৈরি হয় নি। তার পশ্চিমে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ তো ছিলই না। মেডিক্যাল কলেজের উত্তরে যে কলুটোলা স্ট্রিট রয়েছে তার প্রায় মাঝ বরাবর থেকে একটা গলি বেরিয়ে ইডেন হসপিটালের পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণে গিয়ে বর্তমান ইডেন হসপিটাল রোডে পড়ত। এই গলিটার নাম ছিল মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল স্ট্রিট, বা সংক্ষেপে মেডিক্যাল কলেজ স্ট্রিট। তখন ইডেন হসপিটাল রোডের নাম ছিল চাঁপাতলা লেন। যেখানে মেডিক্যাল কলেজ স্ট্রিট চাঁপাতলা লেনে পড়েছিল, প্রায় তার উলটোদিক থেকে আর একটা সরুগলি বেরিয়ে দক্ষিণমুখে বৌবাজার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হতো। সেই গলির নাম ছিল চাঁপাতলা সেকেণ্ড বাই-লেন, পরে হয় নিমু খানসামার লেন, এখন ইডেন হসপিটাল লেন।

কলুটোলা স্ট্রিট ও মেডিক্যাল কলেজ স্ট্রিটের দু'ধারে মুসলমানেরা পুরনো ভাঙা চীনেমাটির বাসন বা কলাই-করা থালা, বাটি ইত্যাদি বিক্রি করত। গরিব

লোকেরা সেগুলি সামান্য দামে কিনে ব্যবহার করত। কলাই-করা বা চীনেমাটির বাসনকে আজও 'সানকি' বলা হয়। গোড়ায় কলুটোলা স্ট্রিট ও মেডিক্যাল কলেজ স্ট্রিটকে 'সান্‌কিভাঙা' বলা হতো। পরে তার আয়তন বৃদ্ধি হয়ে মেডিক্যাল কলেজের আশপাশের সমস্ত চত্বরটাই সান্‌কিভাঙা হয়ে দাঁড়ায়। মেডিক্যাল কলেজের পূর্বদিকে প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে (যে-গলির নাম তারও আগে ফক্‌স লেন Fox Lane ছিল) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাড়ি করেছিলেন। আজও লোকে বলে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি ছিল সান্‌কিভাঙায়।

তৃতীয় প্রশ্ন : চড়কডাঙার মোড় কোথায় ?

উত্তর : বিডন বাগানের দক্ষিণ-পাশ্চিম কোণের সামনে চিৎপুরের পশ্চিমদিক থেকে একটা গলি গঙ্গার দিকে চলে গেছে। এখন ঐ গলিটার নাম টেগোর ক্যাস্‌ল স্ট্রিট (Tagore Castle Street)। আগে নাম ছিল চড়কডাঙা স্ট্রিট। কিন্তু চড়কডাঙা স্ট্রিটে চড়ক হতো না, হতো বিডন উদ্যানে। যখন চড়ক হতো তখন সেখানে উদ্যান হয় নি, একটা খালি মাঠ ছিল। চড়ক সেই মাঠে হতো।

কলকাতায় আরো অনেক চড়কডাঙা ছিল। একটা ছিল নারকেলডাঙায়। এখনো সেখানে চড়কডাঙা লেন নামে একটা গলি আছে। ভবানীপুর পদ্মপুকুরের পাশে আর এক চড়কডাঙা ছিল। এখনো সেখানে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে মেলা বসে। হাজরা রোডে আর এক চড়কডাঙা ছিল। বিডন স্ট্রিটে অনাথবাবুর বাজারে আর এক চড়কডাঙা ছিল। বিডন উদ্যান তৈরি হলে সেখানকার চড়ক উঠে এসে অনাথবাবুর বাজারের মাঠে হতে থাকে। আজও হয়।

চতুর্থ প্রশ্ন : ডিঙিভাঙার মোড় কোথায় ?

উত্তর : মোড় কোথায় জানি না, তবে জায়গাটা কোথায় বলতে পারি। জায়গাটা হচ্ছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের চারপাশ ও বিশেষ ক'রে পূর্বদিক। ওয়েলিংটন লেন, এখন যার নাম হয়েছে রাজকুমার বোস লেন, তার নাম ছিল ডিঙেভাঙা লেন। একটু পূর্বে ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে বেরিয়েছে গঙ্গারাম পালিত লেন। এই গঙ্গারাম পালিত বংশকে আজও ডিঙেভাঙার পালিত বংশ বলা হয়।

জায়গাটার নাম ডিঙিভাঙা নয়, শুদ্ধ ডিঙাভাঙা, চলিত ডিঙেভাঙা। যেমন, উল্টোডাঙা নয়, উল্টোডিঙি। ছোটনদী ও খালপথে যাতায়াতের ছোট নৌকাকে বলা হয় ডিঙি, যেমন জেলেডিঙি। আর বড়নদী ও সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য বড় পালওয়ালা নৌকাকে বলা হতো ডিঙা, যেমন ধনপতি বা শ্রীমন্ত সদাগরের ছিল সপ্তডিঙা এবং মধুকর ডিঙা ইত্যাদি।

বহুকাল আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে (তখন অবশ্য এই স্কোয়ার

হয় নি) একটা খাল (creek) পশ্চিমে গঙ্গা থেকে বেরিয়ে পুবে লবণহ্রদে গিয়ে পড়ত। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১০-১১ সেপ্টেম্বরের মহাঝড় ও ভূমিকম্প কলকাতাকে বিধ্বস্ত ক'রে দেয়। এই ঝড়ে গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দিরের ও সেণ্ট অ্যান (St. Anne) গির্জার চূড়া ভেঙে পড়ে। সেই ঝড় ও ভূমিকম্পে যে সংখ্যায় মানুষ ও পশুপাখি মরেছিল, বাড়িঘর ভেঙেছিল ও নৌকো-জাহাজ ধ্বংস হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতির সেই প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা কলকাতার লোকে বহুদিন ভুলতে পারে নি। সেদিনের ঝড় অনেক বড় বড় জাহাজকে নদীর বুক থেকে তুলে ডাঙার উপর অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফেলেছিল। সেদিন কোনো একটা জাহাজ গঙ্গা থেকে ঝড়ের মুখে উড়ে এসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের খালের মধ্যে আছাড় খেয়ে ভেঙে গিয়ে থাকবে। তারই স্মৃতি এখনো বহন করছে ডিঙাভাঙা নাম। এই খালে যেটা ভেঙেছিল সেটা ডিঙি ছিল না, ডিঙা ছিল। তাই ডিঙিভাঙা বলা ভুল, হবে ডিঙাভাঙা।

পঞ্চম প্রশ্ন : নফর কুণ্ডু কে ছিলেন ?

উত্তর : নফরচন্দ্র কুণ্ডু ছিলেন এক সাধু প্রকৃতির পরহিতব্রতী যুবক। তিনি থাকতেন ভবানীপুরে। যেখানে থাকতেন সেই জায়গার নাম এখন নফর কুণ্ডু রোড। তিনি এণ্টালির রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের একজন সদস্য বা ভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ ভবানীপুর থেকে এণ্টালিতে হেঁটে যাতায়াত করতেন। ১২-৫-১৯০৭ তারিখে তিনি যাবার বা আসবার সময় দেখতে পান যে ভবানীপুর দক্ষিণ-চক্রবেড়ে রোডের এক ড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে দু'জন মুসলমান ড্রেন-কুলি ম্যানহোলের ভেতর ডুবে যাচ্ছে। দেখেই তিনি তাদের উপরে টেনে তোলবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই ম্যানহোলের ভেতর পড়ে মারা যান। তাঁর জন্ম হয় ২২-৩-১৮৮১ তারিখে, মরবার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৬-২৭ বছর। তাঁর পরার্থে অত্মাহুতিকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য, যে-জায়গায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন তার সামনে একফালি জায়গাকে রেলিং দিয়ে ঘিরে তাঁর গুণমুগ্ধ ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়রা মিলে চাঁদা তুলে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। তার ওপর ঐ যুবকের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা আছে। এই স্মৃতিস্তম্ভ বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার ১১-১-১৯০৮ তারিখে উন্মোচন করেন।

সেই স্মৃতিস্তম্ভ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তবে তার এমনি হীনাবস্থা হয়েছে যে আর কতদিন টিকে থাকবে বলা যায় না। স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে, নফর কুণ্ডু এণ্টালির রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য ছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। এণ্টালিতে কোনোদিন রামকৃষ্ণ মিশন ছিল না। সম্প্রতি একটি রামকৃষ্ণ সারদা মিশন স্থাপিত হয়েছে। তখন যা ছিল ও আজো যা আছে, তার নাম এণ্টালির 'রামকৃষ্ণ

অর্চনালয়'—ঠিকানা ৩৯ নম্বর দেব লেন। মহামহোপাধ্যায় ৺হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশের বাড়ির ঠিক পূর্ব গায়ে। স্থাপিত ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ৬ মে। স্থাপয়িতা ৺দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'মহিলা' কাব্যের কবি ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোট ভাই। বড় ভাই পাথুরেঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এস্টেটে ও ছোট ভাই মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এস্টেটে কাজ করতেন।

এই কলকাতা শহরের রাস্তায় আর একটি মহাপ্রাণ যুবক (যুবক না বলে কিশোর বলাই উচিত) নফরচন্দ্র কুণ্ডুর আত্মত্যাগের ২৪ বছর পরে পরকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বলি দেন। তিনি ছিলেন মুসলমান, নাম শেখ দৌলত হোসেন। বয়স মাত্র ১৮ বছর। ৭-১০-১৯৩১ তারিখে সামসুল হুদা রোড ও ব্রাইট স্ট্রিটের মোড়ের কাছে একদল সশস্ত্র ডাকাত কোনো লোকের বাড়ি চড়াও হলে এই যুবক একা খালিহাতে অমিত বিক্রমে তাদের বাধা দেয় ও তাদের ধরে ফেলতে চেষ্টা করে। শেষপর্যন্ত ডাকাতদলের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে। ঐ অঞ্চলের সর্বসাধারণে চাঁদা তুলে অকুস্থলে ঐ কিশোরের উদ্দেশে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। জাস্টিস টি. আমির আলি সেই স্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন ২৯-৫-১৯৩২ তারিখে। এই স্মৃতিস্তম্ভটিও রেলিংএ ঘেরা।

ষষ্ঠ প্রশ্ন : পার্ক স্ট্রিটের নাম কেন পার্ক স্ট্রিট ?

উত্তর : এখন মিডলটন রো-এ যেটা লোরেটো হাউস, আগে সেটা ছিল গভর্নর ভ্যানসিটার্টের (১৭৬০-৬৪) পল্লীনিবাস। তাঁর পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে এই বাড়িতে ১৭৭৪ সন থেকে ১৭৮২ সন পর্যন্ত বাস করেন। ই বাড়ির চারধারে প্রকাণ্ড বড় একটি পার্ক ছিল, তাতে নাকি হরিণ থাকত। লোকে বলত 'ডিয়ার পার্ক'। বাগানের চারদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। বাগা টি বিস্তৃত ছিল পূর্বে ক্যামাক স্ট্রিট থেকে পশ্চিমে রাসেল স্ট্রিট পর্যন্ত, আর দক্ষিণে বেরিইং গ্রাউণ্ড রোড পযন্ত। এই রোডের ওপর এক ফটক ছিল। সেই ফটকে ঢুকে দু'ধারে দু'সারি ঘন গাছের মধ্য দিয়ে জজ সাহেবের বাড়িতে যাওয়া যেত। সেই দু'সারি গাছের বীথির জায়গাটাই এখন হয়েছে—মিডলটন রো। আর. ইম্পের পার্কের জন্যই বেরিইং গ্রাউণ্ড রোডের নাম হয়েছে পার্ক স্ট্রি '

সপ্তম প্রশ্ন : অক্রুর দত্ত কেন বিখ্যাত ?

উত্তর : অক্রুর দত্ত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বা মলঙ্গার বা ডিঙেভাঙার দত্ত-বংশের আদিপুরুষ। এই বংশে অনেক বিখ্যাত লোক জন্মেছেন। তাঁর বাড়ির সামনের গলির নাম অক্রুর দত্ত লেন। তিনি অনেককাল আগে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থেকে কলকাতায় আসেন। এসে জানবাজারের ৺রাজচন্দ্র দাসের পিতা

৺প্রীতিরাম দাস (বংশের উপাধি মান্না) বা মাড়ের সঙ্গে ব্যবসা ক'রে খুব বড়লোক হন। অক্রুর দত্ত কোম্পানির আমলে কমিশরিয়েট বিভাগে কাজ করেও প্রচুর টাকা করেছিলেন। বীরভূম রাজনগরের মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তিনি ইংরেজ সেনার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অষ্টম প্রশ্ন : চার্লস ডিকেন্সের ছেলের সমাধি কোথায় আছে ?

উত্তর : এঁর সমাধি ভবানীপুর রোডের (বর্তমান নাম দেবেন্দ্রলাল খাঁ রোড) সৈনিকদের গোরস্থানে আছে। এঁর নাম লেফটেনাণ্ট ওয়াল্টার ল্যাণ্ডর ডিকেন্স। জন্ম ৮-২-১৮৪১ তারিখে। ইনি চার্লস ডিকেন্সের চতুর্থ সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র। কোম্পানির সেনাবাহিনীতে কাজ নিয়ে ভারতে আসেন ১৮৫৭ সনে। ১৮ বছর বয়সে লেফটেনাণ্ট হন। স্বাস্থ্যের কারণে ইংল্যাণ্ডে যাবার মুখে পীড়িত হয়ে সৈনিক হাসপাতালে ভর্তি হন এবং রক্তবমনের ফলে মারা যান। সমাধিক্ষেত্রের ফটক পার হয়ে বাঁদিকের দ্বিতীয় সারির মাঝামাঝি তাঁর পাকা কবর আছে। তার উপর একটি পাথরে তাঁর পিতার লেখা এই ক'টি লাইন খোদাই করা আছে [ইংরেজির বাংলা অনুবাদ] : "চার্লস ডিকেন্সের দ্বিতীয় পুত্র লেফটেনাণ্ট ওয়াল্টার ল্যাণ্ডর ডিকেন্সের স্মৃতিতে। তিনি অসুস্থ হয়ে ছুটি নিয়ে দেশে ফেরবার পথে ১৮৬৩ সনের ৩ ডিসেম্বর ২৩ বছর বয়সে কলকাতায় সৈনিক হাসপাতালে মারা যান।"

নবম প্রশ্ন : ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর সম্বন্ধে গবেষণা কোথায় হয়েছিল ?

উত্তর : ক. ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটালের (বর্তমান নাম শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতাল) একটি ছোট গবেষণাগারে হয়েছিল। সেই প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল এখন আর নেই। পুরনো হাসপাতালকে ভেঙে ফেলে ১৯:৬ সনে বর্তমান হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেই ছোট গবেষণাগারটি এখনো আছে।

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটালের উত্তরদিকের দেওয়ালের খানিকটা অংশ ভেঙে ফেলে সেখানে এক লোহার ফটক বসিয়ে তার দু'পাশে দুই পাথরের ফলক লাগিয়ে তার উপর এই আবিষ্কারের কথা লিখে দেওয়া হয়েছে। একটা ফলকে লেখা আছে—"এই ফটকের ৭০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ঐ ছোট গবেষণাগারে সার্জন-মেজর রোনাল্ড রস, আই. এম. এস. ১৮৯৮ সনে আবিষ্কার করেন মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া কী প্রকারে সংক্রামিত হয়।" [ইংরেজির বাংলা অনুবাদ]। অপর ফলকে এই আবিষ্কার সম্বন্ধে আবিষ্কর্তার স্বরচিত একটি কবিতা লেখা আছে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে তিনি 'স্যার' উপাধি পান।

খ. ইংরেজ ডাক্তার স্যার উইলিয়াম লিশম্যান (Leishman, 1865–1926) কালাজ্বর রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে জীবাণুর নাম রাখা হয় 'লিশম্যানিয়া', আর কালাজ্বর রোগের নাম দেওয়া হয় 'লিশম্যানিয়াসিস্।' ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (৭-৬-১৮৭৫–৬-২-১৯৪৬) ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যাপনা করার সময় (১৯০৫-২৩) ঐ হাসপাতালের গবেষণাগারে গবেষণা ক'রে ১৯২২ সনে কালাজ্বরের ওষুধ 'ইউরিয়া-ষ্টিবামাইন' আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে তিনি 'স্যার' উপাধি পান।

এবার ১নং প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অনামী লেখক সখেদে বলেছেন: "আমি বহু ঘুরেছি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। জব চার্নক ঠিক কোথায় বসতেন বার করতে পারি নি।"

উত্তর: যদি তিনি বার করতে না পেরে থাকেন তাহলে দুঃখ করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তাতে তাঁরও কিছু আসে যায় না, জোব চার্নকেরও কিছু আসে যায় না। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য নয়, কিংবদন্তি মাত্র। জোব চার্নকের সমস্ত জীবনটাকে ঘিরে রাশি রাশি কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে। তার কারণ তাঁর সম্বন্ধে অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক সত্য খুব কমই পাওয়া যায়। বরং যদি লেখক দুঃখ ক'রে বলতেন, অনেক চেষ্টা কবেও আজ পর্যন্ত তিনি ঠিক করতে পারেন নি জোব চার্নকের জীবনে কোন ঘটনা সত্য, আর কোনটা মিথ্যা, তাহলেও কিছু মানে হতো।

জোব চার্নক একটা গাছের নিচে বসতেন। শুধু বসতেন না, ইয়ার-বকসি ও মক্কেলদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন, কেনাবেচার কথাও বলতেন, আবার হুঁকো টানতেন। সেটি কোন গাছ? জোব চার্নককে আশ্রয় দিলে যদি সম্মান বৃদ্ধি হয় তাহলে এই সম্মান দাবি করে তিনটি প্রকাণ্ড গাছ। একটি অশ্বত্থ, একটি বট, আর একটি নিম। সব ইংরেজ লেখকই গোড়ার দিকে অশ্বত্থ গাছটাকেই ভোট দিয়েছিলেন। সে গাছটা ছিল সার্কুলার রোড ও বৌবাজার স্ট্রিটের মোড়ের পূর্বদিকে শেয়ালদা স্টেশন হাতার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ঐ গাছটাকে কেটে ফেলা হয় এক মতে ১৭৯৯-এ, অন্য মতে ১৮২০-তে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলতেন, এই বটগাছটার জন্যেই বৌবাজার স্ট্রিটের আগে নাম ছিল বৈঠকখানা স্ট্রিট। কারণ ঐ বিরাট অশ্বত্থ গাছটাই জোব চার্নকের বৈঠকখানা-রূপে ব্যবহার হতো। এ কথাটা যে একেবারে গাঁজাখুরি, সেকথা পরবর্তীকালের ইংরেজরা বুঝেছিলেন এবং এই গাছের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মত হচ্ছে: উত্তর-কলকাতার চিৎপুর রোডের ধারে যে প্রকাণ্ড এক বটগাছ ছিল—যা থেকে ঐ সমস্ত অঞ্চলটার নাম হয়েছে বটতলা, সেই গাছটার

নিচে জোব চার্নক বসতেন। কারণ তিনি সুতানুটির ঘাটে নেমেছিলেন, সুতানুটিতে ছিলেন, আর সেই গাছটা গঙ্গার ঘাট থেকে বেশিদূর নয়। কিন্তু এই মতের সমর্থক-সংখ্যা খুব কম।

আজকাল বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে, জোব চার্নক একটি প্রকাণ্ড নিমগাছের তলায় বসতেন—যে-নিমগাছ থেকে নিমতলা ও নিমতলা ঘাটের নাম হয়েছে। *Chuttanuttee Diary and Consultations*-এ আছে :

> 1690 August 24th. This day, at Shankhrail ordered Captain Brooke to come up with his vessel to Chuttanuttee …the Captain steered for ***the great tree*** which was the sea-mark and landed nearby.

এই 'great tree'-ই হচ্ছে ঐতিহাসিকদের মতে সেই নিমগাছ। এই গাছটা ১৮৭৯-৮০ সনে আগুন লেগে পুড়ে যায়। নিমতলার আনন্দময়ী কালীর মন্দিরের কাছেই এই নিমগাছটা ছিল। তারই কিছু উত্তরে জোব চার্নক জাহাজ থেকে নেমেছিলেন।

তিনি ঠিক কোন ঘাটে নেমেছিলেন তা জানা নেই। তবে বেশির ভাগ লোকের মত—তিনি বেনেটোলা ও শোভাবাজার ঘাটের মাঝামাঝি মোহনটুনির ঘাটে নেমেছিলেন।

জোব চার্নক কোন সালে ভারতে প্রথম আসেন তাও ঠিক জানা নেই। বলা হয়, ১৬৫৫ কি ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে। তিনি ৩ বার কলকাতায় আসেন। প্রথমবার আসেন হুগলি থেকে পালিয়ে ২০-১২-১৬৮৬ তারিখে। কিন্তু থাকতে পারেন নি, পালিয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয়বার আসেন উলুবেড়িয়া থেকে পালিয়ে ২০-৯-১৬৮৭ তারিখে। ক্যাপ্টেন হিথ (Capt. Heath) তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের জোর ক'রে জাহাজে উঠিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে মাদ্রাজে নিয়ে যান ৫-৩-১৬৮৯ তারিখে। পরের দিন (৬-৩-১৬৮৯) বাংলাদেশের প্রথম পাদ্রি ইভান্স (Rev. John Evans) তাঁর ৩ মেয়েকে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (Fort St. George)-এর সেণ্ট অ্যান (St Anne) গির্জায় ব্যাপটাইজ করেন। মাদ্রাজ থেকে চার্নক মেয়েদের, কাউন্সিলের সদস্যদের, ফ্যাক্টরদের ও ৩০ জন সৈন্য নিয়ে তৃতীয় ও শেষবারের মতো কলকাতায় আসেন ২৪-৮-১৬৯০ তারিখে—শেষ কলকাতা ছেড়ে যাবার ১ বছর ৯ মাস ১৬ দিন পরে।

দ্বিতীয়বার এসে যখন চার্নক কলকাতায় ১৪ মাস কাটান তখন তিনি বাস করেছিলেন সুতানুটিতে কতকগুলি মাটির চালাঘর তৈরি ক'রে। শেষবার এসে দেখলেন যে কুঁড়েঘরগুলির অস্তিত্ব নেই। তাঁদের অবর্তমানে 'মালিক বরখুরদার' এসে সেগুলিকে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। আবার তাঁদের গতবারের মতো গোটা-কতক কাঁচা চালাঘর তুলে থাকবার ব্যবস্থা করতে হয়।

এই 'মালিক বরখুরদার'কে নিয়ে একটি রগড়ের ব্যাপার আছে। একজন বাঙালি ঐতিহাসিক 'মালিক বরখুরদার'কে করেছেন 'ব্যারাকদার মল্লিক' ও আর একজন করেছেন 'বুকোদর মল্লিক'। এই ভুলটা হয়েছে সামান্যতম ফার্সি না জানার দরুন। আমরা 'মালিক' শব্দটাকে মল্লিক ক'রে নিয়েছি। কিন্তু কথাটা তো মল্লিক নয়, মালিক। মানে, প্রভু বা কর্তা। আর 'বরখুরদার' মানে ছোট। ফার্সি মূলশব্দ 'খুর্দ'—সংস্কৃত 'ক্ষুদ্র' মানে ছোট। 'খুর্দ' থেকে হয়েছে 'খুর্দা', বাংলায় 'খুচরা'—অর্থ ছোটমুদ্রা বা রেজ্কি। অতএব 'মালিক বরখুরদার' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ছোট কর্তা'। এটা কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, তাঁর উপাধিমাত্র। সুবেদার বা নবাবের নিচেই যে সরকারি কর্মচারী থাকতেন তাঁকে, অথবা নবাবের প্রতিনিধিকে বলা হতো 'মালিক বরখুরদার'।

শেষবার কলকাতায় এসে গোটাকতক খড়ের চালঅলা মাটির ঘর তুলে তো চার্নক সঙ্গীসাথীদের নিয়ে রইলেন। কিন্তু কোথায় রইলেন? সে-জায়গাটা কি হাটখোলা সুতানুটি, যেখানে তিনি জাহাজ থেকে নেমেছিলেন? না ডালহৌসি স্কোয়ারে, যে-জায়গাটার পরে নাম হয় 'ডিহি কলকাতা' বা 'টাউন কলকাতা'? অথবা, দিনকতক সুতানুটিতে থেকে পরে 'কলকাতা'য় গিয়ে থাকেন? তিনি দেহরক্ষা করলেন কোথায়? কোথায় তাঁর প্রথম কবর হল—এসব প্রশ্নের কোনো জবাব আজ পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক দেন নি। এমনকি, কি ইংরেজ, কি ভারতীয়, কোনো ঐতিহাসিকই এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন পর্যন্ত করেন নি। সকলেই চুপচাপ থেকে গোঁজামিল দিয়ে গেছেন।

তার কারণ, এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব মুশকিল। মুশকিলটা হচ্ছে 'সুতানুটি'র অর্থ নিয়ে। 'সুতানুটি' বলতে হাটখোলার সুতানুটি তো বোঝাতই, তাছাড়া লালদীঘি (ডালহৌসি স্কোয়ারে) অঞ্চলকেও বোঝাত। কলকাতা থেকে ইণ্ডিয়া অফিসে যেসব চিঠি লেখা হয়েছে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের ২৭ মার্চ পর্যন্ত, সেইসব চিঠির মাথায় 'কলকাতা' লেখা নেই, 'সুতানুটি' (Chuttanuttee) লেখা আছে। ঐ বছরের ৮ জুন থেকে যেসব চিঠি লেখা হয় তাদের মাথায় লেখা আছে 'ক্যালকাটা' (Calcutta)। সুতরাং আমাদের বোঝবার উপায় নেই, অন্তত ২৭-৩-১৭০০ তারিখ পর্যন্ত ইংরেজরা 'সুতানুটি' বলতে কোন সুতানুটি বুঝত—হাটখোলা-সুতানুটি, না কলকাতা-সুতানুটি?

লেখা হয়েছে, চার্নকের মৃত্যুর পর তাঁর বড় জামাই চার্লস আয়ার তাঁর কবরের উপর বর্তমান সমাধি-সৌধটি (Mausoleum) তৈরি ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু এটা লেখা হয় নি যে তাঁর কবরটা প্রথম থেকে ওখানেই ছিল, না জামাই অন্য কোনো জায়গা থেকে তাঁর মৃতদেহকে তুলে নিয়ে এসে এখানে নতুন ক'রে কবর দিয়ে তার উপরে স্মৃতি-সৌধটি নির্মাণ করেছেন।

একটি জিনিস নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে চার্নকের সময় পর্যন্ত লাল-

দীঘির ধারে ইংরেজদের কোনো কুঠিবাড়ি—কাঁচা বা পাকা—তৈরি হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর গোল্ডস্‌বারো (Sir John Goldsborough) মাদ্রাজ থেকে এসে ভবিষ্যৎ কুঠিবাড়ির জায়গাটা নির্দিষ্ট ক'রে দেন।

লেখা হয়েছে যে চার্নক কোম্পানির কাগজ পত্র, যা মাটির ঘরে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তা সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারদের দোতলা পাকা কাছারিবাড়িটা ভাড়া নিয়ে তাতে রাখেন। সেই বাড়িটাই নাকি ও অঞ্চলে 'সবেধন নীলমণি' পাকাবাড়ি ছিল। কিন্তু চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে ঐ অঞ্চলে সাবর্ণ চৌধুরীদের কোনো পাকা কাছারিবাড়ি ছিল না, আর জোব চার্নক সে বাড়িতে কোম্পানির কাগজপত্র সরিয়ে রাখেন নি। কাগজপত্র সরিয়ে রাখা হয় তাঁর মৃত্যুর পর ওয়াল্‌শ (Walsh) নামে এক ইংরেজের পাকাবাড়িতে।

জোব চার্নক লালদীঘি অঞ্চলে কোনো কুঠিবাড়ি তৈরি করেন নি, কিংবা কোম্পানির কাগজপত্র ঐ অঞ্চলের কোনো পাকাবাড়িতে রাখেন নি—এই দু'টি তথ্য থেকে অবশ্য এটা প্রমাণিত হয় না যে তিনি ঐ অঞ্চলে বাস করেন নি। সেটা প্রমাণিত হয় মাত্র একটি দলিল থেকে। অবশ্য এই দলিলেও সেই জায়গাটার অবস্থান বা নাম কোনোটাই দেওয়া নেই। শুধু বলা আছে 'কুঠি থেকে অনেকখানি দূরে'। হাটখোলা-সুতানুটি হলেও হতে পারে। দলিলটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মূল ইংরেজিতেই তুলে দিচ্ছি। দলিলটি হচ্ছে *Chuttanuttee Diary and Consultations,* তারিখ ১৬৯৫ সালের ৮ এপ্রিল। তাতে আছে :

> The House which Agent Charnock formerly lived in and lately Mr. Ellis, being of Thatch was by an accident burned down one Night; and ordered ro be rebuilt by the Charges General Keeper Mr. Cormell, and to be covered with brick for security, but charge exceeding what we expected (it amounting to 400 and odd Rupees) and ***being a considerable distance from the factory***, And ***inconvenient for the company's servants for that reason,*** Mr. Cormell was ordered to dispose of it by outcry, which was accordingly done for 575 Rupees.

এলিস (Mr. Ellis) চার্নকের মৃত্যুর পর এজেন্ট হয়েছিলেন। গোল্ডসবারো (Sir John Goldsborough) এসে তাঁকে তাড়ান ও তাঁর জায়গায় চার্লস আয়ারকে এজেন্ট নিযুক্ত করেন। 'Outcry' শব্দের মানে 'নিলাম'।

জোব চার্নকের ৩ কন্যা ছিলেন—মেরি, এলিজাবেথ ও ক্যাথারিন। তাঁদের একজনেরও জন্মসন ও স্থান জানা যায় না। মেরি চার্লস আয়ারকে, এলিজাবেথ

উইলিয়াম বাউরিজ নামে একজন কোম্পানির জুনিয়ার মার্চেণ্টকে ও ক্যাথারিন জোনাথন হোয়াইট নামে একজন কোম্পানির কর্মচারীকে বিবাহ করেন। উইলিয়াম বাউরিজ মারা যান ১৭২৪ সনের এপ্রিল মাসে ও জোনাথন হোয়াইট ২৩-১-১৭০৪ তারিখে। এলিজাবেথের এক ছেলে ছিল, নাম উইলিয়াম, ও এক মেয়ে, তার নামও এলিজাবেথ। মেরি ১৯-২-১৬৯৭ তারিখে, ক্যাথারিন ২১-১-১৭০১ তারিখে ও এলিজাবেথ ২-৮-১৭৫৩ তারিখে কলকাতায় মারা যান। মেরি ও ক্যাথারিনকে কবর দেওয়া হয় জোব চার্নকের পাশেই। চার্নক সমাধি-সৌধে তাঁদের স্মৃতিফলক আছে।

জোব চার্নকের মৃত্যুর তারিখ নিয়েও মতভেদ আছে। তাঁর সমাধি-ফলকে লেখা আছে—১০ জানুয়ারি ১৬৯২। এই থেকে অনেক মহা-মহারথীও সিদ্ধান্ত করেছেন তিনি ১৬৯২-তে মারা যান। এটি অপসিদ্ধান্ত। চার্নক মারা যান ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে।

চার্নকের হাতের লেখা পাওয়া গেছে। তার একটা নকল এক সংখ্যা ***Bengal Past and Present*** পত্রিকায় বেরিয়েছিল। ৭-৭-১৬৮৬ তারিখে হুগলি থেকে 'Mr. Fitzhugh & Ca Council at Balasore'-কে একটি চিঠি লেখা হয়েছিল। সেই চিঠিতে কলকাতা কাউন্সিলের সব সদস্যই সই করেছিলেন। প্রথমেই সই করেছেন জোব চার্নক প্রকাণ্ড অক্ষরে। দেখে মনে হয় এটা মানুষের সই নয়, দৈত্যের সই।

হ্যাকলুইট সোসাইটির (Hakluyt Society) প্রেসিডেণ্ট ইউল (Col. Henry Yule, R. E.C.B. LL. D.) ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর উইলিয়াম হেজেসের ১৬৮১-৮৭ সনের ডায়েরি সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ করেন। তাতেই তিনি জোব চার্নকের জীবনের প্রথম প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। তখনো পর্যন্ত চার্নকের কোথাও কোনো জীবনী লেখা হয় নি। পরে কর্নেল ইউলের সংগৃহীত মালমশলা অবলম্বন ক'রে ইংল্যাণ্ডের ***Dictionary of National Biography***-তে জোব চার্নকের একটি জীবনী লেখা হয়। তাতেও অনেক ভুল আছে। আশ্চর্যের বিষয় ***Encyclopaedia Britannica***-র ১৯৪৩-৭৩ সনের সর্বশেষ সংস্করণেও চার্নক সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ নেই। আছে ঐ বিশ্বকোষের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণে, যার নাম ***Micropaedia***। সেটা আসলে Britannica-র সূচিপত্রের দ্বিতীয় খণ্ড। প্রবন্ধটি খুব ছোট। সেখানে চার্নকের একটি প্রতিকৃতিও ছাপা হয়েছে। সেটি হোয়াইট সাহেবের প্রতিকৃতি থেকে ট্রটার (T. Trotter) নামে এক সাহেব (১৭৫০-১৮০৩) যে খোদাই করেছিলেন সেই খোদাই থেকে ছাপা। ছবিটি আছে ম্যানসেল (Mansell)-সংগ্রহে।

জোব চার্নক সম্বন্ধে বাদবাকি যা-কিছু সব কিংবদন্তি। চার্নক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি এক আতস কাঁচের সাহায্যে শত্রুপক্ষের

সবগুলি জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে আটকাবার জন্য গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত টানা এক মোটা লোহার শেকল তলোয়ারের একচোটে কেটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এমন কিংবদন্তিও আছে।

কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কিংবদন্তি হচ্ছে, স্বামীর চিতা থেকে জোর ক'রে উদ্ধার-করা তাঁর সুন্দরী হিন্দু যুবতী স্ত্রী সম্বন্ধে। কয়েক বছর পরদেশী স্বামীর ঘর ক'রে কয়েকটি কন্যারত্ন স্বামীকে উপহার দিয়ে তিনি যখন ওপারে চলে গেলেন, তখন শোকার্ত স্বামী তাঁর দেহকে কলকাতায় কবর দেন ও সেই কবরের উপর এক সমাধিমন্দির তৈরি করিয়ে দেন। আর প্রতিবছর তাঁর মৃত্যুতিথিতে তাঁর কবরের উপর একটি ক'রে মোরগ জবাই করতেন। এই গল্পটি প্রথম প্রচার করেন ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন তাঁর *A New Account of the East Indies* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন বিভিন্ন প্রাচ্যদেশে ১৬৮৮ থেকে ১৭২৩ সন পর্যন্ত ব্যবসা-সূত্রে ঘুরে বেরিয়েছিলেন।

কর্নেল ইউল এই গল্পকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মতপ্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "ঐ সময়ে পাটনা থেকে কিংবা ভারতের অন্য কোথাও থেকে একজন ইয়োরোপীয়ের পক্ষে সতী হতে যাচ্ছে এমন একজন হিন্দু বিধবাকে তাঁর স্বামীর চিতা থেকে জোর ক'রে হরণ ক'রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া একজন হিন্দু রমণীকে কবর দেওয়াই বা হয় কি ক'রে? এবং তাঁর শ্রাদ্ধের দিনে তাঁর কবরে হিন্দুদের চোখে যা অতি অপবিত্র এমন এক পাখিকে বলি দেওয়াটা কোন দেশীয় হিন্দু প্রথা?"

নবাবজাদা এ. এফ. এম. আবদুল আলি তো একে আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

আর একটা কথা। চার্নক হিন্দু রমণীকে চিতা থেকে উদ্ধার করলেন কোন জায়গায়? কেউ বলেন পাটনায়, কেউ বলেন কাশিমবাজারে। আবার কেউ কেউ বলেন ব্যারাকপুরে; কারণ তাঁরা বলেন চার্নক ব্যারাকপুরে থাকতেন, আর তারই থেকে ব্যারাকপুরের নাম 'চানক' হয়েছে। এইসব পণ্ডিতদের জানা নেই যে, ব্যারাকপুর নামটা মাত্র ১৭৭২ সনে হয়েছে। আর 'চানক' নাম জোব চার্নকের বহুপূর্ব থেকেই চলে আসছে। চার্নক কোনোদিন ব্যারাকপুরে থাকেন নি। বর্ধমান জেলাতেও 'চানক' নামে এক গ্রাম আছে। হিন্দু স্কুলের বিখ্যাত হেডমাস্টার রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের বাড়ি এই গ্রামে। সেখানেও কি চার্নক বাস করেছিলেন?

কর্নেল ইউল বলেছেন যে চার্নকের চরিত্র খুব ভালো ছিল একথা আমরা দাবি করতে পারি না। কেন পারি না তা জানা যায় হেজেস্-এর (William Hedges) ডায়েরি থেকে। তিনি লিখেছেন:

"আজ সকালে হুগলি ও কাশিমবাজারের শাসনকর্তা বুলচাঁদ একজন হিন্দু বড়লোককে আমার কাছে পাঠান। তিনি আমাকে বলেন যে চার্নক সাহেব এমন লজ্জাজনক কাজ করেছেন যাতে সমস্ত ব্রিটিশ জাতের মুখে চুনকালি পড়েছে। চার্নক সাহেব গত ১৯ বছর ধরে তাঁরই স্বজাতি (বা জ্ঞাতি, ইংরেজি 'of his kindred'—রা. মি.) এক হিন্দু রমণীকে রক্ষিতা রেখেছেন এবং যদি চার্নককে দিয়ে আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে না পারি তাহলে তিনি নবাবের কাছে নালিশ করবেন। যাতে আমাদের জাতের কলঙ্ক আর না বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে আমি তাকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উপস্থিত মতো নিরস্ত করলাম।

"এই ভদ্রলোক এবং আরো অনেক লোক আমাকে বলেছেন যে যখন চার্নক পাটনায় থাকতেন তখন নবাবের কাছে এই নালিশ করা হয়েছিল যে তিনি (চার্নক) একজন হিন্দু রমণীকে রক্ষিতা রেখেছেন। সেই মহিলার স্বামী তখনো জীবিত ছিলেন, কিংবা সবেমাত্র মারা গেছেন। সেই নারী তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে এবং আসবার সময় স্বামীর সব টাকাকড়ি ও অনেক দামী জহরত চুরি ক'রে নিয়ে এসেছে। এই কথা শুনে নবাব চার্নককে ধরে আনবার জন্যে ১২ জন সিপাই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চার্নক পালিয়ে যাওয়ায় তাঁরা তাঁর উকিলকে ধরে দু'মাস জেলে আটকে রেখে দেয়। আর সিপাইরা দিনরাত কুঠির ফটকের সামনে ধরনা দিয়ে বসে থাকে। তার ফলে চার্নক নগদ ৩ হাজার টাকা, ৫ থান খুব উৎকৃষ্ট পশমি কাপড় (Broadcloth) এবং কতকগুলি তলোয়ার নবাবকে উপহার দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে। এইরকম ঘটনা তার বহুবার কাশিমবাজারে ঘটেছে—একথা আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি।"

চার্নকের হিন্দু স্ত্রী বলে যাকে রটানো হয়, সে চার্নকের স্ত্রী ছিল না, উপপত্নী ছিল। হিন্দু মেয়ে ও খ্রীস্টান পুরুষের মধ্যে বিয়ে হতে পারত না। বিয়ে হতে হলে একজনকে তার ধর্মত্যাগ করতে হতো। চার্নক হিন্দু হন নি, কিংবা সেই মহিলাকে খ্রীস্টান করেন নি। সুতরাং বিয়ের কথাটা বাজে কথা। আর সে রক্ষিতা খুব সম্ভবত মুসলমান রমণী ছিলেন। তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল ও কবরের ওপর মোরগ জবাই করা হতো—এই প্রবাদই তার পরোক্ষ প্রমাণ। মুসলমান রক্ষিতা অনায়াসেই পাওয়া যেত, ফিরিঙ্গি মেয়েদের পরেই। খুব 'নীচ' জাতের ছাড়া হিন্দু মেয়ে পাওয়া যেত না। চার্নকের রক্ষিতা হিন্দু মেয়ে হয়ে থাকলে খুব 'নীচ' জাতের মেয়ে ছিল। তাছাড়া চার্নক যে একটি নারী নিয়েই আজীবন সন্তুষ্ট ছিলেন তারই বা প্রমাণ কি? বহু নারীর সঙ্গে সংসর্গ হতে বাধা কোথায়? হেজেস যে বলেছেন, এরকম কেলেঙ্কারি এক কাশিমবাজারেই চার্নক বহুবার করেছে—এই উক্তি কি একেবারেই অবিশ্বাস্য? অতএব এও

সম্ভব যে বিভিন্ন উপপত্নীর গর্ভে চার্নকের ৩টি মেয়ে ও ১টি ছেলের জন্ম হয়েছিল। ছেলের কথা আমরা পরে পাব।

রবার্ট অর্মি (Robert Orme) লিখেছেন যে নবাব চার্নককে কয়েদ ক'রে চাবুক বা বেত মেরেছিলেন ('scourged'—রা. মি.)।

ইউল সাহেব স্বীকার করেছেন যে চার্নক লোককে কথায় কথায় বেত মারতেন। কিন্তু এটা স্বীকার করেন নি বেত খেয়ে যখন লোকেরা ত্রাহিস্বরে চিৎকার করত বা কাঁদত, সেই কান্না শুনে তাঁর কানের খুব সুখ হতো।

চার্নক কোম্পানির ডিরেক্টারদের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। চার্নক সম্বন্ধে তাঁদের খুব উঁচু ধারণা ছিল। কিন্তু ভারতে কোম্পানির ক্যাপ্টেন-জেনারেল (সর্বেসর্বা) স্যার জন গোল্ডসবারো, যিনি চার্নকের মৃত্যুর অল্পকাল পরে সুতানুটিতে এসেছিলেন তাঁর মত চার্নক সম্বন্ধে অন্যরকম ছিল। ১৬৯৩ সনে লেখা এক রিপোর্টে তিনি চার্নকের শাসনপটুতার ও ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন চার্নক কুঁড়ে ছিলেন, কর্তব্য পালন করতে গড়িমসি করতেন ও তাঁর সহকর্মী ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে কপটাচরণ করতেন।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সর্বশেষ সংস্করণের *Micropaedia*-তে চার্নক সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তা উদ্ধৃত ক'রে আমি চার্নক-চরিত্রের প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি। তাতে লেখা হয়েছে :

> Frequently at odds with Indian leaders and his superiors, Charnock was at times accused of mismanagement, theft, brutality to Indian prisoners and having questionable morals ; he was once recommended for dismissal.

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে কর্নেল হেনরি ইউল সখেদে লিখেছিলেন : "জোব চার্নক ব্রিটিশ-ভারতের গোড়ার ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। অথচ কোনো জীবনীকোষেই তাঁর নাম নেই। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ('origin') সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আমি এ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারি নি।"

ইউল সাহেব যদি আর ৩০ বছর বাঁচতেন তাহলে জোব চার্নকের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে দুঃখ করতে হতো না। ১৯১৭ সনে দু'টি উইল প্রকাশিত হয়—একটি চার্নকের পিতার এবং আর একটি তাঁর নিজের। এই দু'টি উইল থেকে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় অনেকখানি পাই।

এই দু'টি উইল খুব বড়, ইংরেজি ভাষায় লেখা। সেই ইংরেজিও আবার আধুনিক ইংরেজি নয়, ৩০০ বছর আগেকার পুরনো ইংরেজি ; তার ওপর সোজা ভাষা নয়, আইনের ঘোরালো-প্যাঁচালো ভাষা। প্রায় প্রতি শব্দের বানান ভুল (তখন এইরকম বানানই চলিত ছিল), যতি-চিহ্নের কোনো বালাই নেই, নামবাচক বিশেষ্য নয়, জাতিবাচক বিশেষ্য শব্দ, তাও আরম্ভ হয়েছে বড়হাতের অক্ষর

দিয়ে। মানে বুঝতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। সুতরাং বাংলায় অনুবাদ করার প্রচেষ্টা না ক'রে মূল ইংরেজি ভাষায় উইল দু'টি নিচে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম। প্রথমে চার্নকের পিতার, পরে চার্নকের উইল দিলাম। পিতার উইল অত্যন্ত বড় ও অবান্তর কথায় পূর্ণ। তাই তাঁর সমস্ত উইলটা না দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশমাত্র তুলে দিলাম। জোব চার্নকের পুরো উইলটাই দিয়েছি, মাত্র কয়েকটি বাজে শব্দ বাদ দিয়ে।

Last will and Testament of Richard Charnocke made in the presence of John Alsoppe, Scrivener, William Braxton and John Bargeman, his servants the second day of April Anno Domini one thousand six hundred and sixty three.

I Richard Charnocke of the parish of St. Mary Wool-Church London, Yeoman, make and ordaine this my Present Testament (conteyning there are my last will).

My body I commit to the Earth to be buried in the Parish Church St. Katherine Creechurch London. And my will is that not above the summe of Eight pounds shall be spent upon the charge of my funerall. And I will that all such debts and duties as I shall truly owe to any Person or Persons att the tyme of my decease shall be well and truly paid within as short a tyme after my decease as may be conveniently And as touching that worldly meanes and estate that it hath pleased Almighty God of his mercy and Goodness to bestow upon me, …I doe give devise bequath and dispose thereof in manner and forme following—

First I give and bequath unto my sonne Stephen Charnocke All that my messuage, Tenement or Inne with the appurtenances commonly called or knowne by the name or signe of the Bell scytuate lying and beingin theCounty of Bedford. And all the land now thereunto belonging and therewith used All which premisses are now in the tenure of George Sayers or his assignes for the term of his natural life and the Reverseon of the said Messuage and

Land with the appurtenances expedant after the decease of my said sonne StephenCharnocke I doe give and devise unto the Parson and Church wardens of the Parish Pennerton(Penwortham, a Parish in the hundred of Leyland, Lancaster, two miles S. W. of Preston) in the County of Lancaster. And to their successors and assignes forever upon Trust and confidence that out of the Rents thereof the said Parson and Church wardens and their successors shall yearly and every yeare forever place out to apprentice in London Two Poore Boyes borne in Hutton(a township in Penwortham containing a grammar school) in the said Parish of Pennerton, or within some other village or place in the same Parish.

I give and bequath unto my said sonne StephenCharnocke the summe of Twenty Pounds of lawful money of England and a Trunke with Barres corded upp with such Lynnen and other things as are or shall be there in at the tyme of my decease.

I give and bequath my sonne Job Charnocke the sum of six hundred Pounds of lawfull money of England.

I give to my brother William Marsh the summe of Twenty Pounds of lawfull money of England and to my sister Mary Marsh his wife the sum of Forty Shillings of like money and to each of their Four Children now at home with the summe of Forty Shillings a Peece of like money.

I give unto Samuell Waters Grocer in Candleweek Street (at the eastend of 'Great East-Cheap', now known as Cannon Street) London the summe of Ten Shillings of like money to buy him a Ring.

I give unto Mr. Thomas Bateman Merchant sometymes servant to Mr. Michael Markeland the sum of six pounds of lawfull money of England. And into James Hall Woollen draper in Candleweek Streete aforesaid the like

summme of six pounds of like money.

The Rest and Residue of all and singular my goods chattells ready moneyes Plate lesses debts and other things whatsoever to me belonging and not before in these Presents given and bequathed I give and bequath unto my said two sonnes Stephen Charnocke and Job Charnocke to be equally divided between them which said Stephen Charnocke and Job Charnocke my sonnes I do make ordaine and appoint the full executors of this my Present Testament and Last Will.

And I do make nominate and appoint my said brother William Marsh and the said Thomas Bateman and James Hall the Executors of this my will in Trust for the benefit of my said sonnes in case my said sonnes shall be out of England att the tyme of my decease.

And my will and mind is that if my said sonne Job Charnocke shall happen to depart this life before his return to England then the six hundred pounds to him above herein bequathed shall be disposed of and accrue as followeth (that is to say) one Hundred pounds thereof shall accrue and come to the Five Children of my said brother William Marsh in equal shares and Proportions And the other Five hundred pounds residue thereof shall come and accrue to my said sonne Stephen Charnocke.

And my will and mind is that my Executors in trust in the absence of my sonnes shall have power to put forth any moneyes of myne att Interest for the benefit of my sonnes the bonds for which moneyes Soe to be put out shall be taken in the names of my said Executors in Trust and in the conditions of the same the moneyes shall be expressed to be for the use of my said sonnes And then and in such case if any losse doe happen to my Estate my Executors shall not be therewith chargeable.

Editor's note :

Probate was granted to Stephen Charnocke on the 2nd

June 1665 power being reserved to issue the same to Job, the other executor, on his return to England.

এবার জোব চার্নকের উইল :

Job Charnock's Last Will and Testament.

In the name of God Amen.

I Job Charnock at present Agent for Affairs of the Right honoble English East India Company in Bengall being indisposed in body but perfect and sound in mind and memory, make and ordaine this to be my last will and Testament (vizt).

I bequeath my soul to Almighty God who gave it and my body to be decently buriyed at the discretion of my overseers and for what estate it hath pleased Almighty God to bless me withall I doe hereby will and bequeath it as followeth.

I will and bequeath that all debts or claims lawfully made on me be discharged by my overseers.

I give and bequeath to my beloved Friend Daniel Sheldon Esquire [chief of Kasimbazar Factory, 1658-65.—R.M.] Seventy Pounds Sterling as a Legacy to buy him a Ring

I give and bequeath to the honoble Nath [aniel] Higginson [Governor of Fort St. George, Madras, 1692-93.—R.M] as a Legacy to buy him a Ring four hundred Rupees.

I give and bequeath to Mr. John Hill [Secretary and Captain of the soldiers—R.M.] as a legacy to buy him a Ring two hundred Rupees and that likewise he be paid out of my parte of the permission Trade Commission one hundred Rupees more in all three hundred Rupees.

I give and bequeath to Mr. Francis Ellis [Second of Hooghly Council, succeeded Charnock as Agent at Sutanuti, dismissed by Sir John Goldsborough in 1693.—R.M.] as a legacy to buy him a ring one hundred and fifty

Rupees.
I do hereby ordaine and appointed (sic) the honoble Nathaniel Higginson President of Madras and Mr. John Beard of Councill in Bengal [Governor of Bengal, 1701-06.—R.M.] to be overseers of this my will.
I give and bequeath to the Poore of the Parish of Creechurch London the summe of Fifty Pounds Sterling.
I give and bequeath Budlydasse [Badridas—R.M.] one hundred Rupees and the meanest sort of my sonnes cloathes lately deceased.
I give and bequeath to the Doctor now attending me fifty Rupees.
I give and bequeath to my servants Gunnysham [Ghanashyam—R.M.] and Dallub [Durlabh—R M.] each twenty Rupees.
I give and bequeath after the Payment of the above mentioned debts and Legacies that all my whole Estate in India and elsewhere be equally given and distributed to my three daughters Mary Elizabeth and Katherine only with this reservation that as an addition to my daughter Mary's Portion there shall be paid her out my daughter Eliza[beth] and Katherine two thirds six hundred pounds Sterling.
I will and desire that my overseers before mentioned that my three daughters be sent with a convenient handsome equipage for England and recommended to the care of my well beloved friend Daniell Sheliton [Sheldon—R.M.] Esqr. in London and that there Estates be invested in goods Proper for Europe and sent as by the Right honoble Companyes Permission on as many and such ships as my overseers shall think Convenient.
I hereby aquit Mr. Charles Pate for his debt to me of Fifty Pagodas lent him at the Fort [Fort St. George, Madras.—R.M.].
I will and ordaine the honoble Daniell Sheldon and my

eldest daughter Mary Charnock to be Executors of this my last will and Testament revoking and disannulling all former or other will or wills that have been made in witness whereof I have hereunto putt my hand and seale this ninth day of January one thousand and six hundred and ninety two [1692-3].

Job Charnock

Signed and sealed in the presence of

Johathan White

Francis Houghton

John Hill

Editor's Note :

Probate was granted on the 12th June 1695 to Robert Dorrell attorney to Mary Charnock, Daniel Sheldon renouncing.

এই উইলটি প্রকাশ করেন লেফটেনাণ্ট কর্নেল স্যার রিচার্ড কার্নাক টেম্পল ব্যারনেট (Carnac Temple Bart.),—ইনি বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর ও পরে বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর পুত্র। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ও উপভাষায় অসংখ্য লোককথার সংগ্রাহক ও রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র *Folk Tales of Bengal*-এর প্রেরণাদাতা। তিনি চার্নক বংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য দিয়েছেন :

"চার্নক বংশের আদিনিবাস ছিল ইংল্যাণ্ডের ল্যাংকাশায়ারে। তাঁরা ঐ কাউন্টির লেলান হান্‌ড্রেডের যেসব স্থানে বাস করেছেন সেইসব স্থানের নাম তাঁরা ব্যক্তিগত নামরূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন চার্নক রিচার্ড, হিথ চার্নক ও চার্নক গোগার্ড। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এইসব স্থান-নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং চার্নক রিচার্ড ও চার্নক হিথ নামে দু'টি গ্রামকে এখনো ঐ নামে ডাকা হয়।

"রিচার্ড চার্নকের Penwortham ও Hutton-কে অর্থদান করা থেকে বোঝা যায় ঐ দু'টি Parish সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ দু'টির মধ্যে একটি হয়তো তাঁর নিজের জন্মস্থান ছিল। দুর্ভাগ্যবশত Penwortham-এর পুরনো রেজিস্টারগুলি, যা পাওয়া গেলে ঐ বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যেতে পারত, সেগুলি ১৮৫৭ সনে আগুন লেগে পুড়ে গেছে।

"১৬ শতাব্দীতে চার্নক বংশের একটা শাখা লণ্ডনে এবং আর একটা

Bedfordshire-এর Hull Cott-এ বসবাস আরম্ভ করে এবং রিচার্ড চার্নক একদিকে লণ্ডনের অধিবাসী, অন্যদিকে Bedford-এ স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় হয়ত দুই শাখার সঙ্গেই জড়িত ছিলেন, কিন্তু তার সত্যিকার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি।

"রিচার্ড চার্নকের বড়ছেলে জোব চার্নকের দাদা, স্টিফেন চার্নক পিউরিটান পাদরি ও অলিভার ক্রমওয়েলের পুত্র আয়ারল্যাণ্ডের ডেপুটি, হেনরি ক্রম-ওয়েলের যাজক ছিলেন। তিনি ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে St. Catherine Cree Church Parish-এ জন্মান। সেই Parish-এই জোব চার্নক তাঁর দু'তিন বছর পরে জন্মান। পরে পিতা রিচার্ড কার্নাক সম্ভবত St. Mary Wool Church Parish-এ গিয়ে বাস করেন। (১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের মহাগ্নির পর St. Mary Wool Church-এর পোড়া গির্জাটি আর নতুন ক'রে তৈরি করা হয় নি) এবং সেখানেই তিনি মারা যান।

"Mr. Wood রিচার্ড চার্নককে অ্যাটর্নি বা সলিসিটার বলেছেন। কিন্তু আমি ঐ সময়ের সলিসিটার কোনো রিচার্ড চার্নকের রেকর্ড অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাই নি।"

৭

সামাধ্যায়ী, রাহা ও কিছু প্রশ্নোত্তর

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রসঙ্গে মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর কথা কিছু বলেছিলাম। (দ্র. পৃ ১১০)। সেকথা নজরে আসায় দিল্লি থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ মশাই আমাকে লিখেছেন : "আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে চিতাভস্ম হতে তুলে লোকটাকে জনসমক্ষে উপস্থিত করেছেন। বিচিত্র তাঁর কর্মজীবন, জন্ম বিক্রমপুর (ঢাকায়)—কর্মস্থল কলিকাতার বিভিন্ন সংগঠনে, হুগলীতে ও বারাণসীতে।" শ্রীযুক্ত গুহ চেয়েছেন, আমি মোক্ষদাচরণ সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁর সঠিক জীবনী লিখি। তাঁর সদিচ্ছা পূরণ করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু এতদিন পরে সামাধ্যায়ীর সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া অসাধ্য। তবু আমি চেষ্টা আরম্ভ করেছি। এ পর্যন্ত যেটুকু তাঁর সম্বন্ধে জানতে পেরেছি তা এই।

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর জন্ম আনুমানিক ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার পাইকপাড়া গ্রামে। এঁর বংশগত উপাধি খাসনবিশ। পিতা শ্যামাচরণ খাসনবিশ। কাশীতে বেদ পড়ে 'সামাধ্যায়ী' উপাধি পান। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'সন্ধ্যা' পত্রিকার ম্যানেজার হয়েছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীন কলকাতার বঙ্গীয় জাতীয় কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। 'যুগান্তর' দলের বিপ্লবীদের গোপনে পরামর্শ ও আশ্রয় দিতেন। ১৯০৯ সনে হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বর থানার অধীন বিরাটি গ্রামে কিশোরীমোহন রায়ের বাড়িতে ১৬ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে

স্বদেশী ডাকাতি হয়। মোক্ষদাচরণ ১৯০৯ সনে এই ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর সাজা হয় নি, তিনি ছাড়া পান। ফের তাঁকে ৪ জন ডাকাতকে লুকিয়ে রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু হাওড়ার জুরি তাঁকে নিরপরাধ বলে ছেড়ে দেয়। ছাড়া পাবার পর ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় ফিরে যান। ১৯১১ সনে কলকাতায় ফিরে আসেন। ঐ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়েন্দা হেড কনস্টেবল সুরেশ (শ্রীশ?) চক্রবর্তী নিহত হয়। তার হত্যার সঙ্গে মোক্ষদাচরণ জড়িত ছিলেন বলে পুলিশের ঘোরতর সন্দেহ হয়, কিন্তু প্রমাণাভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। ১৯১১সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি কাশীতে ফিরে আসেন এবং সেখানে ১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসে একটা জীবনবীমা সংক্রান্ত প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ৩ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। (শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশের সৌজন্যে পাওয়া পুলিশ-রিপোর্টের ভিত্তিতে আমি একথা লিখলাম।)এই আপাত-গর্হিত কাজ তিনি করেছিলেন দেশোদ্ধারের জন্য। তাঁর মত ছিল, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কোনো উপায়ই নিন্দনীয় নয়।

'যুগান্তর' নেতা শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁর 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' গ্রন্থে বলেছেন:

"১৯২০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব তোলার সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন গণ-চাঞ্চল্য দেখা দেয় যে, ইংরেজ সরকার, ইংরেজ ব্যবসায়ী ও নাগরিক আন্দোলনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এ আতঙ্ক যুদ্ধের যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের এবং রাওলাট রিপোর্ট প্রকাশের পর বাংলাতেই বিশেষ ক'রে দেখা দেয়। তার ফলে বাংলা সরকার, ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইংরেজের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এবং দেশী ও বিদেশী ব্যারিস্টারেরা মিলে Citizen Protection League বলে এক রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে। সরকারী-বেসরকারী টাকায় চেষ্টা হয় একটা বেসরকারী কর্মীসংঘ গড়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার। এই চেষ্টার সক্রিয় ভূমিকা ছিল দেশী ব্যারিস্টারদের—বিশেষত এস. আর. দাস ও বি. সি. চ্যাটার্জির। এঁরা চেষ্টা করেন মুক্ত বিপ্লবীদের বোঝাতে যে, তাঁরা তো অহিংসায় বিশ্বাস করেন না, সুতরাং গান্ধী যখন দেশকে অহিংসার ভ্রান্ত পথে নিয়ে চলেছেন, তখন তাঁরা গান্ধীর সঙ্গে কেন যাবেন।

"এঁরা আরো বলেন, বরং এঁদের অর্থানুকূল্যে যদি এঁরা শহরে ও গ্রামে প্রচার চালান ও সংগঠন গড়েন তাহলে তার সাহায্যে ভবিষ্যতে বিপ্লবের কাজের সুযোগ বাড়বে। অন্য বিপ্লবীরা বিশেষভাবে এই অর্থ সাহায্যকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং ওদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন।··· পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে এঁরা (অনুশীলন দল—রা. মি.) সহজেই এই

সাহায্য গ্রহণে রাজী হলেন এবং 'ভারতসেবক সংঘ' গড়লেন। নলিনীকিশোর গুহের সম্পাদনায় 'হক কথা' নামে গোপন প্রচারপত্র এবং 'শঙ্খ' নামে সাপ্তাহিক ক গজ বের করেন। এর সাহায্যে এঁদের কর্মীরা জেলায় জেলায় অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকেন।"

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত কি 'অনুশীলন সমিতি'র ওপর আক্রোশবশে মিথ্যা কথা লিখেছিলেন? তা তো নয়। এ বিষয়ে স্বয়ং পুলিনবিহারী দাস কি লিখেছেন দেখা যাক। তিনি তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন:

"বাংলাদেশের কারাগার মুক্ত বিপ্লবীদের আহ্বানে নিগৃহীত সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হই। সেই সম্মিলনীতে আমি যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিল'ম··· (সে) প্রবন্ধটি ইংরাজীতে লিখিয়া দিয়াছিলেন ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জী।

"সভা শেষ হইলে এস. আর. দাস আমাকে ডাকিয়া তাঁহাকে নিজের পরিচয় দিলেন এবং পরের দিন সকাল বেলায় তাঁহার বাসায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্বে আমি এস. আর. দাসকে চিনিতাম না, নামও শুনি নাই।

"পরেব দিন সকালে এস. আর. দাসের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে তাঁহার সহিত গান্ধী সম্বন্ধে ও তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা উভয়েই গান্ধী ও তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী, সুতরাং একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব হইতে পারে কি না?

"আমি বলিলাম কি কি কাজ এবং কর্মপদ্ধতিই বা কি হইবে, তাহা বুঝিতে পাবিলে আমি আমার মতামত জানাইতে পারি।

"এস. আর. দাস বলিলেন, কাজ শুধু অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন ত্রুটিগুলি দেশের জনসাধারণকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহার কর্মপদ্ধতি ও কার্য্য পরিচালনাব ভার আপনাকেই লইতে হইবে, ব্যয়ভার সম্পূর্ণ আমি বহন করিব।

"আমার পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক হইল যে · নিজেদের একটি পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন কতকগুলি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে··· বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে।···

"এস.আর. দাস আমাকে যথাযোগ্য অর্থপ্রদান করিয়া কার্য্যারম্ভের নির্দেশ দিলেন। আমি 'ভারতসেবক সংঘ' নাম দিয়া এক নূতন সমিতি স্থাপন করিলাম। অনুশীলন সমিতির সভ্যগণই কর্মী হইল, নলিনী গুহ প্রবন্ধ লিখিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিল। নলিনী গুহের প্রস্তাবনা মতেই এই প্রবন্ধগুলির নাম 'হক কথা' হইল। ক্রমে এস. আর. দাস 'স্বরাজ' পত্রিকা প্রকাশ

করিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল পরে নলিনী গুহই সম্পাদক হইল।

"হক কথা প্রচারের ফলে দেশের মধ্যে বিশেষভাবেই উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। গান্ধীভক্ত কংগ্রেসসেবিগণ সকলেই আমাদিগকে গালাগালি দিতে লাগিল। 'যুগান্তরে'র সভ্যগণ আমাদিগকে গভর্নমেণ্টের অনুচর বলিতে লাগিল।...কিন্তু আই. বি. সেন, বি. সি. চ্যাটার্জ্জী, শাসমল প্রমুখ ব্যারিষ্টারগণ আমাদিগের কার্য্যকলাপ সমর্থন করিয়াই মতপ্রকাশ করিলেন।

"নানারূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও 'ভারতসেবক সংঘে'র কার্যাকলাপ চলিতে লাগিল। এই সময়ে নলিনী গুহের প্রস্তাবে অনুশীলন সমিতির কর্মিগণ সিদ্ধান্ত করিল যে, এস.আর. দাসের নিকট হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহারই এক অংশ দ্বারা তাহারা মুখপত্র স্বরূপ 'শঙ্খ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিবে। কর্মিগণের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আমিও বাধা দিলাম না। এই সম্পর্কে নলিনী গুহই সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিল।"

দেখা যাচ্ছে ৺পুলিন দাসের লেখায় ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখায় কোনো তফাত নেই। কিন্তু শ্রীনলিনীকিশোর গুহ মশাই তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' বইয়ে এ বিষয়ে একটা কথাও লেখেন নি।

কিন্তু ভারতসেবক সংঘ, শঙ্খ, হক কথা ইত্যাদির সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। এগুলিকে পাঠকদের সামনে আনা হয়েছে, আমি যা বলতে যাচ্ছি তার পটভূমি হিসেবে। আমার সঙ্গে যার সম্বন্ধ সে ব্যাপারটি পুলিন দাস ও নলিনী-কিশোর গুহ জেনেও বলেন নি। আর ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মনে হয় জানেন না বলে বলেন নি।

১৯২০ সনে অন্তরীণ, জেল ও বন্দীশিবির থেকে অনুশীলন সমিতির যেসব কর্মী ছাড়া পেয়েছিলেন সেইসব কপর্দকশূন্য কর্মীদের ৪৭নং বেনেপুকুর রোডে পুকুর ও বাগান-সমেত একটা দোতলা বাড়িভাড়া ক'রে নিখরচায় থাকা ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্যবস্থা করেছিলেন ও সমস্ত খরচ যোগাতেন এদেশী ব্যারিস্টারা। তাঁদের ৪ জনের নাম তো আমরা পুলিন দাসের লেখাতেই পেয়েছি। এই বাড়িতে অনুশীলন সমিতির কর্মী ছাড়া অন্য কোনো দলের কর্মী থাকতেন না। শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ঐ দলের তরফ থেকে এই বাড়িতে থাকতেন। আর আবাসিকদের দেখাশোনা করতেন 'রাহা' উপাধিধারী ওয়াই. এম. সি. এ.-র সদস্য একজন বাঙালি খ্রীস্টান ভদ্রলোক। তিনি ওয়াই.এম. সি. এ-র জেনারেল সেক্রেটারি কে. টি. পালের নির্দেশে এই তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন। ১৯২০ সন ও ১৯২১ সনেরও বোধহয় কিছুকাল কর্মীরা এখানে ছিলেন। ১৯২১ সনে এইসব কর্মীদের অধিকাংশকে নিয়েই 'ভারতসেবক সংঘ' গড়া হয়।

বেনেপুকুর রোডের এই বাড়িতে অনুশীলন সমিতির কর্মীদের সঙ্গে থাকতেন

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। তিনি কর্মীদের বেদ পড়াতেন। একথা আমি জেনেছি আমার বন্ধু শ্রী ধরণী গোস্বামীর কাছ থেকে। তিনি নিজে অনুশীলন দলের কর্মী ছিলেন। বছর খানেক এই বাড়িতে থেকেছেন ও পণ্ডিত সামাধ্যায়ীর কাছে বেদ পড়েছেন।

সামাধ্যায়ী কর্মবীর ছিলেন, তা সত্ত্বেও লেখার কাজে তাঁর অবহেলা ছিল না। তিনি এই বইগুলি লিখেছিলেন: ১. দাদাভাই নওরোজির জীবনী (৪৯ পৃষ্ঠা), ১৯২০, ২. টলস্টয়ের জীবনী (৭৭ পৃষ্ঠা), ১৯২১; ৩. মহাত্মা গান্ধী (১৬ পৃষ্ঠা), ৯২১; ৪. বেদ পরিচয় (২৯৬ পৃষ্ঠা), ১৯২৯; ৫. বারভুঁইয়া (৯২ পৃষ্ঠা), ১৯৩৮; ৬. লোকমান্য তিলকের জীবনী; ৭. সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি; ৮. পাণিনীয় পতঞ্জলীকৃত মহাভাষ্যের বঙ্গানুবাদ (৮০০ পৃষ্ঠা); ৯. টলস্টয়-কৃত রুশবিপ্লবের বঙ্গানুবাদ; ১০. শুক্রনীতি (বঙ্গানুবাদ-সমেত); ১১. প্রাচীন ভূগোল। (শেষের ৩খানি বই ১৯২১ সনে যন্ত্রস্থ ছিল। পরে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা আমি জানি না।)

সামাধ্যায়ীর লেখা মাত্র একটি বইতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কথা আছে—সেটি টলস্টয়ের জীবনী। এই বইটি তিনি তাঁর স্বর্গীয়া মাতৃদেবীকে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ-পত্র থেকে জানতে পারা যায় তাঁর মায়ের নাম ছিল বরদাসুন্দরী দেবী। ১৯২০ সনে সামাধ্যায়ী অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত হন। মুক্ত হবার মাত্র একমাস আগে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর এক বছর আগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেন নি। মোক্ষদাচরণের যখন মাত্র ৬ বছর বয়স তখন তাঁর পিতা মারা যান। মা-ই তাঁকে মানুষ করেন।

এই উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন: "যে জন্মভূমির জন্য বহুবর্ষব্যাপী বহুকষ্ট পাইয়াছি, দশটি কারাগার দর্শন করিয়াছি, পৈতৃক বাস্তুভূমি উৎসন্ন দিয়াছি, তোমাদিগকে চিরদুঃখিনী করিয়াছি, সে তোমারও জন্মভূমি। আশীর্ব্বাদ করিও যেন, তোমার ও আমার জন্মভূমির দুর্গতি, আরও অনেক ক্লেশভোগ করিয়া বা দেহান্ত পর্য্যন্ত করিয়া দূর করিয়া যাইতে পারি।"

এই বইয়ের শেষদিকে মোক্ষদাচরণ লিখেছেন: "শ্রমজীবিগণ ধনজীবিগণের আধিপত্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য নানাভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে কৃতকার্য্যও হইয়াছে—এই পুরুষকারকে কে বাধা দিবে? আমাদের বিশ্বাস ইহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়া ছাড়িবে।"

সামাধ্যায়ী বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সন্তানাদি হয় নি। 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধানে' তাঁর সম্বন্ধে এইটুকু লেখা আছে: "সুবক্তা ছিলেন। রাজনীতি থেকে সরে এসে ত্রিবেণীতে সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। মৃত্যু ৮-৮-১৯৩১ তারিখে।"

'বারভুঁইয়া'র প্রকাশকাল ১৯৩৮। তাহলে কি বইখানি তাঁর মৃত্যুর পর

প্রকাশিত হয়েছিল ? অথবা ঐ প্রকাশের তারিখ ভুল ? অথবা মৃত্যু তারিখ ভুল ?

সামাধ্যায়ী-পর্ব এখানেই আপাতত শেষ হল। যদি ভবিষ্যতে তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তখন দেওয়া যাবে।

কিন্তু তাঁর সূত্রে 'রাহা' উপাধিধারী যে বাঙালি খ্রীস্টান ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করেছি (পৃ ১৪১), তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু বলা দরকার।

বাংলাদেশের সুসন্তানদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খ্রীস্টান—প্রথম যুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়), কুমারী তরু দত্ত—শেষের দিকে ডাক্তার প্রাণধন বোস, রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজন খ্রীস্টান ছিলেন অপূর্বকুমার ঘোষ। ইনি ব্যারিস্টার, বঙ্গভঙ্গের যুগে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ও কট্টর সমাজতন্ত্রী ছিলেন। এঁকে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। আর মিঃ রাহার নাম তো কেউ বোধহয় শোনে নি, সুতরাং ভোলার প্রশ্নই ওঠে না।

মিঃ রাহার নাম ছিল র‍্যানডল্‌ফ ওগিলভি রাহা (Randolph Ogilvie Raha)। এঁর পিতার নাম কমলকৃষ্ণ রাহা। পিতার সমাধি লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে আছে। মিঃ র‍্যানডল্‌ফ রাহা রণেন রাহা নাম নিয়ে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হস্টেল ও মেসের পরিদর্শক হন। তিনি বিবাহ করেন নি। ৩১/১নং আমহার্স্ট স্ট্রিটের সেণ্ট পল কলেজের হস্টেলে থাকতেন। তিনি মৃত্যুর আগে ১৬-১-১৯৩৯ তারিখে একটি উইল ক'রে যান। তাতে এই নির্দেশগুলি দিয়ে যান :

১. তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর দেহ কোনো হিন্দু শ্মশানে দাহ ক'রে চিতাভস্ম যেন তাঁর পিতার কবরে পুঁতে দেওয়া হয়।

২. তাঁর বইপত্র ও ছবির যে ছোট লাইব্রেরি আছে সেটি যেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজকে দিয়ে দেওয়া হয়।

৩. তাঁর বাদবাকি সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি যেন তাঁর ভগ্নীকে নিঃশর্তভাবে দিয়ে দেওয়া হয়।

৪. তাঁর জহরত ও আসবাবপত্র যা এখন তাঁর ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রীর—মিঃ ও মিসেস কেনেথ সি. রিচি-র—দখলে আছে সেগুলি তাঁর বড়ছেলে এডোয়ার্ড অ্যালবার্ট পাবে।

তাঁর মৃত ভগ্নী মেলভিনা, যিনি মিঃ রোলাণ্ডচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন, তাঁর কয়েকটি পুত্রকন্যা আছে।

উইলকারী মিঃ রাহা হাঁপানি রোগে ভুগছেন। তাঁর বাদবাকি সমস্ত সম্পত্তি, যার মোট দাম ২৫, ৯৯৭ টাকা ৬ আনা ৯ পাই, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যাচ্ছেন। ঐ টাকার উপস্বত্ব থেকে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুযোগ্য ছাত্র, যারা হিন্দু পিতামাতার সন্তান, তাদের প্রত্যেককে নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোনো একটি শেখবার জন্য ৩ বছর অন্তর মাসে ৭৫ টাকা ক'রে ৩ বছরের জন্যে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হবে—ক. ব্যবহারিক ব্যোমযান বিদ্যা (Practical Aeronautics), খ. ব্যবহারিক ডুবো জাহাজ বিদ্যা (Practical Submarine), গ. ব্যবহারিক সামরিক বাস্তুবিদ্যা (Practical Military Works), ঘ. পল্লী পুনর্গঠনের সর্বাধুনিক প্রণালী ও হস্তশিল্প।

শিক্ষা শেষ করবার পর প্রাক্তন ছাত্রেরা নিজস্ব কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে ঐ টাকা থেকে তাদের ভরণপোষণের জন্য একবছর সাহায্য দেওয়া হবে।

উইলকারী ডাক্তার জে. সি. গ্রিফিথ্‌স নামে আর এক ভগ্নীকে (তিনি তখন মিরাটে বাস করতেন) উইলের কার্যকারিণী নিযুক্ত ক'রে যান। মিঃ রাহার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়িকা কুমারী ক্ল্যারিস গ্রেস সলোমন ২৫,৯৯৭ টাকা ৬ আনা ৯ পাই-এর চেক উইলের নির্দেশ অনুসারে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে পাঠিয়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় ৬-১২-১৯৪১ তারিখে ঐ চেক গ্রহণ করেন।

মিঃ রাহা মিঃ রোল্যাণ্ডচন্দ্র নামে তাঁর যে ভগ্নীপতির কথা উইলে উল্লেখ করেছেন, তিনি পাটনায় ব্যারিস্টারি করতেন। তাঁরা ৩ ভাই—বড় রোল্যাণ্ড-চন্দ্র, মেজ স্যামুয়েলচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার ছিলেন ও ছোট রায়বাহাদুর নেভিলচন্দ্র কলকাতার শুল্ক (Customs) বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বড়ভাই মিঃ রাহার ভগ্নী মেলভিনাকে ও মেজভাই একজন মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করেন। ছোটভাই বিয়ে করেন নি। মেজ ও ছোটভাই মিলে ১৫নং বেনেপুকুর রোডে ১৯৩৩ সনে House of Prayer and Good News নামে একটি Pentecostal Chapel প্রতিষ্ঠা করেন। গির্জাটি এখনো আছে। কিন্তু চন্দ্রেরা সকলেই গত হয়েছেন। রোল্যাণ্ডচন্দ্রের এক পুত্র ছিলেন। তিনিও পাটনায় থাকতেন। তিনি এখনো জীবিত আছেন কিনা জানি না।

মিঃ রাহার মতো সংস্কারমুক্ত, উদার প্রকৃতির মানুষ সব দেশেই ও সব কালেই বিরল। তিনি চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের সদস্য ছিলেন, থাকতেন চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের কলেজ হস্টেলে, অথচ তাঁর লাইব্রেরিটি রোম্যান ক্যাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজকে দান করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হল না। ক্রিশ্চান হলেও তাঁর মৃতদেহ হিন্দুমতে সৎকার করার ও মাত্র হিন্দু পিতামাতার সন্তানদের

ছাত্রবৃত্তি দেবার নির্দেশ দিতে তাঁর আদৌ বাধল না। আর এতবড় দেশপ্রেমিক বড় একটা দেখা যায় না। তিনি দেশের ছেলেদের সেইসব বিদ্যা শেখাতে চেয়েছিলেন যা সচরাচর শেখানো হয় না, অথচ যা শিখলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়। বৈপ্লবিক মন না থাকলে তিনি সেযুগে ছেলেদের সামরিক বিদ্যার বিভিন্ন বিষয় হাতেকলমে শেখাবার কথা চিন্তা করতেই পারতেন না। এমন লোককে না জানা, বা জেনে ভুলে যাওয়া, দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা।

প্রশ্নোত্তর

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পরমভক্ত, ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল গবেষণারত ও সেই গবেষণার ফলস্বরূপ 'সমন্বয়-মার্গ' নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মশাই সম্প্রতি আমাকে লেখেন: "Vincent's Home Hospital ১৮৭০-৭১ সালের মধ্যে কলকাতার কোন জায়গায় ছিল জানালে বিশেষ উপকৃত হব। এই গৃহে পরবর্তী সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 'ভারতাশ্রম' আনা হয়েছিল।"

আমি তাঁকে জানিয়েছি: "Daughters of the Cross নামে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে বেলজিয়াম থেকে কলকাতায় আসেন ও ১-৩-১৮৬৯ তারিখে সেন্ট ভিনসেন্টস হোম (হাসপাতাল নয়) প্রতিষ্ঠা করেন তখনকার ব্রজনাথ ধরের বাগানবাড়িতে। সেইখানে ঐ হোম ছিল ১৮৬৯ সনের ১লা মার্চ থেকে ১৮৭৩ সনের ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত। ১৮৭৩ সনের ২০শে অক্টোবর তারিখে ঐ বাগানবাড়ি থেকে তার বর্তমান আবাস খিদিরপুরে ৬৮নং ডায়মণ্ড হারবার রোডে উঠে যায়। ঐ হোম উঠে যাবার পর কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারতাশ্রম' ব্রজনাথ ধরের বাগানবাড়িতে ১৮৭৩ সনে তার পূর্ব আবাস থেকে উঠে আসে। 'ভারতাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয় ৫-২-১৮৭২ তারিখে। ব্রজনাথ ধরের বাগানবাড়ি ছিল ২৯৮ নং আপার সার্কুলার রোডে। বর্তমানে সেখানে কলকাতা ট্রাম কোম্পানির রাজাবাজার ডিপো রয়েছে ১৯১০ সন থেকে।"

আমার ঐ উত্তর পাওয়ার পর শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মশাই আরো দু-একটি প্রশ্ন করেন। প্রথম প্রশ্ন: ব্রজনাথ ধরের বংশধর বা উত্তরাধিকারী কারা? তাদের নাম। দ্বিতীয় প্রশ্ন: এখন ঐ বাগানবাড়ি কার সম্পত্তি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি: "ব্রজনাথ ধরের পুত্র ৺আশুতোষ ধর অ্যাটর্নি ছিলেন। তাঁর পুত্র (জীবিত কি মৃত জানিনা) রূপলাল ধর। তাঁদের বাড়ি ৪নং রূপচাঁদ রায়ের স্ট্রিট, বড়বাজার।" এই ধরেদের বাড়িই, বা তার জায়গাতেই,

রূপচাঁদ রায়ের বাড়ি ছিল। ১-৫-১৮২৬ তারিখে গোলদীঘির ধারে সংস্কৃত কলেজের দু'পাশের বাড়িতে যাবার আগে হিন্দু কলেজ কিছুকাল রূপচাঁদ রায়ের বাড়িতে ভাড়া ছিল। রূপচাঁদ রায় বহু হাউসের মুচ্ছুদ্দি ও বিরাট ধনী ছিলেন। সতীকুমার বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি।

সতীকুমার বাবুর আর একটি প্রশ্ন : রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্নীর নাম কি? তিনি জানিয়েছেন কুমারী কোলেটের লেখা রামমোহনের জীবনীতে কোনো স্ত্রীর নাম নেই।

আমি তাঁকে জনিয়েছি : "রামমোহনের যখন মাত্র ৮ বছর বয়স তখন তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সে স্ত্রীর নাম জানা যায় না। অন্তত আমি জানি না। এই স্ত্রীর মৃত্যুর একবছরের মধ্যে রামমোহনের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় বর্ধমান জেলার কুরমুন গ্রামের শ্রীমতী দেবীর সঙ্গে। এই স্ত্রী জীবিত থাকতে তিনি তৃতীয় দার পরিগ্রহ করেন। এই পত্নীর নাম উমা দেবী। তিনি ছিলেন ভবানীপুরের ৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। এই পত্নীর কোনো সন্তানাদি হয় নি। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে রামমোহনের দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ জন্মান। প্রথম পুত্রের জন্ম হয় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের শেষে কিংবা ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে। দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় ২৮-৭-১৮১৭ তারিখে।"

শ্রদ্ধেয় সতীকুমার বাবুর সব প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়া হল। কিন্তু সেণ্ট ভিনসেণ্টস হোম-এর কথা যখন উঠেছে তখন তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য দিচ্ছি, যা জানা দরকার। যাঁর নামে হোম তাঁর পুরো নাম হচ্ছে—St. Vincent de Paul। ইনি জাতিতে ফরাসি ছিলেন। জন্ম ১৫৭৬ অথবা ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে। 'সন্ত' উপাধি পান ১৭৩৭ সনে। তিনি সমস্ত জীবন দরিদ্রের সেবা ক'রে গেছেন। সেণ্ট ভিনসেণ্টস হোম পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে। কলকাতার হোম অনাথা দুঃস্থা মহিলাদের আশ্রয়। এটি প্রতিষ্ঠা করেন 'ডটার্স অব দি ক্রস', সেকথা আগেই বলেছি। এই রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় ১৮৩৫ সনে বেলজিয়ামের লিজ (Liege) শহরে Mother Marie Theresa Haze প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৮ সনে এই সম্প্রদায়ের যে সন্ন্যাসিনীরা কলকাতায় আসেন তাঁরা সকলেই বেলজিয়ান ছিলেন। এখন এই সম্প্রদায়ে পৃথিবীর সব দেশের সন্ন্যাসিনীরা আছেন। ৬৮নং ডায়মণ্ড হারবার রোডে ২৯ বিঘা জমির ওপর এঁদের এই প্রতিষ্ঠানগুলি আছে : ১. বৃদ্ধা ও পীড়িতা মহিলাদের জন্যে St. Catherine's Hospital ও Home ; ২. যেসব তরুণী বিভিন্ন জায়গায় কাজ ক'রে জীবিকা অর্জন করে তাদের জন্য St. Bridget's Hostel ; ৩. তরুণীদের পুনর্শিক্ষার জন্য St. Gertrude's বিভাগ ; ৪. ছোট ছেলেদের জন্য St. Paul's Boarding ও Day School ; ৫. St. Joseph's প্রাথমিক স্কুল ; ৬. St. Teresa-র উচ্চ মাধ্যমিক

স্কুল—এই স্কুলে কলা ও বিজ্ঞান দুই বিভাগই আছে।

আগে থাকতেই এখানে একটা ছোট St. Paul's Orphanage (অনাথাশ্রম) ছিল ছেলেদের জন্য। ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরি ১৯১২ সনের ৬ জানুয়ারি St. Vincent's Home পরিদর্শন করেন। রানী তখন এঁদের যে অর্থদান করেন তাই দিয়ে St. Paul's Orphanage এঁরা খুব বড় করেছেন। বেলজিয়ামের রাজা ও রানীও ২৮-৯-১৯২৫ তারিখে এই হোম পরিদর্শন করেন। এই হোমের যিনি প্রধান পরিচালিকা তাঁর উপাধি Mother Superior। এঁর ওপরে একজন Mother Provincial আছেন। তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালিকা।

৬৮নং ডায়মণ্ড হারবার রোডে ২৯ বিঘে জমির ওপর একটি বাড়ি এঁরা ১৮৭৩ সনে ৩৫ হাজার টাকায় খরিদ করেন। এই জায়গায় আগে একটি আমেরিকান প্রোটেস্টাণ্ট মিশন ছিল।



যোগাযোগ-ব্যবস্থা : জলপথ

পোর্তুগিজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম বন্দরে আসে ১৫৩০ থেকে ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। সেখান থেকে তারা ১৫৭৮ কিংবা ১৫৮০ সনে হুগলিতে যায়। ইংরেজরা বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে হুগলিতে, ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে। ডাচেরা চুঁচড়ায় তাদের কুঠি স্থাপন করে প্রায় ঐ সময়েই। হুগলি শহরে ইংরেজদের কুঠি থাকায় ও হুগলি শহর ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় ইংরেজরা ভাগীরথী বা গঙ্গানদীর নাম রাখে হুগলি নদী।

পোর্তুগিজদের ও ডাচেদের ৬০০ টনের কাঠের তৈরি পালের জাহাজ (Gally or Galleon or Galleass) সাগরমুখ (Sandhead) থেকে হুগলি নদী দিয়ে প্রথম গার্ডেনরিচ ও বেতর পর্যন্ত চলে আসত, নদীতে অনেক বিপজ্জনক বাঁক ও চড়া থাকা সত্ত্বেও। পরে পোর্তুগিজ জাহাজ হুগলি ও ডাচ জাহাজ চুঁচড়া পর্যন্ত অনায়াসেই পৌঁছতে পারত। এটা তারা করতে পারত তাদের সুশিক্ষিত পাইলটদের গুণে। কিন্তু ইংরেজদের জাহাজ হুগলি শহর তো দূরের কথা, গার্ডেনরিচ পর্যন্তও আসতে পারত না। টন-প্রতি মালের বেশি ভাড়া দিয়েও ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। তখন কোম্পানির ডিরেক্টরগণ বুঝলেন, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাইলটের অভাবেই তাঁদের জাহাজের এই ব্যর্থতা। তাই ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা 'হুগলি পাইলট সার্ভিস' প্রতিষ্ঠা করেন। তার ১০-১১ বছর পরে ১৬৭৮ কিংবা ১৬৭৯ সনে ক্যাপ্টেন স্টাফোর্ড (Captain Stafford)-এর নেতৃত্বে প্রথম ইংরেজ

জাহাজ 'ফ্যালকন' (Falcon) কলকাতার পাশ দিয়ে (যদিও তখনো কলকাতায় ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয় নি) হুগলি পর্যন্ত যায়। গ্যাঞ্জেস পাইলট সার্ভিস (Ganges Pilot Service)—এখনো আছে। ১৯৬৮-তে ঐ সার্ভিসের তিন শতাব্দী পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ইংরেজদের স্থায়ীভাবে আগমন ও বসবাসের পর থেকে ইংরেজদের কাঠের তৈরি পালের জাহাজ ক্রমশ বেশি সংখ্যায় কলকাতায় আসতে আরম্ভ করে।

কিন্তু ইয়োরোপ বা ইংল্যাণ্ড থেকে এইসব জাহাজ ভারতবর্ষে আসত Cape-পথে, অর্থাৎ আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে। এই ঘুরপথে আসতে অনেক মাস, কখনো কখনো একবছরেরও বেশি সময় লেগে যেত।

তাছাড়া পথটাও ছিল বিপজ্জনক। মহিলারাও এ পথে বড় একটা আসতে চাইতেন না। তাই একটা সংক্ষিপ্ত পথের চিন্তা বা কল্পনা মাথায় আসা স্বাভাবিক ছিল। সংক্ষিপ্ত পথের কল্পনাটা ছিল ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে আগাগোড়া জলপথ না হয়ে খানিকটা জল ও খানিকটা স্থলপথ (Overland Route)। অর্থাৎ কলকাতা, মাদ্রাজ বা বোম্বাই থেকে জাহাজে চেপে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে সুয়েজ বন্দরে যাওয়া, সেখান থেকে ইজিপ্টের মরুভূমির উপর দিয়ে উটের পিঠে বা গাড়িতে চেপে কায়রো শহর হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়া, সেখান থেকে জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌছানো। এই পথ দিয়ে যেতে পারলে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে বা ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে যাতায়াতের সময় অনেক কম লাগে। এই পথটিকে বলা হতো লোহিত সাগর-সুয়েজ পথ (Red Sea-Suez Route)।

কিন্তু এই পথের পরিকল্পনা প্রথম কোন লোকের মাথায় আসে? এ বিষয়ে দু'টি মত আছে। প্রথম মতে, এই পথের পরিকল্পনা প্রথম করেন হেনরি জনসন (Captain James Henry Johnson) ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছরে তিনি একটি পুস্তিকা লেখেন। পুস্তিকাটির নাম ছিল 'A Prospectus for establishing by means of Steam Navigation a Communication with Calcutta and the East Indies generally via the Mediterranean, Isthmus of Suez and the Red Sea'। ১৮২৩ সনে এই পুস্তিকাটি Bolt Court, Fleet Street, London-এর Mr. B. Binsley ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাটি থেকে জানতে পারা যায় যে লোহিত সাগর-সুয়েজ পথের প্রথম নির্দেশক হচ্ছেন ক্যাপ্টেন জেমস হেনরি জনসন—ক্যাপ্টেন টমাস ওয়াগহর্ন নন।

ক্যাপ্টেন জনসন-এর জন্ম হয় ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে। ১৮০৫ থেকে ১২ বছর তিনি রাজকীয় সামরিক নৌবিভাগে (Royal Navy) নানারকম চাকুরি করেন।

২০-১০-১৮০৫ তারিখে তিনি লর্ড নেলসনের অধীনে ট্রাফালগারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮১৭ থেকে তাঁর ভারতীয় জীবন আরম্ভ হয়। 'দি এণ্টারপ্রাইজ (The Enterprise) নামে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ (steamship) তিনি ১৮২৫-এ ইংল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ইংল্যাণ্ডের Falmouth বন্দর থেকে ছেড়ে ১৪৫ দিন পরে 'দি এণ্টারপ্রাইজ' ৯-১২-১৮২৫ তারিখে কলকাতায় পৌছায়। ক্যাপ্টেনকে পুরস্কৃত করবার জন্য যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তার দু'গুণেরও বেশি সময় কলকাতা পৌছাতে লেগেছিল। শান্ত সমুদ্রে ঘণ্টায় ৮ সামুদ্রিক মাইলের (Knot-এর) বেশি জাহাজের গতিবেগ ছিল না। এই ঘটনার পর ক্যাপ্টেন জনসন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নৌবহরের বাষ্পীয় বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তার ফলে নদীপথে বাষ্পীয় জাহাজ পরিচালনা, বাষ্পীয় জাহাজ মেরামতের কারখানা, বাষ্পীয় জাহাজ তৈরির ডক ও এঞ্জিনিয়ার-দের স্কুল—সবই তিনি সংগঠিত করেন। ২৬-১২-১৮২৫ তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট ও লেডি আমহার্স্ট, কুমারী আমহার্স্ট, লর্ড বিশপ হিবার ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী হিবার, হ্যারিংটন দম্পতি, স্যার চার্লস গ্রে, স্যার অ্যাণ্টনি বাটলার মিঃ ইলিয়ট এবং আরো কতিপয় সম্রান্ত মহিলা ও পুরুষ ক্যাপ্টেন জনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'দি এণ্টারপ্রাইজ' জাহাজ গঙ্গার ভাঁটিতে Melancholy Point পর্যন্ত যায় ও বিকেলে ফিরে আসে। জাহাজটি গভর্নমেণ্ট ৪০ হাজার পাউণ্ডে কিনে নিয়ে নিজেদের খাস সম্পত্তি করেন। ক্যাপ্টেন জনসনই তার পরিচালক রইলেন। ক্যাপ্টেন জনসন ৫-৫-১৮৫১ তারিখে ৬৩ বছর বয়সে উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে জাহাজেই মারা যান। খিদিরপুরের সেণ্ট স্টিফেন্স চার্চ (St Stephen's Church)-এর ভেতর দেওয়ালের গায়ে অনেক নাবিকের স্মৃতি-ফলকের সঙ্গে ক্যাপ্টেন জনসন-এরও স্মৃতিফলক আছে। অন্যমতে এঁর নাম জনসন নয়, জনস্টন (Johnston)।

ক্যাপ্টেন জনসন লোহিত সাগর-সুয়েজ পথের আদি পরিকল্পক বা নির্দেশক হতে পারেন, কিন্তু নিজের পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি, বা করবার সুযোগ পান নি।

দ্বিতীয় মতে, লোহিত সাগর-সুয়েজ পথের পরিকল্পনা করেন টমাস ওয়াঘর্ন (Lieutenant Thomas Waghorn) ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে। ঐ সনেই 'হিউ লিণ্ডসে' (The Hugh Lindsay) নামে ৪১১ টনের বাষ্পীয় জাহাজ বোম্বাই থেকে সুয়েজ পর্যন্ত পাড়ি দেয়। মাত্র বোম্বাই ষ্টিম কমিটি ওয়াঘর্ন-কে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দেয়। এই নগণ্য সাহায্য ছাড়া তিনি প্রায় সম্পূর্ণ নিজের খরচে কায়রো ও সুয়েজের মধ্যে ইজিপ্টের মরুভূমিতে ৮টি বিশ্রামকেন্দ্র ও ৩টি হোটেল নির্মাণ করেন; যাত্রী ও মালবহনের জন্য উটের গাড়ির বন্দোবস্ত করেন এবং নাইল নদীতে ও আলেকজান্দ্রিয়ার খালে ছোট ছোট কয়েকটি ষ্টিমার মজুত

রাখেন। তাঁর পরিকল্পনার সার্থকতা তিনি প্রমাণ করেন ১৫ বছর পরে ১৮৪৫ সনে। ঐ বছরে ১ অক্টোবর বোম্বাই থেকে ডাক (Mail) নিয়ে রওনা হয়ে তিনি লণ্ডনে পৌছান ৩১ অক্টোবর, অর্থাৎ ঠিক একমাসের মাথায়। প্রথম প্রথম এই নতুন পথে মাত্র ডাক নিয়ে যাওয়া হতো। ক্রমশ ছ'চার জন ক'রে যাত্রীও যেতে আরম্ভ করল। কিন্তু নিয়মিত যাত্রী যাওয়া আরম্ভ হল ১৮৬৯ সন থেকে, যে সনে ফরাসি এঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ দে'লেসেপ্‌স (Ferdinand de Lesseps) সুয়েজ যোজককে কেটে সুয়েজ খাল তৈরির কাজ শেষ করেন। বলা বাহুল্য, এর আগে থাকতেই উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ক্রমশ পরিত্যক্ত হতে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু ১৮৬৯ সনে সুয়েজ খাল খোলার পর থেকে একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। ঐ বছব থেকে সুযেজ খাল দিয়েই যাত্রী, ডাক, মাল—সবকিছুই ভারত ও ইয়োরোপের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকে।

১৮৩০ সন থেকে ১৮৪০ সন পর্যন্ত ভারত ও সুয়েজের মধ্যে ডাক বহন করত ভারতীয় নৌ-বিভাগের জাহাজগুলি। ১৮৪০ সনে পেনিনসিউলার অ্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল স্টিম কোং (Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, সংক্ষেপে P and O) ভাবত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি ক'রে এই ডাক বহনের দায়িত্ব নেয়।

১২-১৩ নং গার্ডেনরিচে এখন যে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের (বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের) এজেন্টের অতি সুন্দর বাসভবনটি রয়েছে, সেটি তৈরি হয় একজন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট রবিনসন (Mr. C.K. Robinson)-এর নকশা অনুযায়ী। ১৮৪৫ সনে এই অট্টালিকাটি ছিল পেনিনসিউলার অ্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল কোম্পানির এজেন্টের বাসভবন। আর সামনেই নদীতীরে অদুরেই ঐ কোম্পানির অতি সুন্দর বাষ্পীয় পোতগুলি সারি সারি নোঙর করা থাকত। এই গাডেনরিচেই তখন ছিল ঐ কাম্পানির ভারতস্থ প্রধান কার্যালয়। এখানে তাদের ৮টি বড় দোতলা বাড়ি ছিল। তাছাড়া জাহাজ মেরামতের প্রকাণ্ড কারখানা ও গুদামঘরও ছিল। তখন মাসে ছ'বার ডাক যেত কলকাতা থেকে বিলেতে। একপক্ষে কলকাতার ডাক (ও যাত্রী) সোজা গার্ডেনরিচ থেকে পি-অ্যাণ্ড-ও স্টিমারে ক'রে যেত। দ্বিতীয় পক্ষে কলকাতা থেকে স্থলপথে, কোথাও রেলে(তখন পর্যন্ত যেখানে যেখানে রেল হয়েছিল)কোথাও ডাকগাড়িতে, বোম্বাই যেত। সেখান থেকে স্টিমারে চেপে রচনা হতো সুয়েজের পথে। সুয়েজ খাল খোলা হবার কিছু আগে ডাক ও যাত্রীরা স্টিমারে ক'রে সুয়েজ যেত, সেখান থেকে ট্রেনে কায়রো হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া গিয়ে সেখান থেকে অন্য স্টিমার ধরত। ঠিক সেইভাবে বিলেত থেকে ডাক ও যাত্রী একপক্ষে বোম্বাইতে আসত, সেখান থেকে স্থলপথে কলকাতা। দ্বিতীয় পক্ষে আসত সুয়েজ থেকে সমুদ্রপথে সোজা গার্ডেনরিচে। সুয়েজ খাল খোলবার পর গার্ডেনরিচ থেকে

পি-অ্যাণ্ড-ও কোম্পানির কিছু জাহাজ বোম্বাইতে চলে যায়। ক্রমশ তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৮২ সন নাগাদ ঐ কোম্পানির মাত্র কয়েকটি জাহাজ গার্ডেনরিচে দেখা যায়। কয়েক বছর পর এগুলোও চলে যায় বোম্বাইতে। তখন থেকে গার্ডেনরিচের পরিবর্তে বোম্বাই হলো পি-অ্যাণ্ড-ও কোম্পানির প্রধান কার্যালয়। আর, ১৪ দিনের পরিবর্তে সপ্তাহে একবার ঐ কোম্পানির জাহাজ বিলেত ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত করতে আরম্ভ করল।

২৩ নং গার্ডেনরিচে আর একটি বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও জেটি ছিল। সেটি হচ্ছে ফরাসি কোম্পানি—Compagni des Messegeries Maritimes de France। আর দু'টি কোম্পানিরও বিদেশগামী জাহাজ ছিল এই গার্ডেনরিচে—একটি Apcar Co. (আর্মেনিয়ান), দ্বিতীয়টি Jardine Skinner Co. (ব্রিটিশ)। এই দুই কোম্পানির জাহাজ শুধু চীনের সঙ্গে কারবার করত।

কিন্তু এসব হল পশ্চিমের সঙ্গে, অর্থাৎ ইয়োরোপ বা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের পূবের সঙ্গে, অর্থাৎ আসাম, চাঁদপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা, ২৪-পরগনা ও সুন্দরবনের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ-ব্যবস্থা রেলপথ হবার আগে কেমন ছিল?

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা ও গৌহাটির মধ্যে প্রথম স্টিমার চালাবার ব্যবস্থা করে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি ক'রে ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোং (India General Steam Navigation Company) কলকাতা ও আসাম উপত্যকার মধ্যে দু'খানি স্টিমার চালাতে আরম্ভ করে। ছয় সপ্তাহ অন্তর স্টিমার ছাড়ত। সেই সময় থেকে সরকারি স্টিমার উঠিয়ে নেওয়া হয়। তার দু'বছর পরে (১৮৬২ সনে) ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের শিয়ালদা-কুষ্টিয়া লাইন খোলা হয়।

কিন্তু এ তো হল ১৮৪৮ সনের কথা। ঐ বছরের আগে কি ব্যবস্থা ছিল? ঐ বছরের আগে কলকাতা ও আসামের মধ্যে একমাত্র নদীপথেই বড় বড় নৌকাযোগে যাতায়াত করতে হতো। তাতে সময় লাগত ৬-৭ সপ্তাহ। শুধু আসাম থেকে নয়, পূর্ববঙ্গের যে কোনো জেলা থেকে আসতে হলেও নদীপথ ও বড় বড় নৌকো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। ভারি ভারি মালপত্রও নৌকো বোঝাই ক'রে আনতে হতো। নদীপথে গোয়ালন্দে এসে সেখান থেকে আড়িয়ল খাঁ, হরিণঘাটা, ভাঙ্গড়, মালঞ্চ, রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা (বা হরিণখোলা), গোয়াসাবা, মাতলা, জামিরা (বা ঠাকুরণ) ও সপ্তমুখী নদী হয়ে পশ্চিমে সাগরদ্বীপ ও পূর্বে মূল ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী বড়তলা নদীর (channel creek-এর) মধ্য দিয়ে এসে কলকাতা থেকে ৭০ মাইল দক্ষিণে Mudpoint নামক

জায়গায় হুগলি নদীতে ঢুকে কলকাতায় আসতে হতো। এই ঘুরপথে আসতে অনেক সময় লাগত। মালপত্র ও যাত্রী বোঝাই নিয়ে একমাত্র বড় বড় স্টিমারের পক্ষে এই পথে আসা সম্ভব হতো। কিন্তু ভারি মালপত্র ও যাত্রী বোঝাই নৌকোর পক্ষে এই পথে সমুদ্রের গা ঘেঁষে আসা, বিশেষত বর্ষাকালের চারমাস, অত্যন্ত বিপজ্জনক ও প্রায় অসম্ভব ছিল। অথচ অন্তত বরিশাল থেকে চাল ও সুন্দরবন থেকে কাঠ কলকাতার বাজারে না আনলেই নয়। তাই কলকাতা থেকে অন্তত বরিশাল পর্যন্ত একটা সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ আবিষ্কার করা দরকার হয়ে পড়ল।

এই পথ বার করলেন উইলিয়াম টলি বা টালি (Major William Tolly)। তিনি গভর্নমেণ্টকে প্রস্তাব দিলেন যে সম্পূর্ণ মজে যাওয়া আদিগঙ্গার শুকনো খাতকে সম্পূর্ণ নিজের খরচে কাটিয়ে আসাম উপত্যকার ও পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির এবং ২৪-পরগনার ও সুন্দরবনের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎপন্ন দ্রব্য তিনি খিদিরপুরে আনবার ব্যবস্থা করবেন। সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং টালি সাহেবকে প্রয়োজনীয় জমির মেয়াদী ইজারা, এই খাল দিয়ে যেসব নৌকো চলাচল করবে তাদের কাছ থেকে টোল (মাশুল) আদায় করবার অধিকার ও এই খালের ধারে একটি গঞ্জ বা বাজার বসাবার অনুমতি দিলেন। টালি সাহেব এই খাল কাটতে আরম্ভ করেন ১৭৭৫ সনে, শেষ করেন ১৭৭৬ সনে, ও নৌকো চলাচলের জন্য খুলে দেন ১৭৭৭ সনে। সাবেক আদিগঙ্গা বর্তমান হেস্টিংসের কাছে গঙ্গা থেকে বেরিয়ে পূবমুখে গড়িয়া পর্যন্ত ৮ মাইল গিয়ে বেঁকে দক্ষিণদিকে বইত ছিল। মেজর টালি গড়িয়া পর্যন্ত ৮ মাইল আদিগঙ্গার খাতকে কেটে খানিকটা গভীর ও চওড়া করলেন। গড়িয়া থেকে দক্ষিণমুখে না গিয়ে সোজা পূর্বমুখে ৯ মাইল লম্বা একটি সম্পূর্ণ নতুন খাল কাটিয়ে শামুকপোতা বা তাদা বন্দরে নিয়ে গিয়ে সেকালে প্রবল বেগে বহতা বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে যোগ করে দিলেন। হেস্টিংস থেকে শামুকপোতা বা তাদা পর্যন্ত ১৭ মাইল লম্বা খালকে বলা হয় টালির নালা। টালির নালা নাম হবার আগে হেস্টিংস থেকে গড়িয়া পর্যন্ত ৮ মাইল লম্বা আদিগঙ্গার খালের নাম ছিল স্যারম্যান সাহেবের নালা (Surman's Nullah) এবং তারও আগে নাম ছিল গোবিন্দপুর নালা বা খাল (Govindpur creek)। শামুকপোতা ও তাদা বিদ্যাধরী নদীর এপারে এবং ওপারে কলকাতা থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পূবে। সে সময়ে শামুক-পোতা থেকে বিদ্যাধরী নদী দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী হয়ে ক্যানিং বা মাতলা নদীতে গিয়ে পড়ত। সেখান থেকে কয়েকটি খাল ও নদী পার হয়ে কালিন্দী নদীতে পড়া যেত এবং কালিন্দী নদী দিয়ে খুলনা জেলার বসন্তপুর পর্যন্ত যাওয়া যেত। বসন্তপুর থেকে আবার নানা খাল ও নদীপথে বরিশাল পর্যন্ত যাওয়া যেত। সোজা গেলে কলকাতা থেকে বরিশাল শহরের দূরত্ব মাত্র ১৮৭ মাইল। কিন্তু

কলকাতা থেকে এইসব নদী-খাল দিয়ে যেতে গেলে দূরত্ব পড়ত ১২৭ মাইল। হাজার মণ বা আরো বেশি মাল বোঝাই বড় বড় দেশী নৌকো বা ছোট মালবাহী স্টিমারের পক্ষে শামুকপোতা থেকে বরিশাল যাবার এই নদীপথ ছিল একমাত্র পথ। এ পথের নাম ছিল 'বাইরের নৌকোপথ' বা নিচের সুন্দরবন-পথ (Outer Boat Route or Lower Sunderbans Passage)।

শামুকপোতা থেকে বিদ্যাধরী দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে যেমন মাতলা ইত্যাদি স্থানে যাওয়া যেত, তেমনি ঐ নদী দিয়েই উত্তর-পশ্চিমে ১৪½ মাইল দূরে বামনঘাটায় আসা যেত।

ইংরেজরা যখন প্রথম কলকাতায় আসে তখন চাঁদপাল ঘাটের কাছে গঙ্গা থেকে একটা খাল বা নালা বেরিয়ে হেস্টিংস স্ট্রিটের উপর দিয়ে, ধর্মতলা স্ট্রিটের উত্তর দিয়ে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে সার্কুলার রোড পার হয়ে, এণ্টালির উত্তর গা দিয়ে দক্ষিণমুখে গিয়ে বেলেঘাটার দক্ষিণে বাদা বা লবণ হ্রদের ভেতর ধাপায় পড়ত। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ হেস্টিংস স্ট্রিট থেকে সার্কুলার রোড বা এণ্টালি রোডের কাছ পর্যন্ত এই খাল হয় ক্রমশ পলি পড়ে পড়ে বুজে গিয়েছিল, নয় রাস্তা, বাড়িঘর ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে বুজিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সার্কুলার রোড থেকে ধাপা পর্যন্ত ঐ খালের নিচের অংশ (যার নাম ছিল এণ্টালি বা বেলেঘাটা খাল) তখনো বর্তমান ছিল। এণ্টালি রোড থেকে পামার ব্রিজ পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত এই এণ্টালি খালের উপর অংশ মাতলা (ক্যানিং) রেল লাইন পাতার ও কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর (underground drainage) কাজ আরম্ভ হবার সময়ে ১৮৬০ কি ১৮৬১ সনে বুজিয়ে ফেলা হয়।

পূর্বে ধাপা থেকে বামনঘাটা পর্যন্ত ৫½ মাইল লম্বা বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখা লবণহ্রদের মধ্য দিয়ে বহতা ছিল। এই শাখানদীকে ইংরেজিতে বলা হতো Central Lake Channel। বামনঘাটায় গিয়ে এই শাখা নদী মূল বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আরো ১৪½ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গিয়ে শামুকপোতা বা তার্দায় পৌছাত।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ লেক চ্যানেল ও বেলেঘাটা খাল পলি পড়ে প্রায় অকেজো হয়ে যায়। যাতে শামুকপোতা থেকে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে বামনঘাটায় এসে লেক চ্যানেল দিয়ে সার্কুলার রোড পর্যন্ত মাল বোঝাই নৌকো পৌছাতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্ট ১৮১০-এ লেক-চ্যানেল ও বেলেঘাটা খালের ভালো রকম সংস্কার করেন।

এরপর টালির নালার উপর থেকে অতিরিক্ত নৌকোর চাপ কমাবার জন্য ১৮২৬ ও ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিমে বামনঘাটা ও পূর্বে যমুনা বা ইছামতী নদীতীরস্থ হাসনাবাদের মধ্যে একটা সোজা পূর্বমুখী খালপথ তৈরি করা হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে বহতা কতকগুলি নদীকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ৬টি ছোট ছোট

কৃত্রিম খাল কেটে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। এই খালপথে ধাপা থেকে বরাবর সোজা পূর্বদিকে গিয়ে হাসনাবাদে পৌঁছানো যেত। (আরো কিছু পরে এই পথের উপর দিয়েই ভাঙড় খাল কাটা হয়। সেকথা পরে বলা হবে।) এই খালপথই হল ভেতরের নৌকো পথ অথবা উপরের সুন্দরবন-পথ (Inner Boat Route or Upper Sunderbans Passage)। এই পথে শুধু ছোট ছোট হালকা নৌকো ও স্টিমলঞ্চ চলাচল করতে পারত। ভারি মাল বোঝাই বড় বড় নৌকো পারত না। তাদের জন্য বাইরের নৌকো-পথ বা নিচের সুন্দর-বন-পথ ছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

এখন বামনঘাটা থেকে শামুকপোতা বা তারও নিচে পর্যন্ত বিদ্যাধরী নদী একেবারে শুকিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও মাত্র একহাত চওড়া একটা শুকনো খাদ পড়ে থাকতে দেখা যায়। হুগলি ও হাওড়া জেলায় সরস্বতী নদীর যে দশা হয়েছে, ২৪-পরগনা জেলায় বিদ্যাধরী নদীরও সেই হাল হয়েছে।

বামনঘাটা খালের সম-সময়েই সার্কুলার খাল কাটা হয়। এই খাল কাটার পরিকল্পনা সর্বপ্রথম করেন টেরিটি (Tiretta) সাহেব, যাঁর নামে টেরিটি বাজার। তিনি কলকাতার পথঘাট ও বাড়িঘরের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তিনি লর্ড ওয়েলেসলিকে এই খাল কাটার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শ তখন গ্রাহ্য হয় নি।

তারপর মেজর সক্ (Major Schalch) ১৮২৪ সনে এই খালের এক নকশা তৈরি করেন। কিন্তু নকশা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হবার আগেই তিনি ১৮২৬ সনে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে মারা যান। সক্ সাহেব কলকাতা শহরের এক মানচিত্রও তৈরি করেছিলেন। একসময়ে এই মানচিত্র কলকাতাবাসীদের ঘরে ঘরে দেখা যেত। সক্ সাহেবের মৃত্যুর পর ১৮২৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর নকশা অনুযায়ী সার্কুলার খাল কাটা আরম্ভ হয় ও শেষ হয় ১৮৩৩ সনের জুন-জুলাই মাসে। ১৮৩৩ সনেই চিৎপুরে প্রথম 'লক্' বা জলকপাট বসানো হয়।

মারহাট্টা খাদের উপর দিয়ে তখন যে চিৎপুরের পোল ছিল, তার ঠিক উত্তরে গঙ্গা থেকে এই খাল আরম্ভ হয়ে টালার ও বেলগেছের রাস্তা পার হয়ে সার্কুলার রোডের সমান্তরালে, সার্কুলার রোড থেকে পূবে আধ মাইলেরও কম দূরত্বে, এগিয়ে চলেছে। শেষে বেলেঘাটা রাস্তা পার হয়ে এই খাল দক্ষিণ-পূর্বে সামান্য বাঁক নিয়ে এণ্টালি বা বেলেঘাটা খালে পড়েছে। সার্কুলার খাল উপরের দিকে ৮০ হাত চওড়া, তলায় জলের বিস্তার ৮০ ফুট। গভীরতা কোথাও ৬ ফুটের কম নয়, স্থানে স্থানে ১৮ ফুট পর্যন্ত। এই খালের দুদিকে—পূর্বে ও পশ্চিমে—৪০ হাত চওড়া রাস্তা। প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক রাজাবাজারের কাছ থেকে এই খাল কাটতে আরম্ভ ক'রে ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণে এগিয়ে যায়। এই খাল যদিও

গোল নয়, তবুও এর নাম হয়েছে সার্কুলার খাল, এই কারণে যে এ খাল সার্কুলার রোডের পাশাপাশি চলেছে।

কিন্তু বামনঘাটার খাল ও সার্কুলার খাল কেটেও তেমন সুরাহা হল না। পণ্যবাহী নৌকোর সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলল। খালে আর নৌকো ধরে না। পুরনো খালের উপর থেকে এই নৌকোর চাপ সরাবার জন্য আর একটা নতুন খাল কাটা হল। কাটার কাজ আরম্ভ হয় ১৮৫৫-৫৬ সনে, শেষ হয় ১৮৫৮-৫৯ সনে। এই খালের নাম হল নতুন-কাটা খাল (New-cut Canal)। এটি বেলগেছিয়া পুলের ৯০০ ফুট দক্ষিণে উল্টোডাঙায় সার্কুলার খাল থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্ব-দক্ষিণে গিয়ে ধাপায় পড়ত। পড়ত বলছি এইজন্য যে এখন আর এ খাল নেই। ১৯৬৩ সনে বাংলা সরকার এক যুগোশ্লাভ কোম্পানিকে ঠিকা দিয়ে এই খাল ভরাট করেন। কোম্পানি গঙ্গা থেকে পাইপে ক'রে বালি এনে এ খাল বুজিয়ে ফেলেছে। তার ফলে অন্য কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে। মানিকতলা-নারকেলডাঙা অঞ্চলের জল নিকাশ হচ্ছে না। বর্ষার ৪ মাস এই অঞ্চল জলে ভেসে যায়। নানারকম অসুখ-বিসুখও ছড়ায়।

সার্কুলার খাল ও বেলেঘাটা খালেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ (Irrigation) বিভাগ এই খাল দু'টিকেও বুজিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু যখন নতুন-কাটা খাল বহতা ছিল তখন সার্কুলার খাল দিয়েও যেমন ধাপা থেকে চিৎপুরে যাওয়া যেত, এ খাল দিয়েও তেমনি যাওয়া যেত।

আগেকার মানিকতলা মিউনিসিপালিটি ছিল একটি দ্বীপের মতো। এর পশ্চিমে আছে সার্কুলার খাল, উত্তরে ও পূর্বে ছিল নতুন-কাটা খাল ও দক্ষিণে আছে বেলেঘাটা খাল। এখনো এই অঞ্চলটিকে দ্বীপ বলা চলে। কেননা, ভারতীয় ভূগোল অনুসারে কোনো ভূভাগের মাত্র দুইদিকে জল থাকলেই সেটি দ্বীপ। [দ্বী=দুই (দিকে), প (অপ -জল)]।

তারপর ১৮৮৩ সনে সার্কুলার খালের দুই প্রান্তে দু'টি কপাট (Lock) বসানো হল প্রায় একই সময়ে—একটি চিৎপুরে, আর একটি ধাপায়। চিৎপুর লক্ খোলা হয় ১৪-২-১৮৮৩ তারিখে। অন্যমতে ২১-৭-১৮৮৩ তারিখে। ধাপা-লক্ খোলা হয় ৪-২-১৮৮৩ তারিখে। চিৎপুর-লক্ এখনো আছে। কিন্তু ধাপা-লক্ বালিচাপা পড়ে আছে, শুধু মাথাটার একটুখানি বেরিয়ে আছে। লক্-এর প্রধান কাজ হচ্ছে নদীতে বা খালে জলের সমতা রক্ষা করা। আর একটা কাজ হচ্ছে লক-এর ভেতর নৌকোগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে 'টোল' (মাশুল) আদায় করা।

১৮২৬ ও ১৮৩১ সনের মধ্যে কলকাতা ও হাসনাবাদের মধ্যে যে জলপথ তৈরি করা হয়েছিল বলেছি, কালক্রমে সে পথ ক্রমশ পলি পড়ে পড়ে নৌকোর

পক্ষে অব্যবহার্য হয়ে উঠেছিল। তাই ১৮৯৫ সনে ঐ পথের উপর দিয়ে বামনঘাটা থেকে কুলটি পর্যন্ত এক নতুন খাল কাটা আরম্ভ হল। কাটা শেষ হল ১৮৯৭ সনে। এই খালের নাম হল ভাঙ্গড় কাটাখাল। খালের দুই প্রান্তে দু'টি লক্ তৈরি হল—বামনঘাটায় একটি ও কুলটিতে একটি। এ খালটি এখনো আছে। বামনঘাটা ও কুলটি 'লক্' তৈরি হয় ১৮৯৭ সনে ও পরিত্যক্ত হয় ১৯৩৫ সনে।

১৮৯৭ সনের পর থেকে লেক চ্যানেল পলি জমে খুব তাড়াতাড়ি মজে যেতে লাগল। বামনঘাটা থেকে ধাপায় আসবার ঐ ছিল একমাত্র পথ। সুতরাং আর একটা খাল না কাটলেই নয়। ১৯০৮-১০ সনে এই খাল কাটা হল। নাম হল কৃষ্টপুর খাল (কৃষ্টপুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে বলে)। এই খাল নতুন-কাটা খাল থেকে আরম্ভ হয়েছে আরাটুন (Aratoon) পাট-কলের কাছ থেকে আর উত্তর লবণ হ্রদের (এই হ্রদও এখন বালি দিয়ে প্রায় ভরাট ক'রে ফেলা হয়েছে) পূর্বদিক দিয়ে বামনঘাটায় ভাঙ্গড় খালে পড়েছে। এখন পূর্বদেশগামী বা পূর্বদেশ থেকে আগত সব নৌকোই এই খাল দিয়েই যাতায়াত করে। এই খাল দিয়ে যাতায়াত করার একটা বড় সুবিধে এই যে, পূর্বদেশ থেকে আগত সমস্ত নৌকো একবার কুলটি 'লক্' পার হয়ে ভাঙ্গড় খালে ঢুকে পড়লে তাদের বামনঘাটা লক্ পেরোতে হতো না, বামনঘাটা লক্-কে পশ্চিমে রেখে সোজা নতুন-কাটা খালে পৌঁছাতে পারত। সেখান থেকে ইচ্ছে করলে একদিকে নতুন-কাটা খাল দিয়ে ধাপা লক-এ যেতে পারত, অন্যদিকে সার্কুলার খাল দিয়ে চিৎপুর লক্-এ পৌঁছাতে পারত। এখন শুধু চিৎপুরে যেতে পারে। ধাপা লক-এ যাবার উপায় নেই। কেননা আগেই বলা হয়েছে, নতুন-কাটা খাল ভরাট ক'রে ফেলা হয়েছে।

কৃষ্টপুর খালের পর কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গে যাবার অন্য কোনো খাল এ পর্যন্ত কাটা হয় নি।

উল্লিখিত সমস্ত নদীর ও খালের সমষ্টিগত নাম ছিল সার্কুলার এবং প্রাচ্য খালমণ্ডল (Circular and Eastern Canals System) অথবা কলকাতার প্রাচ্য খালমণ্ডল (Calcutta and Eastern Canals System)। খাল বলতে শুধু খালকেই ধরলে হবে না, নদীকেও ধরতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, এই খাল পরম্পরার দৈর্ঘ ছিল মোট ১১২৭ মাইল। তার মধ্যে মাত্র ৪৭ মাইল কৃত্রিম খনিত খাল। বাকি ১০৮০ মাইল স্বাভাবিক নদীপথ। কলকাতা খালের অন্তর্গত ছিল সার্কুলার খাল, বেলেঘাটা খাল ও নতুন-কাটা খাল। কৃষ্টপুর-সমেত বাকি সব খাল ও নদী প্রাচ্য খাল।

পূর্বে বাংলা গভর্নমেণ্টের একটা স্বতন্ত্র সার্কুলার ও প্রাচ্য খালবিভাগ (Circular and Eastarn Canals Division) ছিল একজন Executive

Engineer-এর অধীনে। ১৮৫২-৫৩ সনে গুডউইন (Lt. Colonel H. Goodwin) দক্ষিণ-পূর্ব সার্কেলের সুপারিনটেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার (Superintending Engineer) ছিলেন। ১৮৭৮ সনে আইজাক (Mr. Isaac) ছিলেন এই সার্কেলের সুপারিনটেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার। Major Schalch ১৮১৭-২৫ সনে Superintendent of Canals and Bridges ছিলেন। তাঁর পরে প্রিন্সেপ (Captain Thomas Prinsep) ১৮২৫-৩২ সনে Superintendent of Canals ছিলেন।

গত শতাব্দীর ৮ম-৯ম দশকে Mr. J. C. Vertannes নামে একজন ইংরেজ এই খাল বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম সার্কেলের সুপারিনটেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আর যাঁর নাম এখনো গ্যালিফ স্ট্রিট (Galiff Street) বহন করছে সেই গ্যালিফ ছিলেন সার্কুলার ও প্রাচ্য খালগুলের সুপারিনটেনডেণ্ট এবং খালের টোল (মাশুল)-আদায়কারী (Collector)। ৯ নং গ্যালিফ স্ট্রিটে তাঁর অফিস ছিল, বাড়িটির নাম Canal Villa। সে বাড়ি এখনো রয়েছে। Captain Guthrie ছিলেন খালের প্রথম মাশুল-আদায়কারী (Toll Collector)।

স্বাধীনতার পর সার্কুলার ও প্রাচ্য খালবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ (Irrigation) বিভাগের অধীনে চলে গেছে। এই বিভাগের উপর একজন চিফ্ এঞ্জিনিয়ার আছেন।

কিন্তু যে টালির নালা দিয়ে আমরা কৃত্রিম খাল সৃষ্টি করার কথা আরম্ভ করেছিলাম, তার শেষ এখনো বলা হয় নি। টালি সাহেবের কাটা আদিগঙ্গার খাল তেমন গভীর বা চওড়া ছিল না। মাত্র ছোট ছোট হালকা নৌকো এই খাল দিয়ে যেতে-আসতে পারত। টালি সাহেবকে গর্ভনমেণ্ট যে নৌকোর ওপর থেকে টোল আদায় করবার ইজারা দিয়েছিলেন, তা ছিল ১০ বছরের জন্য। ১০ বছর পর পর এই ইজারা নতুন ক'রে দেওয়া হবে, এই চুক্তি ছিল। টালি সাহেব মারা যান ১৭৮৪ সনে। ১৭৯০ সনের ক্যালকাটা গেজেট-এ (*Calcutta Gazette*) প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, মেজর টালির বিধবা পত্নী আনা মারিয়া (Anna Maria Tolly), জন উইলকিন্‌স (Mr. John Wilkins) নামে এক সাহেবকে টালির নালা থেকে টোল আদায় করবার ইজারার বাকি মেয়াদ বিক্রি করেছেন। কিন্তু এই খালের পরিচালনা মোটেই সন্তোষজনক না হওয়ায় গভর্নমেণ্ট ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে টালির নালা নিজের হাতে নিয়ে নেন। ঐ সনের গভর্নমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত একটি সরকারি ঘোষণায় বলা হয় যে টালির নালা দিয়ে যাতায়াতকারী নৌকো ও মালের উপর যে শুল্ক স্বর্গীয় টালি সাহেবের মৃত বিধবার জন্য আদায় করা হতো, তা এরপর থেকে ২৪-পরগনা জেলার কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে

গভর্নমেণ্টের জন্য আদায় করা হবে। গভর্নমেণ্ট টালির নালা নিজের হাতে নেবার পর থেকে এই নালাকে অনেক চওড়া ও গভীর করেন, যার ফলে নৌকো চলাচল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাহলেও এই নালায় অনবরত পলি জমে, বিশেষত টালিগঞ্জের কাছে। তাই এই নালাকে অনবরত পরিষ্কার করতে হয় সচল রাখবার জন্য। এমনকি ভরা বর্ষায় একটা ছোট বাষ্পীয় লঞ্চ তখনই টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে যেতে পারে, যখন নালা জোয়ারের জলে অর্ধেক বা তারও বেশি ভরে যায়।

এখন টালিগঞ্জ অর্থাৎ টালি সাহেবের বসানো গঞ্জ বা বাজার কোথায় ছিল? যেখানে খিদিরপুর ডক থেকে Boat Canal টালির নালায় পড়েছে, তার ঠিক দক্ষিণে বজবজ রেল লাইন নালার উপর দিয়ে চলে গেছে। আরো কিছুটা দক্ষিণে টালির নালার পূর্ব পাড়ে এই গঞ্জ ছিল। এখন পূর্ব-পশ্চিমে সমস্ত অঞ্চলটার নাম হয়েছে টালিগঞ্জ। কিন্তু যাঁর নামে এই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম, সেই টালি সাহেবের গঞ্জ বা বাজার বহুদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বোধহয় টালি সাহেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী বিলেতে থাকতেন। খুব সম্ভবত তিনি বাজারের মালিক ছিলেন না। নইলে কারো-না-কারো সঙ্গে এ বাজারেরও বিলি-বন্দোবস্তের বিজ্ঞাপন তাঁর তরফ থেকে আমরা পেতাম।

কলকাতার কয়েক মাইল দক্ষিণে টালির নালা থেকে ২০ মাইল লম্বা একটা খাল বেরিয়ে কাওড়া পুকুরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে মগরাহাট পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। লক্ষ্মীকান্তপুর রেললাইন হবার আগে মগরাহাট থেকে ডোঙ্গা বা শালতি ক'রে আর একটা সরু খাল দিয়ে জয়নগর-মজিলপুর যেতে হতো। অন্য কোনো উপায় ছিল না। অথচ রেলপথে কলকাতা থেকে মগরাহাট মাত্র ২৫ মাইল দূর ও জয়নগর-মজিলপুর ৩১ মাইল দূর।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হল তা থেকে আমরা কলকাতা থেকে বরিশাল যাবার ৩টি বিকল্প পথ পাচ্ছি। একটি হল ভেতরের নৌকো-পথ বা উপরের সুন্দরবন-পথ। দ্বিতীয়টি হল বাইরের নৌকো-পথ বা নিচের সুন্দরবন-পথ। তৃতীয়টি হল স্টিমার-পথ।

ভেতরের নৌকো-পথ চিৎপুর থেকে সার্কুলার খাল ও লেক চ্যানেল দিয়ে বামনঘাটা পর্যন্ত পৌঁছাত। বামনঘাটায় গিয়ে ভাঙ্গড় খালে ঢুকত। ভাঙ্গড় খাল দিয়ে বরাবর জলপথে ইছামতী বা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত হাসনাবাদে এবং সেখান থেকে ঐ নদী দিয়ে খুলনা জেলায় বসন্তপুরে পৌঁছাত। মাত্র ছোট দেশী নৌকো ও লঞ্চ এইপথে যেতে পারত।

ভারি ভারি মাল বোঝাই বড় বড় নৌকো বা মালবাহী স্টিমার ভেতরের নৌকো-পথ দিয়ে যেতে পারত না। তারা বাইরের নৌকো-পথ ব্যবহার করতে বাধ্য হতো। বাইরের নৌকো-পথ শামুকপোতা থেকে আরম্ভ হতো। কলকাতা থেকে শামুকপোতা যাবার দুই উপায় ছিল, হয় সার্কুলার খাল দিয়ে, নয় টালির

নালা দিয়ে। শামুকপোতা থেকে পূর্ব-দক্ষিণে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে ক্যানিং-এ যাওয়া যেত। ক্যানিং থেকে কয়েকটি নদী পার হয়ে কালিন্দী নদীতে পড়া যেত, আর কালিন্দী নদী ধরে বসন্তপুরে পৌঁছাতে পারা যেত।

স্টিমার-পথ ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি ও রিভার্স স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানির বড় বড় স্টিমার ও গাদাবোট ব্যবহার করত। এই স্টিমার-পথে বাষ্পীয় জাহাজ কলকাতা থেকে গঙ্গানদী দিয়ে ৭০ মাইল দক্ষিণে মাড-পয়েণ্টে যেত। মাড-পয়েণ্ট থেকে মূল ভূখণ্ড ও সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী বড়তলা নদী বা চ্যানেল ক্রিকে ঢুকত। চ্যানেল ক্রিক থেকে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগুলি খাল পার হয়ে সপ্তমুখী নদীতে পড়ত। সপ্তমুখীর পরে জামিরা নদী, জামিরা থেকে পরপর মাতলা, গুষাসাবা, হাঁড়িয়াভাঙা ও কালিন্দী নদী পার হয়ে খুলনা জেলায় পৌঁছাত। তারপর খুলনা জেলা থেকে ক্রমাগত পূর্বমুখে গিয়ে বরিশালে পৌঁছাত।

নিম্নলিখিত খালগুলি একসময়ে সার্কুলার ও ইস্টার্ন খাল বিভাগের একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অধীনে ছিল :

১. সার্কুলার খাল — ৫½ মাইল
(বেলিয়াঘাটা-সমেত)
২. নতুন কাটা খাল — ৪ "
৩. কৃষ্টপুর খাল — ১০ "
(নিউ-কাট থেকে বামনঘাটা)
৪. লেক চ্যানেল — ৫½ "
(ধাপা থেকে বামনঘাটা)

ভেতরের নৌকো-পথে :

৫. বামনঘাটা থেকে কুলটি — ১৫ "
৬. বামনঘাটা থেকে বসন্তপুর — ৪২ "

বাইরের নৌকো-পথে :

৭. বামনঘাটা থেকে শামুকপোতা — ১৪½ "
৮. শামুকপোতা থেকে বসন্তপুর — ৫৪ "
৯. টালির নালা — ১৭ "
(শামুকপোতা থেকে হেস্টিংস পুল)
১০. কাওড়া পুকুর খাল — ২০ "
(টালির নালা থেকে মগরাহাট)
১১. সুন্দরবন স্টিমার-পথে — ১৭২ "
(কলকাতা থেকে বসন্তপুর)

এ পর্যন্ত যত পথের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ছিল কলকাতা থেকে দক্ষিণে বা পূর্বে যাবার পথ। কিন্তু রেল হবার আগে উত্তরে বা পশ্চিমে যাবার উপায় কি ছিল? এক উপায় ছিল ডাঙাপথে পালকি বা ডাকগাড়ি চেপে। এ ছিল অনেক খরচ-সাপেক্ষ। দ্বিতীয় উপায় ছিল গঙ্গা দিয়ে নৌকো ক'রে যাওয়া। 'নৌকো' শব্দটি সাধারণ নাম।

ছোট, বড়, যাত্রীবাহী, মালবাহী নানারকমের নৌকো ছিল এবং এখনো আছে। অল্প লোকে কাছাকাছি যেতে হলে 'পান্‌সি' ব্যবহার করত। 'পান্‌সি' নামটি ইংরেজি Pinnace থেকে এসেছে। অল্প মালসহ বহু যাত্রীবাহী বড় নৌকোর নাম ছিল 'বজরা'। এ নামটিও ইংরেজি Barge থেকে এসেছে। বড় লোকদের আরাম ক'রে যাবার নৌকো ছিল 'ভাউলে'। তাতে খাবার, শোবার ও বসবার জন্য পৃথক পৃথক ঘর থাকত। শুধু মালপত্র বইবার জন্যে দু'রকমের বড় নৌকো ছিল—কিস্তি ও ভড়।

এইসব নৌকো ক'রে লোকে ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমের শহরে তীর্থ করতে বা শুধু বেড়াবার জন্য যেত। নৌকোর ভাড়া ঠিক হতো দাঁড়ের সংখ্যা ও গন্তব্যস্থানের দূরত্ব অনুসারে।

তারপর এল বাষ্প-চালিত জাহাজ (Steamship বা Steamer)। পাল-চালিত জাহাজ, এমনকি যুদ্ধের জাহাজও, হতো কাঠের তৈরি। বাষ্প-চালিত জাহাজ কিন্তু লোহার তৈরি। যাত্রী বা মালবহনের ক্ষমতা ও গতির দিক থেকে সেইলিং শিপ (Sailing Ship) স্টিম শিপ(Stemship) থেকে অনেক নিকৃষ্ট।

হোর মিলার কোম্পানি (Hoare Miller Co)-র প্রকাণ্ড দোতলা প্যাড্‌ল হুইল (Paddle-wheel) স্টিমার জগন্নাথঘাট থেকে ছেড়ে শান্তিপুর-কালনা যেত। এই কোম্পানির জাহাজের গতি ছিল মন্থর। কিন্তু ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টিম ন্যাভিগেশান কোং (India General Steam Navigation Co.) সংক্ষেপে I.G.S.N. Co.) এবং রিভার্স স্টিম ন্যাভিগেশন কোং(Rivers Steam Navigation Co.) সংক্ষেপে R.S.N. Co.—এই দুই কোম্পানির জাহাজ ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা ও বেশি দ্রুতগামী। এই জাহাজগুলি কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি স্থানে যাতায়াত করত। সুতরাং সুদূর পশ্চিমে যেতে হলে এই দুই কোম্পানির জাহাজে চেপে যেতে হতো। জলপথে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে যাওয়ার কথা পরে আরো বলা হবে।

তারপর গত শতাব্দী পার ক'রে এই শতাব্দীতে পোর্ট কমিশনাররা চাঁদপাল ঘাট থেকে তাঁদের ফেরি স্টিমার (Ferry Steamer Service) খুললেন। প্রথম স্টিমার চালু হয় ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে। এই ফেরি সার্ভিস ক্রমশ বিস্তৃত হয় দক্ষিণে রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, গার্ডেনরিচ, রাজগঞ্জ, সাঁকরাইল পর্যন্ত ও উত্তরে কাশীপুর, বরানগর, দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ, লিলুয়া, বেলুড় ও বালি পর্যন্ত।

উল্লিখিত অঞ্চলগুলির লোকেদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পোর্ট ট্রাস্ট এই ফেরি সার্ভিস খোলে। কিন্তু অল্পদিন পরে দেখা গেল, এই সার্ভিস থেকে পোর্ট ট্রাস্টের লাভ না হয়ে লোকসান হচ্ছে। ২০ বছর চালিয়ে ১৯২৭ সালে পোর্ট ট্রাস্ট এই ফেরি সার্ভিস তুলে দেয়। শেষপর্যন্ত তাদের ফেরি স্টিমারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৩।

তারপর ফেরি সার্ভিস চালান ক্যালকাটা স্টিম ন্যাভিগেশন কোং (Calcutta Steam Navigation Co. Ltd.)। ৫নং ফেয়ার্লি প্লেসে তাঁদের অফিস ছিল। এঁদের মাত্র দু টি সার্ভিস ছিল, দু'টিই দৈনিক। একটি চাঁদপাল-রামকৃষ্ণপুর সার্ভিস, দ্বিতীয়টি চাঁদপাল-রাজগঞ্জ সার্ভিস। প্রথমটিতে স্টিমার চাঁদপালঘাট থেকে যেত রামকৃষ্ণপুর, সেখান থেকে তেলকলঘাট; তেলকলঘাট থেকে চাঁদপালঘাটে ফিরে আসত। দ্বিতীয়টিতে স্টিমার চাঁদপালঘাট থেকে যেত শিবপুর, সেখান থেকে তক্তাঘাট, সেখান থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন, সেখান থেকে মেটিয়াবুরুজ; মেটিয়াবুরুজ থেকে রাজাবাগান, রাজাবাগান থেকে রাজগঞ্জ। রাজগঞ্জ থেকে ঐ পথেই, অর্থাৎ রাজাবাগান, মেটিয়াবুরুজ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, তক্তাঘাট, শিবপুর হয়ে চাঁদপালঘাটে ফিরে আসত।

১৯শ শতকের গোড়ায় সেনট্রাল লেক চ্যানেল (Central Lake Channel)-কে বলা হ'ত ইস্টার্ন ক্যানাল্‌স (Eastern Canals)। এ নামটা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। সেনট্রাল লেক চ্যানেল নাম হবার পরেও এ নামটা কখনো কখনো ব্যবহার হতো। তখন একে বলা হতো ওল্ড ইস্টার্ন ক্যানাল্‌স (Old Eastern Canals)।

আগেই বলা হয়েছে, মজে যাওয়া সেনট্রাল লেক চ্যানেল ও বেলেঘাটা বা এন্টালি খালকে ১৮১০ সনে ভালোভাবে সংস্কার করা হয়। এই খাল সংস্কার করা হয় সুন্দরবন থেকে কলকাতায় জ্বালানি কাঠ, সুন্দরীগাছের খুঁটি, কুঁড়েঘর ছাইবার গোলপাতা ইত্যাদি আনবার জন্য।

বেলেঘাটা খালের ওপর থেকে অত্যধিক নৌকোর ভিড় কমাবার জন্য সার্কুলার খাল কাটা হয়। এই খাল কাটা শেষ হয় ১৮৩৩ সনে। ঐ সনেই চিৎপুরে একটি 'লক্' বা জলকপাট বসানো হয়। ৫০ বছর পরে ১৮৮৩ সনে চিৎপুরে আর একটি লক্ বসানো হয়। তখন এই লক্‌টিকে বলা হতে লাগল 'নতুন লক্' ও ১৮৩৩ সনের লক্‌টিকে 'পুরনো লক্'।

চিৎপুরে প্রথম 'লক্' বসাবার ৩ বছর পরে ১৮৩৬ সনে এক আইন পাশ করা হয়। এই আইনটির নাম হয় ১৮৩৬ সনের ২২ নং আইন। তখন পর্যন্ত যতগুলি খাল ছিল, অর্থাৎ সেনট্রাল লেক চ্যানেল, বেলেঘাটা খাল, ভাঙড় কাটাখাল ও সার্কুলার খাল—এই আইনটি তাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। এই আইন বলেই একজন খালের সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, একজন খালের

একজিকিউটিভ অফিসার ও একজন মাশুল-আদায়কারীর (Toll Collector) পদ সৃষ্টি হয়।

এই আইনেই বলা হয় যে, প্রত্যেক ১০০ মণ মালবাহী নৌকো এইসব খালে মাল বোঝাই ও খালাস করবার জন্য ২ দিন ও ঢোকবার ও বেরোবার জন্য আরো ৩ দিন থাকতে পারবে। এই সময়ের পরেও থাকলে খালে ঢোকবার সময় যে মাশুল তাকে দিতে হয়েছিল তার ১/৮ ভাগ প্রতিদিনের দেরির জন্য জরিমানা (demurrage) দিতে হবে। খালে ঢোকার 'টোল' বা মাশুল ধার্য হয় প্রত্যেক ১০০ মণ মালের জন্য ১ টাকা। ১৮৩৮-৩৯ সনে এই মাশুল এক টাকা থেকে কমিয়ে আট আনা করা হয়। এই নামমাত্র জরিমানাটুকু দিয়ে দিলেই সব ল্যাটা চুকে গেল। যে যতদিন খুশি খালের ভেতর থাকতে পারে। তাকে আইনত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। এতে ক'রে হল নৌকো-ওয়ালাদের পোয়াবারো এবং মাল খালাস ও বোঝাই করার ব্যাপারে অতিরিক্ত দেরি। এই আইন অনুসারে ১০০ মণ মাল বোঝাই একটা নৌকো খালের ভেতর বিনা বাধায় ২০ দিন, আর ঢোকবার ও বেরোবার জন্য আরো ৩ দিন, মোট ২৩ দিন থাকতে পারে। এর ওপর প্রতিদিনের দেরির জন্য ১ টাকা ৪ আনা বা মাত্র ১০ আনা জরিমানা দিলেই যতদিন খুশি সে খালের ভেতর থাকতে পারে—কেউ তাকে আইনত বার ক'রে দিতে পারে না। এই দেরির ফলেই খালের ভেতর জমা নৌকোর সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যেতে লাগল। সবচেয়ে বেশি ভিড় হতো জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে।

পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে বড় ছোট নানারকম নৌকো বোঝাই ক'রে আনা হতো ধান, চাল, ফল, তরি-তরকারি, মাছ ও অন্যান্য স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য। তাছাড়া আসত কাঠ ও চুন বোঝাই বড় বড় নৌকো। আসত বাঁশের ভেলা বা মাড়। আর মগের মুল্লুক থেকে প্রতি বছর আসত মগ নৌকো। তারা আনত হরিণ ও মোষের শিং, হাতির দাঁত ও প্রচুর পরিমাণ সেগুন কাঠ। এসব নৌকোর ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ভিড়ে সেইসব নৌকো যা গঙ্গা থেকে আসত বা গঙ্গায় বেরিয়ে যেতে চাইত তারা যাবার পথ পেত না। যেসব নৌকো কলকাতার বাজারের জন্য আমদানি মাল নিয়ে আসত, তারা খালের ভেতর মাল খালাস করত। আর যেসব নৌকো •বফতান মাল নিয়ে আসত। তারা মাল খালাস করত গঙ্গায়।

তখন বেলেঘাটা খালের প্রায় সমস্ত উত্তর পাড় জুড়ে, সার্কুলার খাল যেখানে বেলেঘাটা খালে পড়েছে সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে বেলেঘাটা পুল পর্যন্ত সার্কুলার খালের দুই পাড়ে এবং ঐ (সার্কুলার) খালের টালা ও চিৎপুর পোলের মধ্যবর্তী অংশের দুই পাড়ে, সারবন্দী গুদামঘর ছিল। এইসব গুদাম-ঘরের সামনে আমদানি নৌকোগুলোর অসম্ভব ভিড় লেগে থাকত। তারা

নিজেরা দিনের পর দিন এই দুই খালে মাল খালাস করবার জন্য পড়ে তো থাকতই, রফতানি নৌকোগুলোকেও আটকে রেখে দিত।

এই দুই খালের ভেতর নৌকো চলাচলের বাধা দূর করবার জন্য সার্কুলার খালের পশ্চিমদিক দিয়ে একটা নতুন খাল কাটানোর প্রস্তাব হয়। এই খাল মাত্র সেইসব নৌকোই ব্যবহার করতে পারবে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে রফতানি মাল নিয়ে সোজা গঙ্গায় বেরিয়ে যাবে, বা গঙ্গা থেকে মাল নিয়ে সোজা পূর্ববঙ্গ যাবে—মাঝপথে মাল খালাস করবে না। যেসব নৌকো কলকাতা বাজারের জন্য মাল আনবে বা খালাস করবে, তাদের জন্য থাকবে মাত্র দু'টি খাল—বেলেঘাটা খাল ও সার্কুলার খাল।

তারপর দেখা দেখা গেল, সার্কুলার খালের পশ্চিমদিক দিয়ে নতুন খাল কাটা নানা কারণে অসম্ভব। অতএব সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। ১৮৫২ সনে রবার্ট রোজ (Robert J. Rose) এই খালগুলির একজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, সার্কুলার খালের পূর্বদিক দিয়ে ও তার সমান্তরালে এই নতুন খাল কাটা হোক। সে খাল চিৎপুর লক্-এ গিয়ে সার্কুলার খালে পড়বে না, চিৎপুর লক্-এর উত্তরে গঙ্গায় গিয়ে পড়বে। আর যেখানে গঙ্গায় পড়বে সেইমুখে একটা 'লক্' বসবে। এর জন্য জমিও দখল করা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই পরিকল্পনাও পরিত্যক্ত হল। নতুন খালের মোহানা ও লক্-এর জন্য যে জমি নেওয়া হয়েছিল, তা শেষপর্যন্ত ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলকে দিয়ে দেওয়া হল। এই নতুন-কাটা খাল (New-cut Canal) ১৮৫৮-৫৯ সনে বেলগেছিয়া পুলের ৯০০ ফুট দক্ষিণে উল্টোডাঙায় সার্কুলার খাল থেকে বেরিয়ে পূর্ব-দক্ষিণমুখী হয়ে নোনা জলের বিলের কাছে পৌঁছে সোজা দক্ষিণমুখী হয়ে ধাপা টোল-ঘরে সেনট্রাল লেক চ্যানেলে পড়ত।

১৮৯৫ সনে আরম্ভ হয়ে ভাঙড় খাল কাটা শেষ হয় ১৮৯৭ সনে। ১৮৯৭ সনের পর থেকেই ধাপা ও বামনঘাটার মধ্যে সেনট্রাল লেক চ্যানেল পলি পড়ে খুব তাড়াতাড়ি বুজে যেতে আরম্ভ করে। সেনট্রাল লেক চ্যানেল দিয়ে আর নৌকো ইত্যাদির যাওয়া-আসা সম্ভব নয় দেখে হর্ন (Horn) নামে এক সাহেব এঞ্জিনিয়ার ধাপা ও বামনঘাটার মধ্যে একটা নতুন খাল কাটবার পরিকল্পনা দেন। সেনট্রাল লেক চ্যানেলের গাজার ফুট উত্তর থেকে এই নতুন খাল কাটা আরম্ভ হয় ১৯০২-৩ সনে। এই খাল কাটার বিরুদ্ধে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। তাঁরা বলেন, এই খাল ঐখান থেকে কাটা শুরু হলে তাঁদের বানতলায় সদ্য তৈরি ময়লা জলের নিকাশী ব্যবস্থা (outfall) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই নতুন খালের প্রবাহপথ নির্ধারণের ভার দেওয়া হয় এক কমিটির ওপর। কমিটিতে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি ছিলেন তার চেয়ারম্যান চার্লস অ্যালেন (Sir Charles Allen)। এখানেও আপত্তি এত

প্রবল হয় যে ১৩-৩-১৯০৬ তারিখের কমিটি মিটিং-এ গভর্নমেণ্টের সেচ-বিভাগের প্রধান এঞ্জিনিয়ার ইংগলিস (Mr. Inglis) ঘোষণা করেন যে প্রস্তাবিত খালের গতিপথ আরো উত্তরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই আরো-উত্তরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া খালই হল কৃষ্টপুর খাল, যা কাটা আরম্ভ হয় ১৯০৮ সনে ও শেষ হয় ১৯১০ সনে।

ধাপা টোল-ঘর থেকে বামনঘাটা পর্যন্ত সেনট্রাল লেক চ্যানেল ছিল খালের টোল-কালেক্টরের অধীনে। বামনঘাটা থেকে যমুনা বা ইছামতী নদী পর্যন্ত খালপথ ছিল খালের একজিকিউটিভ অফিসার-এর অধীনে।

বামনঘাটার পরেই জলপথ দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছিল—একটি শাখা দক্ষিণ-মুখী হযে তারদা কালিন্দী নদীর মধ্য দিয়ে বসন্তপুরে যমুনা নদীতে গিয়ে পড়ত; আর একটি শাখা ভাঙ্গড় কাটাখালের মধ্য দিয়ে পূর্বমুখে গিয়ে বসন্তপুরের ৯ মাইল উত্তরে রাজপুরে যমুনা নদীতে পড়ত। বামনঘাটা থেকে ভাঙড় কাটাখালের গোড়া পর্যন্ত ছিল প্রায় ৮ মাইল, আর বামনঘাটা থেকে উত্তর খাল-পথে রাজিপুর পর্যন্ত দূরত্ব ছিল ৩৪ মাইল।

বিদ্যাধরী নদীর ভরাযৌবন ছিল ১৮৩০ থেকে ১৮৮৩ সনের মধ্যে। ১৮৩৩ সনে সার্কুলার খাল ও ১৮৫৯ সনে নতুন-কাটা খাল তৈরি হয়। এই দুই খালের জল পেয়ে বিদ্যাধরী ফুলে ফেঁপে ওঠে। ১৮৮৩ সনের পর থেকে তার অবনতি শুরু হয়। অবনতির সূত্রপাত হয় ১৮৮৩ সনে ধাপা-লক্ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে। অবনতি বাড়ে ১৮৯৫-৯৭ সনের মধ্যে বামনঘাটা থেকে কুলটি পর্যন্ত ১৫ মাইল লম্বা ভাঙ্গড় কাটাখাল তৈরির ফলে। ১৮৯৭ সালে বামনঘাটায় একটি ও কুলটিতে একটি লক্ বসিয়ে এই খোলা খালকে একটি বদ্ধখালে পরিণত করা হয়। ১৯০৮-১০ সনে কৃষ্টপুর খাল কাটার ফলে বিদ্যাধরীর অবনতি দ্রুততর হয়। ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে মৃতপ্রায় এই নদীকে ফের বাঁচিয়ে তোলার নানারকম চেষ্টাচরিত্র হয়, কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হল না। ১৯৩০ সনে ধাপা থেকে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত ৩৫ মাইল-ব্যাপী বিদ্যাধরী নদী একেবারে মরে গেল। ধাপা-লক্ পরিত্যক্ত হল ১৯২৭ সনে, বামনঘাটা-লক্ ১৯৩৬ সনে।



যোগাযোগ-ব্যবস্থা : স্থলপথ

আগের অধ্যায়ে কলকাতার সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ-ব্যবস্থার কথা লিখেছি। এবারে স্থলপথে যোগাযোগ-ব্যবস্থার কথা লিখছি। তবে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থার কথা বলছি না। আপাতত কলকাতার ভেতরে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায়, এক মাথা থেকে আর এক মাথায়, যাবার কি কি উপায় ছিল তারই কথা, অর্থাৎ বিভিন্ন যানবাহনের কথা বলছি।

কলকাতার আদিপর্বে আজকের গাড়িঘোড়া, যানবাহন ছিল কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দেখা দরকার তখন পথঘাট ছিল কি না। আগে পথ, তারপর পরিবহন। রাস্তা না থাকলে যানবাহনের কথা উঠতেই পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়, কলকাতার পত্তনের ১৬ বছর পরে, ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে, তখনকার কলকাতার—মানে, সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিন গ্রামের—জমি, বাড়ি, রাস্তা ইত্যাদির প্রথম জরিপ হয়। তাতে দেখা যায়, সুতানুটি গ্রামের মোট ১৬৯২ বিঘা জমির মধ্যে ১৫৫৮ বিঘা ছিল জঙ্গল ও ধানক্ষেত। গোবিন্দপুর গ্রামের ১১৭৮ বিঘা জমির মধ্যে ১১২১ বিঘা ছিল ঘোর জঙ্গল। কলকাতা গ্রামকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—বাজার-কলকাতা ও ডিহি-কলকাতা। বাজার-কলকাতার ৪৮৮ বিঘা জমির মধ্যে ৮৮ বিঘা ছিল পতিত ও ডিহি-কলকাতার ১৭১৮ বিঘা জমির মধ্যে ১৪৭০ বিঘা ছিল ক্ষেত ও পতিত জমি। তিন গ্রামের মোট ৫০৭৬ বিঘা জমির মধ্যে ১৫২৫ বিঘা ছিল ধানক্ষেত ও ৪৮৬ বিঘা বাগান। ২৫০ বিঘায় কলাগাছ লাগানো

হয়েছিল, ১৮৭ বিঘাতে তামাক ও ১৫০ বিঘায় শাকসবজি। ১১৬ বিঘাতে ছিল রাস্তা, খাল, পাতকুয়ো ও পুকুর, আর ১১৪৪ বিঘা ছিল পতিত। ঐ সনের জরিপ থেকে আরো জানা যায় তখন মাত্র দুটি 'স্ট্রিট' ও দুটি 'লেন' ছিল, একটিও 'রোড' বা 'বাই-লেন' ছিল না।

১৭২৬ সনে দ্বিতীয়বার ঐ তিন গ্রামের জরিপ হয়। তাতে জানা যায় তখন 'স্ট্রিট'-এর সংখ্যা হয়েছে ৪ ও 'লেন'-এর সংখ্যা ৮। 'রোড' বা 'বাই-লেন' তখনো হয় নি।

১৭৪২ সনে তৃতীয়বার জরিপ হয়। তাতে দেখা যায়, 'স্ট্রিটে'র সংখ্যা তখন দাঁড়িয়েছে ১৬, 'লেন'-এর ৪৬ ও 'বাই-লেন'-এর ৭৪। ১৭৫৬ সনে চতুর্থবার জরিপ হয়। তখন 'স্ট্রিট'-এর সংখ্যা হয়েছে ২৭, 'লেন'-এর ৫২ ও 'বাই-লেন-এর সংখ্যা বাড়ে নি, ৭৪-ই আছে।

সত্যিকার বড় রাস্তা, যাকে ইংরেজিতে বলে 'হাইওয়ে' বা 'রোড' ১৭৫৬ সন পর্যন্ত একটিও হয় নি। আর 'স্ট্রিট', 'লেন', 'বাই-লেন' —সব রাস্তাই ছিল সরু সরু ও কাঁচা। কাঁচা রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি চলতে পারে না। সুতরাং তখনো ঘোড়ার গাড়ির জন্ম হয় নি কলকাতায়। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, বা এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যেতে হলে তিনটি উপায় ছিল—হয় পায়ে হেঁটে, নয় গোরুর বা মোষের গাড়িতে চেপে, আর নয় পালকিতে চড়ে।

কলকাতায় সত্যিকার প্রথম বড় রাস্তা (রোড) হল সার্কুলার রোড। ১৭৪২ সনে খোঁড়া মারহাট্টা খাল বুজিয়ে এই রাস্তা তৈরি হয়। কিন্তু ঠিক কোন সনে তৈরি হয় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল বলেন ১৭৮০ সনে, আর একদল বলেন ১৭৯৯ সনে, অর্থাৎ আঠারো শতকের একেবারে শেষে। যে সনেই তৈরি হয়ে থাক না কেন, সব পণ্ডিতেরই একমত যে ১৭৯৯ সনে সার্কুলার রোড পাকা করা হয়। সার্কুলার রোড কলকাতার প্রথম 'রোড' বা লম্বায় ও চওড়ায় প্রকৃত বড় রাস্তাই নয়, প্রথম পাকা রাস্তা। কিন্তু 'পাকা' মানে পাথরের টুকরো দিয়ে নয়, ইট-ভাঙা খোয়া দিয়ে বিছানো। পাথরভাঙা খোয়া দিয়ে কলকাতার রাস্তা পাকা করা আরম্ভ হয় ১৯৩৪-৩৫ সনে। তাই দেখা যায়, উনিশ শতকের গোড়া থেকে কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি চলা আরম্ভ হয়েছে। পালকি তো আগে থাকতেই ছিল।

১৭৬৬ সনের জুন মাসে কলকাতায় প্রথম পথ-সমীক্ষক (Road Surveyor) নিযুক্ত হন। কিন্তু উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত তিনি কলকাতার রাস্তাঘাটের বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারেন নি। তখন কলকাতার অবস্থা সবদিক থেকে এত খারাপ ছিল যে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ৮০৩ সনে কলকাতার ৩০ জন প্রধান নাগরিককে নিয়ে 'শহর উন্নয়ন কমিটি' নামে এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির ওপর এই ক'টা কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল : ড্রেন,

পথঘাট, বাড়িঘরের উন্নতি করা ; বাজার, কসাইখানা ও কবরখানার স্থান নিয়ন্ত্রণ করা এবং নতুন রাস্তা, গলি ও বাড়ি তৈরি করা। ব্যাপক অনুসন্ধানের পর কমিটি বিরাট এক রিপোর্ট দাখিল করে (যদিও সে রিপোর্ট আজ আর পাওয়া যায় না)। রিপোর্টে যেসব বিষয়ের উন্নতি করবার সুপারিশ করা হয়েছিল গভর্নমেণ্ট সেগুলি মঞ্জুর করেছিলেন, কিন্তু ১৮০৫ সনের আগস্ট মাসে ওয়েলেসলি যখন ভারত থেকে চলে যান, দেখা গেল তখন পর্যন্ত উন্নতিমূলক একটিও কাজ হয় নি।

কলকাতায় প্রথম লটারি ক'রে টাকা তোলা হয় ১৭৮৪ সনে সেণ্ট জন গির্জা তৈরি করবার উদ্দেশ্যে। ঐ সনে ৯ জন ভদ্রলোককে নিয়ে একটি বিশেষ 'লটারি কমিশন' ঐ কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের প্রত্যেক সদস্যকে বলা হতো লটারি কমিশনার। টাকা তোলার এই নতুন কৌশল লোকের এতই মনে ধরল যে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে লটারি-মারফত টাকা তোলা এরপর থেকে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। ১৮০৫ সনে লটারি কমিশনাররা ওয়েলেসলির 'শহর উন্নয়ন কমিটি'র হাতে শহরের উন্নতির জন্য টাকা দেওয়ায় ঐ সনে গভর্নমেণ্ট সর্বপ্রথম লটারি কমিশনারদের সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিলেন। পরে ১৮০৯ সনে লর্ড মিণ্টোর আমলে ওয়েলেসলির শহর উন্নয়ন কমিটি তুলে দিয়ে আর একটি শহর উন্নয়ন কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই দ্বিতীয় কমিটিকেও পাঁচ বছর পরে ১৮১৪ সনে তুলে দেওয়া হয়। এই কমিশনারদের মিউনিসিপ্যালিটির কাজের উন্নতির জন্য লটারি ক'রে টাকা তোলবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই কমিশনাররা ১৮১৭ সন পর্যন্ত মাত্র ৩ বছর কাজ ক'রে বিদায় হন। তাঁদের জায়গা দখল করে বিখ্যাত 'লটারি কমিটি'।

১৮০৫ থেকে ১৮১৭ সনের মধ্যে লটারির টাকায় অনেক পুকুর খোঁড়া হয় ; টাউন হল, যা লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে তৈরি আরম্ভ হয়, তা সম্পূর্ণ করা হয় ১৮১৩ সনে, বেলেঘাটা খালের সংস্কার করা হয় ও অনেক রাস্তা তৈরি করা হয়।

লটারি কমিশনাররা প্রতি বছরই একবার, কখনো কখনো একবারের বেশি, লটারির আয়োজন করতেন। ১৮১৭ সালে যে স্থায়ী লটারি কমিটি নিযুক্ত হয় গভর্নমেণ্ট তার হাতে পূর্বের ১৭টি লটারির উদ্বৃত্ত সাড়ে-চার লক্ষ টাকা তুলে দেন। এই কমিটি ১৮৩৬ সন পর্যন্ত মোট ২০ বছর কাজ করে। শহর উন্নয়নের জন্য লটারির দ্বারা টাকা তোলা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে ইংল্যাণ্ডের জনমত নিন্দা করলে, এই কমিটি কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

১৮০৫ থেকে ১৮৩৬ সনের মধ্যে এই রাস্তাগুলি তৈরি হয় : ইলিয়ট রোড, স্ট্র্যাণ্ড রোড (প্রিন্সেপ্‌স ঘাট থেকে হাটখোলা পর্যন্ত), উড স্ট্রিট, ওয়েলেসলি স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, হেস্টিংস স্ট্রিট, ময়রা স্ট্রিট, লাউডন স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, হেয়ার স্ট্রিট, কলুটোলা স্ট্রিট, মির্জাপুর স্ট্রিট,

ক্যানাল স্ট্রিট, রডন স্ট্রিট, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট। আর এই সময়ের মধ্যে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কিড স্ট্রিট, ম্যাঙ্গো লেন ও বেন্টিংক স্ট্রিটকে চওড়া ও সোজা করা হয়। এই সময়ের মধ্যে গড়ের মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলার রাস্তা ও পায়ে চলার অনেকগুলি পথও তৈরি করা হয়। আর এই সময়ের মধ্যেই প্রতিবছর ২৫ হাজার টাকা খরচ ক'রে কলকাতার রাস্তাগুলিকে নিয়মিতভাবে পাকা করবারও ভার নেওয়া হয়।

লটারি কমিটি উঠে যাবার পরের বছর ১৮৩৭ সনে প্রেসিডেন্সি সার্জন ও ধর্মতলার নেটিভ হাসপাতালের সার্জন ডাঃ জেম্‌স র‍্যানাল্ড মার্টিন একটি বই লিখে প্রকাশ করেন। বইখানির নাম *Notes on the Medical Topography of Calcutta and its Subarbs*। তখনকার গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের দৃষ্টি এই বইটির দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee নামে এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট। ইনি ১৮৩৩ থেকে ১৮৪৮ সন পর্যন্ত কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। এঁরই পুত্র, তাঁরও নাম স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট, স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডের পরে বাংলার দ্বিতীয় ছোটলাট (লেফটেনাণ্ট-গভর্নর) হয়েছিলেন। এই কমিটির ভারতীয় সদস্য ছিলেন চার জন—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত ও রুস্তমজী কাওয়াসজী। কলকাতার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত হেন বিষয় নেই যার সম্বন্ধে এই কমিটি ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করে নি। এই কমিটি তিনটি রিপোর্ট পেশ করে—প্রথমটি ১৮৪০ সনে ও শেষেরটি ১৮৪৭ সনে। এই কমিটির অনুরোধেই লেফটেনাণ্ট অ্যাবারক্রম্বি রাস্তার উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, কিন্তু অর্থাভাবে সেই পরিকল্পনা কার্যকর করা যায় নি।

১৮৪৮ সনের দুই নম্বর আইনে বলা হয়, সরু সরু গলিঘুঁজি ভেঙে ফেলে সোজা ও চওড়া রাস্তা তৈরি করতে হবে। গাড়ি চলার রাস্তাগুলি হবে অন্তত ৫০ ফুট চওড়া ও যেসব রাস্তায় গাড়ি চলবে না সেগুলি হবে অন্তত ২০ ফুট চওড়া। এই আইন ১৮৫২ সনে নাকচ করা হয়। এই আইনের একমাত্র ফল হয় কলুটোলা স্ট্রিট থেকে মেছোবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত লম্বা হ্যালিডে স্ট্রিট। তৈরি হয় ১৮৫৬-৫৭ সনে। সে স্ট্রিট এখন আর নেই, সেনট্রাল অ্যাভিনিউর মধ্যে পড়ে গেছে।

১৮৬৩ থেকে ১৮৮০ সনের মধ্যে এই রাস্তাগুলি তৈরি হয়: ১. ফ্রি স্কুল স্ট্রিটকে বাড়িয়ে ধর্মতলা স্ট্রিট পর্যন্ত নিয়ে আসা হয় (১৮৬৪); ২. ক্যানিং স্ট্রিট (১৮৬৫); ৩. বিডন স্ট্রিট (১৮৬৮); ৪. গ্রে স্ট্রিট (১৮৭৩)। ৩ ও ৪ নম্বর রাস্তা লেফটেনাণ্ট অ্যাবারক্রম্বির পরিকল্পনার বিলম্বিত ফল।

১৮৮৮ সন পর্যন্ত কলকাতায় ১৮১½ মাইল রাস্তা ছিল। তার মধ্যে ৩৪½

মাইল ছিল খোলা নর্দমা বুজিয়ে তৈরি করা সরু গলি (sewered ditches)।

১৮৮৮ সনের দুই আইন অনুসারে সার্কুলার রোডের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে যেসব শহরতলি (suburb) ছিল সেগুলিকে কলকাতার মধ্যে আনা হয়—যথা, পূর্বদিকে এণ্টালি,বেনেপুকুর, ট্যাংরা, তপসিয়া ও নোনা জলের বাদা পর্যন্ত অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, আলিপুর ও খিদিরপুর। এই শহরতলিগুলিকে কলকাতার মধ্যে আনার পর এইসব রাস্তা তৈরি হয়েছে : ১. ল্যান্সডাউন রোড ; ২. হরিশ মুখার্জি রোড ; ৩. হাজরা রোড ; ৪. চেতলা সেনট্রাল রোড ; ৫. স্টার্নডেল রোড ; ৬. জজেস কোর্ট রোড ; ৭. গোপালনগর রোড ; ৮. সবজিবাগান রোড ; ৯. কালীমন্দির রোড ; ১০. হেস্টিংস পার্ক রোড ; ১১. উডবার্ন পার্ক রোড ; ১২. জগন্নাথ দত্ত স্ট্রিট ; ১৩. গ্যাস স্ট্রিট ; ১৪. আপার সার্কুলার রোড—গ্যাস স্ট্রিট।

১৯১১ সনে কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট আইন পাশ হয়ে ১৯১২ সনে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের জন্ম হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে অনেক প্রশস্ত রাস্তা ট্রাস্ট তৈরি করেছে, যথা :

১. এলগিন রোড থেকে টালিগঞ্জ—রসা রোড

২. চৌরঙ্গি রোড থেকে শ্যামবাজার—চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ, গিরিশ অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ

৩. সাদার্ন অ্যাভিনিউ

৪. রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

৫. আমির আলি অ্যাভিনিউ

৬. বটকৃষ্ট পাল অ্যাভিনিউ } (১৯৪৭ সনের পরে তৈরি)

৭. সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ }

১৯১০ সনে অ্যাসফাণ্টাম কলকাতায় অজানা ছিল। ১৯২৪-২৫ সনের পর থেকে রাস্তা তৈরি ও মেরামতের কাজে অ্যাসফাণ্টাম, বিটুমেন বা কোল টার (আলকাতরা বা পিচ) ব্যবহার হতে আরম্ভ হয়েছে। যন্ত্রের দ্বারা মিশ্রিত বিটুমেন বা রোড টারে খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে। ১৯৩৯ সন পর্যন্ত প্রায় ১৮০½ মাইল রাস্তায় পিচের আস্তর লাগানো হয়।

এই হল সংক্ষেপে কলকাতার রাস্তার ইতিহাস। এখন যানবাহনের খবর নেওয়া যাক।

পালকি

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ বহনের জন্য বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে পালকির ব্যবহার হয়ে এসেছে। পালকি জাতীয় আর একরকমের বাহন ছিল,

তার নাম ডুলি। ডুলি ও পালকি দুইই একজন মানুষ বহনের উপযোগী ছিল। দুই বাহনই বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো। বাংলাদেশে ডুলি ও পালকি বহন করত দুলে ও বাগদি শ্রেণীর লোকেরা। ডুলিতে কম বাহক লাগত, তাই পালকির চেয়ে ডুলি কম ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। ডুলি কলকাতায় ব্যবহার হয়েছে বলে শোনা যায় না। কিন্তু পালকি ব্যবহার হয়েছে কলকাতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই। সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় পালকিই অবস্থাপন্ন মানুষের একমাত্র বাহন ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলকাতায় সাহেব মহলে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় থেকেই পালকির ব্যবহারও ব্যাপক হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পালকির সংখ্যা না কমে বরং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এদেশী লোকেরা তো পালকি চড়তই, ইয়োরোপীয়রাও চড়ত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বড়কর্তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য পালকি ও বেহারা রাখতেন। আর ছোট কর্তাদের অর্থাৎ রাইটারদের পালকি ও বেহারা রাখতে নিষেধ করতেন। কারণ পালকি ও বেহারা রাখা শুধু ব্যয়বহুল ব্যাপারই ছিল না,তার সঙ্গে মর্যাদারপ্রশ্নও জড়িতছিল। কিন্তু নিষেধ বড় একটাকেউ মানত না। ছোট-বড়, সরকারি-বেসরকারি সব সাহেবই পালকি ব্যবহার করেছে। ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার ব্যাপক হওয়ার পরও অনেক সাহেব ও বাঙালি পালকি চড়েছেন। ডেভিড হেয়ার বরাবর পালকি ব্যবহার করেছেন, কোনোদিন ঘোড়ার গাড়ি চড়েন নি। বিদ্যাসাগর মশাই ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করতে চাইতেন না। পল্লীগ্রামে তিনি পালকি চড়তেন। পর্বের দিনে বাঙালি সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা-দের ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে ক'রে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাওয়া হতোএবং পালকি সুদ্ধ গঙ্গার জলে চোবানো হতো। মহিলারা পালকি থেকে বেরিয়ে স্নান করতেন না। এ দৃশ্য আমরা ছেলেবেলায় অনেক দেখেছি।

আগেই বলা হয়েছে, প্রথমে কলকাতায় বাঙালি দুলে ও বাগদি শ্রেণীর লোকেরা পালকি বইত। একটা কিংবদন্তি আছে যে মহারাজ নবকৃষ্ণ উড়িয়া পালকি-বেহারা ও উড়িয়া 'ঠাকুর' (পাচক ব্রাহ্মণ) কলকাতায় প্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। একথা যদি সত্য হয় তাহলে মনে হয় তিনি ১৭৬৭ সনে 'মহারাজা' হবার পর একাজ করেছিলেন, তার আগে নয়। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি কলকাতায় নানা জায়গায় পালকির ও উড়িয়া পালকি-বেহারাদের আড্ডা ছিল। লোকে সেখানে গিয়ে পালকি ভাড়া ক'রে আনত। উড়িয়া বেহারাদের পরে আসে পশ্চিমা অর্থাৎ হিন্দুস্থানি বেহারা। আমরা হিন্দুস্থানি পালকি বেহারা দেখি নি। সাহেব-রাই হিন্দুস্থানি বেহারা রাখত। উড়িয়া ও হিন্দুস্থানি বেহারাদের চাপে বাঙালি

পালকি-বেহারারা কলকাতা থেকে অদৃশ্য হল।

১৮৫০ সনে একজন হিন্দুস্থানি পালকি বেহারার মাইনে ছিল মাসে ৪ টাকা ও একজন উড়িয়া বেহারার ৫ টাকা। একটা পালকির জন্য ৬ জন হিন্দুস্থানি বেহারা লাগত। আর উড়িয়া বেহারা লাগত ৫ জন। সুতরাং হরেদরে খরচ সমানই হতো। ঐ সনে ঠিকা বা ভাড়ার বেহারাদের দিতে হতো পালকি ও মজুরি মিলিয়ে দিনে ১।০ (এক টাকা চার আনা)। তাহলে দেখা যাচ্ছে নিজের পালকি রাখলে বেহারাদের মাইনে বাবদ মাসে খরচ পড়ত ২৫ টাকা ও পালকি ভাড়া করলে খরচ হতো সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা। ঐ সনে বাংলাদেশে মোট পালকি-বাহকদের সংখ্যা ছিল ১১,৫০০। ১৮৯১ সনে শুধু কলকাতায় পালকির সংখ্যা ছিল ৬০৬ এবং পালকি-বেহারাদের সংখ্যা ১৬১৪।

নিজস্ব পালকি ও ভাড়া-করা পালকির মধ্যে তফাত ছিল এই যে, নিজস্ব পালকি হতো সামান্য একটু বড় ও বেশি বাহারি। পালকির তলাটা হতো বেতের বোনা। তার উপর থাকত একটা গদি, পিঠের দিকে ও দুই পাশে থাকত একটা ক'রে তাকিয়া। ভাড়া-করা পালকিতে এই গদি ও তাকিয়া-মোড়া থাকত খুব সরু কাঠির মাদুর বা শীতল-পাটি দিয়ে ও নিজস্ব পালকি হলে মরক্কো চামড়া দিয়ে। কলকাতার বড়লোকদের জন্য তিনহাজার টাকা দিয়েও এক-একখানা পালকি তৈরি হয়েছে।

রাজা-মহারাজারা কিংখাপের ঝালর দেওয়া পালকি ব্যবহার করতেন। তার দাম আরো বেশি ছিল। মোগল সম্রাটগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঝালরদার পালকি ব্যবহার করবার অনুমতি দিতেন কিংবা উপহার দিতেন। এটা বিশেষ সম্মানের ব্যাপার ছিল।

১৮২৭ সনে কলকাতার উড়িয়া পালকি-বেহারারা ধর্মঘট করেছিল। কলকাতা থেকে বাইরে যাবার জন্য পালকির ডাকও ছিল।

সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরুষদের জন্য একরকম চওড়া চেয়ারের মতো খোলা পালকি ছিল। এর নাম ছিল তাঞ্জাম (ইং Tonjon)। এই যান ইয়োরোপের 'সিডান চেয়ারে'র মতো ছিল।

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি না, ইংরেজ রাজত্বের একেবারে শেষের দিকে কলকাতায় পালকি ভাড়া ছিল এইরকম :

১. দূরত্ব হিসেবে—এক মাইল পর্যন্ত ৩ আনা। এক মাইলের বেশি হলে প্রতি মাইলে বা মাইলের অংশে ৩ আনা।

২. সময় হিসেবে—এক ঘণ্টা পর্যন্ত ৬ আনা। এক ঘণ্টার বেশি হলে প্রতি ঘণ্টার বা ঘণ্টার অংশের জন্য ৩ আনা। পাঁচ ঘণ্টার আধদিনের জন্য ১ টাকা। নয় ঘণ্টার একদিনের জন্য দেড় টাকা।

এই হার সরকারিভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

ঘোড়ার গাড়ি

তারপর এল গাড়ির যুগ। কিন্তু মাত্র দু'টি ছাড়া কোন রকম গাড়ি আগে বেরোয়, কোন রকম গাড়ি পরে, তা বলা সম্ভব নয়।

কলকাতার সাহেব মহলে পাঁচরকম গাড়ি খুব জনপ্রিয় ছিল, যথা : চেরোট (chariot), পালকি গাড়ি, ছোট পালকি গাড়ি, ব্রাউনবেরি ও বগি (buggy)।

চেরোট ছিল খুব বড় ও দামী গাড়ি। এ গাড়ি ব্যবহার করতেন গভর্নর, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, জজ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি ও ডাক্তাররা। বিশেষ ক'রে তাঁদের পরিবারের মহিলারা। এই গাড়ি চড়ে তাঁরা বিকেলবেলায় গড়ের মাঠে বা স্ট্র্যাণ্ডে হাওয়া খেতেন। এতে ঘোড়া, সইস, 'কোচুয়ান' সবই থাকত।

পালকি গাড়িতে দরজা থাকত। দু-ঘোড়ায় টানত। চালক ও দুই সইস থাকত। তারা ঘোড়ার পাশে পাশে ছুটত। সবরকম গাড়িরই নিয়ম ছিল এক— যতগুলি ঘোড়া, ততগুলি সইস।

ছোট পালকি-গাড়িতে দরজা থাকত না, থাকত পালকিতে যেমন তেমনি দু-পাশে দুটো পাল্লা, হাত দিয়ে ঠেলে সরানো যেত। একটা ঘোড়ায় টানত, তাই মাত্র একটি সইসের দরকার হতো। কোচম্যান বা চালকও থাকত।

একটা ডাণ্ডাহীন পালকিকে চারটে চাকার ওপর বসিয়ে দিলে যা হয় তাই ব্রাউনবেরি। এতে কোনো চালকের দরকার হতো না। একটিমাত্র ঘোড়ায় টানত ও একটিমাত্র সইস থাকত।

১৮২৭ সনে উড়িয়া পালকি-বেহারাদের ধর্মঘটের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তার ইতিহাস এই। পালকি-বেহারারা যাত্রীদের ওপর প্রায়ই জুলুম করত। যার যা খুশি ভাড়া বা মাইনে চাইত। না বলবার উপায় ছিল না। তখনো পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার আইন হয় নি। সাধারণের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদন করলে সরকার বেহারাদের ওপর কতকগুলি হুকুম জারি করেন। সরকারের বাঁধা হারে তাদের ভাড়া নিতে হবে, পালকিতে নম্বর দিতে হবে ও বেহারাদের হাতে পরতে হবে নম্বর-দেওয়া ব্যাজ বা চাকতি। বেহারারা কোনোটাতেই রাজি হয় না। তারা বলে চাকতি পরলে তাদের জাত যাবে। সরকারও অনমনীয়। বেহারারা কাজ ছেড়ে দিয়ে ধর্মতলায় এসে জড়ো হল। তারা বলল তারা কাজ করবে না, দেশে ফিরে যাবে। ফলে লোকেদের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হতে লাগল।

তখন কলকাতায় ব্রাউনলো নামে এক সাহেব ছিল। কেউ বলে সে কোনো গাড়ির কারখানায় কাজ করত, আবার অপরের মতে তার নিজের একটা পালকি ছিল। সে একদিন পালকির দুই ডাণ্ডা খুলে ফেলে, তলায় চারটে চাকা

লাগিয়ে এক-ঘোড়ায় টানা এক গাড়ি বানিয়ে ফেলল। তারই নামে গাড়ির নাম হল 'ব্রাউনবেরি'। ব্রাউনবেরির জন্ম হয় ১৮২৭ সনে।

পঞ্চম গাড়ি বগি—মাথায় ঢাকনা দেওয়া গাড়ি।

গ্রিনফিল্ড নামে এক সাহেব ১৮৭৫-৭৬ সনে কলকাতার কুলিবাজারে (যে অঞ্চলকে এখন হেস্টিংস বলে সেখানে) থাকত। সে ব্রাউনবেরির সঙ্গে পালকি গাড়ি মিলিয়ে এক দো-আঁশলা গাড়ি তৈরি করে। এ গাড়ি তৈরি করতে অনেক খরচ পড়ত। আবিষ্কর্তার নামে এ গাড়ির নাম হয় 'গ্রিনফিল্ড'। এর জন্মসন ১৮৭৫-৭৬।

আর ছিল অফিস-যান (office jaun) বা কেরাঞ্চি গাড়ি। অফিস-যান সাহেবরা ব্যবহার করত, কেরাঞ্চি গাড়ি দেশী কেরানিরা। আর ছিল ছ্যাকরা গাড়ি (hackney carriage)। এর জন্ম ১৮২৭ সনে—ব্রাউনবেরির জন্মের একই বছরে ও একই কারণে। এক-ঘোড়ায় বা দু'-ঘোড়ায় টানা লাল রঙের তৃতীয় শ্রেণীর ও কালো রঙের দ্বিতীয় শ্রেণীর। এছাড়া ছিল ফিটন (phaeton)—প্রথম শ্রেণীর মাথা খোলা ছ্যাকরা গাড়ির মতো। আর ছিল ভিক্টোরিয়া—ফিটনের মতোই মাথার ঢাকাটা দু'দিকে গুটিয়ে রাখা যেত। আর ছিল ব্রুয়াম্ (Brougham)—এক-ঘোড়ার বন্ধ গাড়ি, ইংল্যাণ্ডের Lord Brougham-এর নামে। এখানেই শেষ নয়। ছিল ল্যাণ্ডো (landau), ছোট ল্যাণ্ডো (landaulet), টমটম, ব্যারুশ (barouche), গিগ্ (gig)। একা, তাঙ্গা (tonga) পশ্চিমে চলে, কলকাতায় নয়। এসব গাড়ি যে একেবারে অচল হয়ে গেছে তা নয়, এখনো কিছু-কিছু আছে, বিশেষ ক'রে ছ্যাকরা গাড়ি। এসব গাড়ির চাকা ছিল লোহা-বাঁধানো। রবার টায়ার ব্যবহার হতে শুরু হয়েছে ১৯০০ সন থেকে।

ব্রিটিশ আমলের শেষাশেষি কলকাতায় ঠিকে গাড়ির ভাড়া ছিল এইরকম: ১. প্রথম শ্রেণীর গাড়ি: দূরত্ব হিসেবে—একমাইল পর্যন্ত ৮ আনা। এক মাইলের বেশি হলে প্রতি মাইলে বা মাইলের অংশে ৬ আনা। সময় হিসেবে—পনের মিনিটের জন্য ৮ আনা, আধ ঘণ্টার জন্য ১ টাকা, এক ঘণ্টার জন্য দেড় টাকা, পরবর্তী প্রত্যেক ঘণ্টার জন্য ১২ আনা, পাঁচ ঘণ্টার আধদিনের জন্য ৪ টাকা, নয় ঘণ্টার একদিনের জন্য ৭ টাকা। ২. দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি: দূরত্ব হিসেবে—এক মাইল পর্যন্ত ৬ আনা। এক মাইলের বেশি হলে প্রতি মাইলের বা মাইলের অংশের জন্য ৪ আনা। সময় হিসেবে—(ক) ফিটন ধরনের গাড়ির ভাড়া—পনের মিনিটের জন্য ৬ আনা,আধ ঘণ্টার জন্য ১২ আনা, এক ঘণ্টার জন্য ১ টাকা, পরবর্তী প্রত্যেক ঘণ্টার জন্য ৮আনা, পাঁচ ঘণ্টার আধদিনের জন্য ২টাকা ৮ আনা,নয় ঘণ্টার পুরো একদিনের জন্য ৪ টাকা; (খ) ব্রাউনবেরি ধরনের গাড়ির ভাড়া—আধ ঘণ্টার জন্য ৮ আনা, এক ঘণ্টার জন্য ১৪ আনা, পরবর্তী প্রত্যেক

ঘণ্টার জন্য ৮ আনা, পাঁচ ঘণ্টার আধদিনের জন্য ২ টাকা ৮ আনা, নয় ঘণ্টার একদিনের জন্য ৪ টাকা। ৩. তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি : দূরত্ব হিসেবে—এক মাইল পর্যন্ত ৩ আনা; এক মাইলের বেশি হলে প্রতি মাইল বা মাইলের অংশের জন্য ২ আনা। সময় হিসেবে—আধ ঘণ্টার জন্য ৬ আনা, একঘণ্টার জন্য ৮ আনা, পরবর্তী প্রত্যেক ঘণ্টার জন্য ৬ আনা।

আগে যে নানা নামের ও নানা ধরনের ঘোড়ার গাড়ির কথা বলা হয়েছে তাদের কলকাতায় তৈরি ক'রে বিক্রি করত বা ভাড়া দিত নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। গত শতাব্দীর এইরকম কতকগুলি গাড়ি-নির্মাতার নাম ও ঠিকানা এখানে দেওয়া হল :

আর. বার্টলেট	২৭ বেন্টিংক স্ট্রিট
এ. জর্জ অ্যাণ্ড কোং	৪২ ঐ
সিটন অ্যাণ্ড কোং	৪-৫ ঐ
জন ক্যামেরন অ্যাণ্ড কোং	১৩৩ ধর্মতলা স্ট্রিট
ইস্টম্যান অ্যাণ্ড কোং	৯ ঐ
জে. জে. লামস্‌ডেন	২৯ ঐ
নানাভাই ধুনজি অ্যাণ্ড কোং	২১ ঐ
ই. ডিসুজা	৬১ ওয়েলেসলি স্ট্রিট
জে. সোমারভিল	৪২ ঐ
উইনসর অ্যাণ্ড কোং	৯ গভর্নমেণ্ট প্লেস
স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড কোং	১ (বিকল্পে ৮) ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার
জি. স্মিথ	৩৫ জিগ জ্যাগ লেন
সি. এ স্মিথ	মিডলস রোড, এণ্টালি
শেখ মকসুদ আলি	লোয়ার সার্কুলার রোড (২৪ পরগনার দিক)
হরিশচন্দ্র বোস	২-১ ঐ
ডি. গুজম্যান	১১৮ নিউ চায়নাবাজার স্ট্রিট
জে. গ্রেগরি	২০ হরিণবাড়ি লেন
জে. বি. গার্ডনার	সাউথ রোড, এণ্টালি
ডব্লিউ. এল. ফার্কার	৯ চৌরঙ্গি রোড
ডাইক্‌স অ্যাণ্ড কোং	১৫ ওয়াটারলু স্ট্রিট
জন ডিসুজা	২২০ বউবাজার স্ট্রিট
ই. ডেলানগেরোড	৪০ জানবাজার ফোর্থ লেন
কলিন্‌স অ্যাণ্ড কোং	৩-৪ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট
জে. কার অ্যাণ্ড কোং	১১।১ চিৎপুর রোড

এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে বিখ্যাত গাড়ি-নির্মাতা ছিল স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড কোং। এই প্রতিষ্ঠানের একটু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া দরকার।

এই গাড়ি তৈরির ব্যবসা আরম্ভ হয় ১৭৭৫ সনে কসাইটোলায় (বেন্টিংক স্ট্রিটে)। ১৭৮৩ সনে জেমস স্টুয়ার্ট (Steuart) কলকাতায় আসেন। সেই বছরই কারখানা উঠে যায় ১নং (বা ৮নং) ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নারে। এখন ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার নেই। সেটা ছিল পশ্চিমে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ গির্জা ও লায়ন্স রেঞ্জ এবং পূর্বে নর্টন বিল্ডিংস ও রাধাবাজারের মধ্যে। দক্ষিণে লালবাজার। উত্তর বন্ধ ছিল। সেখান দিয়ে বেরনো যেত না। এখন উত্তর দিকটা ভেঙে ব্রেবোর্ন রোড হয়েছে। এই জায়গায় এই কোম্পানি ছিল ১৭৮৩ থেকে ১৯০৭ সন পর্যন্ত। জেমস স্টুয়ার্টের ভাই রবার্ট স্টুয়ার্ট কলকাতায় আসে ১৭৮৪ সনে ও তাদের বৈমাত্রেয় ভাই উইলিয়াম স্টুয়ার্ট আসে ১৭৯৫ সনে। ১৯০৭ সনে এই কোম্পানি ৩নং ম্যাঙ্গো লেনে উঠে যায় ও সেখানে থাকে ১৯৩০ সন পর্যন্ত। ১৯৩০ সনে আবার উঠে যায় ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ও পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে। ১৯১৯ সনে এই কোম্পানি লিমিটেড-কোম্পানি হয়।

ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ন'রে ২ বিঘা ১৭ কাঠা ১৩ ছটাক জমির উপর এদের কারখানা-বাড়ি ছিল। এই জমি ও বাড়ি এদের নিজেদের সম্পত্তি ছিল না—অপরের কাছ থেকে ইজারা নেওয়া ছিল। ১৯৩০ সনের পর কোম্পানির প্রধান কারখানা স্থাপিত হয় বালিগঞ্জে, ১৬ বিঘা জমির উপর।

শেষের দিকে এই কোম্পানি ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করা ছেড়ে দিয়ে মোটর গাড়ি তৈরি, মেরামত ও বিক্রির ব্যবসা আরম্ভ করে। এ ব্যবসা তারা আরম্ভ করে ম্যাঙ্গো লেনে থাকতেই। বালিগঞ্জে তাদের মোটর গাড়ি তৈরি ও মেরামতের কারখানা ছিল। আর পার্ক স্ট্রিটে ছিল তাদের মোটর গাড়ি বিক্রির দোকান।

এই কোম্পানি আগে সবরকমের ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করত—যেমন, চেরোট, বগি, গিগ, ফিটন, ল্যাণ্ডো, অফিস-যান, ভিক্টোরিয়া, ডাক-গাড়ি, ব্রুয়াম্, ব্রাউনবেরি। এরা টিপু সুলতানের পুত্রদের জন্যও পালকি তৈরি করেছে। তাঞ্জোরের রাজার জন্য মহান্না বা মিয়ান্না নামে এক প্রকাণ্ড ধরনের পালকি তৈরি করেছে, যার ভেতর হাত-পা ছড়িয়ে সটান হয়ে শোয়া যেত। রাজা-রাজরাদের তারা খুব দামী বাহারি শৌখিন গাড়ি যুগিয়েছে। সম্রাট এডোয়ার্ড যখন যুবরাজ হয়ে ১৮৭৫ সনে ভারতে আসেন, তাঁর হাতির পিঠে বসবার জন্য হাওদা এরা তৈরি ক'রে দেয়। দু'বছর পরে ঝিন্দের মহারাজার জন্য ২৫ হাজার তোলা ওজনের রুপোর পাত মোড়া এক গাড়ি তৈরি ক'রে দেয়। ১৮৮২ সনে ও তার পরে ভাওয়ালপুরের নবাব, নেপালের প্রধান সেনাপতি ও কাবুলের আমিরকে বহু মূল্যবান সুদৃশ্য গাড়ি তৈরি ক'রে দেয়। ১৯০৩ সনে সপ্তম এডোয়ার্ডের

রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লর্ড কার্জন দিল্লিতে যে দরবার করেন, সেই দরবারের জন্য একটা নিরেট রুপোর হাওদা এরা তৈরি ক'রে দেয়। বড়লাটের নিজের অতিথিদের জন্য ২২টা ল্যাণ্ডো ও ১৮টা ভিক্টোরিয়া যোগান দেয়। ১৯০৬ সনে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতে আসেন তখন তাঁর জন্য একটি বিচিত্র কারুকার্য করা গাড়ি ও ১৯১১ সালে যখন তিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জ হয়ে আসেন তখন তাঁর জন্য একটি অত্যন্ত বাহারি গাড়ি তৈরি ক'রে দেয়। ১৯২৬ সনে বড়লাটের বিকানির পরিদর্শন উপলক্ষে বিকানিরের মহারাজাকে একমাসের মধ্যে দু'টি সুদৃশ্য গাড়ি তৈরি ক'রে সরবরাহ করে।

ডাইক্স অ্যাণ্ড কোম্পানিরও গাড়ি-তৈরিওয়ালা হিসাবে নামডাক ছিল। এদের ব্যবসা ছিল ১নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে। সেই জায়গায় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল তৈরি হওযাতে তারা ১৫ নং ওয়াটারলু স্ট্রিটে উঠে যায়। এখানে তাদের ব্যবসা ছিল ১৯২৪ সন পর্যন্ত।

জেম্স (বা টমাস) মেরেডিথও একজন নামকরা ঘোড়ার গাড়ি-তৈরিওযালা ছিল। এর নামেই মেরেডিথ স্ট্রিট।

এইসব গাড়ি-নির্মাতারা ছাড়া আরো অনেক ব্যক্তি ও কোম্পানি ছিল যাদের ইংরেজিতে বলা হতো Livery Stable Keeper। এদের নিজেদের ঘোড়া ও গাড়ি রাখবার আস্তাবল বা আড়গড়া ছিল। সেখানে তারা ঘোড়া ও গাড়ি রাখত। সেসব গাড়ি ও ঘোড়া তারা বিক্রি করত—আবার দিন, মাস বা বছর হিসেবে ভাড়াও দিত। বহু লোক নিজেদের গাড়ি-ঘোড়া না রেখে এদের কাছ থেকে বছরের পর বছর, কিংবা যতদিন দরকার ততদিনের জন্য ভাড়া নিত। আবার উল্টোটাও হতো। অর্থাৎ যাদের নিজেদের ঘোড়া-গাড়ি আছে তারা তাদের নিজেদের বাড়িতে রাখবার ও তোষাজ করবার হাঙ্গামা না ক'রে এদের কাছেই জিম্মা রাখত। এরা গাড়ি ধোলাই করা, সাফসুতরো রাখা, ঘোড়াদের নিয়মিত দানাপানি দেওয়া ও দলাই-মলাই করা ইত্যাদির ভার নিত। বিনিময়ে মালিকরা চুক্তি মতো তাদের মাসে-মাসে কিছু টাকা দিত।

লিভারি স্টেবল কিপারদের কয়েকটির নাম ও ঠিকানা এখানে দেওয়া হল:

কুক অ্যাণ্ড কোং	৩, ৪, ৫ ধর্মতলা স্ট্রিট
ঐ কোম্পানির শাখা	১১৯ ঐ
ঐ ঐ	৪৩, ৪৪ ইমামবাড়ি লেন
হান্টার অ্যাণ্ড কোং	২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ধর্মতলা স্ট্রিট
ঐ কোম্পানির শাখা	১৩৫ ঐ
ঐ ঐ	৭ জানবাজার স্ট্রিট

এছাড়া ছিল হার্ট ব্রাদার্স ও মিলটন্ কোম্পানি। হার্ট ব্রাদার্সের ঘোড়া-গাড়ির খুব ফলাও করাবার ছিল। তাদের আস্তাবল বা আড়গড়া ছিল মস্ত জায়গা জুড়ে—

উত্তরে প্রিন্সেপ্‌স স্ট্রিট থেকে দক্ষিণে ধর্মতলা স্ট্রিট পর্যন্ত, পশ্চিমে হসপিটাল স্ট্রিট ও টেম্পল স্ট্রিট, পূর্বে মিলটন কোম্পানির আড়গড়া। ঠিক এই জায়গাতেই ১৮ শতকের শেষে ও ১৯ শতকের গোড়ায় 'ড্রামণ্ড সাহেবের অ্যাকাডেমি' ছিল —যেখানে ডিরোজিও পড়েছিলেন। আবার, এই জায়গারই দক্ষিণ অংশে ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপর গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পাথুরেঘাটার ঘোষেদের বাড়ির আনন্দ-নারায়ণ ঘোষের বাজার ছিল। সে বাজার উঠে যেতে 'হার্ট ব্রাদার্স' সে জায়গা দখল করে। এদের আস্তাবল শুধু এখানেই ছিল না; বালিগঞ্জে এখন যে ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেন আছে, আগে সেই সমস্ত গার্ডেনটা জুড়ে হার্ট ব্রাদার্সের আস্তাবল ছিল। এ থেকে অনুমান করতে পারা যায়, এদের ঘোড়ার ব্যবসা কত ফলাও ছিল।

মিলটন কোম্পানির আস্তাবল ছিল ধর্মতলা স্ট্রিটে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত যেখানে কমলালয় স্টোর্স ছিল। মিলটন কোম্পানির আড়গড়াই কমলালয় স্টোর্সের বাড়ি। মিলটন কোম্পানির বিশেষত্ব ছিল দালালি গাড়ির ব্যবসা। দালালদের ব্যবহারের জন্য একরকম গাড়ি ছিল, তাতে পা-দানি থাকত না ও তার দরজা খোলা থাকত, যাতে ক'রে দালালরা একলাফে কর্মস্থলে পৌঁছতে পারে। দরজা খুলে নামবার তাদের সময় কোথায়? এক মিনিটের দেরিতে সমূহ ক্ষতি হতে পারে, কিংবা অন্য দালালরা তাদের মুখের গ্রাস ছো মেরে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই তাদের ত্বর সয় না, গাড়ির দরজা সবসময় খোলা। এই গাড়িকে বলা হতো দালালি গাড়ি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিলটন কোম্পানি ঘোড়াগাড়ির ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে স্টুয়ার্ট কোম্পানির মতো মোটর গাড়ির ব্যবসা আরম্ভ করে। একসময়ে এ কোম্পানি ঘোড়ার খাদ্য যোগাবার ব্যবসাও করত।

লিভারি স্টেবল কিপার ছাড়া আর কতকগুলি কোম্পানি ছিল যারা ঘোড়া ও গাড়ি নিলাম করত। তাদের কতকগুলির নাম ও ঠিকানা এই:

কুক অ্যাণ্ড কোং	৩, ৪, ৫ ধর্মতলা স্ট্রিট
হাণ্টার অ্যাণ্ড কোং	২৩, ২৪, ২৫, ২৬ ঐ
মেণ্ডিজ অ্যাণ্ড কোং	৬ বেন্টিংক স্ট্রিট
টমাস স্মিথ অ্যাণ্ড কোং	১৩৬, ১৩৭ ধর্মতলা স্ট্রিট

এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ডাকসাইটে ছিল কুক কোম্পানি। কুক সাহেব নিজে ছিলেন ঘোড়ার ডাক্তার। এরা শুধু গাড়ি ও ঘোড়া নিলামই করত না। আগে দেখেছি এরা ছিল লিভারি স্টেবল কিপার। লর্ড লিটন ১৮৭৭ সনের জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে খুব ধুমধাম ও জাঁকজমকের সঙ্গে এক দরবার ক'রে ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়াকে ভারত-সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করেন। সেই উপলক্ষে দিল্লিতে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ছাড়াও বহু সরকারি ও বেসরকারি

হোমরাচোমরারাও উপস্থিত হন। এঁদের ব্যবহারের জন্য বহু গাড়িঘোড়ার প্রয়োজন হয়। এই উপলক্ষে কুক কোম্পানি একটি আলাদা ট্রেনে ক'রে কলকাতা থেকে দিল্লিতে ৪০ খানি গাড়ি ও ৮০টি ঘোড়া পাঠায়।

৬ ও ৪১নং ধর্মতলা স্ট্রিটে টি. এফ. ব্রাউন অ্যাণ্ড কোং ছিল। তারা শস্তাদরে সাধারণকে প্রথম শ্রেণীর ব্যারুশ, ফিটন, ব্রুয়াম, বগি ইত্যাদি গাড়ি, ঘোড়া-সমেত ভাড়া দিত।

১৫৯ সি ধর্মতলা স্ট্রিট দোতলা বাড়ি। নিচে নন্দী ব্রাদার্সের সাইকেলের দোকান। এই নন্দী হলেন হরিদাস নন্দীর দাদা অক্ষয়কুমার নন্দী। দোতলায় থাকতেন পরলোকগত ডঃ মহম্মদ ইশাক—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও সদর স্ট্রিটে ইরান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। এই বাড়ির ছাতের আলসেতে পাথরের বা সিমেন্টের তৈরি প্রকাণ্ড এক ঘোড়ার মূর্তি ছিল। পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়বার ভয়ে কলকাতা কর্পোরেশন দু-তিন বছর আগে এই মূর্তিটিকে নামিয়ে ফেলে। এই থেকে বোঝা যেত যে নন্দী ব্রাদার্স আসবার আগে এখানে একটা ঘোড়ার আড়গড়া বা অস্তাবল ছিল, যেখানে ঘোড়া বিক্রি হতো বা ভাড়া পাওয়া যেত।

ঘোড়ার গাড়ি পর্ব এখানেই শেষ। এখন ট্রামের কথা।

ট্রা ম

১৮৬৭ সালে কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ভার ছিল কতকগুলি লোকের হাতে, যাদের বলা হতো Justices of the Peace। ঐ সনের এক আইনের দ্বারা গভর্নমেণ্ট কলকাতায় নিজেরা ট্রামলাইন বসাতে কিংবা কোনো কোম্পানিকে দিয়ে বসাতে জাস্টিসদের হাতে ক্ষমতা দেন। তিনবছর পরে ২০-৩-১৮৭০ তারিখে ভারত সরকার বাংলা গভর্নমেণ্টকে বললেন যে শেয়ালদা স্টেশন থেকে কলকাতার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় মালপত্র নিয়ে যাবার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাংলা সরকার এক কমিটি নিয়োগ ক'রে এক পরিকল্পনা রচনা ক'রে হিসাবপত্র দাখিল করতে কমিটিকে নির্দেশ দিলেন। কমিটি ২৪-৮-১৮৭০ তারিখে তার রিপোর্ট পেশ করল। ভারত গভর্নমেণ্ট ১৮৭১ সনের মার্চ মাসে ঐ পরিকল্পনা মঞ্জুর ক'রে কাজ আরম্ভ করতে নির্দেশ দিলেন। বাংলা গভর্নমেণ্ট ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দেশ জাস্টিসদের জানালেন এবং একটি কমিটি নিয়োগ করতে বললেন। জাস্টিসরা সেই মতো একটি কমিটি নিয়োগ ক'রে সেই কমিটিকে আবার এক পরিকল্পনা তৈরি করতে বললেন। কমিটি মনে করল যে যদি কলকাতায় ট্রাম চালানো হয় তো সেই ট্রাম প্রধানত ব্যবহার করা

হবে পল্লীগ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য শেয়ালদা স্টেশন থেকে স্ট্র্যাণ্ড রোড ও শোভা-বাজার অঞ্চলে যেসব গুদাম আছে সেইসব গুদামে নিয়ে যাবার জন্য, আর পাইকারি ব্যাপারিরা সেসব মাল ঐ গুদামে জমা ক'রে রাখবে। এই ভেবে কমিটি সুপারিশ করল যে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে একটা ট্রামলাইন পাতা হোক শেয়ালদা স্টেশন থেকে বৌবাজার দিয়ে গঙ্গার ধার অবধি, আর সেখান থেকে উত্তরমুখে আর্মেনিয়ান ঘাট ও আহিরিটোলা ঘাট, আবার সেখান থেকে শোভা-বাজারের ভেতর দিয়ে গিয়ে বাগবাজারে মিউনিসিপ্যালিটির রেললাইন পেরিয়ে চিৎপুর পুল পর্যন্ত।

বাংলা গভর্নমেণ্ট শেয়ালদা স্টেশন থেকে মাত্র আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক ট্রামলাইন পাতবার মঞ্জুরি দিলেন। মনে রাখতে হবে যে আর্মেনিয়ান ঘাটে তখন হাওড়ার ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কলকাতা স্টেশন অর্থাৎ টিকিট-ঘর ছিল। শেয়ালদা স্টেশন থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত লাইন পাতার মানেই শেয়ালদা স্টেশন থেকে হাওড়া স্টেশনে মাল নিয়ে যাওয়া ও হাওড়া স্টেশন থেকে শেয়ালদা স্টেশনে মাল নিয়ে আসা। এ ছাড়া আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত লাইন পাতার অন্য কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে না।

ঠিক হল ট্রামগাড়ি টানবে ঘোড়ায়। ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ১½লক্ষ টাকা খরচ ক'রে লাইন বসানো হল। শেয়ালদা স্টেশনে আরম্ভ হয়ে এই লাইন বৈঠকখানা রোড (সার্কুলার রোড), বৌবাজার স্ট্রিট ধরে গিয়ে ডালহাউসি স্কোয়ারে পৌঁছে কাস্টম্স্ হাউসের ভেতর দিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোডে পড়ে ঐ রোড ধরে গিয়ে আর্মেনিয়ান ঘাটে শেষ হয়েছিল। এই লাইনে প্রথম গাড়ি চলে ২৪-২-১৮৭৩ তারিখে। কোথায় মালপত্র নিয়ে যাওয়া? প্রথমদিন থেকেই এ লাইন যাত্রী বহন করেছে।

প্রথমদিন কিরকমভাবে ট্রাম চলেছিল তার বিবরণ এক প্রত্যক্ষদর্শী দিয়েছেন। এখানে আমি তার চুম্বক দিলাম—

সেদিন শেয়ালদা স্টেশন থেকে পর পর দু'টি 'ট্রাম-ট্রেন' ছাড়ে। প্রথমটিতে ছিল তিনটি গাড়ি—একটি প্রথম শ্রেণীর ও দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর। দ্বিতীয়টিতে ছিল দু'টি গাড়ি—একটি প্রথম শ্রেণীর, আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর। 'ট্রাম-ট্রেন' বলতে একথা যেন কেউ না ভাবেন যে আজকালকার ইলেকট্রিকে টানা ট্রাম-গাড়ির মতো আগে-পিছে দু'টি বা তিনটি গাড়ি পরস্পরের সঙ্গে জোড়া ছিল। প্রত্যেক গাড়িটাই আলাদা ছিল, প্রত্যেকটাই দুটো বলিষ্ঠ ঘোড়া দিয়ে টানা। প্রথম ট্রাম-ট্রেনটিকে ৬টি ঘোড়ায় টেনেছিল, দ্বিতীয়টিকে ৪টি ঘোড়ায়। ট্রেন বলা হয়েছে এইজন্য যে একটি গাড়ির পিছনে আর একটি গাড়ি ছিল।

পূর্ববঙ্গ রেলের ৯-১৫ মিনিটের ট্রেনটা যেই শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছল অমনি ট্রাম টিকিটের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, আর দেখতে দেখতে দ্বিতীয় শ্রেণীর

গাড়ি দু'টির ভেতর ও ছাদ পর্যন্ত যাত্রীতে এমনভাবে ভরে গেল যে সর্দিগর্মি হবার উপক্রম। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে মাত্র পাঁচটি লোক চাপল—তিনটি ইয়োরোপীয় ও দু'টি দেশী ভদ্রলোক। ৯-৩০ মিনিটে রওনা হবার সংকেত করা হল। প্রথম শ্রেণীর গাড়িটা অনায়াসেই স্টেশন থেকে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু যখন তার পরের গাড়িটাকে ছাড়বার জন্য সংকেত দেওয়া হল দেখা গেল, অমন তাগড়া ঘোড়াদু'টো প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি ক'রে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গেল কিন্তু গাড়ি যেখানকার সেখানেই রইল, এক ইঞ্চিও নড়ল না, এত লোক তাতে চেপেছিল। এই দেখে পূর্ববঙ্গ রেলের ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্রাণ্ডার ঘোড়া দু'টোর গায়ে সপাৎ সপাৎ ক'রে কয়েক ঘা চাবুক কশে দিল, তবুও নট-নড়ন-চড়ন, নট-কিচ্ছু। তারপর একদল ট্রাম কর্মচারির সাহায্যে গাড়ি চালু হল।

দ্বিতীয় ট্রেনটায় প্রথমটার চেয়েও বেশি মানুষ বোঝাই ছিল। সেই জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িটিকে আগে, আর প্রথম শ্রেণীটিকে পিছনে রাখা হল। তাতে প্রথম শ্রেণীর ইয়োরোপীয় যাত্রীরা চটে গেল। দুই গাড়িই ধীরে ধীরে ডালহাউসি স্কোয়ারে পৌঁছল। বিপুল জনতা সেদিন আগাগোড়া সমস্ত পথটার ধারে দাঁড়িয়ে এই নতুন গাড়ি চলা দেখেছিল। বৈঠকখানা রোড-বৌবাজার স্ট্রিটের মোড়ে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল।

ট্রামলাইন তৈরি করবার খরচ যুগিয়েছিলেন বাংলা গভর্নমেণ্ট। কিন্তু পরিচালনার ভার ও কর্তৃত্ব ছিল একমাত্র জাস্টিসদের ওপর। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা লোকসান দিয়ে ৯ মাস পরে ২১-১১-১৮৭৩ তারিখে এই ট্রাম উঠিয়ে দেওয়া হল। চলেছিল ২৪-২-১৮৭৩ তারিখ থেকে ২০-১১-১৮৭৩ তারিখ পর্যন্ত।

১৮৭৩ সনের ডিসেম্বর মাসে জাস্টিসরা ঠিক করলেন যে তাঁরা ম্যাক অ্যালিস্টার নামে এক সাহেবকে সব গাড়ি সমেত পুরো ট্রামলাইন একপয়সা লাভ না রেখে পড়তা দামে বিক্রি ক'রে দেবেন। কিন্তু বাংলা সরকার এই প্রস্তাবে আপত্তি করায় শেষপর্যন্ত লাইন ও গাড়িগুলি Parish ও Souttar নামে দু'জন ইংরেজকে বিক্রি ক'রে দেওয়া হয় বেশকিছু মুনাফা রেখে।।

এই ঘটনার পাঁচবছর পরে ১৮৭৮ সনে সারা কলকাতায় নিয়মিতভাবে ট্রাম চালাবার প্রস্তাব কয়েকটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আসে। তাদের মধ্যে মিঃ সৌটার ও মিঃ প্যারিশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই দু'জনকে শহরময় ট্রাম চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়। অনুমতি পেয়ে তাঁরা তাঁদের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করবার জন্য একটা সিণ্ডিকেট বা কোম্পানি গঠন করেন—কোম্পানির নাম দেন ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি। ১৮৭৯ সনের এই কোম্পানিকে তাঁরা তাঁদের ১৮৭৩ সনে কেনা ট্রামলাইন, গাড়ি ও অধিকার মাইলপিছু ৪ হাজার পাউণ্ড দামে বিক্রি ক'রে দেন। ২-১০-১৮৭৯ তারিখে কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানির মধ্যে এক চুক্তি হয়। এই চুক্তি

অনুসারে ট্রাম কোম্পানিকে প্রথমে ৮টি অঞ্চলে, পরে কর্পোরেশন ও গভর্নমেণ্টের অনুমোদিত অন্য অন্য অঞ্চলে একক ও জোড়া ট্রামলাইন তৈরি ও রক্ষা করবার অধিকার দেওয়া হয়। ঐ আটটি অঞ্চল হচ্ছে: ১. শিয়ালদা স্টেশন থেকে বৌবাজার হয়ে ডালহাউসি স্কোয়ার; ২. চৌরঙ্গি রোড; ৩ চিৎপুর রোড; ৪. ধর্মতলা স্ট্রিট; ৫. স্ট্র্যাণ্ড রোড, ৬. শ্যামবাজার; ৭. খিদিরপুর ৮.ওয়েলেসলি স্ট্রিট।

চুক্তির দ্বিতীয় শর্ত ছিল, কোম্পানি সময়ে সময়ে গাড়ির ভাড়া বেঁধে দিতে পারবে। কোম্পানি কলকাতা কর্পোরেশনকে পথের ভাড়া বাবদ দেবে একটি লাইনের জন্য বছরে ২ হাজার টাকা ও জোড়া লাইনের জন্য ৩ হাজার টাকা। চুক্তির ২২ বছর পরে (১৯০১ সনে) এই ভাড়া বেড়ে হবে যথাক্রমে ৩ ও ৪ হাজার টাকা। ২১ বছরের শেষে (১৯০০ সনে) কর্পোরেশনের সমস্ত লাইন কিনে নেবার অধিকার থাকবে, আর যদি সেই সময় কিনে না নেওয়া হয় তাহলে সে অধিকার বর্তাবে প্রত্যেক ৭ বছর অন্তর।

শিয়ালদা-বৌবাজার লাইনে প্রথম ট্রাম চলে ২৯-১০-১৮৮০ তারিখে, আর শিয়ালদা-বৌবাজার-ডালহাউসি-স্কোয়ার স্ট্রিট লাইনে ১৯-১১-১৮৮০ তারিখে। তারপরে নেওয়া হয় চিৎপুর লাইন। ১৮৮৪ সনের মধ্যে চিৎপুর-সমেত বাকি ৬টি লাইনে ট্রাম চালু হয়।

প্রথম আঞ্চলিক ট্রামলাইন, শিয়ালদা-বৌবাজার লাইন, শেষ হতো ডালহাউসি স্কোয়ারে নয়—ক্লাইভ স্ট্রিটের বেশ খানিকটা ভেতরে গিয়ে। ক্লাইভ স্ট্রিট একে সরু রাস্তা, তায় আবার ট্রাম লাইন ছিল রাস্তার একপাশে নয়, ঠিক মাঝখানে। তাতে পথচারীদের যাওয়া আসার ও যানবাহন চলাচলের বড়ই অসুবিধা হতো। এ অবস্থা দু-এক বছর নয়, ১৩ বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ সন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ১৮৯৩ সনে কর্পোরেশন এই লাইন প্রথমে রাস্তার একধারে সরিয়ে নিয়ে যায় ও পরে নতুন চীনাবাজার পর্যন্ত লাইনটিকে হটিয়ে নিয়ে এসে শেষ করে।

প্রথমে ট্রামলাইন চওড়া ছিল ৩ফুট ৬½ ইঞ্চিতে। ১৯০২ সনে কোম্পানি সব লাইন চওড়া ক'রে দেয় ৪ ফুট ৮½ ইঞ্চি। আজকাল ট্রামের কণ্ডাকটার ও ড্রাইভাররা যে খাকি পোশাক পরে, গত শতাব্দীতে তারা তা পরত না। পাহারাওয়ালাদের মতো মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধত। এখন কত রংবেরং-এর ট্রামগাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। গত শতকে একটা বিশেষ রকম রং—পাঁশুটে—দিয়ে ট্রামগাড়ি রং করা হতো। এই রং-এর ইংরিজি নাম ছিল CTC Grey। এক-একটা ট্রামগাড়ি টানত মোটা মোটা হাড়ওয়ালা একজোড়া ওয়েলার ঘোড়া। তাদের ঘাড়ে ও মাথায় শোলার টুপি পরানো থাকত ও দু'টো কান পাশের ছেঁদা দিয়ে টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকত।

১৮৯৬ সনে কলকাতায় ৬টা ডিপোতে ট্রাম কোম্পানির সমস্ত ঘোড়াকে

রাখা হতো। এই ৬টা ডিপো ছিল—শ্যামপুকুর, চিৎপুর, শিয়ালদা, কলিঙ্গা, ভবানীপুর ও খিদিরপুরে।

১৯০১ সনে পর্যন্ত ঘোড়ায় টানা ট্রামের যুগে ছিল একখানি ক'রে গাড়ি। একদিকে পাঁচটি ক'রে দু'দিকে ১০টি খোলা দরজা ছিল এক-একটি গাড়িতে। ঢুকেই বেঞ্চিতে সামনাসামনি বসবার জায়গা ছিল—দু'দিক দিয়েই ওঠানামা করা যেত। কালীঘাট লাইনে গাড়িগুলি আরো একটু ছোট ছিল—চারটি ক'রে দরজা আর একটি ক'রে ঘোড়ায় টানত।

১৯০৮-৯ সনের আগে ট্রামস্টপ ছিল না। তার পরিবর্তে কতকগুলি স্টেশন ছিল, যেখানে ট্রাম-যাত্রীরা জলযোগ করতে পারত ও যেখানে ঘোড়া বদল হতো। বড় রাস্তায় এক মাইল অন্তর অন্তর এইরকম স্টেশন বা ঘোড়া বদলের আস্তাবল ছিল; যেমন, চিৎপুর লাইনে সক (Schalch) স্ট্রিটে (বর্তমানে দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিট) একটা, জোড়াসাঁকোয় একটা, হ্যারিসন রোডের মোড়ে একটা, লালবাজারের মোড়ে একটা, ডালহাউসি স্কোয়ারে একটা, এসপ্লানেডের মোড়ে একটা, শ্যামবাজার লাইনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বই-এর দোকানের জায়গায় একটা, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোণে একটা এইরকম স্টেশন ছিল। এছাড়া আরো অনেক স্টেশন ছিল।

আগে চিৎপুর রোডে সক স্ট্রিট পর্যন্ত গিয়ে ট্রামলাইন শেষ হতো। তখনো বাগবাজার পর্যন্ত লাইন হয় নি। সক স্ট্রিটের আস্তাবল স্টেশন নয়—ঘোড়ার মস্ত ডিপো। সেইরকম শিয়ালদায় যে স্টেশন ছিল সেটাও আস্তাবল নয়—ঘোড়ার ডিপো। এটা ছিল বর্তমান কোলে বাজারের জায়গায়। কলিঙ্গায় যে স্টেশন ছিল সেটাও আস্তাবল নয—ঘোড়ার ডিপো। সেটা ছিল ওয়েলেসলি স্কোয়ারের দক্ষিণে, রাস্তার পূর্ব ধারে। আগে এখানে ক্যালকাটা গার্লস স্কুল ছিল, এখন যে স্কুল ধর্মতলা স্ট্রিটে সে.বর্ন গির্জার উত্তর-পশ্চিম পাশে আছে।

প্রথম ট্রামলাইন হবার কিছু পরেই দেখা গেল, যে যে-রেলের ওপর দিয়ে ট্রাম-গাড়িগুলো চলে অনেক জায়গায় সেই রেল রাস্তা থেকে দুই ইঞ্চি উপরে উঠে আছে। এটা পথচারী ও যানবাহন উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক। কোন কোন জায়গায় রেল এইরকমভাবে উঠে আছে সে সম্বন্ধে পুরোদস্তুর অনুসন্ধান করা হয়। তার ফলে ১৮৮৫ সনে কোম্পানির বিরুদ্ধে মমলা করা হয়। চার বছর পরে কোম্পানিকে বলা হয় লাইনগুলিকে ঠিক-ঠাক ক'রে দিতে, আর ১৮৯০ সনে বলা হয় কোম্পানি কতদূর কি করল তার রিপোর্ট দিতে। এর ফলে ১৮৯০ সনে ত্রুটিগুলির সংশোধন হয়। অর্থাৎ লাইন বসাবার পর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত রেলগুলো অনেক জায়গায় মাটি থেকে দুই ইঞ্চি উঁচু হয়ে থাকে।

১৮৯০-৯১ সনে ট্রাম কোম্পানির কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২,২৫০ ও ঘোড়ার সংখ্যা ১০০০।

ট্রামগাড়ি টানবার ঘোড়াগুলো ছিল ঠাণ্ডাদেশের ঘোড়া। তাদের একেই কলকাতার গরম সহ্য হতো না। তার ওপর তাদের মানুষ-বোঝাই ভারি ভারি গাড়িগুলোকে টানতে হতো। এটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। ১৮৮১ সনের গ্রীষ্মকালে অনেক ঘোড়া অতিরিক্ত গর্মিতে মারা পড়ে। ১৮৮২ সনের মে মাসে ট্রাম কোম্পানিকে চৌরঙ্গি লাইনে একমাসের জন্য স্টিম এঞ্জিন দ্বারা ট্রামগাড়ি চালাবার অনুমতি দেওয়া হয় পরীক্ষামূলকভাবে। এই একমাসের মধ্যে ৬টি দুর্ঘটনা ঘটে, যদিও তাতে কোনো মানুষ মরে নি বা জখম হয় নি। একমাসের শেষে চৌরঙ্গির বাসিন্দারা চাওয়াতে আরো ১১ মাস স্টিম এঞ্জিন দিয়ে এই লাইনে ট্রামগাড়ি চালাতে দেওয়া হয়। ১১ মাস পরে স্টিম এঞ্জিন দিয়ে ট্রাম চালানো বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় এই কারণে যে সেসময় এই লাইন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। শুধু প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময় কোম্পানি বিশেষ অনুমতি পেত চৌরাঙ্গি রোডে বাষ্পীয় এঞ্জিন চালাবার, তীর্থযাত্রীদের কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া ও সেখান থেকে নিয়ে আসার জন্য। খিদিরপুর লাইনেও কিছুদিন বাষ্পীয় এঞ্জিন দিয়ে ট্রামগাড়ি চালানো হয়েছিল।

১৮৯৬ সনে কিলবার্ন কোম্পানি বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা ট্রামগাড়ি চালাবার অনুমতির জন্য দরখাস্ত করে। ট্রাম কোম্পানির সঙ্গে কিলবার্নের একটা বোঝাপড়াও হয়। ২৮-১-১৮৯৭ তারিখে নিযুক্ত কর্পোরেশনের এক বিশেষ কমিটি কি কি শর্তে বিদ্যুতের দ্বারা ট্রাম চালানো যেতে পারে তা বিবেচনা ক'রে একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করে। এই খসড়া চুক্তি কর্পোরেশন অনুমোদন করলেও ট্রাম কোম্পানি মানতে অস্বীকার করে। ১৮৯৯ সনে কিছুটা অদলবদল ক'রে ঐ খসড়া চুক্তি কোম্পানি গ্রহণ করে। এই চুক্তির ফলে কোম্পানি লাইনের প্রয়োজনীয় রদবদল ও পুনর্গঠন ১৮৯৯ সনের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে আর ঘোড়ার বদলে বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে গাড়ি চালানো ৯-১১-১৯০২ তারিখের মধ্যে আরম্ভ করতে বাধ্য থাকে। ৯-১২-১৯০২ তারিখে ট্রাম কোম্পানির সঙ্গে আবার এক চুক্তির বলে কর্পোরেশন ১-১-১৯৩১ তারিখের মধ্যে অথবা তারপর প্রতি ৭ বছর অন্তর সমস্ত ট্রামলাইন কিনে নেবার অধিকার পায়। এই চুক্তিতে শহরতলির লাইনের ভাড়া ধার্য হয় প্রতি মাইলে হাজার টাকা। ১৯১৪ সনে কলকাতায় ও শহরতলিতে মোট ৩১ মাইল ট্রামলাইন, ২৪৫টি প্রথম শ্রেণীর ও ২৪৫টি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি ছিল।

২৭-৩-১৯০২ তারিখে খিদিরপুর লাইনে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে। এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুরের ভাড়া প্রথম শ্রেণীতে ছিল দু'আনা। খিদিরপুর লাইনের পর কালীঘাট লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে ১৪-৬-১৯০২ তারিখে। তারপর বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে ওয়েলিংটন স্ট্রিট লাইনে, অর্থাৎ ওয়েলিংটন স্ট্রিট, বৌবাজার ও ডালহাউসি স্কোয়ার পর্যন্ত। তারপর বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে

ধর্মতলা লাইনে। ১৯-১১-১৯০২ তারিখের মধ্যে সব ক'টি পুরাতন লাইনে অশ্বশক্তির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবর্তিত হয়।

এরপর থেকে কোম্পানির কাজ-কারবারে দ্রুত উন্নতি দেখা যায়। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সনের মধ্যে টালিগঞ্জ, বেলগাছিয়া, বাগবাজার, হ্যারিসন রোড, লোয়ার সার্কুলার রোড, আলিপুর এবং বেহালা লাইন খোলা হয়। ৭-৭-১৯০৫ তারিখে শেয়ালদা থেকে হ্যারিসন রোড দিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে হাইকোর্ট পর্যন্ত। শিয়ালদা থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত লাইন নিয়ে যাওয়া হয় ১৯১০ সনে। ১৯২৫ সনে পার্ক সার্কাস লাইন খোলা হয়, ১৯২৮ সনে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ লাইন, ১৯৪১ সনে রাজাবাজার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত আপার সার্কুলার রোড লাইন এবং ১৯৪৩ সনে পার্ক সার্কাস থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত লাইন খোলা হয়।

ট্রাম কোম্পানির প্রথম ম্যানেজার ছিলেন Mr. Maples, দ্বিতীয় ম্যানেজার Mr. Martyn Wells।

হাওড়ায় ট্রাম

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতা ট্রাম কোম্পানিকে ২৬-১১-১৯০৭ তারিখে হাওড়ায় ট্রাম লাইন খোলবার অনুমতি দেয়। তার ফলে কোম্পানি ডবসন রোড (এখন আবুল কালাম আজাদ রোড) ও গোলাবাড়ি রোড (এখন ডাঃ অবনী দত্ত রোড)-এর মোড়ে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-উৎপাদন স্টেশন স্থাপন করে এবং উত্তর বিভাগে দুই পথে ৪ ফুট ৮½ ইঞ্চি মাপের দু'টি ট্রামলাইন ও দক্ষিণ বিভাগে ঐ মাপের একটি লাইন পাতে। দক্ষিণের লাইন খোলা হয় ১০-৬-১৯০৮ তারিখে। এ লাইনটি হাওড়া পুল থেকে শুরু ক'রে বাকল্যাণ্ড পুলের উপর দিয়ে হাওড়া কোর্ট ও ময়দানের ধার দিয়ে কাওড়াপাড়া ঘাট পর্যন্ত দু'মাইল গিয়ে শেষ হয়। আর উত্তর বিভাগের দু'টি লাইনও হাওড়া পুল থেকে আরম্ভ হয়ে সালকিয়া বাঁধাঘাটের কাছে ঘুসুড়ি রোড (এখন যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড)-এর দক্ষিণ প্রান্তে শেষ হয়। একটি লাইন যায় ডবসন রোড, পূর্ব গোলাবাড়ি রোড, হাওড়া রোড (এখন শালকিয়া স্কুল রোড) দিয়ে, আর দ্বিতীয় লাইনটি যায় ডবসন রোড, পশ্চিম গোলাবাড়ি রোড, গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড, হরগঞ্জ রোড, তারপর পূর্বদিকে শ্রীঅরবিন্দ রোড ধরে। উত্তর বিভাগের দু'টি লাইনই খোলা হয় ১৯০৮ সালে, সঠিক তারিখ জানতে পারি নি। হাওড়ায় মোট ৪¾ মাইল ট্রাম লাইন ছিল। হাওড়ার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ট্রাম-লাইন আর চালু নেই। এ দু'টি বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৭০ সনে। নতুন হাওড়া

পুলের ওপর দিয়ে ট্রাম চালু হয় ১-২-১৯৪৩ তারিখ থেকে।

অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৩৫২ মাইল ট্রাম-পথ ছিল। এখন তা কমে গেছে। কারণ নিমতলা থেকে হাওড়া পুল পর্যন্ত স্ট্র্যাণ্ড রোড লাইন উঠে গেছে। চিৎপুর রোড থেকে নিমতলা ঘাটের লাইন অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। তখন কোম্পানির ৩০০ গাড়ি ও ৭ হাজার কর্মচারি ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সনে ট্রাম কোম্পানি কলকাতা কর্পোরেশনকে ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে লাইনের ভাড়া বাবদ ৩৭ হাজার টাকা দিয়েছিল।

আগে ট্রাম কোম্পানি যাত্রীদের কয়েকটি বিশেষ সুবিধে দিত। যেমন ছুটির দিনে ও রবিবারে ৬ আনায় সমস্ত দিন বেড়াবার টিকিট, ছুটির দিন ও রবিবার ছাড়া অন্যদিনে শস্তায় মধ্যাহ্ন-টিকিট, ট্রান্সফার-টিকিট। এখন এসব বন্ধ হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে আছে শুধু মাসিক-টিকিট। আর সমস্ত দিনের টিকিট সম্প্রতি ফের চালু হয়েছে।

১৯৬৭ সনের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা ট্রাম কোম্পানির কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে ঐ কোম্পানির পরিচালন ভার নিজের হাতে নেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে ৮-১১-১৯৭৬ তারিখে ট্রাম কোম্পানিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও ব্রিটিশ কোম্পানির মধ্যে ১৯৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে সম্পাদিত এক চুক্তিবলে স্থির হয়েছে যে, কোম্পানিকে সম্পত্তির মূল্য বাবদ ২.১৮ কোটি টাকা দেওয়া হবে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধার হিসেবে ১.৪৬৫ কোটি টাকা দেবেন, আর বাকি ৭১.৫০ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজের তহবিল থেকে দেবেন।

বর্তমানে কলকাতায় ট্রামগাড়ির সংখ্যা ৪৩৮।

ট্রাম-পর্ব এখানেই শেষ হল। এখন অন্যান্য যানবাহনের কথা বলা যাক।

বাইসিকল

বাইসিকলের পূর্বপুরুষ হচ্ছে ভেলোসিপিড (Velocepede) নামে কাঠের দুই চাকার এক যন্ত্র, যাতে জিন থাকত কিন্তু প্যাডেল (Pedal) থাকত না, মাটিতে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে চালাতে হতো। এই যন্ত্রের জন্ম হয় ফ্রান্সে আনুমানিক ১৮০০ সনে। কলকাতায় এ গাড়িটি প্রথম কখন আসে বলা যায় না। কিন্তু একজন ইংরেজ, যিনি ট্যাংক স্কোয়ারের (ডালহাউসি স্কোয়ারের) কাছে থাকতেন, ৯-১-১৮২৭ তারিখে লিখেছিলেন, তিনি স্ট্র্যাণ্ড রোডের কাছে দু'টি ভেলোসিপিডের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা ক'দিন আগে দেখেছিলেন।

এই যন্ত্র জার্মানি ঘুরে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছয় ১৮৬৫ সনে। কিন্তু এ যন্ত্রে তখন লোহার চাকা লাগানো থাকত। ঐ যন্ত্রে চড়ে খানিকটা ঘুরলে আরোহীর দেহের হাড়গোড়া খুলে পড়বার জো হতো। তাই ইংল্যাণ্ডে এর নাম হল 'Bone-shaker'। তারপর বেরুল সলিড (হাওয়াহীন, নিরেট) টায়ার। এই টায়ার Bone-shaker-এ লাগিয়ে একটা চাকা খুব বড়, আর একটা চাকা খুব ছোট করা হল। এ গাড়ির নাম হল penny-farthing (১ পেনি=৪ ফার্দিং)। এটা হল ১৮৮০ সনের কথা। কিন্তু penny-farthing-এ চাপলে পড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তাই দু'টো চাকা সমান ক'রে ১৮৮৫ সনে তৈরি হল আজকালকার 'নিরাপদ বাইসিকল' (safety bicycle)। ১৮৮৭ সনে জন বয়েড ডানলপ নামে একজন স্কটল্যাণ্ডের লোক হাওয়া-ভর্তি (pneumatic) টায়ার আবিষ্কার করাতে বাইসিকল খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বাইসিকলের দেখাদেখি ট্রাইসিকলও (তিন চাকার গাড়ি) বেরুল।

বাইসিকল কলকাতায় দেখা দিল ১৮৮৯ সনে। 'কুন্তলীন' ও 'দেলখোস'-এর আবিষ্কারক এইচ. বোস (হেমেন্দ্রমোহন বোস) খুব বাইসিকলের ভক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে আমাদের দেশে এই যানটির আদি প্রবর্তক বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি হ্যারিসন রোডে বাইসিকলের এক দোকান খুলেছিলেন। নিজে তো বাইসিকল চড়তে ভালবাসতেনই, পরকেও চড়তে শেখাতেন। তিনি তিন 'স্যার'কে এই গাড়িটি চড়তে শিখিয়েছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন—স্যার জগদীশচন্দ্র বোস, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও স্যার নীলরতন সরকার।

প্রথমে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের সাইকেলের দোকান ছিল প্রধানত ধর্মতলা স্ট্রিটে। তারপর প্রধান কেন্দ্র হয় বেন্টিংক স্ট্রিট। ধর্মতলায় যে বাঙালি প্রথম সাইকেলের দোকান খোলেন তাঁর নাম এইচ. ডি. (হরিদাস) নন্দী। এখনো তাঁর দোকান আছে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণে ৫০।৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে। আগে বিদেশ থেকে নানা নামের ও নানা দামের সাইকেল আমদানি হতো। এখন আমাদের দেশেই সাইকেল তৈরি হচ্ছে।

প্রথম যখন সাইকেল আমদানি হয় তখন আমাদের দেশে অনেক 'সাইকেল ক্লাব' হয়েছিল। তাদের মধ্যে সাইকেলে দৌড়ের প্রতিযোগিতা হতো। 'রেঞ্জার্স ক্লাব' প্রথমে সাইকেল ক্লাব ছিল।

মো ট র গা ড়ি

জার্মান এঞ্জিনিয়ার Gottlieb Daimler (১৮৩৪-৯০) আনুমানিক ১৮৮৬ সনে মোটর গাড়ি আবিষ্কার করেন। ১৯০০ সনে প্যারিসে যে Merce-

des গাড়ির প্রদর্শনী হয়, সে গাড়ির নাম রাখা হয় তাঁর মেয়ের নামে।

কলকাতার রাস্তায় প্রথম মোটর গাড়ি দেখা দেয় ১৮৯৬ সনে।

ট্যাকসি

কলকাতার রাস্তায় প্রথম ট্যাকসি চলে ১৯০৬ সনে। এখন চৌরঙ্গি রোডে যেখানে ফ্রাংক রস কোম্পানির ওষুধেব দোকান, তখন সেখানে ছিল ফ্রেঞ্চ মোটরকার কোম্পানির অফিস। সেখান থেকে মিটারওয়ালা ট্যাকসি (ওভারল্যাণ্ড গাড়ি) ছাড়ত—যেত দমদম, ব্যারাকপুর, বজবজ। ভাড়া ছিল মাইলে ৮ আনা।

প্রথম ট্যাকসিওয়ালাদের মধ্যে নামকরা ছিল 'A' কোম্পানি। এই কোম্পানিকে 'A' কোম্পানি বলা হতো এইজন্য যে এদের সব ট্যাক্সিরই নম্বর ছিল 'A'। এদের ৮০-৯০ খানা ট্যাকসি ছিল, গ্যারাজ ছিল মুলেন স্ট্রিটে। চালকদের সবাই ছিল বাঙালি। তাদের মাইনে ও কমিশন খুব ভালো ছিল। ক্রমে তাদের মধ্যে মদ-খাওয়া, উচ্ছৃঙ্খলতা, কাজে গাফিলতি ও যখন-তখন কামাই করা ইত্যাদি দোষ দেখা দিল। তখন তাদের জায়গায় শিখ ড্রাইভার আমদানি করা হয়।

ইংরেজ আমলের শেষাশেষি ট্যাকসির ভাড়া ছিল কমপক্ষে ৮ আনা, আর প্রত্যেক সিকি মাইলের জন্য দু'আনা। অপেক্ষা করবার নিরিখ ছিল ঘণ্টায় ১ টাকা ১৪ আনা, অথবা প্রত্যেক ৪ মিনিটের জন্য দু'আনা।

বাস

প্রথম ঘোড়ায়-টানা বাস দেখা যায় কলকাতায় ১৮৩০ সনে। ঐ সনের ২২ নভেম্বর এসপ্ল্যানেড থেকে ব্যারাকপুব পর্যন্ত তিন ঘোড়ায়-টানা বাসে যাত্রী নিয়ে যাওয়া-আসা আরম্ভ হয়। কতদিন এ ব্যবস্থা চালু ছিল জানা যায় না।

কলকাতায় প্রথম যাত্রীবাহী মোটর বাস চালু হয় ১৯২২ সনে। কি ক'রে আরম্ভ হল তার ইতিহাস অহীন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় এখানে দিচ্ছি: "ততদিনে (১৯২৩ সনে—রা. মি.) শহরে বেশ বাস চালু হয়ে গেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, মহাত্মাজীর আন্দোলন ইত্যাদি একের পর এক যেসব ঘটনা ঘটছে, তার সঙ্গে চারিদিকে মিটিং আর হরতাল খুবই হতো। ট্রাম কোম্পানির ধর্মঘট তো লেগেই ছিল। একসময়, সালটা ঠিক আজ মনে নেই, ট্রাম ধর্মঘট বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে-

ছিল। ফলে, অফিস যাতায়াত করার কষ্ট হতে লাগল মানুষের। সেজন্য যে-সব অফিসের মাল-বওয়া লরী ছিল, তাতে বেঞ্চি পেতে তাঁদের বাবুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল তাঁদের—সেসব জায়গায় বাবুরা একে একে জড়ো হতেন, আর তাঁদের উঠিয়ে নিয়ে যেতো সেই সব লরী। মালবাহী লরী, উঁচু তার পাটাতন, ছেলেছোকরারা লাফিয়ে উঠতো, কিন্তু মধ্যবয়সী যারা, একটু বা মোটা হয়েছেন, ভুঁড় হয়ে গেছে বেশী, তাদেরই হতো অসুবিধা। অমন ভারী শরীর নিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতেন, আর ওপর থেকে ২-৩ জন তাঁদের টেনে তোলবার চেষ্টা করতো, এমনকি নীচে থেকে ঠেলতো। মাল বইবার জন্য যাদের ছিল লরীর কারবার, তারা পুলিশ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে এ এক ব্যবসাই চালু করলে। বাসের মত টিকিট করলে তারা। লরীর ওপর বেঞ্চি পাতা, একটা কাঠের মই থাকতো, সেটা নামিয়ে দিত যাত্রীদের ওঠা-নামার দরকারে। দিনকতক পরে সেগুলির আবার মাথায় একটা চটের চাঁদোয়ার মত টানিয়ে দিল। এই করে প্রচুর পয়সা পিটেছে তারা তখন। এইসব দেখে পুলিশ কমিশনার বাসের লাইসেন্স ছাড়তে লাগলেন। দেখতে দেখতে কলকাতার রাস্তায় বিচিত্র সব নামধারী বাসের আমদানী হল। মেনকা, কিন্নরী, উর্বশী, মা, পথের বন্ধু, চলে এসো, আমি যাচ্ছি, এই সব নাম। তারপরে বেরুলো লাল রঙের সব বড়ো বড়ো বাস—Walford কোম্পানির। এই এক কোম্পানিরই বাস ছিল অনেকগুলি। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের পূর্বদিকে—লালবাজারের মোড়ে পৌঁছবার কিছু আগে—একটা ডিপো মতন ছিল, সেখানেই প্রধান আড্ডা হলো বাসগুলির। এরাই প্রথম দোতলা বাস আনলে কলকাতায়। ডবল ডেকার বাস আজকাল যা দেখা যায়, তার মতো ছাদওয়ালা নয়। বৃষ্টিতে সব ছাতা মাথায় বসে আছে দোতলায়, আর বাস চলেছে। গ্রীষ্মের সময় প্রচুর হাওয়া। লোকে হাওয়া খেতে বাসে উঠতো। কালীঘাট থেকে এক বাসে শ্যামবাজার গিয়ে, আবার ঐ বাসেই কালীঘাটে ফিরে আসা, এ তখন ছিল বহু লোকের শখ।”

ওয়ালফোর্ড কোম্পানির দোতলা প্রাইভেট বাস চালু হয় ১৯২৬ সনে। শেষপর্যন্ত এই কোম্পানির মোট ৬৫ খানা বাস ছিল।

কলকাতা ও শহরতলির মধ্যে বাস চালানোর প্রবর্তক হলেন এ. সোভান নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক। তিনি কলকাতার শহরতলি থেকে কলকাতার ভেতর পর্যন্ত বাস চালান, কিন্তু অনিয়মিতভাবে। ১৯২৬ সনে ওয়ালফোর্ড কোম্পানি কলকাতার বাইরে থেকে ভেতর পর্যন্ত নিয়মিত বাস চালাবার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরে ট্রাম কোম্পানিও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে আরম্ভ করে, ধীরে ধীরে অন্যরাও।

১৯২৪ সনে কলকাতায় বাসের সংখ্যা ছিল ৫৫; ১৯২৫ সনে ২৮০।

এখন কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাস চালাচ্ছেন। ১৯৪৮ সনে কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। কয়েক বছর আগে কলকাতায় যে ২,৪০০ বাস চলত তার মধ্যে মাত্র ৫৪০ খানি বাস ছিল কর্পোরেশনের—বাকিগুলি প্রাইভেট। বর্তমানে কলকাতায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন প্রত্যহ ৫৭১ খানি বাস চালায়, আর প্রাইভেট বাসের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার।

স্টেট বাস প্রথম চলে ১৯৪৮ সনে। মিনি বাস চলে এবং 'দেলুক্স' বাস। সম্প্রতি আবার দেলুক্স বাসের নাম বদলে 'স্পেশাল' বাস হয়েছে।

অটোমোবিল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ২৮-৮-১৯০৪ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সনে এই অ্যাসোসিয়েশনের নতুন নাম হয় অটোমোবিল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া।

রিকশ

মে মাসে কলকাতায় ৩০ হাজার হাতে-টানা রিকশ ছিল। রিকশর জন্ম জাপানে। সেখানে এ গাড়িকে বলা হয় 'জিন-রি-কি-শ'। এ কথার মানে হচ্ছে 'মানুষ টানা গাড়ি'। জাপান থেকে এ গাড়ি যায় সাংহাইতে।

১৮৮০ সনের মধ্যে এ গাড়ি ভারতের সিমলায় পৌছায়। এ খবর আমরা জানতে পারি লেডি ডাফরিনের স্মৃতিকথা থেকে। ভারতবর্ষে এই গাড়িকে গোড়ায় বলা হতো 'জেনি রিকশ' বা 'জিন রিকশ'। তারপর সে শব্দটা ছোট হয়ে হল 'রিকশ'।

১৯০০ সনের কাছাকাছি কলকাতার গোটাকয়েক চীনে বাসিন্দা কেবল তাদের নিজেদের যাতায়াতের জন্য রিকশ আমদানি করে। ১৯১৩-১৪ সন বরাবর চীনাদের দ্বারা টানা গোটাকতক রিকশকে কলকাতার রাস্তায় সাধারণের জন্য ভাড়া খাটতে দেখা যায়। ১৯২০ সনের মধ্যে রিকশর ব্যবসা সম্পূর্ণ ভারতীয়দের হাতে এসে যায়।

ইংরেজ আমলের শেষাশেষি রিকশর ভাড়া ছিল এইরকম : ১. দু'জন বসবার মতো রিকশ : দূরত্ব অনুসারে—এক মাইল পর্যন্ত ৩ আনা। এক মাইলের বেশি হলে প্রত্যেক মাইল বা মাইলের অংশের জন্য ৩ আনা। সময়ের হিসেবে—এক ঘণ্টা পর্যন্ত ৬ আনা, এক ঘণ্টার বেশি হলে প্রত্যেক ঘণ্টার জন্য ৩ আনা। ২. একজনের বসবার মতো রিকশ : দূরত্ব হিসেবে—এক মাইল পর্যন্ত ১½ আনা, এক মাইলের বেশি হলে প্রত্যেক মাইল বা মাইলের অংশের জন্য ১½ আনা।

সময় হিসেবে—এক ঘণ্টা পর্যন্ত ৩ আনা, এক ঘণ্টার বেশি হলে প্রত্যেক বাড়তি ঘণ্টার জন্য ১২ আনা।

সংযোজন

আজ কলকাতা থেকে স্থলপথে পশ্চিম বাংলার ভেতরে কিংবা বাইরে কোথাও যেতে হলে—ভারতবর্ষেই হোক, পাকিস্তানেই হোক, অথবা বাংলাদেশেই হোক—প্রধান উপায় হচ্ছে রেলগাড়ি। যেখানে রেলগাড়ি নেই সেখানে আছে বাস, ট্রাক, টেম্পো বা প্রাইভেট ট্যাকসি, নানারকমের ঘোড়ার গাড়ি, নিদেনপক্ষে সনাতন গোরুর গাড়ি। কিন্তু এ যানগুলো গৌণ। প্রধান বাহন হচ্ছে রেলগাড়ি। কলকাতা (হাওড়া) থেকে বাইরে যাবার সর্বপ্রথম রেলপথ—পূর্ব-ভারত রেলপথ—তৈরি হল মাত্র ইংরেজি ১৮৫৫ সনে। তারপরে ১৮৬২ সনে হল পূর্ববঙ্গ এবং কলকাতা ও দাক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ। বাংলা-নাগপুর রেলপথ হয় অনেক পরে।

১৮৫৪ সালে পূর্ব-ভারত রেলপথ তৈরি হবার আগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে—কাশী, এলাহাবাদ (প্রয়াগ), দিল্লি ইত্যাদি স্থানে যেতে হলে প্রথমে নদীপথে নৌকোয় চেপে যেতে হতো। দক্ষিণ-ভারতে শ্রীক্ষেত্র (পুরী) বা অন্যান্য তীর্থ-স্থানে যেতে হলে হয় হাঁটাপথে, নয় সমুদ্র দিয়ে জাহাজে চড়ে যেতে হতো।

ইংরেজি ১৮০১ সনের আগস্ট মাসে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি নদীপথে ব্যারাকপুর থেকে এলাহাবাদ যাবার জন্যে রওনা হন, ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে পৌঁছেছিলেন। সময় লেগেছিল প্রায় ৫ মাস।

১৮৪৩ সনের ১ অকটোবর জর্জ এভারেস্ট—যাঁর নামে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের নাম হয়েছে—দেরাদুন থেকে রওনা হয়ে বরাবর নদীপথে কলকাতায় আসেন। এতটা পথ আসতে সাধারণত দু'মাস সময় লাগত। তাঁর লেগেছিল ৩৫ দিন।

১৮৪৯ সনে মহারাজ রঞ্জিৎ সিংহের খাস চিকিৎসক, ডাক্তার জন মার্টিন হনিগ-বার্গার (Honigberger) উত্তরপ্রদেশের গড় মুক্তেশ্বর থেকে নদীপথে নৌকো চেপে কলকাতায় আসেন। আসতে দু'মাস সময় লেগেছিল। নৌকো-ভাড়া লেগেছিল ১৩০০ টাকা। স্টিমার বা বাষ্পচালিত জাহাজ ১৮৪৯ সনের অনেক আগেই ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, এমনকি আমাদের দেশেও তৈরি হয়েছে। ব্রিটেনে সিমিংটন (Symington) নামে এক সাহেব প্রথম স্টিমার চালিয়ে দেখান ১৭৮৮ সনে। হেনরি বেল সাহেবের 'কমেট' নামক স্টিমার স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইড নদীতে নিয়মিতভাবে যাত্রী বহনের কাজ শুরু করে ১৮১২ সনে। এর অল্পদিন পরেই বাষ্পীয় জাহাজ.অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি দিতে

আরম্ভ করে। প্রথমদিকে স্টিমার কাঠের তৈরি হতো। পরে লোহা দিয়ে তৈরি হতে আরম্ভ হল। লোহার স্টিমার দেখা দেবার পর থেকেই পালের জাহাজ তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটোল।

ক্যাপটেন জনসন 'এন্টারপ্রাইজ' নামক স্টিমারকে ১৮২৫ সনে ইংল্যাণ্ডের ফ্যালমাথ বন্দর থেকে চালিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ১৪৫ দিনে ৯-১২-১৮২৫ তারিখে কলকাতায় নিয়ে আসেন। কিন্তু তার আগেই বাংলা দেশে স্টিমার তৈরি ও নদীতে চলা আরম্ভ হয়েছে। ১৮২৩ শনে হুগলি নদীতে প্রথম কলের স্টিমার চলা আরম্ভ হয়। স্টিমারের নাম ছিল 'ডায়াল'। কলে জাহাজ চলে, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার জন্যে নদীর দুই তীরে লোকের খুব ভিড় হয়েছিল। এটি ছিল ফেরি স্টিমার। একবার যাত্রী নিয়ে চুঁচড়া পর্যন্ত গিয়েছিল।

১৮২৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'হুগলি' নামে একখানি স্টিমার কাশী পর্যন্ত যায়। সময় লাগে ২৪ দিন। ১৮২৬ সনে একটি স্টিমাব মালদহ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে।

১৮১৬ সনে 'ডায়াল' স্টিমারের এঞ্জিনিয়ার মিঃ অ্যাণ্ডারসন 'কমেট' ও 'ফায়ারফ্লাই' নামে দু'খানি স্টিমার কলকাতায় তৈরি করেন। এই দু'টি স্টিমার চুঁচড়ো পর্যন্ত যাতায়াত করত। যাত্রী পিছু যাতায়াতের ভাড়া ছিল ৮ টাকা।

১৮২৯ সনের এপ্রিল-মে মাসে 'হুগলি' স্টিমার দ্বিতীয়বার কাশী যায়। এবার ২১ দিনে পৌঁছেছিল।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক বাষ্পীয় পোতকে খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁর চেষ্টায় কলকাতায় প্রথম লোহার স্টিমার তৈরি হয়। স্টিমারের নাম ছিল 'লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক।

খিদিরপুরের গভর্নমেণ্ট ডক থেকে এই জাহাজগুলি তৈরি হয়: ১. হরিণঘাটা (১৮৪১), ২. ব্রহ্মপুত্র (১৮৪১), ৩. ইণ্ডাস (১৮৪২), ৪. দামোদর (১৮৪৩), ৫. নর্মদা, (১৮৪৫) ৬. মহানদী (১৮৪৭)।

এইসব জাহাজ নিয়মিতভাবে চালাবার জন্যে বড় বড় জাহাজ কোম্পানির সৃষ্টি হয়। এদের মূলধন ছিল যৌথ। কয়েকটি কোম্পানির নাম:

১. ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি। ৬-২-১৮৪৪ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলধন: ১,০৭,৩০০ টাকা। অফিস: ১৫ স্ট্র্যাণ্ড রোড,কলকাতা।

২. গ্যাঞ্জেস স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি। ১৮৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত। মূলধন: ৯ লক্ষ টাকা। অফিস: ১৭ স্ট্র্যাণ্ড রোড। কোম্পানির চেয়ারম্যান: টি. উইলসন। ন্যাসরক্ষক (ট্রাস্টি): টি. উইলসন এবং বরদাদাস মিত্র।

৩. ওরিয়েন্টাল হনল্যাণ্ড স্টিম কোম্পানি লিমিটেড। ভারতীয় নদীতে বাষ্পীয় জাহাজ চালাবার জন্য ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। কলকাতার এজেণ্ট: মে পিকফোর্ড অ্যাণ্ড কোং। অফিস: ১ মিশন রো।

যাত্রীবাহী স্টিমার ছাড়া কতকগুলি স্টিমার তৈরি হয় বড় বড় ভারি মালবাহী নৌকো টেনে নিয়ে যাবার জন্য। এইসব গাদাবোট টানা স্টিমারকে ইংরেজিতে বলা হতো 'টাগ' (tug)। এইসব টাগ তৈরি করার ও ভাড়া দেবার জন্য কোম্পানিও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কোম্পানিগুলোকে 'কোম্পানি' না বলে 'অ্যাসোসিয়েশন' বলা হতো। একটির নাম 'ক্যালকাটা স্টিম টাগ অ্যাসোসিয়েশন', প্রতিষ্ঠা ১৮৩৬ সনে। অফিস : ৬ চার্চ লেন, কলকাতা। সেক্রেটারি : গর্ডন স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড কোং। কোম্পানি স্টিমার ভাড়া দিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অংশীদার ছিলেন। আর একজন বড় অংশীদার ছিলেন রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর একটি এরকম কোম্পানি ছিল। তার নাম 'ইস্টার্ন স্টিম টাগ অ্যাসোসিয়েশন'। অফিস : ১০ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলভিন ঘাট।

এতক্ষণ তো নদীপথে নৌকোয় বা স্টিমারে যাতায়াতের কথা বলা হল। এবার স্থলপথে যাতায়াতের কথায় আসা যাক।

স্থলপথে প্রথম ও খুব জনপ্রিয় বাহন ছিল পালকি। পালকিতে ক'রে ডাক ও মানুষ দুইই নিয়ে যাওয়া হতো। তাই এরকম পালকিকে বলা হতো পালকি-ডাক। সমস্ত রকম ডাক পাঠাবার ও আনাবার ব্যবস্থা করতেন পোস্টমাস্টার। পালকি-ডাকেরও ব্যবস্থা করতেন তিনি। পথে কয়েক মাইল অন্তর অন্তর সরাই বা চটি ও ডাকবাংলা ছিল। সেখানে যাত্রীদের থাওয়া-থাকার ব্যবস্থা থাকত। পথে যাতে পর্যটকদের কোনো বিপদ-আপদ না হয় তা দেখবার জন্য এক ক্রোশ অন্তর অন্তর পুলিশ-চৌকি থাকত। প্রত্যেক চৌকিতে থাকত দু'জন ক'রে পাহারাওয়ালা বা চৌকিদার।

পালকি বইত বেহারারা। যাত্রীদের সঙ্গের মালপত্র বইত কুলিরা। তাদের বলা হতো বঙ্গি বরদার। প্রত্যেক বঙ্গি বরদার দু'টো কাঠের বা টিনের প্যাঁটরায় আধমণ পর্যন্ত মাল বইত একটা লম্বা বাঁশের দুই প্রান্তে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে। বাঁশটা থাকত এদের কাঁধে।

তাছাড়া থাকত কয়েকজন মশালচি। এইসব ডাক রাতেও চলত। তাই মশালচি নেওয়ার দরকার হতো। মশালচিরা পালকির পাশে পাশে মশাল জেলে দৌড়ত। তাদের কাছে বাঁশের বা কাঠের চোঙায় তেল থাকত। সেই তেল দিয়ে তারা মাঝে মাঝে মশালের ন্যাকড়া বা তুলো ভিজিয়ে নিত তেল ফুরিয়ে আসার মতো হলে। কয়েক মাইল অন্তর অন্তর চটিতে পালকি-বেহারা বদল হতো। পুরনো দল চটিতেই থেকে যেত। আর এক নতুন দল সেখান থেকে পালকি নিয়ে রওনা হতো।

১৭৯৬ সনের ২২ মার্চ পোস্টমাস্টার-জেনারেল পালকি-ডাকের এই হার বেঁধে দিয়েছিলেন : কলকাতা থেকে পাটনা পর্যন্ত ৪০০ সিক্কা টাকা, আর কলকাতা

থেকে কাশী পর্যন্ত ৫০০ সিক্কা টাকা। এই দুই জায়গার মধ্যবর্তী স্থানের ভাড়া ছিল মাইলে একটাকা দু'আনা।

পালকি-ডাক ছাড়াও পালকিগাড়ি ছিল গ্র্যাণ্ডট্রাংক রোডে। এই রাস্তায় আগ্রা থেকে কলকাতা পর্যন্ত ২০ মাইল অন্তর অন্তর ডাকবাংলা বা পান্থশালা ছিল। পালকি গাড়িগুলো প্রথম প্রথম ঘোড়ায় টানত না, কুলিতে টেনে নিয়ে যেত। পরে ঘোড়ায় টানতে আরম্ভ করল।

যাত্রীবহনের জন্যে পালকিগাড়ি প্রথম ব্যবহার হয় এলাহাবাদ ও কানপুরের মধ্যে ১৮৪৩ সনের মে মাসে। আর ঐ সনের নভেম্বর মাসে আলিগড় পর্যন্ত, ১৮৪৫ সনের জুন মাসে দিল্লি পর্যন্ত, আর প্রায় ঐ সময়েই আগ্রা ও মিরাট পর্যন্ত পালকিগাড়ির ডাক চালু হয়।

বোম্বাইয়ের পোস্টমাস্টার মিঃ জার্ডিন ১৮৩১ সনে গোরুর গাড়িতে ক'রে ডাক ও যাত্রীবহন প্রথম আরম্ভ করেন। বোম্বাই থেকে পুনা যেতে ঐ গাড়ির ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগত। যাত্রীপিছু ভাড়া ছিল ৯০ টাকা। উত্তর-ভারতে গোরুটানা ডাকগাড়ি প্রথম চালু করেন মিরাটের স্মিথ সাহেব মিরাট ও দিল্লির মধ্যে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে গভর্নমেণ্ট আলিগড় ও কানপুরের মধ্যে গোরুর ডাকগাড়ি চালু করেন ১৮৪১ সনের নভেম্বর মাসে। ১৮৪২ সনের মার্চ মাসে এই ব্যবস্থা মৈনপুরী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ঐ বছর মে মাসে আলিগড় পর্যন্ত, ১৮৪৪ সনের জানুয়ারি মাসে আলিগড় থেকে দিল্লি পর্যন্ত, আর ১৮৪৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আলিগড় থেকে মিরাট পর্যন্ত, ঐ সনের মে মাসে আগ্রা পর্যন্ত, তারপরের মাসে (জুনে) পূর্বদিকে এলাহাবাদ ও কাশীর মধ্যে চালু হয়। তারপর গোরুরগাড়িতে ডাক ও যাত্রীবহনের ব্যবস্থা সাহারানপুর, তারপরে আম্বালা ও লুধিয়ানা, তারপর লাহোর, মুলতান প্রভৃতি শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মোটামুটি বলা যায়, ১৮৪৫ সনের মধ্যে ডাক গোরুর গাড়ি (mail carts) একদিকে কলকাতা থেকে লাহোর পর্যন্ত, অন্যদিকে বোম্বাই থেকে পুনা ও সুরাট পর্যন্ত যাতায়াত করতে থাকে। ১৮৫০ সন নাগাদ গোরু ও বলদের জায়গায় ঘোড়া ব্যবহার হতে আরম্ভ করে। আর এই ঘোড়ার ডাক চালাবার জন্য কয়েকটি কোম্পানিও গঠন করা হয়। একটির নাম নর্থ-ওয়েস্টার্ন ডাক কোম্পানি। তার প্রধান কার্যালয় ছিল—১ বিচার্স বিল্ডিংস, ওয়েলেসলি প্লেস, কলকাতা। এই কোম্পানি ঘোড়ার গাড়িতে ও পালকিতে যাত্রী ও গোরুর গাড়িতে (মেল-কার্টে) পার্সেল বহন করত কলকাতা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে। এইরকম কোম্পানিগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল ইনল্যাণ্ড ট্রানজিট কোম্পানি। এই কোম্পানি গঠন করেন ১৮৫০ সনের মার্চ বা এপ্রিল মাসে (অন্যমতে ১৮৪৯ সনে) তুঁতি বা তাঁতি মল নামে কানপুরের এক ধনী বণিক কয়েকজন ইয়োরোপিয় ভদ্রলোককে নিয়ে। এই কোম্পানি কলকাতা ও কান-

-পুরের মধ্যে ঘোড়ার ডাক প্রচলন করে। এই কোম্পানির কলকাতা অফিস ছিল ৬এ এসপ্লানেড রো-তে, লাটভবনের পূর্ব ফটকের প্রায় উলটোদিকে। এই কোম্পানির বিজ্ঞাপনে বলা হতো যে তারা ঘোড়ার ডাকগাড়িতে যাত্রী আর ঘোড়ায় টানা হালকা মেল-কার্টে পার্সেল বহন ক'রে থাকে। আবার বেহারায় টানা পালকি গাড়িতে অথবা বেহারায় বওয়া পালকিতেও তারা যাত্রীবহন ক'রে থাকে। ইনল্যাণ্ড ট্রানাজট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার আগে তুঁতি বা তাঁতি মল দু'বছর লখনৌ ও কানপুরের মধ্যে ঘোড়ায় টানা যাত্রীবাহী গাড়ি চালিয়েছিলেন। সিভিলিয়ান কে. সি. (কিরণচন্দ্র) দে-র শ্বশুর, বিডন স্ট্রিটের চারুচন্দ্র মিত্রের বাবা, হুগলি জেলার বন্দীপুর গ্রামের নীলকমল মিত্র কাশী ও এলাহাবাদের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ির ডাক বসিয়েছিলেন। তিনি এলাহাবাদে অনেক ভূসম্পত্তি করেন। তিনি খুব ধনী ছিলেন।

তারপর আসে Bullock train-এর কথা। বুলক ট্রেন আর কিছুই নয়—অনেকগুলো বলদে টানা গাড়ি, একটার পিছনে আর একটা এইভাবে সারবন্দী হয়ে যেত বলে এই নাম। এই গাড়িগুলো মানুষ বহন করত না, শুধু মাল বহন করত। কলকাতায় একটা নর্থ-ওয়েস্টার্ন বুলক ট্রেন (কোম্পানি) ছিল। তার অফিস ছিল ১ বিচার্স বিল্ডিংস, ওয়েলেসলি প্লেসে। গভর্নমেণ্টও একটা বুলক ট্রেন চালু করেছিল ১৮৪৫ সনের অক্টোবর মাসে কাশী ও দিল্লি, মিরাট, আগ্রা প্রভৃতির মধ্যে। ১৮৪৭ সনের ১ মে এই ট্রেন বিস্তৃত হয় আম্বালা পর্যন্ত। ১৮৪৯ সনের গোড়ায় এই ট্রেন লুধিয়ানা পৌঁছয়, ১৮৫০ সনের মার্চে জলন্ধরে এবং তার কিছু পরেই লাহোরে।

প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। রামতনু লাহিড়ীর ভাইঝি ও বেথুন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রাধারানী লাহিড়ীর বাবা দ্বারকানাথ লাহিড়ী একদিন হঠাৎ কৃষ্ণনগরের বাড়িথেকে কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেলেন। বহু বছর তাঁর কোনো পাত্তা নেই। বাড়িতে তাঁর মা ছেলের জন্যে ভেবে অস্থির। অনেক বছর পরে দ্বারকানাথ হঠাৎ মাকে চিঠি লিখে জানালেন তিনি আগ্রায় আছেন, আর ঠিকানা দিয়ে অনুরোধ করলেন তিনি যেন শীঘ্রই আগ্রায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেই চিঠি পেয়ে তাঁর বুড়িমা কৃষ্ণনগর থেকে বরাবর গোরুর গাড়ি ক'রে আগ্রায় ছেলের কাছে গিয়েছিলেন। পথে চটিতে চটিতে গোরুর গাড়ি উঠোনে ঢুকিয়ে তিনি ঘরের ভেতর আশ্রয় নিতেন।—আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

১৮৭৮ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বিখ্যাত ভাষাবিদ হরিনাথ দে-র বয়স যখন বছর খানেক, তখন তাঁর মা এলোকেশী দেবী শিশু হরিনাথকে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ি ২৪ পরগনা জেলার এড়িয়াদহ গ্রাম থেকে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে তাঁর স্বামী ভূতনাথ দে-র কাছে যান। ভূতনাথ দে তখন রায়পুরে ওকালতি

করতেন। তখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ হয় নি। এলোকেশী দেবী এড়িয়াদহ থেকে সমস্ত পথ গোরুর গাড়িতে গিয়েছিলেন। সে যাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবীও তাঁর সঙ্গিনী হয়েছিলেন—বড়ছেলে বালক নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে। তখন তাঁর স্বামী বিশ্বনাথ দত্ত রায়পুরে অ্যাটর্নিগিরি করতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৮৫৬ সনে (ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেল হবার দু'বছর পরে) তিনি কলকাতা থেকে সিমলা পাহাড়ে বেড়াতে যান। কলকাতা থেকে কাশী পর্যন্ত তিনি গঙ্গাবক্ষে নৌকো ক'রে গিয়েছিলেন। কাশীতে পৌঁছতে সময় লেগেছিল প্রায় দেড়মাস। আর নৌকোভাড়া লেগেছিল ১০০ টাকা। কাশী থেকে তিনি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে এলাহাবাদে রওনা হন। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি প্রয়াগে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পৌঁছন। পরের দিন দুপুরে একটা খেয়া নৌকো ক'রে তিনি গাড়ি-সমেত নদীপার হয়ে ওপারে পৌঁছন। সেখান থেকে এক ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ১৪ দিনের মাথায় আগ্রায় পৌঁছন। এই ডাকগাড়ি সারাদিন ও সারারাত চলত। আগ্রা থেকে তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন নৌকো ক'রে একমাসে, দিল্লি থেকে তিনি ঘোড়ার গাড়ি চড়ে আম্বালায় গিয়েছিলেন এবং আম্বালা থেকে ঝাম্পান চেপে সিমলা পাহাড়ে পৌঁছেছিলেন। এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রেল হবার দু'বছর পরেও যতদূর পর্যন্ত রেল লাইন খোলা হয়েছিল, ততদূর পর্যন্ত তিনি রেলে না গিয়ে আগাগোড়া নৌকোয় ও ঘোড়ার গাড়িতে গিয়েছিলেন। তাতে তাঁর সময় ও অর্থ দুইই অনেক বেশি লেগেছিল।

কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে মহর্ষি কলকাতা থেকে কাশী গিয়েছিলেন ট্রেনে চেপে। কাশী পৌঁছতে ১৫ ঘণ্টারও কম সময় লেগেছিল। তখন কলকাতা ও কাশীর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ছিল ৬ টাকা ৯ আনা, আর প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ছিল ২৬ টাকা ৫ আনা।

আমরা এখন যেটি স্থলপথের সর্বোৎকৃষ্ট বাহন সেই রেলের যুগে এসে গেলাম।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : রেলপথ

যে বাষ্পীয় এঞ্জিন রেলগাড়িকে টেনে নিয়ে যায় সেই এঞ্জিন জর্জ স্টিফেনসন (১৭৮১-১৮৪৮) নামে একজন ইংরেজ আবিষ্কার করেন, একথা প্রায় সকলেরই জানা আছে। কিন্তু যেকথা সাধারণত জানা নেই সেটা হচ্ছে এই যে, তিনি সামান্য কয়লা খনির শ্রমিক ছিলেন, লেখাপড়া প্রায় কিছুই জানতেন না। আর খনির ভেতর ট্রামরাস্তার উপর দিয়ে কয়লা বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যাবার জন্য ইংরেজি ১৮১৪ সনে বাষ্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কার করেন। এরপর থেকে রেল এঞ্জিন তৈরি করা আর রেল লাইন পাতা২ হয়ে দাঁড়ালো তাঁর জীবনের প্রধান কাজ। অর্থাৎ তিনি রীতিমতো এঞ্জিনিয়ার হয়ে দাঁড়ালেন। এঞ্জিনিয়ার হয়ে তিনি ১৮২১ থেকে ১৮২৫ সনের মধ্যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম রেল লাইন—ইংল্যাণ্ডের স্টকটন-ডার্লিংটন রেল লাইন—তৈরি ক'রে তার উপর দিয়ে নিজের তৈরি এঞ্জিন দ্বারা ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চালালেন। এই ট্রেনে ৩৮ খান গাড় ছিল। তারপর তৈ.ন করলেন ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল-ম্যাঞ্চেস্টার লাইন ১৮২৬ থেকে ১৮২৯ সনের মধ্যে, আর তার উপর দিয়ে নিজের তৈরি 'রকেট' নামক এঞ্জিন দিয়ে যাত্রীগাড়ি চালালেন ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে। এই লাইনের কোথাও কোথাও এই এঞ্জিনের সর্বোচ্চ বেগ হয়েছিল ঘণ্টায় ৩৫ মাইল। তারপর থেকে রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ার হিসেবে চারদিক থেকে তাঁর কাছে ডাক আসতে লাগল।

এঁর পুত্র রবার্ট স্টিফেনসনও (১৮০৩-৫৯) বড় এঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন। তিনি

রেল লাইন পাতায় বাবাকে সাহায্য করা ছাড়া নিজেও কয়েকটি লাইন পেতেছিলেন। কিন্তু তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সেতু-নির্মাতা হিসেবে। স্বদেশে এবং বিদেশে কয়েকটি বিখ্যাত পুল তৈরি ক'রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ফ্রান্সে রেলপথ আরম্ভ হয় ১৮২৯ সনে। মার্কিন মুলুকে বাল্টিমোর-ওহাইও লাইনের ১৫ মাইলের একটা অংশ প্রথম রেলপথ। এই পথ খোলা হয় ১৮৩০ সনের মে মাসে। প্রথম এই লাইনে গাড়ি টানত ঘোড়ায়। পরে বাষ্পীয় এঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। জার্মানিতে প্রথম রেল লাইন খোলা হয় ১৮৩৫ সনে। রুশ দেশে একটি প্রাইভেট কোম্পানি সেন্ট পিটার্সবার্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাড) থেকে প্যাভলোভস্ক শহরতলি পর্যন্ত রেল লাইন সম্পূর্ণ করে ১৮৩৭ সনে। হল্যাণ্ড ও ইটালিতে প্রথম রেল লাইন খোলা হয় ১৮৩৯ সনে, আর স্পেনে ১৮৪৮ সনে।

ভারতবর্ষে প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ি চালাবার সম্মান ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (ই-আই-আর) কোম্পানির প্রাপ্য নয়। সে সম্মান প্রাপ্য গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসিউলার রেলওয়ে (জি-আই-পি-আর) কোম্পানির। এই কোম্পানি ১৮৫৩ সনের ১৬ এপ্রিল বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত ২১ মাইল পথের উপর প্রথম রেলগাড়ি চালায়। এই কোম্পানির প্রথম ডিরেকটারদের মধ্যে ছিলেন জর্জ স্টিফেনসন (রেল এঞ্জিনের আবিষ্কর্তা) ও তাঁর পুত্র রবার্ট স্টিফেনসন ঐ কোম্পানির পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা এঞ্জিনিয়ার (Consulting Engineer) নিযুক্ত হন।

দক্ষিণ-ভারতে মাদ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি ১৮৫৬ সনের ১ জুলাই ব্যাসামপদী (Veyasampaudy) থেকে ওয়ালাজা রোড (আর্কট) পর্যন্ত প্রথম রেলগাড়ি চালায়।

এবার বাংলা দেশের রেলের কথায় আসা যাক।

ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (ই. আই. আর)

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা ও মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লির মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণে যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে ১ কোটি পাউণ্ড মূলধন নিয়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি গঠিত হয়। সাধারণত লেখা হয়ে থাকে এই কোম্পানি ১৮৪৪ সনে গঠিত হয়। কিন্তু প্রকৃত তারিখ ১৮৪৫ সনের মে মাস। এই কোম্পানি গঠনে প্রধান উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন মিঃ (পরে স্যার) রোল্যাণ্ড ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন। প্রকৃতপক্ষে তাঁকেই এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে। তিনিই এই লণ্ডন

কোম্পানির ভারতে প্রথম ম্যানেজিং ডিরেকটার ও এজেন্ট হয়েছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। তাঁর নাম থেকেই বোঝা যায় বিলাতে রেলপথের জনক জর্জ স্টিফেনসনের আত্মীয় (ভাইপো) ছিলেন। ১৮৪৫-৪৬ সনের শীতকালে তিনি ভারতে এসে কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত একটা প্রাথমিক জরিপ ক'রে বিলেতে ফিরে যান এবং নিজের প্রস্তাব ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ও নিজের রেল কোম্পানির ডিরেকটার বোর্ডের সামনে পেশ করেন।

ঠিক এই সময়েই, অর্থাৎ ১৮৪৫-৪৬ সনে কলকাতার সাহেবদের মধ্যে স্টিফেনসনের কার্যকলাপ দেখেই বোধহয় ভারতে রেলপথ তৈরি করবার জন্য এত উৎসাহ দেখা দেয় যে তারা ভাগীরথীর ধার দিয়ে কলকাতা থেকে ভগবানগোলা পর্যন্ত এক রেলপথ তৈরির মতলব এঁটে 'সেন্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি' নামে একটি কোম্পানি গঠন করে। ঠিক হয় যে, এই কোম্পানির মূলধন হবে ১৫ লক্ষ টাকা। এজন্যে কিছু টাকাও তোলা হয়। এমনকি কলকাতার টাউন-হলে এলাহি রকমের একটা খানাপিনাও হয়। তারপর লোক ও টাকা দুইই হাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু নামটা রয়ে গেল লোকের স্মৃতিতে—সেন্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে।

এবার স্টিফেনসনের প্রস্তাবের কথায় ফিরে আসা যাক। তিনবছর ধরে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা ও লেখালেখি চলে। শেষে ১৮৫০ সনে 'পরীক্ষামূলকভাবে' কলকাতা থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ তৈরি করার অনুমতি পাওয়া যায়। স্টিফেনসন ১৮৫১ সনে ভারতে ফিরে এসে বড়মাপের রেল লাইন পাতার কাজ আরম্ভ করেন। ১৮৫৩ সনের শেষাশেষি পাণ্ডুয়া পর্যন্ত লাইন তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু গাড়ি চালানো পিছিয়ে যায় তিনটি কারণে।

প্রথম কারণ, যে-রেলগাড়িগুলি প্রথম এই লাইনে চলবে সেগুলি নমুনা স্বরূপ বিলেতে তৈরি হয়ে এক জাহাজে ক'রে কলকাতায় আসছিল। 'গুডউইন' নামে সেই জাহাজ গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি (Sandheads) এসেই ডুবে যায়। এই সংবাদ পেয়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের প্রথম রেল এঞ্জিনের (Locomotive-এর) প্রধান এঞ্জিনিয়ার মিঃ হজসন (Hodgson) কলকাতার দুই নামকরা গাড়ি তৈরির প্রতিষ্ঠান—স্টুয়ার্ট কোম্পানি ও সিটন কোম্পানিকে নিয়ে নিজের নকশা মতো গাড়ি তৈরি করিয়ে নিলেন। তাতে কিছু সময় লাগল।

দ্বিতীয় কারণ, যে-জাহাজে ক'রে বিলেত থেকে গাড়ি চালাবার এঞ্জিন আসছিল সেই জাহাজ ভুলক্রমে কলকাতায় না এসে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। পরে অবশ্য এই এঞ্জিনকে 'ডেকাগ্রি' নামে অন্য একটি জাহাজে ক'রে অস্ট্রেলিয়া থেকে কলকাতায় আনা হয়। এতেও কিছুটা সময় চলে যায়। এই এঞ্জিনের নাম ছিল 'ফেয়ারি-কুইন'। এই এঞ্জিনকে অনেকদিন পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনের ভেতর ঘিরে রেখে দেওয়া হয়েছিল জনসাধারণকে দেখানোর জন্যে। এখন আর

সেটি সেখানে নেই। কোথায় আছে বা আছে কিনা জানি না।

তৃতীয় কারণ, ফরাসি সরকারের সঙ্গে এক গণ্ডগোল বাধে। ফরাসি সরকার এই বলে অভিযোগ করেন, চন্দননগরের কাছে রেল লাইন ফরাসি এলাকার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে। তাঁদের এলাকার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানিকে রেল চালাতে দিতে ফরাসি সরকারের ঘোর আপত্তি ছিল। তখন ফরাসি এলাকা ও ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে সীমা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত ছিল না। শেষপর্যন্ত গণ্ডগোল মিটে যায় বটে, কিন্তু দেরি যা হবার হয়ে গেল।

শেষকালে হজসন সাহেব ১৮৫৪ সনের ২৮ জুন তারিখে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত একবার রেলগাড়ি চালিয়ে পরীক্ষা করলেন ঠিক চলে কিনা। এরপরে তিনি শেষ পরীক্ষা করেন ১১-৮-১৮৫৪ তারিখে হুগলি পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে। এদিন তিনি একদল ইংরেজ সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের একটি রিপোর্ট ছাপা হয় ১৪-৮-১৮৫৪ তারিখের দু'টি কাগজে—বেঙ্গল হরকরায় ও ইণ্ডিয়া গেজেটে। সেই রিপোর্টে বলা হয়, সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে গাড়ি হাওড়া স্টেশন ছাড়ে ও হুগলি স্টেশনে পৌঁছয় ১০টা ১ মিনিটে। যাবার সময় লাগে: হাওড়া থেকে বালী স্টেশন ৫½ মাইল—১১ মিনিট। বালী থেকে শ্রীরামপুর স্টেশন ৬½ মাইল—১৪ মিনিট। শ্রীরামপুর থেকে চন্দননগর স্টেশন ৮½ মাইল—২০ মিনিট। চন্দননগর থেকে চুঁচড়া স্টেশন ৩ মাইল—৮ মিনিট (এই স্টেশনকে রেলের টাইম টেবলে হুগলি স্টেশন বলে উল্লেখ করা হয়েছে)। হাওড়া থেকে চুঁচড়া পর্যন্ত ২৩½ মাইল—গাড়ির চলতি সময় ৫৩ মিনিট। তাহলে গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় ২৬·৩২ মাইল। এই ক'টা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াবার মোট সময় ৩৮ মিনিট। হাওড়া থেকে চুঁচড়া পর্যন্ত যেতে দাঁড়ানোর সময় নিয়ে মোট সময় লেগেছিল ৯১ মিনিট।

গাড়ি কোনো জায়গায় হেলে নি বা দোলে নি বা ঝাঁকুনি দেয় নি, সমানভাবে চলেছে। এঞ্জিনের প্রধান সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ হজসন বললেন, আরো কিছুদিন চলবার পর গতি আরো ভালো হবে। সুপারিনটেণ্ডেণ্টের ও তাঁর কর্মচারীদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ভদ্র।

এই যাত্রায় সাংবাদিকদের ধারণা হয়েছিল, যাতায়াতের এই নতুন ব্যবস্থা ভারতে আর যতরকমের ব্যবস্থা আছে তাদের হটিয়ে দেবে, আর সবদিক বিবেচনা ক'রে দেখলে খরচের দিক থেকেও এটা সবচেয়ে শস্তা। এখন যে গাড়ি-গুলি চালানো হচ্ছে তা বেশিদিন চালানো হবে না। তারপর আরো ভালো গাড়ি ব্যবহার করা হবে। তবে বর্তমান গাড়িগুলিতেও যথেষ্ট বসবার জায়গা আছে এবং সেগুলি আরামপ্রদ।

গাড়ি থেকে সংবাদদাতারা দেখলেন, লাইনের দু'ধারে এদেশী লোকেরা দাঁড়িয়ে এই নতুন অগ্নিরথকে সেলাম করছে। পুনশ্চ: কলকাতা-হাওড়ার মধ্যে

একটা পুল হওয়া একান্তই দরকার। রেল ধরতে হলে খুব বেশি কষ্ট ও অসুবিধে ভোগ করতে হয়। বর্ষাকালে দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছবে।

১২-৮-১৮৫৪ তারিখে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক (নিশ্চয়ই ইয়োরোপিয়) 'রেকর্ডার' এই ছদ্মনামে দৈনিক 'সিটিজেন' পত্রিকায় রেলের ভাড়া সম্বন্ধে এক চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন যে, কলকাতা থেকে হুগলি পর্যন্ত মাত্র ২৮ মাইলের (এটি লেখকের ভুল, হবে ২৪ মাইল) ভাড়া ৪ টাকা (অবশ্য প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য) অত্যন্ত বেশি। এটাকে অনায়াসে ৩ টাকা করা যায়। এই চিঠিটা ১৪-৮-১৮৫৪ তারিখের 'সিটিজেন' পত্রিকায় ছাপা হয়। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া গোড়ায় ৪ টাকা ধার্য হয়েছিল। মনে হয়, এই চিঠি লেখার ফলেই পরের দিন (অর্থাৎ প্রথম দিন) থেকেই ঐ শ্রেণীর ভাড়া ৩ টাকা করা হয়।

১৪-৮-.৮৫৪ তারিখের কলকাতার 'বেঙ্গল হরকরা' ও 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি বেরোয় (অনুবাদ দেওয়া হল) :

ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

এমাসের ১৫ তারিখ মঙ্গলবার থেকে ট্রেন হাওড়া ও হুগলি ছাড়বে নিম্নলিখিত সময়ে—

হাওড়া থেকে সকাল ১০-৩০ মিঃ, বিকাল ৫-৩০ মিঃ

হুগলি থেকে " ৮-১০ মিঃ " ৩-৩৮ মিঃ

ট্রেন থামবে বালী, শ্রীরামপুর ও চন্দননগর স্টেশনে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ট্রেন হাওড়া ও পাণ্ডুয়ার মধ্যে চলবে, যার সব স্টেশনেই দাঁড়াবে।

যাঁরা কম ভাড়ায় মাসিক টিকিট চান, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন যে কোনো স্টেশনে ফর্মের জন্যে দরখাস্ত করেন ও ফর্মগুলি ভর্তি ক'রে যত শীঘ্র সম্ভব ম্যানেজিং ডিরেকটার ও এজেন্টের কাছে পাঠিয়ে দেন। মাসিক টিকিটের ভাড়া পরে ঠিক করা হবে। পরবর্তী ১ জানুয়ারির আগে মাসিক টিকিট দেওয়া হবে না।

আর. ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন

১২ আগস্ট, ১৮৫৪ ২৯ থিয়েটার রোড, কলকাতা

ইস্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানির ডিরেকটাররা ১৮৫৪ সনের ১৫ আগস্ট প্রথম ট্রেন চালাবার তারিখটি নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। প্রথম ট্রেন চলবার তারিখটি ছিল আমাদের স্বাধীনতা লাভের ঠিক ৯৩ বছর আগে।

১৫-৮-১৮৫৪ তারিখে প্রথম ট্রেনটি বিজ্ঞাপিত সময়ের দেড়ঘণ্টা আগে সকাল ৮-৩০ মিনিটে হাওড়া স্টেশন ছাড়ে ও হুগলি পৌঁছয় ১০-১ মিনিটে।

প্রথম ট্রেনে চাপবার উৎসাহ লোকেদের মধ্যে এত প্রবল হয়েছিল যে তিন হাজার দরখাস্ত পড়েছিল, কিন্তু জায়গা ছিল মাত্র কয়েক শ'র জন্য। লোহার ঘোড়া ভীমবেগে গাড়ি টানছে ও মুখ দিয়ে ভক্-ভক্ ক'রে ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি ছাড়ছে—এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার জন্যে লাইনের দু'ধারে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছিল প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

এই ট্রেনটিতে ৩টি প্রথম শ্রেণীর, ২টি দ্বিতীয় শ্রেণীর ও ৩টি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি ও গার্ডের জন্যে ১টি ব্রেকভ্যান ছিল। একটি গাড়ি এদেশী এক ভদ্রলোক ও আর একটি গাড়ি শিরকোর নামে এক ইয়োরোপিয় ভদ্রলোক রিজার্ভ করেছিলেন।

হুগলি পযন্ত প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ছিল ৩ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১ টাকা ২ আনা ও তৃতীয় শ্রেণীর মাত্র ৭ আনা।

ট্রেন পাণ্ডুয়া পর্যন্ত যেতে আরম্ভ করে ১-৯-১৮৫৪ তারিখ থেকে। এইদিন বধমান মহারাজের জন্মদিন ছিল। অনেক লোক পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে পালকি, তাঞ্জাম ইত্যাদি যানে চড়ে বর্ধমান গিয়েছিলেন।

বর্ধমান পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম ট্রেন চালানো হয় ২০-১২-১৮৫৪ তারিখে। ঐ ট্রেনে মাত্র ৩টি গাড়ি ছিল। এই ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ। তিনি এই ট্রেনে বর্ধমান গিয়ে ফিরতি ট্রেনে কলকাতায় ফিরে আসেন।

বর্ধমান হয়ে রানীগঞ্জ পর্যন্ত প্রথম ট্রেন চলে ৩-২-১৮৫৫ তারিখে। ঐদিনই ই-আই রেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বর্ধমানে। সেদিন ছিল শনিবার। বড়লাট লর্ড ডালহাউসির সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল। তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য বর্ধমান যেতে পারেন নি। হাওড়ার এক সভায় যোগ দিয়েই বিদায় নেন। প্রায় হাজার জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁরা লাট সাহেবের সঙ্গে হাওড়ার সভায় যোগ দিয়েছিলেন। লাট সাহেব চলে যাবার পর তাঁরা সেদিন দু'টি ট্রেনে বর্ধমান গিয়ে উদ্বোধন-সভায় যোগ দেন। তাঁরা হাওড়া থেকে বর্ধমান পৌছন ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে। তখন রানীগঞ্জ যেতে ৭ ঘণ্টা সময় লাগত। বর্ধমান পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ছিল ১ টাকা ১৪ আনা।

১৮৫৩ সনে হাওড়া একটা নগণ্য গ্রাম মাত্র ছিল। কলকাতা থেকে নৌকো ক'রে গঙ্গা পার হয়ে হাওড়ায় পৌছতে হতো। ১৮৫৪ সন থেকে কলকাতার আর্মেনিয়ান ঘাটে এপারের রেলযাত্রীদের জন্য একটি টিকিট-ঘর খোলা হয়। সেখানে যাত্রীদের টিকিট দেওয়া হতো ও তাদের মালপত্র ওজন ক'রে মালের

ভাড়া আদায় ক'রে রসিদ দেওয়া হতো। রেল কোম্পানির লঞ্চ যাত্রীদের মালপত্র-সমেত ওপারে পৌঁছে দিত। লঞ্চের ভাড়া রেলভাড়ার মধ্যেই ধরে নেওয়া হতো।

হাওড়ায় এখন যেখানে নতুন স্টেশন হয়েছে ১৮৫৪ সনে সেখানে রেল স্টেশন ছিল না। বর্তমান স্টেশনের বাইরে ও সর্বদক্ষিণে এখন রয়েছে চারতলা (কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এটা তেতলা ছিল)—ডিভিশন্যাল (বিভাগীয়) সুপারিনটে-ণ্ডেণ্টের অফিস। এই বাড়ির একতলার গায়ে একটি ব্রোঞ্জের ফলক লাগানো আছে। তাতে লেখা আছে :

ORIGINAL ZERO MILE

E. I. RLY.

এই শূন্য মাইলটিই হচ্ছে সাবেক হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ই-আই রেলের বড়মাপের লাইনের প্রথম 'মাইল ফলক'। আর বিভাগীয় অফিস-বাড়িটির জায়গায় তখন ছিল লাল ইটের তৈরি একটি ছোট্ট একতলা ঘর, মাথায় ছিল করোগেটের লোহার চাল। এই ঘরটিই ছিল স্টেশন। তার ভেতর ছিল একটা ছোট্ট টিনের ঘর। তাতে এক-ফোকরওয়ালা একটা খুব ছোট জানলা ছিল। এইটিই ছিল টিকিট অফিস, হাওড়ার লোকদের জন্য। এই একটিমাত্র জানলা দিয়ে গলিয়ে সব শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হতো।

এই স্টেশনের সামনে, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ছিল একটি মাত্র লাইন। তার পূর্ব ও পশ্চিম দু'দিকে দু'টি সরু প্ল্যাটফর্ম। এই লাইন ও প্ল্যাটফর্ম দু'টি এখনো আছে। এখন মাত্র পার্সেল গাড়ি আসে এই প্ল্যাটফর্মে। এই প্ল্যাটফর্মের আগের নম্বর ছিল ১২, এখন হয়েছে ১৭। ১৭-র পরে আর কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই। ১৬নং থেকে ১নং প্ল্যাটফর্ম বর্তমান প্রধান স্টেশন।

পুরনো হাওড়া স্টেশনের কথাই যখন উঠল, তখন এইখানেই নতুন হাওড়া স্টেশনের কথাটা বলে নেওয়া যাক, যদিও সেটা তৈরি হয়েছিল অনেক পরে।

বর্তমান হাওড়া স্টেশনটি ছিল ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানি ও বেঙ্গল-নাগপুর রেল কোম্পানির যৌথ স্টেশন। এখনো তাই আছে, তবে নাম পালটেছে। ই-আই-আরএর নাম হয়েছে ইস্টার্ন রেলওয়ে (পূব রেলপথ) ও বি-এন-আর-এর সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে (দক্ষিণ-পূব রেলপথ)। উত্তরের ভাগটা পূব রেলের ও দক্ষিণেরটা দক্ষিণ-পূর্ব রেলের। এইটি ভারতের সবচেয়ে সুন্দর না হতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বড় স্টেশন। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ১৯০১ সনে তৈরি হয়েছে; আবার অন্যেরা বলেছেন ১৯০৬ সনে। দুটোর কোনোটাই পুরো সত্য নয়, আংশিক সত্য। স্টেশন তৈরির কাজ আরম্ভ হয় ১৯০১ সনে ও শেষ হয় ১৯০৬

সনে। লর্ড কার্জনই প্রথম বড়লাট, যিনি দেশে ফেরবার সময় স্থলপথে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন, অর্থাৎ হাওড়া স্টেশন থেকে (তখনো পুরোটা তৈরি হয় নি) বোম্বাই মেলে চেপে বোম্বাই গিয়ে সেখান থেকে বিলেতের জাহাজ ধরেছিলেন। তাঁর আগে পর্যন্ত সমস্ত বড়লাট প্রিন্সেপ ঘাট থেকে জাহাজে চাপতেন, যদিও শেষের দিকে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে গঙ্গা বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিল।

সাবেক ই-আই-আরএর স্টেশন কোথায় ছিল সেকথা বলেছি। বর্তমান স্টেশন-বাড়ি তৈরি হবার আগে বাংলা-নাগপুর রেলের বলতে গেলে কোনো স্টেশনই ছিল না। লাইন শেষ হতো হাওড়া টিকিয়াপাড়ার সামনে এসে। সেখানে একটা নামমাত্র স্টেশন ছিল। নতুন হাওড়া স্টেশন তৈরি করতে হল অনেকটা বি-এন-আরএর স্বার্থে।

বর্তমান হাওড়া স্টেশন যেখানে, সেখানে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাগে একটি রোমান ক্যাথলিক বালক-বালিকাদের অনাথ-আশ্রম ছিল। আশ্রমটি চালাতেন পোর্তুগিজ ডোমিনিক্যান সম্প্রদায়ের মিশনারিরা। ঐ অনাথ-আশ্রমের পাশেই ছিল একটি ছোট গির্জাঘর এঁদেরই। একটা মহামারী দেখা দেবার ফলে ঐ অনাথ-আশ্রমটিকে কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেই জায়গাটা পাদ্রিরা পূর্ব-ভারত রেল কোম্পানিকে বিক্রি ক'রে দেন। নতুন প্রতিষ্ঠিত রেল কোম্পানি এখানে কতকগুলি টিনের ঘর তৈরি করে। এই ঘরগুলি ছিল তাদের এঞ্জিন মেরামতের ও রেলগাড়ি তৈরির কারখানা। আর এই কারখানাগুলির কাজের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম, মাল-মশলা ইত্যাদির দরকার হতো সেগুলো রেল কোম্পানি কারখানার পাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছিল। একটা ঘর তৈরি ক'রে তার ভিতর জড়ো ক'রে বা গুছিয়ে রাখে নি। এইটি ছিল রেল কোম্পানির স্টোর-বিভাগ। ই-আই-আর, ও বি-এন-আরএর যৌথ স্টেশন করবার কথা ওঠে ১৮৯৬ সনের গোড়াতেই। তখনই ঠিক হয় যে ই-আই-আরএর কারখানাগুলো ও স্টোর-বিভাগ যে জায়গায় আছে সেখানেই নতুন স্টেশনটি তৈরি করা হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয় যে ঐ লাইনেরই কিছুটা পশ্চিমে একটা জায়গায় কারখানাগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর স্টোর-বিভাগকে নিয়ে যাওয়া হবে সালখিয়ায় নুনের গোলার কাছে।

১৮৫৬ সনে ইস্ট-ইণ্ডিয়া রেল সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলি এখানে দিচ্ছি :

কলকাতার অফিস—২৯ থিয়েটার রোড। ১৮৫৪ সনেও ঐখানে অফিস ছিল। ভারতে রেল কোম্পানির এজেন্ট—রোল্যাণ্ড ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন (লণ্ডন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটার)।

রেলওয়ের প্রধান ঠিকাদার (কনট্রাকটর)—বার্ন কোং, ম্যাকিনটশ কোং,

স্মিথ ও অ্যালকিনসন, হাণ্ট ও এমস্লি, জে. বি. নেলসন। গাড়ির (ক্যারেজ) ঠিকাদার—স্টুয়ার্ট কোং, সিটন কোং, রিজেস কোং এবং নিউসন।

বাংলা দেশে প্রধান এঞ্জিনিয়ারের অফিস—৩৩ চৌরঙ্গি রোড। প্রধান এঞ্জিনিয়ার জর্জ টার্নবুল, আবাসিক (রেসিডেন্ট) এঞ্জিনিয়ার—টমাস লিচি। সরকারি এঞ্জিনিয়ার—চার্লস মিসন।

হাওড়ায় ই-আই রেলের প্রথম বা শেষ স্টেশনে ট্রাফিক বিভাগ: ট্রাফিক ম্যানেজার—ডি. এম. বোস; সহকারি ট্রাফিক ম্যানেজার—এফ. কক্স; পুলিশ ইনসপেক্টর—আর. টাক (Tuck); ট্রাফিক অফিসের হিসাবরক্ষক (অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট)—চন্দ্রমোহন ব্যানার্জি; মাল (গুডস) অফিসের সহকারি—জে. লোথার; পার্সেল অফিসের কেরানি—উমাচরণ দাস; লাগেজ বিভাগের কেরানি—ঈশানচন্দ্র মুখার্জি।

রেলের গার্ড—এইচ. ডিকিনসন, সি. চার্চ, জে. জোন্স, জে. ক্রেগন, জে. টমাস, স্যামুয়েল ব্রওস, ডব্লিউ কেরি।

স্টেশন মাস্টার : হাওডা—আর. সি. রিড; বালী—কানাইলাল মিত্র; শ্রীরামপুর—এস. ম্যাসিক; চন্দননগর-হুগলি—জে. কক; মগরা—কালিদাস ব্যানার্জি; পাণ্ডুয়া—যদুনাথ ব্যানার্জি; বর্ধমান—এফ. জি. শ্যানন, মানকর—নবীনচন্দ্র মল্লিক; পানাগড়—প্রাণকৃষ্ণ পাল; তুমলা নালা (দুর্গাপুর), রানীগঞ্জ—জে. গ্রাণ্ডি।

স্টোর কিপার—অনেকগুলি লোকোমোটিভ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, হাওড়া—আর মিলস; নির্মাণ (কনস্ট্রাকশন) বিভাগ, বালী—আর. টার্নার।

এঞ্জিন ও গাড়ি বিভাগ—অফিস : হাওড়া। অস্থায়ী এজেণ্ট এবং প্রধান এঞ্জিন ও গাড়ি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট : সি লিনগার্ড স্টোক্স। সহকারি এঞ্জিন ও গাড়ি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট : বি. গ্রেয়ার; সহকারি গাড়ি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট : আর. ডব্লিউ. পিয়রি; সহকারি বাষ্পীয়পোত (স্টিমবোট) সুপারিনটেণ্ডেণ্ট : রিচার্ড হিল; প্রধান কেরানি : নবীনচন্দ্র রায়।

কারখানা—হাওড়ায়, বর্ধমানে ও রানীগঞ্জে খেয়া পারাপারের বাষ্পীয় পোত (ফেরি স্টিম বোট)—হাওড়া ও কলকাতা।

অনেকদিন পর্যন্ত ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলপথ ছিল মাত্র একটা লাইন। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স বহুবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। ১৮৬৫ সনের মার্চ মাসে আবার একটি স্মারকলিপি পাঠিয়ে চেম্বার বলে যে ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলে মাত্র একটি লাইন থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই ক্ষতি হচ্ছে। উদাহরণ দিয়ে চেম্বার বলে যে ঐ ১৮৬৫ সনে কলকাতা থেকে বিলাতের ডাক নিয়ে দ্রুত ডাকগাড়ির বোম্বাই পৌছতে ৬ দিন সময় লাগে। এই স্মারকলিপির ফলে গভর্নমেণ্ট লক্ষ্মীসরাই থেকে ওপরের দিকে ৭০ মাইল পর্যন্ত

লাইন ডবল করবার জন্মে ১ লক্ষ টাকা খরচ মঞ্জুর করেন এবং সপরিষদ গভর্নর-জেনারেল বলেন যে তিনি মনে করেন এখন যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত লাইন ডবল করার সময় উপস্থিত হয়েছে এবং তিনি ভারত সচিবকে এই মর্মে লিখেছেন।

এখানে প্রথমদিকের রেলগাড়ির কথা কিছু বলা দরকার।

ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম রেলগাড়িগুলো ছিল চৌকো, কাঠের তৈরি, খোলা কতকগুলো বাক্স। তাদের তলায় চাকা লাগানো, উপরে যাত্রীদের বসবার লম্বা-লম্বি কতকগুলো বেঞ্চ-পাতা। বেঞ্চগুলো আর কিছুই নয়, কতকগুলো কাঠের তক্তা মাত্র। সেগুলো ভালো ক'রে চাঁছা-ছোলা বা পালিশ করা হতো না। আর সেগুলোতে যাত্রীদের পিঠে হেলান দিয়ে বসবারও কোনো ব্যবস্থা থাকত না। মাথায় স্থান না থাকাতে যাত্রীদের রোদ, বৃষ্টি, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ও তুষার-ঝড় ভোগ করতে হতো। কাজে কাজেই তারা ফাঁক-ফাঁক হয়ে না বসে, পরস্পরের গা ঘেঁষে জড়সড় হয়ে বসত। কয়েক বছর ক্রমাগত আন্দোলন করবার ফলে যখন গাড়ির মাথায় ছাদের ও বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসবার ব্যবস্থা হল, তখনো কিন্তু রেলে চেপে যাওয়াটা খুব আরামের ব্যাপার ছিল না। গাড়ি-গুলোর ভিতরে একেবারে অন্ধকার, কোনো আলো থাকত না। যাত্রীদের মোমবাতি কিনে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে পিঠ ঠেস দিয়ে বসবার তক্তার মাথায় লাগিয়ে বসতে হতো।

ভারতীয় রেলে সর্বপ্রথম যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগাড়িগুলো ব্যবহার হয়েছে সেগুলি তখনকার ব্রিটিশ রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির নকলেই তৈরি হতো। দরজা বাইরে থেকে টেনে খুলতে হতো। কোনো শৌচাগারের বালাই ছিল না। তবে বিলিতি গাড়ির সঙ্গে আমাদের গাড়ির একটা তফাত ছিল। এদেশে যাত্রীদের মোমবাতি কিনে নিয়ে যেতে হতো না। প্রথম থেকেই এদেশের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে তেলের বাতি ব্যবহার হয়েছে। প্রথম কয়েক বছর তো ঠিক মাপমতো তৈরি গাড়ি পাওয়া না গেলেই মালগাড়ি কিংবা যে-কোনো খোলা ট্রাম যাত্রীগাড়ি হিবেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক আন্দোলন ও লেখালেখির ফলে ৩৭ বছর পরে ১৮৯১ সনে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়।

ই-আই-আর ও জি-আই-পি রেলে দোতলা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি ১৮৬২ সনে ব্যবহার করা হয়। এতদিন পরে আবার দোতলা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি চালাবার কথা উঠেছে। অনেকে মনে করছেন, এটা একটা নূতন ব্যাপার। তা মোটেই নয়। এদেশে ১১৮ বছর আগে এই গাড়ি লোকে চড়েছে।

১৮৭৪ সনে ঐ দুই রেলে চতুর্থ শ্রেণীর কামরা প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু তার ৩ বছর আগে ১৮৭১ সনে পূর্ববঙ্গ রেলে যে চতুর্থ শ্রেণীর কামরা ছিল সেকথা

আমরা জানতে পারি কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্মৃতিকথা থেকে। তিনি লিখেছেন : "তখন [১৮৭১ জানুয়ারি মাসে—রা. মি.] ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলেতে চার শ্রেণী ছিল। ৪র্থ শ্রেণীতে বসবার বেঞ্চ ছিল না। লোকে বিছানা পেতে বসত। সে গাড়িতে বসে থাকলে বাইরের কিছুই দেখা যেত না।"

ই-আই এবং জি-আই-পি রেলেও চতুর্থ শ্রেণীর কামরায় বসবার বেঞ্চ ছিল না। যাত্রীদের গাড়ির মেঝেতে বসতে হতো। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে তো আগে থাকতেই অতিরিক্ত ভিড় হতো। আর চতুর্থ শ্রেণীর কামরায় যাত্রীদের অসহ্য গরমেও গাদাগাদি ক'রে বসতে হতো। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। তাদের কয়েক বছরের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ফলে শেষপর্যন্ত ১৮৮৫ সনে বেঞ্চ পেতে দেওয়া আরম্ভ হল। কিন্তু চার শ্রেণীর গাড়ি রয়েই গেল। আগেকার তৃতীয় শ্রেণীর নাম হল 'ইণ্টারমিডিয়েট' বা 'ইণ্টার' ক্লাস। আর চতুর্থ শ্রেণীর নাম হল তৃতীয় শ্রেণী। ভারতীয় রেলে সাহেব ও ফিরিঙ্গি যাত্রীদের জন্য আলাদা কামরা ছিল। বহু বছরের প্রবল আন্দোলনের ফলে এই তফাত তুলে দেওয়া হয় ১৯৩৩ সনে।

গোড়ায় তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির তলাটা ছিল কাঠের, চারটে চাকার উপর বসানো। একটা কামরায় ৭০ জন বসতে পারত। দোতলা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় মোট ১২০ জন যাত্রী ধরত—দোতলায় ৫০ জন, একতলায় ৭০ জন। তারপরে প্রমাণ আকারের কামরায় ৯৩ জন যাত্রী বসবার বন্দোবস্ত হল। তলাটা আগাগোড়া স্টিলের তৈরি গাড়ি ভারতে প্রথম দেখা দিল ১৮৮৫ সনে।

প্রথমদিকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় একটা থেকে দুটো 'বাংক' (থাক) থাকত। ওপরের বাংকটা ব্যবহার না হলে হুক লাগিয়ে তুলে রাখা যেত।

১৯২২ সনে আগাগোড়া ইস্পাতের তৈরি গাড়ি ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা হয় বোম্বাইয়ে, শহরতলির বৈদ্যুতিক ট্রেন চালাবার জন্য। ঐরকম গাড়ি ই-আই রেলের জন্য আমদানি করা হয় ১৯২৭ সনে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এয়ারকণ্ডিশনড) গাড়ি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৩৩ সনে।

আগেই বলেছি প্রথমদিকে গাড়ির দরজা খুলতে হতো বাইরে থেকে টেনে। ভিতরদিকে ঠেলে খোলা যায়, এমন দরজা প্রথম ব্যবহার হয় ১৯০৯ সনে।

ব্রিটিশ ও কয়েকটি ইয়োরোপিয় রেলে প্রথম গ্যাসের আলো জ্বলে ১৮৬০-এর দশকে। আমাদের দেশে ১৮৭০-এর দশকে গাড়িতে গ্যাসের বাতি জ্বালা ব্যাপক হয়ে ওঠে। এদেশের গাড়িতে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে একটি দেশীয় রাজ্যের রেলে—যোধপুর রেলে—১৯০২ সনে। ১৯০৭ সনের মধ্যেই সব প্রধান রেলেই বৈদ্যুতিক আলো চালু হয়ে যায়।

ভারতে বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা রেলগাড়ি চালানো হয় প্রথম ১৯২৫ সনে জি-আই-পি লাইনের বন্দর শাখায় বোম্বাই থেকে কারলা পর্যন্ত, দূরত্ব ৯½ মাইল।

১৯২৬ সনে কারলা থেকে থানা ও ১৯২৯ সনে বোম্বাই থেকে কল্যাণ পর্যন্ত ৩৩ মাইল পথে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুৎ দ্বারা রেল চালানো আরম্ভ হয় অনেক পরে—পূর্ব-রেলের হাওড়া বিভাগে ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ও শিয়ালদা বিভাগে ১৯৬৩ সনে।

এবার পূর্ব-ভারত রেলপথের কতকগুলি পুলের কথা বলা দরকার।

১. আরার কাছে শোন নদীর ওপর পুল আরম্ভ হয় ১৮৫৬ সনে, আর খোলা হয় ১৮৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। কোনো লাইনে প্রথম ট্রেন চললেই সে লাইনকে 'খোলা হওয়া' বলে। এই পুল উদ্বোধন করেন বড়লাট লর্ড এলগিন।

২. এলাহাবাদের কাছে যমুনা নদীর ওপর পুল খোলা হয় ১৫-৮-১৮৬৫ তারিখে। এই পুলকে নৈনি-পুলও বলা হয়ে থাকে।

৩. দিল্লিতে যমুনার পুলও খোলা হয় ১৮৬৬ সনে।

৪. প্রথম হাওড়া পুল কলকাতাকে হাওড়ার সঙ্গে যোগ করত। এই পুল ছিল কতকগুলি লোহার নৌকোর উপর দাঁড় করানো। সেই জন্য এই পুলকে বলা হতো ভাসমান সেতু। লোক ও গাড়িঘোড়া চলাচলের জন্য তৈরি হয়েছিল। পুলের মাঝখানটা খোলা যেত বড় বড় স্টিমার, নৌকো ইত্যাদি চলাচলের জন্য। প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য—সাধারণত রাত্রে—এই পুল খোলা হতো। কখন খোলা হবে, আর কতক্ষণ খোলা থাকবে তার বিজ্ঞাপন আগে থাকতে খবরের কাগজে দেওয়া হতো। এই পুল তৈরি করেন তদানীন্তন আউধ এবং রোহিল-খণ্ড রেলের প্রধান এঞ্জিনিয়ার মিঃ (পরে স্যার) ব্র্যাডফোর্ড লেসলি। তৈরি হয় কলকাতা পোর্ট কমিশনারদের টাকায়। খোলা হয় ১৭-১০-১৮৭৪ তারিখে, ভেঙে ফেলা হয় ১৯৪৫ সনে।

৫. আগ্রায় যমুনার ওপর পুল তৈরি শেষ হয় ১৮৭৫ সনের জুন মাসে।

৬. গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় পুল জুবিলি পুল—ই-আই-আরএর ব্যাণ্ডেল স্টেশনকে ই-বি-আরএর নৈহাটি স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এটিও তৈরি করেন স্যার ব্র্যাডফোর্ড লেসলি। মহারানী ভিকটোরিয়ার সুবর্ণ-জয়ন্তী (জুবিলি) উপলক্ষে ১৫-৩-১৮৮৭ তারিখে খোলা হয়। তাই এর নাম 'জুবিলি পুল'।

৭. কাশীতে গঙ্গার ওপর 'ডাফরিন পুল' বড়লাট লর্ড ডাফরিন ১০-১০-১৮৮৭ তারিখে উদ্বোধন করেন।

৮. ডিহরি-অন-শোন ও শোন ইস্ট ব্যাংকের মধ্যে শোন নদীর ওপর পুল ১৯০০ সনে তৈরি হয়। এটি দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সেতু।

৯. বালী অথবা উইলিংডন পুল। গঙ্গার ওপর তৃতীয় পুল—দক্ষিণেশ্বর ও বালীর মধ্যে। আরম্ভ হয় ১৯২৭ সনে, শেষ হয় ১৯৩১ সনে। বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সময়ে হয়েছিল বলে নাম 'উইলিংডন পুল'। বর্তমান নাম : বিবেকা-নন্দ সেতু। ডানকুনি থেকে কলকাতা কর্ড রেলওয়ে এই পুলের ওপর দিয়ে দমদম

হয়ে শিয়ালদায় যাচ্ছে।

১০. বর্তমান হাওড়া পুল—গঙ্গার ওপর চতুর্থ পুল। আরম্ভ ১৯৩৭ সনে, খোলা হয় ১৯৪৩ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে। প্রথম হাওড়া পুলের একটু উত্তরে। এটি একটি ক্যান্টিলিভার ধরনের ঝোলা পুল। এর ওপর দিয়ে সব রকমের গাড়ি ও ট্রাম চলাচল করে। মানুষ দু'পাশ দিয়ে হেঁটে যায়।

পূর্ব-ভারত রেলের সম্প্রসারণ

আগেই বলা হয়েছে, হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ২৪ মাইল পথে প্রথম ট্রেন চলে ১৫-৮-১৮৫৪ তারিখে। পাণ্ডুয়া পর্যন্ত (৩৮ মাইল) চলে ১-৯-১৮৫৪ তারিখে, পাণ্ডুয়া থেকে রানীগঞ্জ (হাওড়া থেকে ১২০ মাইল) পর্যন্ত চলে ৩-২-১৮৫৫ তারিখে। হাওড়া-খানা জংশন—রাজমহল লাইন (যাকে সাহেবগঞ্জ লুপ বলা হয়) খোলা হয় ১৮৬০ সনে। খানা জংশন থেকে জামালপুর-মুঙ্গের হয়ে কিউল পর্যন্ত লুপ লাইনের বাকি অংশ খোলা হয় ১৮৬২ সনে। এই সনের শেষে ২২-১২-১৮৬২ তারিখে লক্ষীসরাই থেকে পাটনা-দানাপুর হয়ে মোগলসরাই পর্যন্ত লাইন বিস্তৃত হয়। ওদিকে ১৮৫৮ সনেই এলাহাবাদ-আলিগড় লাইনের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। এলাহাবাদ থেকে কানপুর পর্যন্ত অংশ ১৮৫৯ সনের মধ্যেই শেষ হয়। কানপুর থেকে এটোয়া পর্যন্ত আরো ৮৭ মাইল পথ ১৮৬০ সনে খোলা হয়। গাজিয়াবাদ পর্যন্ত খোলা হয় ১-৮-১৮৬৪ তারিখে।

৫-১-১৮৬৩ তারিখে (অন্যমতে ঐ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে) বড়লাট লর্ড এলগিন মোগলসরাই থেকে কাশীর বিপরীত দিকে রাজঘাট পর্যন্ত অংশ উদ্বোধন করেন। সেই সময়ে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত ই-আই রেলের সম্প্রসারণের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বলা হয়েছিল—কলকাতা থেকে রেলপথে কাশী ৫৪১ মাইল। এই রেলের কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৮৫১ সনে। বর্ধমান পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ১৮৫৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে, অজয় নদী পর্যন্ত ১৮৫৮ সনের অক-টোবর মাসে, রাজভবন পর্যন্ত ১৮৫৯ সনের অকটোবর মাসে, ভাগলপুর পর্যন্ত ১৮৬১ সনে, মুঙ্গের পর্যন্ত ১৮৬২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং বারাণসীর বিপরীত তীর পর্যন্ত ১৮৬২ সনের ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে।

১৮৬৪ সনের আগস্ট মাসেই লাইন দিল্লি. যমুনার তট পর্যন্ত পৌছেছিল। দিল্লি পর্যন্ত পৌছতে পথে ছিল দু'টি বাধা, এলাহাবাদের ও দিল্লির কাছে যমুনা নদীতে তখনো পুল বাঁধা হয় নি। এলাহাবাদে পুল বাঁধা শেষ হয় ১৫-৮-১৮৬৫ তারিখে ও দিল্লির পুল হয় ১৮৬৬ সনে। সুতরাং লুপ লাইন দিয়ে হাওড়া থেকে দিল্লি পর্যন্ত ১০২০ মাইল পথ যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছিল ১৮৬৬ সনের মধ্যেই।

পরের বছর ১৮৬৭ সনের ১ জুন এলাহাবাদ-জব্বলপুর লাইন খোলা হল। ওদিকে জি-আই-পি লাইন বোম্বাই থেকে নাগপুর পর্যন্ত (৫১৯ মাইল)

পৌঁছে গেছে ১০-২-১৮৬৭ তারিখে। কিন্তু নাগপুর থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত আর মাত্র ৯৬ মাইল (বোম্বাই থেকে জব্বলপুর ৬১৫ মাইল) পৌঁছতে হয়ে গেল ৭-৩-১৮৭০ তারিখ। ঐ তারিখেই বড়লাট লর্ড মেয়ো সরকারিভাবে কলকাতা-এলাহাবাদ-জব্বলপুর-বোম্বাই, এই ১৩০০ মাইল রেলপথের উদ্বোধন করলেন জব্বলপুরে। সেদিন ডিউক অব এডিনবরা প্রধান অতিথি ছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বোম্বাই ও বাংলার দুই শাসনকর্তা, কয়েকজন ভারতীয় রাজা ও তাঁদের মন্ত্রী এবং দেশের সব প্রান্ত থেকে বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি ও গণ্যমান্য ব্যক্তি।

মেন লাইন

রানীগঞ্জ-আসানসোল অংশ খোলা হয় ১৮৬৩ সনে এবং আসানসোল-সীতা-রামপুর অংশ দু'বছর পরে ১৮৬৫ সনে। সীতারামপুর থেকে লক্ষীসরাই অংশ ১৮৭১ সনের প্রথমদিকে। তাহলে ১৮৭১ সনের মধ্যেই মেন লাইন দিয়ে হাওড়া থেকে দিল্লি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন

এইপথে সীতারামপুর থেকে বরাকর পর্যন্ত অংশ খোলা হয় ১৮৬৫ সনে, আর বরাকর থেকে ধানবাদ অংশ ১৮৯৪ সনে, মানপুর থেকে গয়া অংশ ১৮৯৯ সনে ও গয়া থেকে মোগলসরাই অংশ ১৯০০ সনে। ধানবাদ থেকে মানপুর পর্যন্ত যে অংশটা বাদ ছিল সেটা তৈরি হয় ১৯০৬ সনে। অতএব ১৯০৬ সনের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন দিয়ে লোকে হাওড়া থেকে দিল্লি যেতে পারত।

পাটনা-গয়া রেলপথ গভর্নমেণ্ট ১৮৭৯ সনে তৈরি করে।

অন্য একটা রেল কোম্পানি বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত রেলপথ তৈরি করে। এই লাইন খোলা হয় ১-১-১৮৮৫ তারিখে। এই লাইনটি চালাবার ভার ই-আই-আরকে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত এই শাখাটি ই-আই-আরএর অংশ হয়ে যায়।

বারকাকানা লুপ লাইন

এই লাইনে শোন নদীর পূর্বতীর (বরুণ) থেকে ড্যাণ্টনগঞ্জ পর্যন্ত অংশ ১৯০২ সনের মধ্যে তৈরি হয়। গোমো থেকে বারকাকানা অংশ ১৯২৬ সনে, আর বারকাকানা থেকে ড্যাণ্টনগঞ্জ অংশ ১৯২৯ সনে খোলা হয়।

হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন

হাওড়া ও বর্ধমানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যাত্রীসংখ্যার মোকাবিলা করবার জন্য এই

লাইন খোলা হয় ১৯১৭ সনে।

কলকাতা কর্ড লাইন

ডানকুনি থেকে উইলিংডন পুল ও দমদম হয়ে শিয়ালদা পর্যন্ত কলকাতা কর্ড লাইন তৈরি হয় ১৯৩২ সনে। আর ডানকুনি লাইনকে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া হয় ১৯৪৪ সনে।

দিল্লি-আম্বালা-কালকা লাইন

১৮৮৯ সনে ভারত সরকার দিল্লি-আম্বালা-কালকা রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে এই চুক্তি করে যে এই কোম্পানি ই-আই রেলের সহযোগে দিল্লি থেকে কালকা পর্যন্ত লাইন পাতবে। গভর্নমেণ্ট কোম্পানিকে শুধু বিনামূল্যে জমি দেবে। খরচ কোম্পানির। এই লাইন কোম্পানি খোলে ১-৩-১৮৯১ তারিখে।

কালকা-সিমলা লাইন

কালকা থেকে সিমলা পাহাড় পযন্ত ছোট মাপের রেল লাইন তৈরি হয় ১৯০৩ সনে। দূরত্ব ৬০ মাইল। এই পথে ১০৩টি সুড়ঙ্গ আছে। তাদের মোট দৈর্ঘ্য ৫ মাইল। দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলে কিন্তু একটিও সুড়ঙ্গ নেই।

শাখা রেলপথ

১. পূর্ব-ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে পূববঙ্গ রেলের নৈহাটি স্টেশন পর্যন্ত শাখা খোলা হয় ১৫-৩- ৮৮৭ তারিখে।

২. ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া শাখা তৈরি আরম্ভ হয় ১৯১১ সনে, শেষ হয় ১৯১৩ সনে। এই শাখা-রেলপথের বিভিন্ন অংশ খোলার তারিখ :

(ক) ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত, ১-৪-১৯১২

(খ) নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত, ১৫-৫-১৯১২

(গ) কাটোয়া থেকে জঙ্গীপুর রোড পর্যন্ত, ১-৫-১৯১৩

(ঘ) জঙ্গীপুর রোড থেকে ধুলিয়ান গঙ্গা পর্যন্ত, ৩১-১-১৯১৩

(ঙ) ধুলিয়ান গঙ্গা থেকে বারহারওয়া পর্যন্ত, ১৯-১-১৯১১

৩. অণ্ডাল-সাঁইথিয়া কর্ড শাখা খোলা হয় ১০-১২-১৯০৬ তারিখে।

৪. মধুপুর-গিরিডি শাখা খোলা হয় ১-১-১৮৭১ তারিখে।

৫. জসিডি জংশন-বৈদ্যনাথধাম বা দেওঘর শাখা খোলা হয় ২৩-১২-১৮৮২ তারিখে।

৬. নলহাটি-আজিমগঞ্জ শাখা খোলা হয় ২১-১২-১৮৬৩ তারিখে। এই শাখা তৈরি করে গভর্নমেণ্ট।

৭. জামালপুর-মুঙ্গের শাখা (লুপ লাইনে) খোলা হয় ১০-৪-১৮৬২ তারিখে।
৮. ঐ লুপ লাইনে তিনপাহাড়-রাজমহল শাখা খোলা হয় ১৫-১০-১৮৬০ তারিখে।
৯. ভাগলপুর থেকে মন্দার পর্বত পর্যন্ত শাখা খোলা হয় ১-১০-১৯২৬ তারিখে।
১০. টুণ্ডলা জংশন থেকে আগ্রার এপারে যমুনা নদী পর্যন্ত শাখা খোলা হয় ১-৪-১৮৬২ তারিখে। যমুনার ওপর পুল তৈরি হয় ১৮৭৫ সনে। আর যমুনা পুল থেকে আগ্রা শহর পর্যন্ত রেলপথ খোলা হয় ১-১-১৯০৮ তারিখে।
১১. হাথরাস জংশন থেকে হাথরাস কেল্লা পর্যন্ত শাখা খোলা হয় ১-১১-১৮৯৮ তারিখে।
১২. খুর্জা থেকে হাপর পর্যন্ত শাখা খোলা হয় ১৫-৪-১৯০৭ তারিখে।
১৩. শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট শাখা, ছোট মাপের, ২৭·৫ কি. মি. দীর্ঘ, খোলা হয় ৫-৪-১৮৯৯ তারিখে।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি গভর্নমেণ্ট কিনে নেয় ১৮৭৯ সনের শেষে। যত টাকায় এই কোম্পানি কিনে নেবার কথা ছিল তত টাকা গভর্নমেণ্ট কোম্পানিকে না দিতে পারায় এক নবগঠিত ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানির হাতে গভর্নমেণ্ট এই রেল চালাবার ভার দেয় ১৮৮০ সন থেকে। ১৯২৫ সনের ১ জানুয়ারি থেকে গভর্নমেণ্ট রেল পরিচালনার ভার নিজের হাতে নেয়। নেবার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি পরিবর্তন হয়। ঐ তারিখ থেকেই গভর্নমেণ্টকে ই-আই রেলের এলাহাবাদ-জব্বলপুর শাখা জি-আই-পি রেলের হাতে ও গাজিয়াবাদ-দিল্লি অংশ এবং দিল্লি-আম্বালা-কালকা লাইন উত্তর-পশ্চিম রেলের হাতে তুলে দিতে হয়। অন্যদিকে আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলপথ ঐ পথের প্রতিষ্ঠাতা কোম্পানির কাছ থেকে গভর্নমেণ্ট কিনে নেয় ১৮৮৯ সনের ১ জানুয়ারি তারিখে। এই রেল গভর্নমেণ্ট চালায় ৩০-৬-১৯২৫ তারিখ পর্যন্ত। ১-৭-১৯২৫ তারিখ থেকে এই রেলপথকে গভর্নমেণ্ট ই-আই রেলের সঙ্গে যোগ ক'রে দেয়। তখন থেকে এই সমগ্র রেলপথটি ই-আই রেলের লখনৌ ও মোরাদাবাদ ডিভিশনে (বিভাগে) পরিণত হয়।

দক্ষিণ-বিহার রেলপথ লক্ষীসরাই থেকে গয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রেলপথ তৈরি করে দক্ষিণ-বিহার রেলওয়ে কোম্পানি ১৮৯৯ সনে। ৩১-১২-১৯০৫ তারিখ পর্যন্ত এই রেল গভর্নমেণ্ট চালায় ই-আই-আরএর দ্বারা, ১-১-১৯০৬ তারিখ থেকে এক চুক্তি ক'রে এই লাইন গভর্নমেণ্টকে ইজারা (লিজ) দেওয়া হয়। আর গভর্নমেণ্ট যদি এই লাইন কিনে নিতে চায় তাহলে যে দাম গভর্নমেণ্টকে দিতে হবে তাও নির্দিষ্ট হয় চুক্তিতে। গভর্নমেণ্ট ৩০-৬-১৯৩৯ তারিখে এই রেলপথ কিনে নেয়, আর ১-৭-১৯৩৯ তারিখ থেকে ই-আই-আরএর সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়।

হরিদ্বার-দেরাদুন রেলপথ হরিদ্বার-দেরাদুন রেল কোম্পানির সম্পত্তি ছিল। কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ১২-৩-১৮৯৭ তারিখে। ৩১-১২-১৯৩৯ তারিখে ভারত সরকার এই রেলপথ কিনে নেয় এবং ১-১-১৯৪০ তারিখ থেকে ই-আই-আরএর সঙ্গে একে যোগ ক'রে দেয়।

আমরা ১৯৪০ সন পর্যন্ত এসে গেলাম। এর ৭ বছর পরে ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট তারিখে অখণ্ড ভারত ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে দুই রাষ্ট্রের জন্ম হল—ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তানের আবার দু'টো অংশ হল—পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাকিস্তান। মাঝখানে ভারত—তার পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্বপ্রান্তে পূর্ব-পাকিস্তান। দেশ ভাগাভাগির সঙ্গে সঙ্গে রেলপথও ভাগাভাগি হল। ভারতের পশ্চিমে ছিল উত্তর-পশ্চিম রেলপথ। এই রেলপথের বেশির ভাগটাই রয়ে গেল পশ্চিম-পাকিস্তানে। সামান্য একটু অংশ পড়ল ভারতের মধ্যে। সেই অংশের নাম হল পূর্ব-পাঞ্জাব রেলপথ, ১৫-৮-১৯৪৭ তারিখ থেকে। সেইরকম পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল বাংলা-আসাম রেলপথ। এই রেলপথ একদিনে হয় নি। পূর্ববঙ্গ, আসাম-বঙ্গ ইত্যাদি নানা নাম পাল্টে ও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত বাংলা-আসাম রেলপথ হয়েছিল। সেকথা যথাস্থানে, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ রেলপথের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা যাবে।

১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে এই বাংলা-আসাম রেলপথ দু'টুকরো হয়ে গেল। যে অংশ আসামের মধ্যে রয়ে গেল তার নাম হল আসাম রেলপথ। এই রেলপথ অবশিষ্ট ভারত থেকে, মাঝখানে পূর্ব-পাকিস্তান পড়াতে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বাকি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পরে আসাম-লিংক রেলপথ তৈরি করতে হয়েছিল। সে কথায় এখন আমাদের দরকার নেই। ১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে ভারতের মধ্যে রয়ে গেল বঙ্গ-আসাম রেলের 'বঙ্গ' অংশটা। এই অংশটা ছিল প্রধানত বড় মাপের লাইন।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভারতের সমস্ত রেলপথের পুনর্বিন্যাস। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত যত রেলপথ ছিল সেগুলোকে ঢেলে সাজানো হল। কতকগুলো রেলপথকে একত্র ক'রে একই পরিচালনার অধীনে নিয়ে আসা হল এবং তাদের নতুন নাম দেওয়া হল।

প্রথম দল সৃষ্টি হল ১৪-৪-১৯৫১ তারিখে। ঐদিন দক্ষিণ-ভারতের মাদ্রাজ ও দক্ষিণ-মাহারাট্টা, দক্ষিণ-ভারত ও মহীশূর—এই ৩টি রেলপথকে একত্র ক'রে নাম দেওয়া হল দক্ষিণ-রেলপথ। এর প্রধান কার্যালয় হল মাদ্রাজে।

এরপর ১৫-১১-১৯৫১ তারিখে ৮টি বিভিন্ন রেল লাইনকে জুড়ে দু'টি করা হল—১ সেন্ট্রাল, ও ২. ওয়েস্টার্ন। সেন্ট্রাল রেলে এল চারটি রেলপথ—গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসিউলার, নিজাম গভর্নমেণ্ট, সিন্ধিয়া ও ধোলপুর। আর ওয়েস্টার্ন রেলে এল চারটি—১. বোম্বাই, বরোদা, ও মধ্যভারত, ২. সৌরাষ্ট্র,

৩. রাজস্থান, ৪. জয়পুর রেলপথ।

সব শেষে একজোট করা হল ১৪-৪-১৯৫২ তারিখে। ঐদিন তিনটি নতুন রেলপথের জন্ম হল — ১. উত্তর-রেলপথ, ২. উত্তর-পূর্ব রেলপথ, ৩. পূর্ব-রেলপথ। যথা—

১. উত্তর-রেলপথ হল মূলত যোধপুর, বিকানির ও পূর্ব-পাঞ্জাব রেলের সমষ্টি। তাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল পূর্ব-ভারত রেলের লখনৌ, মোরাদাবাদ ও এলাহাবাদ বিভাগ। পূর্ব-ভারত রেলপথ ঐদিন তার ঐ তিনটি বিভাগ হারালো। উত্তর-রেলের প্রধান অফিস হল দিল্লিতে।

২. উত্তর-পূর্ব রেলপথ হল মাঝারি মাপের (metre gauge) আউধ-তিরহুত রেল ও মাঝারি মাপের আসাম-রেল নিয়ে। আউধ-তিরহুত রেলপথ তার আগেই তৈরি হয়েছিল বেঙ্গল ও নর্থ-ওয়েস্টার্ন এবং রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন— এই দু'টো রেলপথকে এক ক'রে। ঐগুলো ছিল সবই মাঝারি মাপের রেলপথ। উত্তর-পূর্ব রেলপথের প্রধান অফিস হল গোরক্ষপুরে।

৩. পূর্ব-রেলপথ (ইস্টার্ন রেলওয়ে) — বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের বড়মাপের ৩৭২ মাইল পথ ভারতের মধ্যে রয়ে গেল। এই অংশটা নিয়ে নিল পূর্ব-ভারত রেলপথ। এই অংশটা হল তার শিয়ালদা বিভাগ। পূর্ব-ভারত রেলের শিয়ালদা, হাওড়া, আসানসোল, দানাপুর ও ধানবাদ—এই ৫ টি বিভাগের সঙ্গে সমস্ত বাংলা-নাগপুর রেলপথকে (বড় ও ছোট দুই মাপেরই) জুড়ে দিয়ে পূর্ব-রেলপথ তৈরি হয়েছে। পূর্ব-রেলপথের প্রধান অফিস কলকাতায়। কিন্তু এই দুই রেলপথের কাজ এত বেশি হয়ে দাঁড়াল যে একই কর্তৃপক্ষের পক্ষে একসঙ্গে দু'টোকে সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। তাই ১-৮-১৯৫৫ তারিখ থেকে বাংলা-নাগপুর রেলকে আলাদা ক'রে দেওয়া হল। আর তার নাম রাখা হল দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ। তার প্রধান কার্যালয় রইল গার্ডেনরিচে। আর ৫টি বিভাগ নিয়ে পূর্ব-ভারত রেলপথ হল পূর্ব-রেলপথ। কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব-রেলপথের যে হেড-অফিস ছিল সেই অফিসই পূর্ব-রেলপথের প্রধান কার্যালয় রয়ে গেল। ১০১ বছর পরে তফাতটা বিশেষ কিছুই হল না। ১৫-৮-১৮৫৪ তারিখে যার নাম ছিল পূর্ব-ভারত রেলপথ, ১-৮-১৯৫৫ তারিখে তার নাম হল পূর্ব-রেলপথ। শুধু 'ভারত' কাটা গেল।

এখন কতকগুলো ছোটমাপের রেলপথের কথা বলে এই পর্ব শেষ করছি।

১. বক্তিয়ারপুর-বিহার লাইট রেলওয়ে। দৈর্ঘ্য ৩৩ মাইল। কোম্পানি রেজিস্ট্রির তারিখ ১৯-৭-১৯০১। বক্তিয়ারপুর থেকে বিহার, বিহার থেকে সিলাও, ও সিলাও থেকে রাজগির অংশ খোলা হয় যথাক্রমে ১-৭-১৯০৩, ১০-৭-১৯০৯ ও ১-১১-১৯১১ তারিখে। ১-৪-১৯৬১ থেকে লাইন বন্ধ হয়ে গেছে।

২. আহমদপুর-কাটোয়া রেলপথ। দৈর্ঘ্য ৩২ মাইল। আহমদপুর-কাটোয়া রেল কোম্পানি এই লাইন তৈরি করে। কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ৩-১১-১৯১২ তারিখে। গভর্নমেণ্ট তৈরি করবার মজুরি দেয় ১৬-১১-১৯১৪ তারিখে। সম্পাদক ও খাজাঞ্চি—ম্যাকলিয়ড কোম্পানি। আহমপুর থেকে পাচণ্ডি, পাচণ্ডি থেকে কাটোয়া অংশ খোলা হয় যথাক্রমে ৩০-৫-১৯১৭ ও ২৯-৯-১৯১৭ তারিখে। ১-৭-১৯৬৭ তারিখে গভর্নমেণ্ট এই লাইন কিনে নিয়ে পূর্ব-রেলপথের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েছিল।

৩. বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথ। দৈর্ঘ্য ৩২ মাইল। বর্ধমান-কাটোয়া রেল কোম্পানি এই লাইন তৈরি করে। কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ১৯১৩ সনে, লাইন তৈরির মঞ্জুরির তারিখ ৩০-১২-১৯১৩। লাইন খোলা হয় ১-১২-১৯১৫ তারিখে। এই লাইনেরও সচিব ও খাজাঞ্চি ম্যাকালিয়ড কোং। ১-৪-১৯৬৬ তারিখে এই লাইন গভর্নমেণ্ট কিনে নিয়ে পূর্ব-রেলপথের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েছে।

৪. বেঙ্গল-প্রভিনসিয়াল রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড। দৈর্ঘ্য ৪১ মাইল। এর দু'টি অংশ : ক. তারকেশ্বর থেকে মগরা ৩১ মাইল, ও মগরা থেকে ত্রিবেণী ২ মাইল—মোট ৩৩ মাইল; খ. দশঘরা থেকে জামালপুরগঞ্জ ৮ মাইল। এই লাইনটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এটি সম্পূর্ণ এদেশীয় লোকের অর্থে ও তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় ও পরিচালিত হয়। কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ১৮৯০ সনে।

বাবু আনন্দপ্রসাদ রায় নামে একজন স্থানীয় রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ার এই রেলপথের পরিকল্পনা করেন। বাবু অমৃতলাল রায় একটা লিমিটেড কোম্পানি গঠন ক'রে মূলধন সংগ্রহ করেন। এই রেলপথ খোলবার মঞ্জুরির তারিখ ১৮-১২-১৮৯১। পূর্ববঙ্গ রেলের প্রধান এঞ্জিনিয়ার মিঃ এফ. সি. রবার্টসন এই কোম্পানির পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তারকেশ্বর থেকে বসুয়া পর্যন্ত এবং বসুয়া থেকে মগরা পর্যন্ত অংশ খোলা হয় যথাক্রমে ৭-১১-১৮৯৪ এবং ৮-৩-১৮৯৫ তারিখে। এই লাইন তৈরির ভার ছিল প্রথমে বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায়ের ওপর, পরে বাবু রামকৃষ্ণ মুখার্জির ওপর।

২০-৩-১৯৫৬ তারিখ থেকে এই লাইন বন্ধ হয়ে গেছে।

৫. হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে। ম্যানেজিং এজেণ্ট—মার্টিন বার্ন কোং। রেল কোম্পানি রেজিস্ট্রির তারিখ ২-৫-১৮৯৫। চুক্তি হয়—রেল কোম্পানি ও হাওড়া জেলা বোর্ড, হুগলি জেলা বোর্ড ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে।

প্রধান লাইন হাওড়া-আমতা খোলা হয় ৪ কিস্তিতে :

ক. হাওড়া-তেলকলঘাট থেকে ডোমজুর, খ. ডোমজুর থেকে বড়গাছিয়া, গ. বড়গাছিয়া থেকে মাজু, ঘ. মাজু থেকে আমতা—এই অংশগুলি খোলা হয় যথাক্রমে ১-৭-১৮৯৭, ২-১০-১৮৯৭, ৪-৫ ১৮৯৮ ও ১-৬-১৮৯৮ তারিখে।

তেলকলঘাট থেকে বড়গাছিয়ার দূরত্ব ১৬ মাইল, আর আমতার দূরত্ব ২৮ মাইল।

চাঁপাডাঙা শাখা। এই শাখা খোলা হয় ৩ কিস্তিতে—ক. বড়গাছিয়া থেকে জগৎবল্লভপুর, খ. জগৎবল্লভপুর থেকে আঁটপুর, গ. আঁটপুর থেকে চাঁপাডাঙা। এই ৩টি অংশ খোলা হয় যথাক্রমে ২-১০-১৮৯৭, ১-৬-১৯০৪ ও ২৪-৮-১৯০৮ তারিখে।

তেলকলঘাট থেকে চাঁপাডাঙা ৩২ মাইল ও বড়গাছিয়া থেকে ১৬ মাইল। আমতা ও চাঁপাডাঙা লাইন বন্ধ হয়ে যায় ১-১-১৯৭১ তারিখে।

৬. হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলওয়ে। এরও ম্যানেজিং এজেন্ট মার্টিন বার্ন কোং। রেল কোম্পানি রেজিস্ট্রির তারিখ ১৯-৬-১৮৯৫। চুক্তি হয় রেল কোম্পানি ও হাওড়া জেলা বোর্ড, হুগলি জেলা বোর্ড ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে।

প্রধান লাইন হাওড়া-শিয়াখালা খোলা হয় ৩ কিস্তিতে—ক. কদমতলা থেকে চণ্ডীতলা, খ. চণ্ডীতলা থেকে কেষ্টরামপুর, গ. কেষ্টরামপুর থেকে শিয়াখালা। এই তিন অংশ খোলা হয় যথাক্রমে ২-৮-১৮৯৭, ১০-৯-১৮৯৭ ও ৭-১১-১৮৯৭ তারিখে। তেলকলঘাট থেকে চণ্ডীতলা ১১ মাইল এবং শিয়াখালা ২০ মাইল।

জনাই শাখা। চণ্ডীতলা থেকে জনাই ৩ মাইল। খোলা হয় ৫-৫-১৮৯৮ তারিখে। শিয়াখালা ও জনাই লাইন বন্ধ হয়ে যায় ১-১-১৯৭১ তারিখে।

হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা—এই দু'টি রেলপথই হাওড়ার গঙ্গার ধারে তেলকলঘাট থেকে আরম্ভ হতো। হাওড়া ময়দানের মাঝখানে একটি স্টেশন ছিল। তেলকলঘাট থেকে ছেড়ে ট্রেন হাওড়া ময়দান স্টেশনে থেকে সেখান থেকে হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোড ধরে কদমতলা স্টেশন হয়ে দাশনগর পর্যন্ত যেত। সেখান থেকে হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা লাইন আলাদা হয়ে যেত। স্বাধীনতার পর তেলকলঘাট স্টেশন ও হাওড়া ময়দান স্টেশন দু'টি উঠিয়ে দেওয়া হল ও পঞ্চাননতলা রোডের লাইন উপড়ে ফেলা হল। চাঁদমারি পুলের পশ্চিম ধারে এক নতুন স্টেশন তৈরি ক'রে তার নাম দেওয়া হল হাওড়া ময়দান স্টেশন। আর ট্রেন চলাচলের পুরনো রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই নতুন স্টেশন থেকে বেলিলিয়াস রোডের উপর লাইন পেতে সেই লাইন নিয়ে যাওয়া হল ৪ কি. মি. দূরে দাশনগর পর্যন্ত। সেখান থেকে হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা যাবার সাবেক পথ আরম্ভ। নতুন হাওড়া ময়দান স্টেশন থেকে জাম-নগর পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ১-২-১৯৪৮ তারিখে।

ভারত গভর্নমেণ্ট বড়মাপের হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা লাইন খুলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, লাইনের শিলান্যাসও হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো কাজই হয় নি। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব রেল-

পথের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জে. এস.ডি. ডেভিড বলেছেন যে, হাওড়া-আমতা লাইনে হাওড়া থেকে বড়গাছিয়া পর্যন্ত অংশ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ১৯৮০ সনের মধ্যে খুলবে।

৭. আরা-সাসারাম লাইট রেলওয়ে। দৈর্ঘ্য ৬৫ মাইল। ম্যানেজিং এজেন্ট মার্টিন বার্ন কোং। রেল কোম্পানি রেজিস্ট্রির তারিখ ১৯-১০-১৯০৯। এটি সাহাবাদ জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত লাইন।

আরা থেকে সাসারাম ও সাসারাম থেকে তারাচণ্ডী পাহাড় অংশ খোলা হয় যথাক্রমে ৬-৩-১৯১১ ও ১২-১১-১৯১৪ তারিখে। ১৫-২-১৯৭৮ তারিখ থেকে এই লাইন বন্ধ হয়ে গেছে।

৮. ফতোয়া-ইসলামপুর লাইট রেলওয়ে। দৈর্ঘ্য ২৭ মাইল। ম্যানেজিং এজেন্ট মার্টিন বার্ন কোং। রেল কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ১৯১৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। গভর্নমেণ্ট মঞ্জুরির তারিখ ২৪-৯-১৯১৫। এক পয়সাও আয় নেই। গভর্নমেণ্টের অর্থসাহায্য চলছিল। ১৯৭৭ সনের মে মাস থেকে গাড়ি চালানো সম্পূর্ণ স্থগিত রাখা হয়েছে।

৯. ডিহরি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে। দৈর্ঘ্য ২৪ মাইল। ডিহরি-অন-শোন থেকে রোহতাসগড় পর্যন্ত। রেলকোম্পানির সঙ্গে অনেকবার অনেক রকমের চুক্তি হয়েছে। সর্বপ্রথম চুক্তি হয়—সাহাবাদ জেলা বোর্ড ও কলকাতার Octavius Steel কোম্পানির মধ্যে। লাইন তৈরি করবার মঞ্জুরির তারিখ ১০-১১-১৯০৮। ঐ চুক্তি নাকচ ক'রে ৪-৬-১৯০৯ তারিখে আর এক চুক্তি হয় সরাসরি ডিহরি রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোম্পানি লিঃ ও সাহাবাদ জেলা বোর্ডের মধ্যে ঐ লাইন তৈরির জন্য। এই চুক্তির দ্বারা অক্টেভিয়াস স্টিল কোম্পানিকে সবরকম দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। ১০-১২-১৯২৪ তারিখে সাহাবাদ জেলাবোর্ড ও ডিহরি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোম্পানি লিঃ-এর মধ্যে চুক্তি হয় রোহতাস স্টেশন থেকে আকবরপুর পর্যন্ত লাইন বাড়াবার জন্য।

২৭-১২-১৯৫২ তারিখে ডিহরি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ ও রোহতাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর মধ্যে চুক্তি হয় ডিহরি সিটি থেকে ডালমিয়ানগর কারখানা পর্যন্ত লাইন নিয়ে যাবার জন্য। ঐ ২৭-১২-১৯৫২ তারিখেই ডিহরি রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ ও ডালমিয়া জৈন কোম্পানি লিঃ-এর মধ্যে চুক্তি হয় লাইনকে মুরলি পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য।

৭-৮-১৯৫৩ তারিখে ডিহরি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ ও সাহাবাদ জেলাবোর্ডের মধ্যে চুক্তি হয় লাইন পাচা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করবার জন্য।

৩০-৬-১৯৫৪ তারিখে ডিহরি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ ও রোহতাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর মধ্যে চুক্তি হয় লাইনকে তিউরা-পিপরাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত করবার জন্য। ঐ ৩০-৬-১৯৫৪ তারিখেই ডিহরি-রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোং

লিঃ ও রোহতাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর মধ্যে চুক্তি হয় নাসরিগঞ্জ পর্যন্ত লাইন নিয়ে যাবার জন্য। এই রেলপথ এখনো চালু আছে।

বারাসাত-বসিরহাট-হাসনাবাদ বড় মাপের রেলপথ। এটি সরকারি লাইন, ৫৩ কি. মি. দীর্ঘ। লাইন পাতার কাজ শুরু হয় ১৯৫৯ সনের নভেম্বর মাসে, খোলা হয় ৯-২-১৯৬২ তারিখে। তখনকা'র রেলমন্ত্রী শ্রীজগজ্জীবন রাম এই লাইনের উদ্বোধন করেন ঐ তারিখে। এই লাইন ইস্টার্ন রেলের অন্তর্ভুক্ত।

ইতিমধ্যে আমি পূর্ব-ভারত রেলপথের কথা বলেছি। কিন্তু আর দু'টো রেলপথ —যা কলকাতার সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ রক্ষা করত—তার কথা বলা হয় নি। সেই দু'টো রেলপথ হচ্ছে: বাংলা-নাগপুর ও পূর্ববঙ্গ রেলপথ। সেই দু'টি রেলপথের কথা এখন লিখছি।

বাংলা-নাগপুর রেলপথ (বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে)

এই রেলপথের ইতিহাস একটু বিচিত্র। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি ১৮৮৭ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডে গঠিত হয়। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কোম্পানি গঠিত হওয়ার পরেই ভারতে বাংলা-নাগপুর রেলপথের কাজ আরম্ভ হয়েছে। তা কিন্তু ঠিক নয়। এই রেলপথের সূচনা হয় অনেক আগেই ১৮৬৩ সনে। ঐ সনে তখনকার মধ্যপ্রদেশের (সেনট্রাল প্রভিন্স-এর) চিফ-কমিশনার স্যার রিচার্ড টেম্পল নাগপুর থেকে মধ্যপ্রদেশের শস্যভাণ্ডার ছত্রিশগড় পর্যন্ত একটি ছোট মাপের ট্রামলাইন পাতবার সুপারিশ করেন। কিন্তু সেই সুপারিশ ভারত সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। ৮৭০ সনে মধ্যপ্রদেশের তদানীন্তন চিফ-কমিশনার মিঃ মরিস আবার ঐ ট্রামলাইন খোলার সুপারিশ করেন। ভারত সরকার প্রস্তাবটি আবার বিবেচনা করেন। কিন্তু তখনো প্রস্তাব গ্রাহ্য হল না। শেষে ১৮৭৮ সনে ভারত সরকার নাগপুর থেকে রাজনন্দগাঁও পর্যন্ত একটি মাঝারি মাপের রেললাইন পাতবার অনুমতি দেন। এই লাইনটি ১৪৫ মাইল দীর্ঘ, খোলা হয় ১৮৮২ সনে।

১৮৮৪ সনে নাগপুর থেকে পূর্ব-ভারত রেলপথের সীতারামপুর স্টেশন (আসানসোল স্টেশন থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে ও কলকাতা থেকে ১৩৭ মাইল) পর্যন্ত একটি বড় মাপের রেললাইন তৈরির মঞ্জুরি দেওয়া হয়। ১৮৮৫ সনে এই লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দখল করা হয় এবং মাটি ফেলার কাজও অনেক-দূর এগোয়, কিন্তু হঠাৎ কাজ বন্ধ ক'রে দিতে হয়। তার কারণ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হওয়ার দরুন সরকারি তহবিলে অর্থের ঘাটতি পড়ে।

এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ লাইনের কাজ মুলতুবি রাখায় বিদেশী ব্যবসায়ী মহলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তারা গভর্নমেণ্টকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই লাইন

পাতার ভার একটি বেসরকারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে দিতে রাজি করায়। তারই ফলে ইংল্যাণ্ডে ২৩-২-১৮৮৭ তারিখে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি গঠিত হয়। ঐ সনের ৯ মার্চ তারিখে এই কোম্পানি ভারত সচিবের সঙ্গে একটি চুক্তি করে এই মর্মে যে তারা মাঝারি মাপের নাগপুর-ছত্রিশগড় সরকারি রেলপথকে নিয়ে নেবে, ঐ রেলপথকে মাঝারি মাপ থেকে বড়মাপে পরিবর্তিত করবে, ঐ লাইনকে সীতারামপুর স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং কাটনি থেকে উমারিয়া পর্যন্ত যে বড়মাপের ৩৬½ মাইল দীর্ঘ রেললাইন সরকার ১৮৮৬ সনে তৈরি করেছিল, সেই লাইনকে নিয়ে বিস্তৃত ক'রে পরিকল্পিত নাগপুর-সীতারামপুর প্রধান লাইনের সঙ্গে যোগ ক'রে দেবে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানি কাটনি-উমারিয়া লাইন ১৮৮৮ সনের এপ্রিল মাসে নিয়ে নিল। এইটিই হল বাংলা-নাগপুর রেলপথের প্রথম বড়মাপের লাইন। একদিনের জন্যেও ট্রেন চলাচল বন্ধ না রেখে নাগপুর থেকে রাজনন্দগাঁও পর্যন্ত মাঝারি মাপের লাইনকে বড়মাপের লাইনে পরিবর্তিত করা সম্পূর্ণ হল ১৮৮৮ সনের ২৭ নভেম্বরের মধ্যে। তবে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল যে এই লাইনকে পূর্ব দিকে প্রসারিত ক'রে সীতারামপুরের বদলে আসানসোল স্টেশনে পূর্ব-ভারত রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ১৮৮৮ সনেই একটি শ্রমিক ও এঞ্জিনিয়ারের দল রাজনন্দগাঁও থেকে পূর্বদিকে রেলপথটি তৈরি করতে করতে এগোতে লাগল, আর ১৮৮৯ সনে অন্য একটি দল আসানসোল থেকে রেলপথটি তৈরি করতে করতে ঠিক উল্টোদিকে এগোতে লাগল। ১৮৯১ সনের ১৮ জানুয়ারি এই দু'টি পথ এসে জোড়া লাগল রায়গড় স্টেশনে। কাটনি থেকে উমারিয়া পর্যন্ত শাখা লাইনটিকেও প্রসারিত ক'রে বিলাসপুর স্টেশনে প্রধান লাইনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল ঐ তারিখেরই মধ্যে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাংলা-নাগপুর রেলের প্রধান লাইনটির, অর্থাৎ নাগপুর-গোণ্ডিয়া-রায়পুর-বিলাসপুর-চক্রধরপুর-সিনি-পুরুলিয়া-আসানসোল লাইনের নির্মাণ এবং কাটনি-উমারিয়া লাইনেব বিলাসপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ হয় ১৮-১-১৮৯১ তারিখে। ভাইসরয় লর্ড ল্যান্সডাউন বেঙ্গল-নাগপুর রেলের সরকারিভাবে উদ্বোধন করেন ১৮৯১ সনের ৭ মার্চ তারিখে।

এরপর সিনি জংশন থেকে খড়্গপুর জংশন পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ১-৬-১৮৯৮ তারিখে। তারপর খড়্গপুর থেকে টিকিয়াপাড়া (হাওড়া) লাইন খোলা হয় ১৪-১২-১৯০০ তারিখে। এই লাইন তিন দফায় খোলা হয় : খড়্গপুর থেকে দাইনান খালপুর পর্যন্ত ১৭-১২-১৮৯৮ তারিখে, দাইনান খালপুল থেকে রাজাপুর খাল পর্যন্ত ২৪-৫-১৯০০ তারিখে, এবং রাজাপুর খাল থেকে টিকিয়াপাড়া (হাওড়া) পর্যন্ত ১৪-১২-১৯০০ তারিখে।

সঙ্গে সঙ্গে খড়্গপুর-কটক লাইন তৈরির কাজও চলতে থাকে। খড়্গপুর

থেকে বালেশ্বর পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ১৭-১২-১৮৯৮ তারিখে এবং বালেশ্বর থেকে কটক পর্যন্ত ১০-১-১৮৯৯ তারিখে।

১৯০১ সনে বাংলা-নাগপুর রেলপথ পূর্ব উপকূল রেলপথের (ইস্ট কোস্ট রেলওয়ের) উত্তর অংশ কিনে নেয়। পূর্ব উপকূল রেলপথটি তৈরি করে গভর্নমেণ্ট। এটি দক্ষিণে বিজয়ওয়াড়া (বেজওয়াদা) থেকে আরম্ভ ক'রে সামলকোট, বিশাখাপত্তম্ (ভিজাগাপটম্), গঞ্জাম হয়ে কটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খুরদা রোড থেকে পুরী পর্যন্ত শাখা লাইনও এই সরকারি রেলের অন্তর্গত ছিল। এই রেলপথের ছিল দু'টি অংশ। এক, বিজয়ওয়াড়া থেকে বিশাখাপত্তম্ পর্যন্ত দক্ষিণ অংশ; আর, বিশাখাপত্তমের ঠিক উত্তরে ওয়ালটেয়ার থেকে কটক পর্যন্ত উত্তর অংশ। এই উত্তর অংশ তৈরি হয় ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ সনের মধ্যে। পূর্ব উপকূল রেলপথের এই উত্তর অংশটি বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানি কিনে নেয় ১৯০১ সনে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ১৩ বছরের মধ্যে বাংলা-নাগপুর রেলপথ দু'দিকে বিস্তৃত হয়: বাংলা-বিহার কয়লাখনি অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশের নয়নপুর জেলায়। আদ্রা-ভোজুড়ি-মহুদা-চন্দ্রপুরা বাংলা-নাগপুর রেলপথের এই বড়মাপের অংশটা বাংলা-বিহার কয়লাখনি অঞ্চলে; আর, গোণ্ডিয়া-বালাঘাট-নয়নপুর-জব্বলপুর ও নাগপুর-ছিন্দওয়াড়া-নয়নপুর, এই দু'টি ছোটমাপের রেলপথ নয়নপুর জেলায়।

শেষ গুরুত্বপূর্ণ বড়মাপের লাইন, যা বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানি তৈরি করে, তা হচ্ছে রায়পুর থেকে বিজয়নগরম্ (ভিজিয়ানাগ্রাম) শাখা লাইন। এটি দৈর্ঘ্যে ৪৬৭ কিলোমিটার (প্রায় ২৯০ মাইল)। ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে পার্বতীপুরম্ পর্যন্ত একটি শাখা লাইন ১৯০৯ সনে খোলা হয়েছিল। ১৯২৪ সনে রায়পুর থেকে পার্বতীপুরম্ অংশটার শেষ সমীক্ষা আরম্ভ হয়। পরে রেল লাইন পাতা মঞ্জুর হয় ও কাজ আরম্ভ হয়। এই অঞ্চলটা ছিল আয়তনে ইংল্যাণ্ডের মতোই বড়, কিন্তু অত্যন্ত অনুন্নত, বনজঙ্গলে ভরা। কাজ আরম্ভ হয় দুই প্রান্ত থেকে। এই লাইনের শেষ অংশটার কাজ সম্পূর্ণ হয় ও ট্রেন চলাচল করতে আরম্ভ করে ১৯৩১ সনের ২০ ডিসেম্বর তারিখ থেকে। কোন অংশ কবে খোলা হয়েছিল তার হিসেব নিচে দেওয়া হল:

ক. ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে ববিলি, ২৪-১২-১৯০৮

খ. ববিলি থেকে পার্বতীপুরম্, ৮-৩-১৯০৯

গ. পার্বতীপুরম্ থেকে জুমাদিপেটা, ৩১-৩-১৯৩০

ঘ. জুমাদিপেটা থেকে রায়াঘড়া, ১২-৪-১৯৩০

ঙ. রায়াঘড়া থেকে থেরুবলি, ৩১-৩-১৯৩১

চ. রায়পুর থেকে ঝোঁক, ১৫-১১-১৯২৯

ছ. ঝোঁক থেকে হরিশঙ্কর রোড, ৩০-৩-১৯৩০

জ. হরিশঙ্কর রোড থেকে তিতিলাগড়, ৩০-৯-১৯৩০

ঝ. তিতিলাগড় থেকে থেরুবলি, ২০-১২-১৯৩১

আরো কতকগুলি লাইন কবে খোলা হয়েছিল, তার হিসেব নিচে লেখা হল

ক. সাঁতরাগাছি-শালিমার শাখা, ১৫-৩-১৯০১

খ. টাটানগর-গরুমহিষানি শাখা :

টাটানগর থেকে ওনলাজুড়ি, ১-২-১৯১১

ওনলাজুড়ি থেকে গরুমহিষানি, ৬-৪-১৯১১

ওনলাজুড়ি থেকে বাদামপাহাড়, ২৩-১০-১৯২২

গ. কটক-তালচের শাখা, ২০-১-১৯২৭

ঘ. বারকাখানা-চাণ্ডিল শাখা, ৩১-৩-১৯২৭

ঙ. পূর্ব উপকূল রেলপথের উত্তরাংশ :

ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে ওয়ালটেয়ার ও গোপালপত্নম্, ১৫-৭-১৮৯৩

ভিজিয়ানাগ্রাম থেকে নৌপদা, ২০-৯-১৮৯৪

নৌপদা থেকে পলাশা, ১৭-১২-১৮৯৪

পলাশা থেকে বহরমপুর (গঞ্জাম), ১-৪-১৮৯৫

বহরমপুর (গঞ্জাম) থেকে রম্ভা, ১-৯-১৮৯৫

রম্ভা থেকে খুর্দা রোড, ১-৩-১৮৯৬

খুর্দা রোড থেকে ভুবনেশ্বর, ২০-৭-১৮৯৬

ভুবনেশ্বর থেকে কটক, ১-২-১৮৯৭

চ. খুর্দা রোড থেকে পুরী শাখা, ১-২-১৮৯৭

ছ. গুয়া শাখা :

রাজখরসাওয়ান থেকে ডাঙ্গোয়াপোসি, ১-৭-১৯২৪

ডাঙ্গোয়াপোসি থেকে গুয়া, ২০-২ ১৯২৫

জ. বীরমিত্রপুর শাখা :

কোয়েল নদীর তীর থেকে বীরমিত্রপুর, ২-২-১৯২২

রাউরকেলা থেকে কোয়েল নদীর তীর, ১৭-৯-১৯২২

ঝ. সম্বলপুর শাখা :

ঝাড়সুগুদা থেকে সম্বলপুর, ১-২-১৮৯৩

ঞ. পুরুলিয়া-রাঁচি শাখা :

পুরুলিয়া থেকে রাঁচি, ১৫-১২-১৯০৭

রাঁচি থেকে লোহারডাগা (ছোট মাপের), ৬-১০-১৯১৩

ট. রায়পুর-ধামতারি শাখা :

রায়পুর থেকে কুরুড়, ১০-৯-১৯০০

কুরুড় থেকে ধামতারি, ১৭-১২-১৯০০

আভনপুর থেকে রাজিম, ১৫-১০-১৯০০

সাতপুরা রেলপথ (ছোটমাপের)—

ক. গোণ্ডিয়া-চান্দা দুর্গ শাখা :

গোণ্ডিয়া থেকে নাগভির, ১-১১-১৯০৮

নাগভির থেকে রাজোলি, ১-১২-১৯১০

রাজোলি থেকে বাবুপেট, ১-৪-১৯১৩

বাবুপেট থেকে চান্দা দুর্গ, ২০-২-১৯১৬

খ. গোণ্ডিয়া-জব্বলপুর শাখা :

গোণ্ডিয়া থেকে নয়নপুর, ১৩-৪-১৯০৩

নয়নপুর থেকে বর্গী, ৫-৭-১৯০৪

বর্গী থেকে হাওবাগ, ৭-৪-১৯০৫

গ. নয়নপুর-গড়মণ্ডলা শাখা, ১৫-২-১৯০৯

ঘ. নয়নপুর-বারকুহি শাখা :

নয়নপুর থেকে সিওনি, ১২-২-১৯০৪

সিওনি থেকে চৌরাই, ২৭-৭-১৯০৪

চৌরাই থেকে ছিন্দওয়াড়া, ১-৯-১৯০৪

ছিন্দওয়াড়া থেকে ক্ষীরসাদো, ১৫-৩-১৯০৬

ক্ষীরসাদো থেকে বারকুহি, ২৩-৩-১৯০৭

ক্ষীরসাদো থেকে পারাসিয়া, ২৩-১২-১৯২২

ঙ. বালাঘাট-কাটাঙ্গি শাখা, ১-৫-১৯১৩

বাংলা-নাগপুর রেলপথের প্রধান লাইন :

নাগপুর থেকে রাজনন্দগাঁও, ১৮৮০-৮২

রাজনন্দগাঁও থেকে রায়পুর, ৪-১২-১৮৮৮

রায়পুর থেকে বিলাসপুর, ১০-১-১৮৮৯

বিলাসপুর থেকে রায়গড়, ১০-২-১৮৯০

পুরুলিয়া থেকে দামোদর নদ, ১৪-২-১৮৮৯

দামোদর নদ থেকে আসানসোল, ১২-৬-১৮৮৯

পুরুলিয়া থেকে চক্রধরপুর, ২২-১-১৮৯০

চক্রধরপুর থেকে গোইলকেরা, ১৫-৫-১৮৯০

গোইলকেরা থেকে ঝাড়সুগুদা, ১-২-১৮৯১

ঝাড়সুগুদা থেকে রায়গড়, ২০-৪-১৮৯০

মধ্যভারত কয়লাখনি রেলপথ (সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া কোলফিল্ড রেলওয়েজ)

অনুপপুর থেকে বিজুড়ি, ১৭-৬-১৯২৮

বিজুড়ি থেকে মহেন্দ্রগড়, ২৫-৪-১৯২৯

মহেন্দ্রগড় থেকে চিড়িমিড়ি, ২৩-১-১৯৩১

তুমসার রোড-তিরোদি ছোটমাপের রেলপথ :

এই লাইনটি ভারত সরকার সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া মাইনিং কোম্পানির কাছ থেকে কিনে নিয়ে ১-৪-১৯১৬ তারিখে বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানিকে দিয়ে দেন তাদের নিজস্ব লাইন হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য।

ছোটমাপের পার্লাকিমেদি রেলপথ :

নওপদা থেকে গুনুপ্পুর। এই রেলপথ পার্লাকিমেদির রাজা তৈরি করেন। সুতরাং এটা তাঁরই সম্পত্তি ছিল। বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানি এই লাইন দেখাশোনা করত ও চালাত। ভারত সরকার ১-২-১৯৫০ তারিখে এই রেলপথ কিনে নিয়েছে। সেইদিন থেকে এই রেলপথ বাংলা-নাগপুর রেলপথের অচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে।

খোলার তারিখ :

ক. নওপদা থেকে পার্লাকিমেদি, ১-৪-১৯০০

খ. পার্লাকিমেদি থেকে বারাণসী, ১৭-১১-১৯২৯

গ. বারাণসী থেকে গুনুপ্পুর, ১৬-১১-১৯৩১

ময়ূরভঞ্জ স্টেট রেলওয়ে :

এই রেলপথের রূপসা থেকে বারিপদা অংশটি আগে ময়ূরভঞ্জ সরকারি রেলপথ বলে পরিচিত ছিল। এর মালিক ছিল ময়ূরভঞ্জ স্টেটের রাজা। এই অংশটি ময়ূরভঞ্জ রেলওয়ে কোম্পানি কিনে নেয় এবং যেদিন বারিপদা থেকে তালবাঁধ (বাংড়িপোসি) পর্যন্ত অংশ খোলা হয় (১৫-৭-.৯২০ তারিখে), সেদিন থেকে কোম্পানি নিজের রেলপথের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেয়। ১৯১৫ সনে ময়ূরভঞ্জ রেলওয়ে কোম্পানি রেজিস্ট্রি করা হয় এবং এই রেলপথের শেষোক্ত অংশের ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল কলকাতার হোর মিলার কোম্পানি।

এই লাইন ভারত সরকার তৈরি করে, কোম্পানি অর্থ যোগায়। সুতরাং লাইনের মালিক ছিল কোম্পানি। তবে, ভারত সরকার এই রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করত বাংলা-নাগপুর রেল কোম্পানির মারফত। ভারত সরকার এই রেলপথ নিয়ে নেয় ১-৪-১৯৫০ তারিখে এবং ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্র-পরিচালিত বাংলা-নাগপুর রেলপথের অঙ্গীভূত ক'রে দেয়। এই রেলপথটি ছিল ছোটমাপের।

খোলার তারিখ :

ক. রূপসা থেকে বারিপদা, ২০ ১-১৯০৫

খ. বারিপদা থেকে তালবাঁধ (বাংড়িপোসি), ১৫-৭-১৯২০

এখন আমরা ১৯৫০ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এলাম। এই সময়ের দু'বছর পরে

১৯৫২ সনের ১৪ এপ্রিল ৩টি আঞ্চলিক রেলপথের জন্ম হল। ক. উত্তর রেলপথ, খ. উত্তর-পূর্ব রেলপথ, গ. পূর্ব রেলপথ। ঐদিন সমস্ত বাংলা-নাগপুর রেলপথকে (বড় ও ছোট দুই মাপেরই) পূর্ব-ভারত রেলপথের শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল, দানাপুর ও ধানবাদ—এই ৫টি বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পূর্ব রেলপথ তৈরি হল। কিন্তু এই দুই বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের কাজ এত বেশি হয়ে দাঁড়াল যে একই কর্তৃপক্ষের পক্ষে একসঙ্গে দু'টোকে পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই ১৯৫৫ সনের ১ আগস্ট থেকে বাংলা-নাগপুর রেলপথকে পূর্ব রেলপথ থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে তার নাম রাখা হল দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ। বাংলা-নাগপুর রেলপথের প্রধান কার্যালয় যেখানে ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের প্রধান কার্যালয়ও সেখানেই রইল—গার্ডেনরিচে।

শুধু একটি রেলপথের কথা এ পর্যন্ত বলা হয় নি। সেটি বাঁকুড়া-দামোদর নদ রেলপথ, ছোটমাপের এবং ৬০ মাইল দীর্ঘ। এই রেলপথ তৈরি করে বাঁকুড়া-দামোদর নদ রেলওয়ে কোম্পানি। এই লাইন তৈরি করবার অনুমতি দেওয়া হয় ১-৫-১৯১৪ তারিখে। এই কোম্পানির সম্পাদক ও খাজাঞ্চি ছিল কলকাতার ম্যাকলিয়ড কোম্পানি।

খোলার তারিখ :

ক. বাঁকুড়া থেকে ইন্দাস, ১৫-১২-১৯১৬

খ. ইন্দাস থেকে সেহারা বাজার (বর্ধমান জেলায়), ১-৪-১৯১৭

গ. সেহারা বাজার থেকে রায়নগর (বর্ধমান জেলায়), ৬-৬-১৯১৭। ভারত সরকার এই লাইন কোম্পানির কাছ থেকে কিনে নেয়।

নিম্নলিখিত রেলপথগুলি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের অন্তর্ভুক্ত ছিল :

১. বাংলা-নাগপুর রেলওয়ে
(বড়মাপের ৪,৩৭১ কিলোমিটার, ছোটমাপের ১,৪৮৩ কি. মি.)

২. ময়ুরভঞ্জ স্টেট রেলওয়ে
(ছোটমাপের, ১১৩.৬৮ কি.মি.)

৩. পার্লাকিমেদি লাইট রেলওয়ে
(ছোটমাপের, ৯০.৬১ কি.মি.)

৪. সাতপুরা রেলওয়ে
(ছোটমাপের, ১,০১০ কি মি.)

৫. ভুমসার রোড-তিরোদি রেলওয়ে
(আগে ছিল ছোটমাপের, এখন বড়মাপের, ৪৭ কি.মি.)

পরবর্তী কালে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের সম্প্রসারণ ঘটেছে। যেমন ঝাড়সুগুদা-সম্বলপুর লাইনকে তিতলাগড় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। আর, ওয়ালটেয়ার

থেকে কোট্টাভালসা হয়ে কিরাণ্ডুল পর্যন্ত ২৯৫ মাইল দীর্ঘ এক নতুন লাইন খোলা হয়েছে। তবে এ লাইন শুধু মালগাড়ি বহন করে।

হাওড়া স্টেশন

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা-নাগপুর বা দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের স্টেশন কোনটি? সকলেই জানেন, হাওড়া স্টেশন পূর্ব-ভারত (বর্তমানে ইস্টার্ন) ও বাংলা-নাগপুর (বর্তমানে সাউথ-ইস্টার্ন) রেলপথের যৌথ স্টেশন। এই উক্তির সপক্ষে একটি প্রমাণ দিচ্ছি। ১৭-৪-১৮৯৬ তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল তার বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হল :

হাওড়ায় যৌথ স্টেশন

> ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইংল্যাণ্ড-স্থিত ডিরেকটর বোর্ড বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের সঙ্গে যৌথভাবে হাওড়ায় যে নতুন স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব করেছে এখন তারা তার নকশা ও খরচের হিসেব খতিয়ে দেখছে।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী পরে যে নতুন বিরাট হাওড়া স্টেশন তৈরি হয়, শেষপর্যন্ত তার উত্তর অংশের ৮টি প্লাটফর্ম পূর্ব-ভারত রেলওয়ের ও দক্ষিণ অংশের ৬টি প্লাটফর্ম বাংলা-নাগপুর বা সাউথ ইস্টার্ন রেলের নিজস্ব সম্পত্তি বলে আমাদের এপর্যন্ত ধারণা ছিল। কিন্তু ১-৪-১৭৭৯ তারিখে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটি খবর বেরিয়েছে, তাতে অন্য কথা পাচ্ছি। খবরটির প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে বাংলা তর্জমা ক'রে দেওয়া হল :

> প্রিন্সেপ ঘাট থেকে হুগলি নদীর ওপর যে দ্বিতীয় পুল তৈরি হচ্ছে, সেটি সম্পূর্ণ হলে আর একটি প্রধান রেল স্টেশন তৈরি হবে। দু'টি পরিকল্পনা'কেই এমনভাবে কার্যকর করবার চেষ্টা হচ্ছে যাতে ক'রে দুটিরই [পুল ও স্টেশন — —রা. মি.]।
>
> এই স্টেশনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ তৈরি করবে, কেননা ঐ রেলের কলকাতা অঞ্চলে বর্তমানে নিজস্ব কোনো স্টেশন নেই। হাওড়া এবং শিয়ালদা, এই দুই স্টেশনেরই মালিক হচ্ছে ইস্টার্ন রেলওয়ে। সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়েকে হাওড়া স্টেশনের ১৪টি প্লাটফর্মের মধ্যে ৬টিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কর্তৃপক্ষগণ মনে করেন এই সুবিধে যথেষ্ট নয়।
>
> একটি নতুন স্টেশন ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কর্তৃপক্ষ একটি নতুন মালগুদাম তৈরি করতে চান। শালিমারে যে মালগুদাম আছে তাকে বড় করবার কোনো উপায় নেই। ক্রমবর্ধমান মাল পরিবহনের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া থেকে ১৬ কি. মি. দূরে, হাওড়া-খড়গপুর লাইনের ওপর অবস্থিত সাঁকরাইলকে এই নতুন মাল-ডিপোর

উপযুক্ত স্থান বলে পছন্দ করেছেন। এই মাল-ডিপো তৈরি করতে ২২ কোটি টাকা খরচ পড়বে বলে আন্দাজ করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় স্টেশনটি দ্বিতীয় হুগলি পুলের হাওড়া প্রান্ত থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে তৈরি হবে। তৈরি করতে খরচ পড়বে ৯½ কোটি টাকা।

পূর্ববঙ্গ রেলপথ (ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে)

পূর্ব-ভারত রেলের হাওড়া-হুগলি লাইন খোলার ৩ বছর পরে ১৮৫৭ সনে 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি' গঠিত ও রেজিস্ট্রি করা হয়। এই কোম্পানির সঙ্গে সরকারের চুক্তি হয় যে, তারা কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল রেলপথ খুলবে, আর কুষ্টিয়াতে পুল বেঁধে ঢাকা পর্যন্ত লাইন নিয়ে যাবে। তখন পদ্মা কুষ্টিয়ার ধার দিয়ে বইত। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে পদ্মা দূরে সরে যাওয়ায় পুল বাঁধা অসম্ভব হয়। অতএব কুষ্টিয়াই তখনকার মতো পূর্ববঙ্গ রেল-পথের শেষ সীমা হল। শিয়ালদা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ১৫-১১-১৮৬২ (অন্যমতে ২৯-৯-১৮৬২) তারিখে।

তখন শিয়ালদা স্টেশন বলতে মাত্র একখানি টিনের ঘর ছিল। বড় আকারে পাকা শিয়ালদার প্রধান (মেন) স্টেশন তৈরি হয় ১৮৬৯ সনে। সম্প্রতি এই স্টেশনের বাইরের দিকে খানিকটা ভেঙেচুরে অন্য ধরনের করা হয়েছে, ভেতরের দিকটা অনেকটা আগের মতোই আছে।

১৮৭১ সনে কুষ্টিয়া থেকে লাইনকে বিস্তৃত ক'রে গোয়ালন্দ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত স্টিমার সার্ভিস চালু হয়। এই স্টিমারে ক'রে ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় যাবার ব্যবস্থা হয়।

কুষ্টিয়া লাইনের পরেই 'ক্যালকাটা অ্যাণ্ড সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানি' কলকাতা থেকে পোর্ট ক্যানিং (মাতলা নদী) পর্যন্ত রেল লাইন খোলে ১৮৬২-৬৩ সনে। ১৮৫৬ সনে ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন নিয়ে এই কোম্পানি বিলেতে গঠিত হয়। এই কোম্পানির কলকাতায় এজেন্ট ছিল—ম্যাকে কোম্পানি, ঠিকানা—৩৩নং জ্যাকসন ঘাট স্ট্রিট।

পোর্ট ক্যানিং লাইন আরম্ভ হয় শিয়ালদার পাশের স্টেশন বেলেঘাটা থেকে। বেলেঘাটা স্টেশন এখনো রয়েছে। ১-৪-১৮৮৭ তারিখের আগে পর্যন্ত বেলেঘাটা স্টেশন কলকাতা ও সাউথ-ইস্টার্ন রেলের স্টেশন ছিল। ঐ তারিখ থেকে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের স্টেশন হয়।

বেলেঘাটা থেকে সোনারপুর পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ২-১-১৮৬২ তারিখে। ঐ একই তারিখে সোনারপুর থেকে চম্পাহাটি পর্যন্ত লাইন খোলা হয়। চম্পা-হাটি থেকে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত খোলা হয় ১৫-৫-১৮৬৩ তারিখে। কিন্তু কোম্পানি বেশিদিন রেল চালাতে পারল না। তার লোকসান হতে লাগল।

কোম্পানি গভর্নমেণ্টকে লাইন বিক্রি ক'রে দিল ১৮৬৩ সনেই। ভারতবর্ষে ক্যানিং লাইনই হচ্ছে সর্বপ্রথম সরকার-পরিচালিত (স্টেট) লাইন।

১৮৬২-৬৩ সনের পর ২০ বছর আর রেলপথ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয় নি। ১৮৮২-৮৩ সনে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি ডায়মণ্ড হারবার লাইন খোলে। সোনারপুর থেকে বারুইপুর পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ১০-৬-১৮৮২ তারিখে, বারুইপুর থেকে মগরাহাট পর্যন্ত ১০-৬-১৮৮২ তারিখে, মগরাহাট থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত ২৫-৪-১৮৮৩ তারিখে।

এতদিন পর্যন্ত বেলেঘাটা পোর্ট ক্যানিং লাইনের নাম ছিল কলকাতা ও সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে। ১-৭-১৮৮৪ তারিখে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে সরকারের দখলে আসে। ১৮৮৭ সনের সনের ১ এপ্রিল তারিখ থেকে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের নাম হয়—ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে। সেদিন থেকে ক্যালকাটা ও সাউথ-ইস্টার্ন স্টেট রেলওয়ের। নাম ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। এই রেলওয়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

বালিগঞ্জ থেকে বজবজ পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ১-৫-১৮৯০ তারিখে। বারুইপুর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর পযন্ত লাইন খোলা হয় ১৫-১২-১৯২৮ তারিখে।

পূর্ববঙ্গ রেলপথের মধ্য অংশ (Central section) খোলার তারিখ :

ক. দমদম জংশন থেকে দত্তপুকুর, ২-৪-১৮৮২

খ. দত্তপুকুর থেকে গোবরডাঙা, ৭-১২-১৮৮৩

গ. গোবরডাঙা থেকে বনগাঁ, ২২-৪-১৮৮৪

ঘ. রানাঘাট থেকে বনগাঁ, ১৬-১০-১৮৮২

শান্তিপুর শাখা :

ঙ. চুর্নি নদীর পুল থেকে শান্তিপুর, ৩১-৫-১৯২৫

চিৎপুর অংশ :

চ. দমদম জংশন থেকে চিৎপুর লেভেল ক্রসিং, ১০-১২-১৯১৩

মুর্শিদাবাদ লাইন :

ছ. রানাঘাট থেকে ভগবানগোলা, ১-৯-১৯০৫

জ. ভগবানগোলা থেকে কৃষ্ণপুর, ১০-১১-১৯০৫

ঝ. কৃষ্ণপুর থেকে লালগোলাঘাট (নসিপুর রোড-সমেত), ১৫-৭-১৯০৭

নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে

১৮৭৫-৭৬ সনে উত্তরবঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সরকার এই রেলপথ খোলেন। পূর্ববঙ্গ রেলের পোড়াদা স্টেশন থেকে আরম্ভ হয়ে এই লাইন জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যায়। মধ্যে একটা বড় ফাঁক ছিল—সেখানে স্টিমারে চেপে গঙ্গা পার হতে হতো। বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল ১৮৭৭ সনে

বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেবার আগে সারা (বা সাঁড়া) থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত এই রেলে চড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। সরকারিভাবে এই রেলের উদ্বোধন হয় ১৮৭৮ সনের জানুয়ারি মাসে। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ১৮৭৮ সনের নভেম্বর মাসে।

২-৭-১৮৭৮ তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়। এখানে তার তর্জমা ক'রে দেওয়া হল :

নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের জন্য কতকগুলি এদেশীয় স্টেশন মাস্টার, গুডস ক্লার্ক ও মর্স সিগন্যালার আবশ্যক। সার্টিফিকেটের নকল-সমেত সৈয়দপুরে ট্রাফিক সুপারিনটেন্‌ডেন্টের কাছে দরখাস্ত করুন।

জি. এম. ড্রুরি
ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট।

ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্টের অফিস। সৈয়দপুর, ৭ জুন, ১৮৭৮

সৈয়দপুর পার্বতীপুরের উত্তরে। এখানেই উত্তরবঙ্গ সরকারি রেলপথের প্রধান কার্যালয় ছিল।

প্রথমে লাইন পাতা হয় মাঝারি মাপের। পরে সান্তাহার পর্যন্ত লাইন বড় মাপের করা হয়। এর উত্তর অংশে শিলিগুড়ি পর্যন্ত মাঝারি মাপের লাইন বহুদিন ছিল। শেষে এই অংশকেও বড় মাপের লাইনে পরিবর্তিত করা হয়। পার্বতীপুর থেকে বাঁদিকে দিনাজপুর ও ডানদিকে রংপুর হয়ে কৌনিয়া পর্যন্ত লাইন প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত ছিল মাঝারি মাপের। স্টিমারে চড়ে গঙ্গাপার হওয়ার হাঙ্গামা দূর করা হয় ১৯১৫ সনে সাঁড়ায় বিখ্যাত হার্ডিং পুল তৈরি ক'রে। এই পুল তৈরি হবার পর থেকে দার্জিলিং মেল শিয়ালদা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত সরাসরি যাতায়াত করতে থাকে।

শেষপর্যন্ত ২৪-পরগনা, খুলনা, ফরিদপুর, যশোর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর,-রংপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদা, পূর্ণিয়া (বিহার) কুচবিহার, ময়মনসিং, ঢাকা, গোয়ালপাড়া (আসাম) দরং (আসাম) ও কামরূপ (আসাম)—এই ২১টি জেলার ভেতর দিয়ে পূর্ববঙ্গ রেল চলত। কলকাতা থেকে বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও আসামের শ্রীহট্ট, শিলচর ও গারো পাহাড় যেতে হলে ই. বি. রেল ব্যবহার করতে হতো।

পরে দিনাজপুর-রুহিয়া লাইন, পূর্নিয়া-মুরলীগঞ্জ লাইন, আবদুলপুর-নবাবগঞ্জ লাইন, কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া লাইন ও আসামে ট্যাংলা-রাঙ্গাপাড়া শাখা লাইন খোলা হয়।

১৯৪০ পর্যন্ত ই. বি. রেলওয়ে বাংলা, আসাম ও বিহার প্রদেশে ৩,০৭৮ মাইলের কিছু বেশি বিস্তৃত ছিল। তার মধ্যে বড়মাপের লাইন ছিল ১,৭১৭ মাইল, মাঝারি মাপের ১,৩৪৩ মাইল ও ছোটমাপের ৪০ মাইল। মোট স্টেশনের

সংখ্যা ছিল ৪৬১।

উল্লিখিত লাইনগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বড়মাপের লাইন ছিল :

ক. কলকাতা-ক্যানিং, কলকাতা-বজবজ,
খ. কলকাতা-ডায়মণ্ড হারবার, কলকাতা-লক্ষ্মীকান্তপুর,
গ. কলকাতা-রানাঘাট,
ঘ. রানাঘাট-মুর্শিদাবাদ-লালগোলাঘাট,
ঙ. রানাঘাট-পোড়াদহ-কুষ্টিয়া,
চ. কুষ্টিয়া-কালুখালি,
ছ. কালুখালি ভাটিয়াপাড়া
জ. কালুখালি-গোয়ালন্দ,
ঝ. কালুখালি-ফরিদপুর,
ঞ. পোড়াদহ-ঈশ্বরদি-সিরাজগঞ্জঘাট,
ট. ঈশ্বরদি-আবদুলপুর,
ঠ আবদুলপুর-আমানুরা-নবাবগঞ্জ,
ড. আবদুলপুর-নাটোর-সান্তাহার-পার্বতীপুর-সৈয়দপুর-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি,
ঢ. দমদম-বারাসত,
ণ. গোবরডাঙ্গা-বনগাঁ-যশোহর-খুলনা.
ত. রানাঘাট-বনগাঁ।

মাঝারি মাপের লাইন ছিল এইগুলি :

ক. মনিহারিঘাট-কাটিহার-পূর্ণিয়া-যোগবনী,
খ. পূর্ণিয়া-বাণমানখি মুরলীগঞ্জ,
গ. বাণমানখি-বিহারীগঞ্জ,
ঘ. কাটিহার-বারসোই-কিষণগঞ্জ,
ঙ. বারসোই-দিনাজপুর-পার্বতীপুর,
চ. দিনাজপুর-রুহিয়া,
ছ. পার্বতীপুর-রংপুর কাউনিয়া,
জ. সান্তাহার-বোনারপাড়া-ফুলছড়ি,
ঝ. বোনারপাড়া-গাইবাঁধা-কাউনিয়া,
ঞ. কাউনিয়া-কুড়িগ্রাম,
ট. কাউনিয়া-লালমনিরহাট-গিতালদহ-গোলকগঞ্জ-ধুবড়িঘাট,
ঠ. গিতালদহ-কুচবিহার-রাজাভাতখাওয়া,
ড. রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী,
ঢ. রাজাভাতখাওয়া-ডালসিং পাড়া,

ণ. গোলকগঞ্জ-বড়পেটা রোড-রঙ্গিয়া,

ত. রঙ্গিয়া-আমিনগাঁও,

থ. রঙ্গিয়া-রাঙ্গাপাড়া নর্থ,

দ. নারায়ণগঞ্জ-ময়মনসিং-সিংজানি,

ধ. সিংজানি-জগন্নাথগঞ্জ,

ন. সিংজানি-বাহাদুরাবাদ ঘাট।

১-৭-১৮৮৪ তারিখে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে সরকার গ্রহণ করেন। পরের বছর (১৮৮৫ সনে) সরকার নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা হয়ে ময়মনসিং পর্যন্ত একটি মাঝারি মাপের লাইন খোলেন। ১৮৮৭ সনের ১ এপ্রিল তারিখে (মতান্তরে ১-৭-১৮৮৪ তারিখে) এই ঢাকা-ময়মনসিং স্টেট রেলওয়ে, নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে ও ক্যালকাটা অ্যাণ্ড সাউথ-ইস্টার্ন স্টেট রেলওয়ে—এই ৩টি স্টেট রেলওয়ে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে' নামে পরিচিত হয়। ১৯১৫ সনে 'স্টেট' কথাটি বাদ দেওয়া হয়।

৩১-১২-১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এই খবর বেরিয়েছিল :

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের বারাসত ও যশোহর শাখা আরম্ভ হইবার আর বড় অধিক বিলম্ব দেখা যাইতেছে না। গেজেটে দৃষ্ট হইল লেপটানণ্ট গভরনর দমদমার অন্তর্গত পঞ্চান্ন গ্রামের কতক ভূমি ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এই ভূমিতে একটি বৃহৎ স্টেশন এবং এই স্থান হইতে শাখা বহির্গত হইবে।

কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি, দমদম জংশন থেকে বনগাঁ পর্যন্ত যশোর শাখা খুলতে লাগে ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ সন।

১৫-৪-১৮৯৭ তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এই খবর বেরিয়েছিল। এখানে তার তর্জমা দেওয়া হল :

বাংলাদেশে নূতন রেলপথ।

ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের রাজবাড়ি-ফরিদপুর শাখা তৈরির কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে। অন্যদিকে রংপুর-ধুবড়ি লাইন যা গঙ্গার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও আসামের মধ্যে যে সুদূরপ্রসারী মাঝারি মাপের রেলগুচ্ছের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী অংশ, তার কাজ এখনো সমীক্ষার স্তর পার হয়ে অগ্রসর হয় নি।

১০-৭-১৮৯৭ তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা লিখেছিল (তর্জমা দেওয়া হল) :

আমরা রানাঘাট-কৃষ্ণনগর ট্রামওয়ে পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই। এই পরিকল্পনা কার্যকর করবার জন্য একটি সীমাবদ্ধ দায়িত্বসম্পন্ন (লিমিটেড লায়েবিলিটি) কোম্পানি সম্প্রতি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। এই কোম্পানির মূলধন ৭ লক্ষ টাকা। এখন জনসাধারণকে ডাকা হচ্ছে এই মূলধনের অংশ (শেয়ার)

কেনবার জন্য। প্রস্তাবিত বাষ্পীয় ট্রামওয়ে কিংবা লাইট রেলওয়ে নদীয়া জেলার প্রধান শহর কৃষ্ণনগরকে পূর্ববঙ্গ রেলপথে অবস্থিত রানাঘাটের সঙ্গে যুক্ত করবে শান্তিপুর হয়ে। কৃষ্ণনগরের কোনো রেলপথের সঙ্গেই যোগ নেই।

পরে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ২৭.৫ কিলোমিটার লম্বা ছোটমাপের শান্তিপুর-নবদ্বীপঘাট শাখা লাইন খুলে শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরকে যোগ করে। এই লাইন খোলা হয় ৫-৪-১৮৯৯ তারিখে। তখনো রানাঘাটের সঙ্গে শান্তিপুরের যোগ হয় নি।

কৃষ্ণকুমার মিত্র 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন : "তখন [১৮৭১ সনের জানুয়ারি মাসে—রা. মি.] ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েতে চারিটি শ্রেণী ছিল। চতুর্থ শ্রেণীতে বসিবার বেঞ্চ ছিল না। লোকে বিছানা পাতিয়া বসিত। সে গাড়িতে বসিয়া থাকিলে বাহিরের কিছুই দেখা যাইত না।"

পূর্ববঙ্গ রেলপথের কতকগুলি লাইন ও শাখা লাইন খোলবার তারিখ আগেই দিয়েছি। এখন আরো কতকগুলি লাইনের তারিখ দিচ্ছি।

ক. কৌনিয়া জংশন থেকে গিতালদহ জংশন, ২-১-১৯০২

খ. গিতালদহ জংশন থেকে বামনহাট, ২৩-৯-১৯০২

গ. বামনহাট থেকে গোলকগঞ্জ জংশন, ২৩-৯-১৯০২

ঘ. গোলকগঞ্জ জংশন থেকে কোকড়াঝাড় (আসাম), ১-২-১৯০৬

ঙ. কোকড়াঝাড় থেকে সরভোগ (আসাম), ১-৩-১৯০৯

চ. সরভোগ থেকে আমিনগাঁও (আসাম, ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে), ১-৪-১৯০৯

জয়ন্তী শাখা :

ছ. কালজানি নদীর দক্ষিণতীর থেকে আলিপুরদুয়ার, ১৮-১-১৯০০

জ. আলিপুরদুয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়া, ৫-৪-১৯০০

ঝ. রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী, ১-২-১৯০১

ডালসিংপাড়া শাখা :

ঞ. রাজাভাতখাওয়া থেকে কালচিনি, ১-৪-১৯১২

ট. কালচিনি থেকে হাসিমারা, ১-৪-১৯১৩

ঠ. হাসিমারা থেকে ডালসিংপাড়া, ৫-১-১৯১৪

ধুবড়ি শাখা :

ড. গোলকগঞ্জ থেকে ধুবড়ি (আসাম), ২৩-৯-১৯০২

ঢ. রঙ্গিয়া থেকে ট্যাংলা (আসাম), ১-৩-১৯১২

ণ. ট্যাংলা-বেলসির-রাঙাপাড়া নর্থ শাখা :

ত. ট্যাংলা থেকে মাজভাত, ১-২-১৯৩২

থ. মাজভাত থেকে রাঙাপাড়া নর্থ, ৭-২-১৯৩৩

দ. মনিহারিঘাট থেকে কাটিহার জংশন, (বিহার), ১-৪-১৮৮৭

ধ. কাটিহার জংশন থেকে বারসোই জংশন (বিহার), ১-৭-১৮৮৯

ন বারসোই জংশন থেকে কিষণগঞ্জ (বিহার), ১৫-১২-১৮৯২

প. বারসোই জংশন থেকে রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর), ১-৭-১৮৮৯

ফ. রায়গঞ্জ থেকে দিনাজপুর (বাংলাদেশ), ১৫-২-১৮৮৮

কোশী শাখা (বিহার) :

ব. কাটিহার থেকে কসবা, ১-৪-১৮৮৭

ভ. কসবা থেকে ফরবেশগঞ্জ, ১- -১৮৮৯

ম. ফরবেশগঞ্জ থেকে যোগবনী, ১৫-২-১৯০৯

মুরলীগঞ্জ ও বিহারীগঞ্জ শাখা (বিহার) :

য. পূর্নিয়া থেকে মুরলীগঞ্জ, ২০-৩-১৯২৯

র. বানমান্‌খি থেকে বিহারীগঞ্জ, ১-৮-১৯২৯

পূর্ববঙ্গ রেলপথের কথা মোটামুটি বলা হল। এরপর আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কথা বলা দরকার।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে

সরকারি রেলপথ হিসাবে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের নির্মাণ গভর্নমেণ্ট মঞ্জুর করেন ১৮৯১ সনের মে মাসে। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ সনে। ইত্যবসরে সরকার আসামে যে সমস্ত কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন সেগুলিকে এই কোম্পানি নিজের হাতে নেয় ১-৭-১৮৯৫ তারিখে। কোম্পানি অধুনালুপ্ত নোয়াখালি (বেঙ্গল) রেলওয়েকে চালায় ১৯০৫ সনের শেষ পর্যন্ত। সরকার নোয়াখালি (বেঙ্গল) রেলওয়ে কিনে নিয়ে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেন ১-১-১৯০৬ তারিখ থেকে। এরপর আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানির কাছ থেকে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েকে সরকার নিয়ে নেন ৩১-১২-১৯৪১ তারিখে এবং ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেন ১-১-১৯৪২ তারিখে। আর, এই তারিখ থেকে এই যুক্ত রেলপথের নাম রাখা হয় প্রথমে বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে, তারপর বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে।

১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে দেশ ভাগাভাগি হলে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়েও ভাগাভাগি হয় ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সীমানা অনুসারে। তার ফলে ১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে আসাম রেলওয়ের জন্ম হয়। অর্থাৎ বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের সেইসব অংশ, যেগুলি ভারত ইউনিয়নের মধ্যে পড়ল সেইগুলিকে নিয়ে আসাম রেলওয়ে হল, দু'টি অংশ বাদে। সে দু'টি অংশ হল বেঙ্গল-

আসাম রেলের শিয়ালদহ বিভাগ ও কাটিহার বিভাগ। শিয়ালদহ বিভাগকে দিয়ে দেওয়া হল ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েকে, এবং কাটিহার বিভাগ আউধ ও তিরহুত রেলওয়েকে।

আসাম রেলওয়ে

উক্ত ১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের বড় অংশটাই পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগে পড়ল। আর, আসাম প্রদেশের মধ্যে আগে থাকতে যে সমস্ত রেলপথ ছিল সেগুলিকে নিয়ে হল আসাম রেলওয়ে। কিন্তু জন্মলগ্নেই আসাম প্রদেশ পূর্ব-পাকিস্তান দ্বারা অবশিষ্ট ভারতরাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কোনো পথ দিয়েই ভারতরাষ্ট্র থেকে নিজস্ব জমির উপর দিয়ে আসামে পৌছবার উপায় রইল না। সুতরাং সকলের আগে প্রয়োজন হল রেলপথে বাকি ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে আসামের যোগস্থাপনা করা ভারতের নিজস্ব জমির উপর দিয়ে।

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আসাম রেল সংযোগ প্রকল্প (Assam Rail Link Project) উদ্ভাবিত হল। এই প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে এবং কাজ শেষ হয় ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। এই প্রকল্পের দৈর্ঘ্য মোট ১৪৩ মাইল। প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে মোট ২ বছর লাগে। ১৯৫০ সনের প্রথম থেকে ভারত ও আসামের মধ্যে বিচ্ছিন্ন রেল সংযোগ পুনঃস্থাপিত হয়।

এই প্রকল্পের কাজ বুঝতে হলে আরো ২টি রেলওয়ে সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। একটি হচ্ছে দার্জিলিং-হিমালয় রেলওয়ে, আর দ্বিতীয়টি বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে।

দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ১৮৭৯ সনে। ছোটমাপের লাইন, দৈর্ঘ্য ৮২.১৯ কিলোমিটার (৫১ মাইল)। ম্যানেজিং এজেন্টস্—কলকাতার গিল্যাণ্ডার্স আরবুথনট কোম্পানি লিমিটেড।

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের এজেন্ট ফ্র্যাংকলিন প্রেস্টেজ (Frankline Prestage) এই রেলের পরিকল্পনা তৈরি করেন ও দু'বছরের মধ্যে কাজ শেষ করেন। এই রেললাইন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭ হাজার ফিট উঁচুতে উঠেছে। কালকা-সিমলা রেলপথে অনেক সুড়ঙ্গ আছে। কিন্তু দার্জিলিং-এর পথে একটিও সুড়ঙ্গ নেই। কোথাও কোথাও লাইন এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে এসেছে (reverse), আবার কোথাও কোথাও চক্রাকারে ঘুরে গেছে (loop)। এই দুই কৌশল প্রয়োগ ক'রে লাইন নিচে থেকে ক্রমাগত উপরে উঠেছে সুড়ঙ্গ না ক'রে।

লাইন খোলার তারিখ :

ক. শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং, ২৮-৮-১৮৮০

খ. কার্শিয়াং থেকে সোনাদা, ১-২-১৮৮১

গ. সোনাদা থেকে ঘুম, ৪-৪-১৮৮১
ঘ. ঘুম থেকে দার্জিলিং, ৪-৭-১৮৮১
ঙ. দার্জিলিং থেকে দার্জিলিং বাজার, ১৬-৬-১৮৮৫

দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলের সম্প্রসারণ

দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে এক্সটেনশন কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ২০-১-১৯১৩ তারিখে। ম্যানেজিং এজেন্টস্—গিল্যাণ্ডার্স আরবুথনট কোম্পানি লিঃ, কলকাতা। রেলওয়ে বোর্ড এই লাইন তৈরি করার অনুমতি দেন ৬-২-১৯১৩ তারিখে।

উক্ত সম্প্রসারিত অংশে আছে ২টি শাখা—কিষণগঞ্জ শাখা, ও তিস্তা উপত্যকা শাখা।

১. কিষণগঞ্জ শাখা (ছোটমাপের), ১০৬'৭৮ কি. মি.
লাইন খোলার তারিখ :
ক. পঞ্চনই থেকে মাটিগড়া, ৬-৩-১৯১৪
খ. মাটিগড়া থেকে নকশালবাড়ি, ১-২-১৯১৫
গ. নকশালবাড়ি থেকে তলবপুর, ৬-৫-১৯১৫
ঘ. তলবপুর থেকে ইসলামপুর-আলুয়াবাড়ি, ১-১১-১৯১৪
ঙ. ইসলামপুর-আলুয়াবাড়ি থেকে কিষণগঞ্জ, ১৫-৬-১৯১৪

২. তিস্তা উপত্যকা শাখা (ছোটমাপের), ৪৬ ৮১ কি. মি.
লাইন খোলার তারিখ :
চ. শিলিগুড়ি থেকে শিভোক, ১৬-৩-১৯১৪
ছ. শিভোক থেকে রিয়াং, ১-৫-১৯১৫
জ. রিয়াং থেকে গিয়েলখোলা, ২১-৯-১৯১৫

ভারত সরকার ২০-১০-১৯৪৮ তারিখে এই দুই সম্প্রসারিত অংশ-সমেত সমস্ত দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়েকে কিনে নেন কিনে নেবার কারণ ছিল এই রেল-পথের অংশবিশেষকে ছোটমাপ থেকে মাঝারি মাপে পরিবর্তিত করা, যাতে ক'রে নিজস্ব মাটির উপর দিয়ে আসামের সঙ্গে ভারতের রেল সংযোগ স্থাপন করা যায়। তখন পর্যন্ত আসাম রেলপথের অধিকাংশই ছিল মাঝারি মাপের লাইন।

বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে

এবার বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। এটি মাঝারি মাপের রেলপথ। ছিল বাংলা প্রদেশের মাত্র জলপাইগুড়ি জেলায়। ঐ রেলপথ তৈরি করা হয় প্রধানত ডুয়ার্সের চা-শিল্পের উন্নতির জন্যে। এই রেলওয়েকে গভর্নমেণ্ট

কিনে নিয়েই ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেন ১-১-১৯৪১ তারিখে। তখন থেকে বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ের নাম হল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে।

বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলের প্রধান লাইন (খোলার তারিখ) :

ক. তিস্তানদীর পূর্বতীর (বার্নেসঘাট) থেকে দোমোহানী, ১৫-১-১৮৯৩

খ. দোমোহানী থেকে ডামডিম, ১৫-১-১৮৯৩

শাখা লাইন খোলার তারিখ :

গ. লাটাগুড়ি জংশন থেকে রামশাহী, ১১-৬-১৮৯৩

ঘ. মাল জংশম থেকে চালসা জংশন, ১-৪-১৯০১

ঙ. চালসা জংশন থেকে চেংমারি, ১-১-১৯০৩

চ. চেংমারি থেকে ডালগাঁও, ২৫-৩-১৯০৩

ছ. ডালগাঁও থেকে মাদারিহাট, ১৪-৬-১৯০৯

জ. চালসা জংশন থেকে মেটেলি, ১০-৬-১৯১৮

ঝ. বার্নেস জংশন থেকে চাংড়াবান্ধা, ২০-৪-১৯০০

ঞ. ডামডিম থেকে ওদলাবাড়ি, ১-৫-১৯০১

ট. ওদলাবাড়ি থেকে বাগরাকোট, ১-১-১৯০২

আসাম লিংক প্রকল্প

যদিও ১-১-১৯৪১ তারিখে বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে কোম্পানি ও ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে যুক্ত হল, কিন্তু তাদের রেলপথ যুক্ত হল না। বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলের মাদারিহাট স্টেশন ও ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের হাসিমারা স্টেশন (এ দু'টিই দু'টি রেলের পরস্পর নিকটতম স্টেশ ')—এই দুই স্টেশনের মধ্যে একটা বড় রকমের ফাঁক থেকে গেল।

এখন আসাম রেল সংযোগ প্রকল্প এই ?'টি কাজ করল :

ক. দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথের কিষণগঞ্জ থেকে মাটিগড়া পর্যন্ত ও মাটিগড়া থেকে শিলিগুড়ি টাউন পর্যন্ত ছোট মাপের অংশ থেকে মাঝারি মাপে পরিবর্তিত করল, যাতে মাঝারি মাপের লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন যেতে পারে। আসাম রেল সংযোগ প্রকল্প মাটিগড়া থেকে পঞ্চনই পর্যন্ত ছোট মাপের লাইনকে তুলে দিল। কিষণগঞ্জ থেকে নকশালবাড়ি পর্যন্ত অংশ খোলা হয় ৩১-৭-১৯৪৮ তারিখে, আর নকশালবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি টাউন পর্যন্ত অংশ ৯-১২-১৯৪৯ তারিখে। এই নতুন লাইনের পরিচালনার ভার আসাম রেলওয়ে নিজের হাতে তুলে নিল ২৪-১২-১৯৪৯ তারিখ থেকে।

খ. ছোট মাপের দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের শিলিগুড়ি থেকে জিয়েল-খোলা পর্যন্ত ৪৬·৮১ কি. মি. দীর্ঘ তিস্তা উপত্যকা অংশ ১৯৫০ সনের জুন মাসের ভীষণ বন্যায় একেবারে বিধ্বস্ত হয়। সুতরাং এই অংশটি পরিত্যক্ত হল। পরে

শিলিগুড়ি নর্থ থেকে শিভোক পর্যন্ত মাঝারি মাপের লাইন পাতা হয়।

গ. শিভোক থেকে পূর্বদিকে মাঝারি মাপের রেললাইন পেতে বাগড়াকোট পর্যন্ত নিয়ে গেল। এতে ক'রে শিভোক ও বাগড়াকোটের মধ্যে রেল-সংযোগ স্থাপিত হল। আগে শিভোক ও বাগড়াকোটের মধ্যে রেল-সংযোগ ছিল না।

ঘ. তারপর সাবেক ই. বি. রেলের রাজাভাতখাওয়া স্টেশন থেকে ডালসিং-পাড়া লাইনের হাসিমারা স্টেশনের সঙ্গে পূর্ববর্তী বেঙ্গল ডুয়ার্স লাইনের মাদারি-হাট স্টেশনকে এক মাঝারি মাপের লাইন তৈরি ক'রে জুড়ে দেওয়া হল।

ঙ. হাসিমারা থেকে ই. বি. রেলের মাঝারি মাপের লাইন কালচিনি, রাজা-ভাতখাওয়া, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দিনহাটা হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান সীমান্তে গিতালদহ জংশন পর্যন্ত আগে থাকতেই ছিল। এখন এই লাইনে আলিপুরদুয়ারের ঠিক উত্তরে একটি নতুন স্টেশন তৈরি করা হল। তার নাম দেওরা হল আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন। এই আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে এক মাঝারি মাপের একেবারে নতুন লাইন পেতে পূর্বদিকে নিয়ে গিয়ে আসাম রেলের (আগেকার ই. বি. রেলের) গোলকগঞ্জ-আমিনগাঁও লাইনের ফকিরা-গ্রাম স্টেশনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

এই হল আসাম লিংক রেললাইন, পশ্চিমে বিহারের কিষণগঞ্জ স্টেশন থেকে পূর্বে আসামের ফকিরাগ্রাম স্টেশন পর্যন্ত। এই লাইন হবার পর আসামের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃস্থাপিত হল ভারতের নিজের মাটির উপর দিয়ে। এই ১৪৩ মাইলব্যাপী লাইনে তিস্তা, তোর্সা, সঙ্কোশ নিয়ে মোট ২২টি নদী পড়ে। এই ২২টি নদীর ওপর খুব শক্ত পুল বাঁধতে হয়েছে।

এই আসাম রেল লিংক তৈরি হবার পর ৯-১২-১৯৪৯ তারিখে আসাম রেলওয়ে এটিকে নিজের হাতে নিয়ে নেয়।

দুই সম্প্রসারিত শাখা-সমেত গোটা দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়েকে ভারত সরকার ২০-১০-১৯৪৮ তারিখে কিনে নেন, সেকথা আগেই বলেছি। এই রেল-ওয়েকে আসাম রেলওয়ে ২৪-১২-১৯৪৯ তারিখে নিজের হাতে নিয়েছে।

যে কাটিহার বিভাগ দেশ ভাগাভাগির পূর্বে আগেকার বেঙ্গল-আসাম রেলের সম্পত্তি ছিল এবং যা ১৫-৮-১৯৪৭ তারিখে আউধ-তিরহুত রেলওয়েকে দিয়ে দেওয়া হয়, সেই কাটিহার বিভাগকে ২৬-১২-১৯৪৯ তারিখে আউধ-তিরহুত রেলের কাছ থেকে নিয়ে আসাম রেলকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ রেলপথের চিলাহাটি স্টেশন ও পশ্চিমবঙ্গের হলদি-বাড়ি স্টেশন—এই দুই স্টেশনের প্রায় মাঝামাঝি পড়েছিল ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত। এই সীমান্ত থেকে শিলিগুড়ি টাউন পর্যন্ত ছিল বড়মাপের লাইন। ৬২·১৭ কি.মি. দীর্ঘ এই লাইন দিয়েই শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেল শিলিগুড়ি যেত ভারত ভাগের আগে। রেলপথের এই অংশটা বেঙ্গল-আসাম রেলের সম্পত্তি

ছিল। দেশ ভাগাভাগির পর সমস্যা দাঁড়ালো এই বড়মাপের লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত কেমন ক'রে নিয়ে যাওয়া যাবে। কারণ, আসাম রেলে এইটুকুই তো মাত্র বড়মাপের লাইন, আশেপাশে আর সবই মাঝারি মাপের লাইন। তাই নিরুপায় হয়ে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই এই অংশটুকু পরিচালনার ভার পাকিস্তানের ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের হাতে দেওয়া হল। প্রায় আড়াই বছর পরে ২০-১-১৯৫০ তারিখে আসাম রেলওয়ে পাকিস্তান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এর পরিচালনার দায়িত্ব আবার নিজের হাতে নিল। নিয়েই আসাম রেল লিংক প্রোজেক্ট-এর হাতে দিল বড়মাপের লাইনকে মাঝারি মাপের লাইনে পরিবর্তিত করার দায়িত্ব। শিলিগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত ৫৮·৭১ কি. মি. লাইনকে মাঝারি মাপের লাইনে পরিবর্তিত করা হল ২৬-১-১৯৫৫ তারিখে। হলদিবাড়ি থেকে পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) সীমান্ত পর্যন্ত ৩·৪৬ কি. মি. লাইন বড়মাপের রয়ে গেল।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তা সবই কিন্তু ১৯৫২ সনের ১৪ এপ্রিল তারিখের আগের কথা। আগেই বলা হয়েছে এবং এখানে আবার বলা দরকার যে ঐ ১৪-৪-১৯৫২ তারিখে তখন পর্যন্ত উত্তর ও পূব-ভারতে যে সমস্ত রেলপথের অস্তিত্ব ছিল তাদের আঞ্চলিক রেলওয়ে হিসেবে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। তার ফলে ঐ তারিখে ৩টি রেলপথের জন্ম হয়। যথা, ১. নর্দার্ন রেলওয়ে, ২. ইস্টার্ন রেলওয়ে, ৩ নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে। নর্দার্ন রেলওয়ের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইস্টার্ন রেলওয়ের কথা আগেই দু'বার বলা হয়েছে—একবার ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়বার বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে প্রসঙ্গে। বাকি রইল নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে। এখন এই রেলওয়ের কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

নর্থ-ইস্টার্ন রেলের উদ্ভব হয় দু'টি রেলওয়েকে এক ক'রে—আউধ-তিরহুত রেলওয়ে ও আসাম রেলওয়ে। আসাম রেলওয়ের কথা এতক্ষণ বলা হল।

আউধ-তিরহুত রেলওয়ের জন্ম হয় এই ক'টি রেলওয়েকে যুক্ত ক'রে :

ক. বেঙ্গল ও নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে—মাঝারি মাপের, দৈর্ঘ্য ২১৯৫·৫৩ কিলোমিটার। এই রেলপথ খোলা হয়, ১-১১-১৮৭২ তারিখে।

খ. রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলওয়ে, মাঝারি মাপের, দৈর্ঘ্য ৪.৬ ৩১ কি.মি.।

গ. মশরক-থাওয়ে সম্প্রসারিত শাখা, মাঝারি মাপের, দৈর্ঘ্য ৬৩.২৮ কি. মি.।

ঘ. লখনৌ-বেরিলি রেলওয়ে, মাঝারি মাপের, দৈর্ঘ্য ৫০০·৭৬ কি. মি.।

মশরক-থাওয়ে সম্প্রসারিত শাখা পূর্বে সরকারের তরফে বেঙ্গল ও নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত হতো। সেইরকম লখনৌ-বেরিলি রেলওয়ে পূর্বে সরকারের তরফে রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলওয়ে কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হতো।

ঙ. তিরহুত রেলওয়ে, মাঝারি মাপের, দৈর্ঘ ১২৬১'১৬ কি.মি.।

আগেকার ইস্ট-ইণ্ডিয়ান (এখনকার ইস্টার্ন) রেলওয়ের মোকামা জংশন ও বখতিয়ারপুর জংশনের মাঝামাঝি বাঢ় (Barh) নামে একটি স্টেশন আছে। সেই স্টেশন থেকে একটি রেললাইন বরিয়ে অল্প উত্তরে গঙ্গার দক্ষিণতীর পর্যন্ত গিয়ে একটি ফেরি স্টিমারে গঙ্গাপার হয়ে গঙ্গার উত্তর তীর থেকে ৫২ মাইল দূরে মোজাফ্‌ফরপুর পর্যন্ত যেত, আবার মোজাফ্‌ফরপুর থেকে আরেকটি শাখা লাইন ২৩ মাইল দূরে দ্বারভাঙা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হতো। এই ছিল সাবেক তিরহুত রেলওয়ে, যা ১৮৭৭ সনের আগে তৈরি হয়।

বেঙ্গল ও নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানির এবং রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলওয়ে কোম্পানির লাইন গভর্নমেণ্ট নিজের হাতে নিয়ে নেন ১-১-১৯৪৩ তারিখে। তারপর গভর্নমেণ্ট তিরহুত রেলওয়ে, মশরক-থাওয়ে শাখা ও লখনৌ-বেরিলি রেলওয়ে—এই তিনটি রেলওয়েকে ঐদিনেই বেঙ্গল ও নর্থ-ওয়েস্টার্ন এবং রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রে একটিমাত্র স্টেট রেলওয়ে গঠন করেন এবং তার নাম দেন আউধ এবং তিরহুত রেলওয়ে। পরে এই নামটি আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ায়, আউধ-তিরহুত রেলওয়ে।

এই আউধ-তিরহুত রেলওয়ে ও আসাম রেলওয়েকে এক ক'রে ১৪-৪-১৯৫২ তারিখে সৃষ্টি হয় নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে।

এই রেলপথ আগাগোড়াই মাঝারি মাপের। এর প্রধান কার্যালয় উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর শহরে। গঙ্গার উত্তরে উত্তরপ্রদেশের অনেকখানি জুড়ে, উত্তর-বিহারের প্রায় সবটা ও আসামের সবটা জুড়ে এই রেলপথ বিস্তৃত হয়েছে। পশ্চিম প্রান্তে আগ্রা ফোর্ট স্টেশন থেকে পূর্বপ্রান্তে আসামের তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, সৈদিয়া, ডিগবয়, মার্ঘারিটা, লেডো, লেখাপানি পর্যন্ত এই রেলপথের বিস্তার। এই রেলওয়ের অন্তর্গত কতকগুলি লাইনের উল্লেখ এখানে করা হল :

ক. আগ্রাফোর্ট-লখনৌ-কাটিহার,

খ. কাঠগোদাম-কাশগঞ্জ,

গ. জয়নগর-দ্বারভাঙ্গা,

ঘ. লখনৌ-বেরিলি,

ঙ. নারকটিয়াগঞ্জ-বেরিলি,

চ. ভাটনি-ঔনরিহার-এলাহাবাদ সিটি,

ছ. মোরাদাবাদ-রামনগর-লালকুয়া,

জ. বারাণসী-ছাপরা,

ঝ. সোনপুর-মোজাফ্‌ফরপুর-বরৌনি জংশন,

ঞ. নারকটিয়াগঞ্জ-দ্বারভাঙ্গা সমস্তিপুর,

ট. মৈলানি জংশন-নানপাড়া জংশন,

ঠ. গোণ্ডা জংশন-গোরক্ষপুর জংশন,

ড. নৌতনওয়া-গোরক্ষপুর,

ঢ. নেপালগঞ্জ রোড-গোণ্ডা,

ণ. গোরক্ষপুর-ছিতৌনি,

ত. গোরক্ষপুর-সিওয়ান,

থ. ছাপরা-সিওয়ান,

দ. সাহগঞ্জ-ইন্দারা-বালিয়া,

ধ. মানসি-সাহরসা-সপৌল-ফরবেশগঞ্জ,

ন. সাহরসা-পূর্ণিয়া জংশন-কাটিহার জংশন।

এই হল বর্তমান নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে ছোট ছোট লাইনগুলি বাদে। এর সঙ্গে সমগ্র আসাম রেলওয়ে নিয়ে ১৪-৪-১৯৫২ তারিখে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে গঠিত হয়েছিল।

কিন্তু ইস্টার্ন রেলওয়ের বেলায় যা হয়েছিল, নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ের বেলায়ও ঠিক তাই হল। দুই রেলওয়েরই জন্ম একদিনে। দুই বিশাল রেলওয়ে—ইস্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর—নিয়ে ইস্টার্ন রেলওয়ে হয়েছিল। কিন্তু একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই দুই রেলওয়ে চালানো অসম্ভব হওয়ায় সওয়া-তিনবছর পরে ১-৮-১৯৫৫ তারিখে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে থেকে আলাদা হয়ে সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে গঠিত হয়। ঠিক সেইরকম ভাবে দুই বিশাল রেলওয়ে—আউধ-তিরহুত ও আসাম—নিয়ে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে গঠিত হয়। কিন্তু একই কারণে, অর্থাৎ একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই দুই বিশাল রেলওয়ের পরিচালনা অসম্ভব হয়ে ওঠায় কিছু-কম ৫ বছর পরে ১৯৫৮ সনের ১৫ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ ও আসাম রেলপথ, নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে আলাদা হয়ে গেল। তখন তার নাম হল নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে। এর প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হল মালিগাঁওয়ে। পরে প্রধান কার্যালয় স্থান স্থানান্তরিত হয়েছে পাণ্ডুতে। মালিগাঁও ও পাণ্ডু দুইই বৃহত্তর গৌহাটির অংশ।

বিহারের মনিহারিঘাট, কাটিহার, যোগবনী থেকে আরম্ভ ক'রে পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার রেলপথ ও আসামের সমস্ত রেলপথ এই নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের আওতায় এল।

নিচের রেলওয়েগুলি নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত হল :

১. ক. আসাম রেলওয়ে,

খ. কুচবিহার স্টেট রেলওয়ে,

গ. জোড়হাট প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে,

২. ক. দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে,

খ. ঐ রেলওয়ের দুই সম্প্রসারিত অংশ—কিষণগঞ্জ-শিলিগুড়ি এবং

শিলিগুড়ি-শিভোক (তিস্তা উপত্যকা),

৩. ক. ডিব্রু-সৈদিয়া রেলওয়ে,

খ. লেডো ও টিকাক মারঘারিটা কয়লাখনি রেলওয়ে,

৪. বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে,

৫. আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে,

৬. ক. বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে,

খ. ঐ রেলওয়ের সম্প্রসারিত শাখা,

৭. তেজপুর-বালিপাড়া লাইট রেলওয়ে,

৮. চাপারমুখ-শিলাঘাট রেলওয়ে,

৯. কাটাখাল-লালাবাজার রেলওয়ে।

কুচবিহার স্টেট রেলওয়ে ছিল কুচবিহার রাজ্যের, মাঝারি মাপের, ৩৩ মাইল দীর্ঘ। স্বাধীনতায় পর কুচবিহার স্টেট পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে কুচবিহার স্টেট রেলওয়ে ভারত সরকারের সম্পত্তি হয়ে যায় ১-১-১৯৫০ তারিখে। তখন এই রেলওয়েকে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অংশ ক'রে দেওয়া হয়।

তেজপুর-বালিপাড়া লাইট রেলওয়ে ছিল তেজপুর-বালিপাড়া লাইট রেলওয়ে কোম্পানির, ছোটমাপের, ২০ মাইল দীর্ঘ, জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত রেলপথ। এই রেলপথ থেকে ১-৯-১৯৫২ তারিখে সরকার নিয়ে নর্থ-ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়। তেজপুর থেকে রাঙাপাড়া নর্থ পর্যন্ত ২৬·৬৭ কি. মি. লম্বা অংশটা ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে মাঝারি মাপের লাইনে পরিবর্তিত করা হয় এবং রাঙাপাড়া নর্থ থেকে বালিপাড়া পর্যন্ত ছোটমাপের অংশটাকে তুলে দেওয়া হয় ৩০-৪-১৯৫৩ তারিখে।

চাপারমুখ-শিলঘাট রেলওয়ে ছিল ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানির, মাঝারি মাপের, ৫১ মাইল দীর্ঘ। চালায়—উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

কাটাখাল লালাবাজার রেলওয়ে ছিল ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানির, মাঝারি মাপের ২৪ মাইল দীর্ঘ। চালায়—উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

জোড়হাট-প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে। এটি ছিল ছোটমাপের লাইন। এর মালিক ছিল তখনকার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট। কিন্তু এই মালিকানা ১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল ভারত গভর্নমেণ্টে বর্তায়। এই রেলওয়েকেও ১-১০-১৯৪৩ তারিখে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। তারপর এই রেলপথের একটা অংশকে মাঝারি মাপের লাইনে পরিবর্তিত করা হয়, আর বাদ বাকি অংশ তুলে দেওয়া হয়।

ডিব্রু-সৈদিয়া রেলওয়ে। এই রেলওয়ের মালিক ছিল আসাম রেলওয়েজ অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানি। এই কোম্পানি এই রেলওয়েকে চালায় ৩১-৩-১৯৪৩ তারিখ পর্যন্ত। যুদ্ধের প্রয়োজনে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে কোম্পানি ১-৪-১৯৪৩

তারিখে এই রেলপথের পরিচালনার ভার নিজের হাতে নেয়। সরকার এই লাইন কিনে নেয় ১-৪-১৯৪৫ তারিখে।

নিচের লাইনগুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের অন্তর্গত :

ক. কাটিহার-ফকিরাগ্রাম-গৌহাটি-মারিয়ানি-তিনসুকিয়া,

খ. বারসোই জংশন-কাটিহার,

গ. মনিহারিঘাট-কাটিহার,

ঘ. নিউ জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি,

ঙ. নিউ জলপাইগুড়ি দার্জিলিং,

চ. সিংহাবাদ-মালদা টাউন,

ছ. কাটিহার জংশন-পূর্ণিয়া জংশন-যোগবনী,

জ. আলিপুরদুয়ার-বামনহাট,

ঝ. ধুবড়ি ফকিরাগ্রাম জংশন,

ঞ. কাটিহার-বারসোই-রাধিকাপুর,

ট. চাংড়াবান্ধা নিউমাল-রামসাহী,

ঠ. রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী,

ড. রঙ্গিয়া জংশন রাঙাপাড়া নর্থ-তেজপুর,

ঢ. চাপারমুখ জংশন-ময়রাবাড়ি-শিলঘাট টাউন,

ণ. ফারকাটিং-জোড়হাট-মারিয়ানি জংশন,

ত. ডিব্রুগড় টাউন-লেডো-লেখাপানি,

থ. নাগিনীমোরা-মোরানহাট,

দ. লামডিং জংশন-করিমগঞ্জ-ধর্মনগর,

ধ. করিমগঞ্জ জংশন-বদরপুর জংশন-শিলচর,

ন. কাটাখাল জংশন-লালঘাট,

প. বড়ালগ্রাম-তুর্লভচেরা।

নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে ছিল আগাগোড়া মাঝারি মাপের। মাঝারি মাপের লাইনে, কি যাত্রীবাহী কি মালবাহী, কোনো ট্রেনই দ্রুতগতিতে যেতে পারে না, বা বেশি মালপত্র ও যাত্রী বহন করতে পারে না। সুতরাং বড়মাপের রেলপথের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হতে লাগল। একই সঙ্গে আর একটি জিনিসের অভাব দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের এবং আসামের লোক অনুভব করতে লাগল। সেটি হল গঙ্গার ওপরে একটি বড় রেলপুলের অভাব। গঙ্গার ওপর একটি বড় রেলপুল তৈরি হলে ও বড়মাপের রেললাইন তার উপর দিয়ে নিয়ে গেলে সবদিক দিয়েই সমস্যার সুরাহা হয়।

গঙ্গানদী বাংলাদেশকে দুই বড়ভাগে ভাগ করলেও দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত একটি আদ্যোপান্ত বড়মাপের

রেললাইন—হার্ডিং সেতুর ওপর দিয়ে পদ্মা পার হয়ে একদিকে পোড়াদা, অন্যদিকে ঈশ্বরদি দিয়ে গিয়ে। তখন আগাগোড়া রেলপথে আবদুলপুর ও আমনুরা জংশন হয়ে মালদায় যাওয়া যেত। শুধু আমনুরায় বড়মাপের রেল থেকে মাঝারি মাপের রেলে একবার মাত্র গাড়িবদল করতে হতো। আর একটা পথ ছিল মালদায় যাবার—লালগোলাঘাট থেকে ফেরি স্টিমারে গঙ্গাপার হয়ে ওপারে গোদাগাড়িঘাট থেকে সোজা মাঝারি মাপের রেলপথে। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এই দু'টি পথই আমরা হারালাম।

স্বাধীনতার পর উত্তরবঙ্গ ও আসাম গঙ্গার দক্ষিণের অংশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে আরম্ভ করল দু'টি নতুন পথে। দুই পথেই ফেরি স্টিমারে গঙ্গাপার হতে হতো ও একমাপের লাইন থেকে আর এক মাপের লাইনে গাড়িবদল করতে হতো। একটি পথ ছিল গঙ্গার এপারে বিহারের সকরিগলিঘাট থেকে ওপারে মনিহারিঘাট হয়ে কাটিহার। এটা ছিল দুরের পথ। দ্বিতীয় এবং নিকটতর পথ হল ধুলিয়ানে গঙ্গাপার হয়ে ওপারে খেজুরিয়াঘাট থেকে মালদা। পরবর্তীকালে গঙ্গার পাড় ক্রমাগত ভাঙতে থাকার ফলে ধুলিয়ানকেও পরিত্যাগ করতে হয়। তাগলে কাছাকাছি আর কোন্ জায়গায় গঙ্গাপার হওয়া যায় খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত ফারাক্কা নামে একটি অতি অখ্যাত গ্রামকে বেছে নেওয়া হল।

ঠিক হল, গঙ্গার দক্ষিণতীরে তিলডাঙা থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত একটি বড়মাপের রেললাইন পাতবে ইস্টার্ন রেলওয়ে, এবং এর বিপরীত দিকে (গঙ্গার উত্তরতীরে) খেজুরিয়াঘাট থেকে মালদা পর্যন্ত আর একটি বড়মাপের লাইন পাতবে নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে। আর, ফারাক্কা ও খেজুরিয়াঘাটকে যোগ করবে এক বিরাট ফেরি, যাকে বলা হয় 'মালগাড়ি (wagon) ফেরি'।

ইতিমধ্যে ১৯৫৯ সনের মে মাসে গঙ্গার দক্ষিণে মোকামা জংশন ও উত্তরে বরৌনি জংশনের মধ্যে একটা বড় নতুন পুল তৈরি শেষ হল। তার নাম হল রাজেন্দ্র-পুল। এই পুল হওয়ায় কিন্তু কলকাতার যাত্রীদের বিশেষ কোনো সুবিধে হল না। স্টিমারে গঙ্গা পারাপারের হাঙ্গামাটা বেঁচে গেল বটে, কিন্তু দূরত্ব অনেক বেড়ে গেল; আর ওপারে গিয়ে গাড়ি বদল করার, অর্থাৎ মাঝারি মাপের গাড়িতে চেপে কাটিহার যাবার ভোগান্তি রয়েই গেল। রাজেন্দ্র-সেতু হবার ফলে ইস্টার্ন রেল কর্তৃপক্ষ গঙ্গার আরো ভাঁটিতে ঐরকম একটা বড় রকমের পুল তৈরি করবার উৎসাহ পেলেন। সাঁড়ার হার্ডিং পুলের কথা তো তাঁদের মনে আগে থাকতেই ছিল।

৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ তিলডাঙা-ফারাক্কা ব্রডগেজ রেললাইন পাতবার কাজ আরম্ভ হল ১৯৫৯ সনের ডিসেম্বর মাসে এবং শেষ হল ৩১-৩-১৯৬০ তারিখে। উল্টোদিকে খেজুরিয়াঘাট থেকে মালদা পর্যন্ত ৩৭.২৭ কি. মি. দীর্ঘ ব্রডগেজ রেল লাইন পাতার কাজ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আরম্ভ করে ১৯৫৯ সনের নভেম্বর

মাসে ও শেষ করে ১৯৬০ সনের জুলাই মাসের মধ্যে। ঐ সনের ৩০ আগস্ট ফারাক্কায় এসে পৌছল ৮টি স্টিমার ও ১০টি বজরা (barge)—মুখ্যত মালগাড়ি ও গৌণত যাত্রী পারাপার করবার জন্য। তাই, এই ফেরির নাম হয় 'মালগাড়ি (ওয়াগন) ফেরি'। এক একটা বজরায় পাতা থাকত পাশাপাশি ৯টি রেল-লাইন। প্রত্যেক লাইনে ২টি ক'রে বড়মাপের মালগাড়ি ধরত। সুতরাং প্রতি ক্ষেপে ১৮টি ক'রে বড় মালগাড়ি পার করা যেত। তাহলে ১০টি বজরায় ১৮০টি মালগাড়ি একবারে পার করা সম্ভব ছিল। এই ফেরি দিনে গড়পড়তা ৪৫০ খানি মালগাড়ি এপার থেকে ওপারে নিয়ে গেছে ও ওপার থেকে এপারে নিয়ে এসেছে। সমস্ত ভারতের মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় 'ওয়াগন ফেরি'। ফারাক্কায় এই ফেরি কাজ করেছে ১০ বছর।

নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে খেজুরিয়াঘাট ও মালদার মধ্যে বড়মাপের রেল লাইন তৈরি করবার পরে এই লাইনকে একদিকে কাটিহার পর্যন্ত এবং অন্যদিকে নিউ জলপাইগুড়ি ও নিউ বনগাঁইগাঁও পযন্ত প্রসারিত করে। মালদা-সিঙ্গাবাদ লাইন এবং নিউ জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি লাইনও এই সময়ে বড়মাপের লাইনে পরিবর্তিত হয়। পুরনো মালদহ থেকে খেজুরিয়াঘাট লাইন, ৩৭.২৬ কি.মি.

কুমেদপুর জংশন থেকে মুকুরিয়া জংশন পর্যন্ত লাইন, ২২.৬৩ কি. মি. দীর্ঘ। মুকুরিয়া জংশন থেকে বারসই জংশন পর্যন্ত লাইন, ৪.৫০ কি.মি. দীর্ঘ, খোলা হয়

কুমেদপুর-মুকুরিয়া-বারসই লাইন প্রথমে মাঝারি মাপের লাইন হিসাবে তৈরি হয় ও খোলা হয় ১৪-১২-১৯৫৯ তারিখে। পরে এই লাইন বড় মাপের লাইনে পরিবর্তিত করা হয়।

কাটিহার জংশন থেকে সিংহাবাদ লাইন, : ০.১৪ কি.মি. দীর্ঘ।

মোট ১১৬.১৫ কি. মি. দীর্ঘ এই লাইন প্রথমে মাঝারি মাপে তৈরি হয় ও খোলা হয় ১-১-১৯০০ তারিখে। এই ১১৬.১৫ কি. মি., এর মধ্যে ১১০.১৪ কি. মি. পরে বড়মাপের পরিবর্তিত করা হয়

আগেই বলেছি, ইস্টার্ন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের মনে মোকামায় রাজেন্দ্র-সেতু তৈরি হবার পর গঙ্গার ভাঁটিতে আরো একটি নতুন বড় পুল তৈরি করবার বাসনা জাগে। এই সময়ে তাঁরা শুনলেন যে ভারত সরকারের সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তিমন্ত্রক ফারাক্কায় গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটি বড় বাঁধ (ব্যারেজ) ও তার পাশে একটি 'ফিডার' খাল তৈরি করার সিদ্ধান্ত করেছে। এই খবর পেয়ে রেলমন্ত্রক সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তিমন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সিদ্ধান্ত করে যে তারা ঐ বাঁধের ওপরে একটি পুল তৈরি ক'রে তার ওপর দিয়ে বড়মাপের একটি রেললাইন ওপারে নিয়ে যাবেন। এই রেললাইন যাবে বাঁধের ওপর

দিয়ে হেঁটে যাবার ও অন্যান্য যানবাহন চলার যে রাস্তা হবে, তার সমান্তরাল-ভাবে। এবং 'ফিডার' খালের ওপরেও আরেকটি রেলপুল তৈরি করা হবে।

ফারাক্কা বাঁধের কাজ শুরু হয় ১৯৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে। এই কাজে খরচ হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। রেলপুলে ওঠবার জন্যে যে ক্রমোচ্চ (approach) বাঁধ তৈরি করা জরুরি, তার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬৯ সনের জানুয়ারি মাসে। আর ফারাক্কায় বড়মাপের রেলপুল তৈরি করবার কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬৯ সনের নভেম্বর মাসে। ১৫ জন এনজিনিয়ার, ২৬৬ জন যন্ত্রবিদ (টেকনিক্যাল স্টাফ) ও ২ হাজার শ্রমিক প্রায় ৩০ মাস খেটে কাজটি শেষ করেছেন। নতুন রেলওয়ে লাইনের পূর্ণ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১০.৮৯ কিলোমিটার (অন্য হিসাব মতো ১০.৯৩ কি. মি. ৬.৭৮ মাইল)। শুধু ফারাক্কা পুলটিরই দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২.৬৩ কি. মি (অন্য হিসাব মতে ২.২৪ কি. মি, ১.৩৯ মাইল)। 'ফিডার' খালের ওপরের পুলটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৮৭০ ফিট। রেলপুলের ওপর আপাতত মাত্র একটি লাইন পাতা হয়েছে। ভবিষ্যতে দরকার হলে আরো একটি লাইন পাতা যাবে। তার জন্য পুলের ওপর জায়গা রাখা আছে। এই কাজে রেলমন্ত্রকের সবসুদ্ধ ৭ কোটি টাকা খরচ পড়েছে। এ লাইন খোলবার কথা ছিল ১৯৭২ সনের ১ জানুয়ারি, কিন্তু খোলা হয়েছে তার প্রায় দেড় মাস আগে ১৯৭১ সনের ১১ নভেম্বর তারিখে। উদ্বোধন করেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী কে. হনুমন্থিয়া। এই সেতু খোলবার পর ফারাক্কা-খেজুরিঘাটের 'ওয়াগন ফেরি' সার্ভিসের আর প্রয়োজন না থাকায় বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

পুরনো ফারাক্কা-খেজুরিয়াঘাটের কিছু পূর্বে ফারাক্কা বাঁধ ও ফারাক্কা রেল-পুল তৈরি করা হয়েছে। তিলডাঙা স্টেশন থেকে এক নতুন শাখা লাইন পেতে 'ফিডার' খালের ওপর দিয়ে ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খালের ওপারে গিয়েই এই লাইন বাঁয়ে ও ডাইনে দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। তিলডাঙার আগে বল্লালপুর হল্ট স্টেশন থেকে নতুন লাইন পেতে উত্তর-পূর্বে নিউ ফারাক্কা স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে সোজা উত্তরে বাঁধ ও রেলপুলের ওপর দিয়ে এই লাইন গিয়ে গঙ্গার ওপারে নর্থ-ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেলের ব্রডগেজ খেজুরিয়া-মালদা লাইনের প্রথম স্টেশন চামা গ্রামে শেষ হয়েছে। আর তিলডাঙা স্টেশন থেকে যে শাখা লাইনটি 'ফিডার' খাল পার হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে দুই বাহু বিস্তার করেছিল, তার বাম বাহুটি নিউ ফারাক্কা স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়েছে ; আর, ডান বাহুটি বল্লালপুর হল্ট ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনের মধ্যবর্তী প্রধান লাইনের সঙ্গে মিলেছে। বল্লালপুর হল্ট থেকে নিউ ফারাক্কা স্টেশন পর্যন্ত লাইনকে ভূমি (base) হিসেবে ধরলে, এই ভূমির উপর তিলডাঙা শাখা লাইন একটি ত্রিভুজ বা ব-দ্বীপ রচনা করেছে। আর, পূর্বদিক দিয়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক বাঁধের ওপর দিয়ে ওপারে চামাগ্রাম স্টেশনের পাশ দিয়ে উত্তরদিকে চলে গেছে।

আজকাল দার্জিলিং মেল এই ফারাক্কা পুলের ওপর দিয়েই যাতায়াত করছে। আরো ২টি ট্রেন এই পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমটি হচ্ছে হাওড়া-ফারাক্কা প্যাসেঞ্জার, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহারওয়া লুপ লাইন দিয়ে কাটিহার পর্যন্ত যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি কামরূপ এক্সপ্রেস, হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে নিউ বনগাঁইগাঁও পর্যন্ত যাতায়াত করছে।

আগেই বলা হয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৯৫৮ সনের ১৫ জানুয়ারি গঠিত হয়। তারপরে এই রেলওয়ে কতকগুলি বড়মাপের লাইন তৈরি করেছে। সেকথাও বলা হয়েছে। তারপরে এই রেলওয়ে মাঝারি মাপের কয়েকটি নতুন লাইন তৈরি করেছে ও কয়েকটি পুরনো লাইনকে সম্প্রসারিত করেছে। নতুন তৈরি করা লাইনের মধ্যে সবচেয়ে বড় লাইন হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে রাঙাপাড়া নর্থ জংশন স্টেশন থেকে উত্তর-পূর্বে মারকংসেলেক পর্যন্ত ৩২৭ কিলোমিটার (২০৫ মাইল) লম্বা লাইনটি। আর, সম্প্রসারিত লাইন হচ্ছে লেডো থেকে লেখাপানি ও তিনসুকিয়া থেকে ডাংগড়ি (২৫ মাইল)। শিলিগুড়ি থেকে আসামের যোগীঘোপা—পর্যন্ত একটি বড় মাপের ২৬৮·৭৮ কি. মি. (১৬৮ মাইল) দীর্ঘ লাইন খোলা হয়েছে।

বর্তমানে ভারতীয় রেলগাড়ি বাংলাদেশের এইসব মাঝারি মাপের রেললাইনের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে :

ক. বুড়িমারি (বাংলাদেশ)—চাংড়াবান্দা (ভারত)—২.৪১ কি মি.

খ. লালমনিরহাট (বাংলাদেশ)—গীতলদহ (ভারত)—১২.৮৭ কি. মি.

গ. বিরল (বাংলাদেশ)—রাধিকাপুর (ভারত)—৮.৪৫ কি. মি.)

আবার বাংলাদেশের রেলগাড়ি ভারতের এইসব বড়মাপের রেললাইনের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে :

ক. হলদিবাড়ি (ভারত)—চিলাহাটি (বাংলাদেশ)—৩.৩৭ কি. মি.

খ. করিমগঞ্জ (ভারত)—লাটু (বাংলাদেশ)—১২.৮৭ কি. মি.

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে থেকে কথা শুরু হয়েছে। এতক্ষণে সেকথা শেষ হল।

এখন কতকগুলি ছোটখাটো লাইনের কথা বলা বাকি আছে। যথা—

১. বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ে।

এই রেলপথ ছিল ছোটমাপের, ৫২ মাইল দীর্ঘ। বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে কোম্পানি এই লাইন তৈরি করে। ২৪ পরগনা জেলাবোর্ড এই কোম্পানিকে সাহায্য করত। ম্যানেজিং এজেন্টস—এন.এল. রায় অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলকাতা। কোম্পানি রেজিস্ট্রি হয় ৩০-৭-১৯০৩ তারিখে।

প্রধান লাইন খোলার তারিখ :

ক. বারাসাত থেকে বসিরহাট, ১-২-১৯০৫

খ. বসিরহাট থেকে চিংড়িঘাটা (হাসনাবাদ), ২-৩-১৯০৯

শ্যামবাজার শাখা—

গ. বেলেঘাটা পুল থেকে পাতিপুকুর, ১৬-২-১৯১০

ঘ. পাতিপুকুর থেকে বেলগাছিয়া (শ্যামবাজার), ২-১০-১৯১৪

এই লাইন বন্ধ হয়ে যায়, ১-৭-১৯৫৫ তারিখে।

২. লাইন না থাকায় যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায়, ভারত সরকার বারাসত থেকে বসিরহাট হয়ে হাসনাবাদ পর্যন্ত একটি বড় মাপের রেলপথ তৈরি করেছেন। এই লাইন ৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ। কাজ শুরু হয় ১৯৫৯ সনের নভেম্বর মাসে। খোলা হয় ৯-২-১৯৬২ তারিখে। উদ্বোধন করেন, তৎকালীন রেলমন্ত্রী জগজীবন রাম।

এখন এই রেলপথ ইস্টার্ন রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৩. কালীঘাট-ফলতা রেলওয়ে।

এটি ব্রাঞ্চ লাইন কোম্পানির লাইন। তৈরি করে কালীঘাট-ফলতা রেলওয়ে কোম্পানি। ছোটমাপের লাইন, ২৬ মাইল লম্বা। কোম্পানি রেজিস্ট্রি করা হয়—১৯১৫ সনের এপ্রিল মাসে। এই লাইন তৈরির মঞ্জুরি দেওয়া হয়, ২৬-৪-১৯১৫ তারিখে। ম্যানেজিং এজেন্টস—ম্যাকলিয়ড কোম্পানি কলকাতা।

(কালীঘাট স্টেশনের কাছে) ঘোলসাহাপুর থেকে ফলতা পর্যন্ত লাইন খোলা হয় ২৮-৫-১৯১৭ তারিখে। ঘোলসাহাপুর থেকে মাঝেরহাট স্টেশন পর্যন্ত বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের সঙ্গে অস্থায়ী সংযোগ স্থাপন করা হয় ১-৫-১৯২০ তারিখে। ভারত সরকার ১-৪-১৯৪৭ তারিখে এই লাইনটি কিনে নিয়ে একেবারে বন্ধ ক'রে দেন এবং লাইনও উপড়ে ফেলেন।

৪. যশোর-ঝিনাইদা রেলওয়ে।

ছোটমাপের লাইন। ম্যানেজিং এজেন্টস—বি. সি. রায়, কলকাতা। কোম্পানি রেজিস্ট্রি করা হয়, ৪-৮-১৯২৪ তারিখে। প্রথমে বাংলা সরকার এই লাইন পাতার মঞ্জুরি দেন। ভারত সরকার এই মঞ্জুরি অনুমোদন করেন ২-১২-১৯১০ তারিখে। যশোর-ঝিনাইদা রেলওয়ে কোম্পানি লাইন তৈরি করে। কিন্তু কোম্পানি দেউলে হয়ে যায়। কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি ঝিনাইদা রেলওয়ে সিণ্ডিকেট লিঃ কিনে নেয়, ২৪-৯-১৯২৪ তারিখে।। ১-৪-১৯৬৩ তারিখে এই রেলওয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রধান লাইন (খোলার তারিখ) :

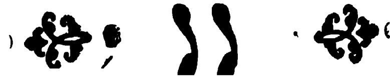
ক. যাশোর থেকে ঝিনাইদা, ১-১০-১৯১৩

শাখা লাইন—

খ. শিবনগর [শিবনিবাস ? —রা. মি.] থেকে কোটচাঁদপুর, ১-১০-১৯১৩

এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৭½ মাইল।

এতক্ষণে রেলের কথা ফুরলো। এবার অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।



যোগাযোগ-ব্যবস্থা : বিমান পরিবহন

প্রথম প্রথম যেসব বৈমানিক (পাইলট) তাঁদের বিমান নিয়ে কলকাতায় আসেন, তাঁরা গড়ের মাঠকেই বিমান অবতরণ ক্ষেত্র (air fild) রূপে ব্যবহার করেন। দু'জন ফরাসি বিমানচালক Jules Tyck ও Baron de Cators ১৯১২ সনের ২৪ ডিসেম্বর এই গড়ের মাঠের ওপরেই খানিকটা চক্কর দিয়ে কলকাতাবাসীকে সর্বপ্রথম বিমানে ওড়া দেখান। এই ঘটনা ঘটে বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি বৈমানিক Bleriot ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিয়ে ইংল্যাণ্ডে উড়ে যাবার ঠিক সাড়ে-তিন বছর পরে। Louis Bleriot (১৮৭২-১৯৩৬) ফ্রান্সের ক্যালে থেকে ইংল্যাণ্ডের ডোভারে উড়ে যান ২৫-৭-১৯০৯ তারিখে। তার সাড়ে পাঁচ বছর আগে দু'জন আমেরিকান বৈমানিক Orville Wright (১৮৭১-১৯৪৮) ও তাঁর দাদা Wilbur Wright (১৮৬৭-১৯১২) এঞ্জিন-চালিত বিমানে চড়ে সর্বপ্রথম ওড়েন ২৩-১২-১৯০৩ তারিখে। এর আগে বিমানে ওড়া ছিল না, ছিল বেলুনে ওড়া।

১৯২০ সনের বসন্তকালে (মার্চ-এপ্রিল মাসে) রোম থেকে টোকিও উড়ে যাবার সময় একঝাঁক ইটালিয়ান বিমান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণের খোলা মাঠকে তাদের বিমানঘাটি হিসেবে ব্যবহার করে।

অতঃপর কলকাতা থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে দমদমার মাঠ হল বিমান ওঠা-নামার জায়গা।

১৫-৮-১৯২২ তারিখে Major Blake, Capt. McMillan ও Capt.

Malins লণ্ডনের ক্রয়ডন (Croydon) থেকে উড়ে এসে দমদমে নামেন। তাঁরা বিমানটিকে কলকাতায় নিলামে বিক্রি ক'রে দিয়ে লণ্ডনে ফিরে যান।

এরপর ২-৫-১৯২৪ তারিখে ফরাসি পাইলট Lt. D'oisy প্যারিস থেকে উড়ে এসে দমদমে নামেন। তারপর আসেন দু'জন পোর্তুগিজ পাইলট Capt. Paes ও Capt. Beiers, ৩০-৫-১৯২৪ তারিখে। এরপর ২৬-৬-১৯২৪ তারিখে আসেন কয়েকজন মার্কিন পাইলট সামুদ্রিক বিমানে (Sea-Plane) চড়ে। তাঁরা নামেন গঙ্গায় ব্যারাকপুরের কাছে নবাবগঞ্জে। তাঁরা সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছিলেন।

১৩-১১-১৯২৪ তারিখে দু'জন ডাচ পাইলট Vander Hoop ও H. Poleman আমস্টারডাম থেকে ব্যাটাভিয়া যাবার পথে রাত্রিবেলায় অন্ধকারে মশালের আলোর সাহায্যে দমদম বিমানক্ষেত্রে নামেন।

১৯২৫ সনের বড়দিনের সময় ইংরেজদের ৬ খানি রাজকীয় সামরিক (Royal Air Force) বিমান অল্পসময়ের জন্যে দমদমে নামে। ৩১-১২-১৯২৫ তারিখে ৫ খানি বিমান কলকাতা ও আশপাশের ওপর দিয়ে উড়ে কলকাতার লোককে দেখায়।

১৪-৪-১৯২৬ তারিখে স্পেনদেশীয় সামরিক বিমান পাইলট Capt. J. Loriga ও Capt. Gonsalez মাদ্রিদ থেকে কলকাতায় পৌছান। তারপর আসেন দু'জন ডেনমার্কের পাইলট Bolved ও Hershend, ১৯-৩-১৯২৬ তারিখে, কোপেনহ্যাগেন থেকে টোকিও যাবার পথে।

ব্রিটেনের Alan Cobham ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রেলিয়া থেকে দু'বার ইংল্যাণ্ডে বিমানে আকাশপথ সমীক্ষা করতে যাবার সময় দু'বার দমদম হয়ে যান ১৯২৬ সনের ২৩ জুলাই ও ২৩ সেপ্টেম্বর।

৩-১১-১৯২৬ তারিখে দু'জন ফরাসি পাইলট Rignot ও Costes প্যারিস থেকে দমদমে পৌছান।

হল্যাণ্ডের আমস্টারডাম ও ইন্দোনেশিয়ার ব্যাটাভিয়ার মধ্যে প্রথম বাণিজ্যিক বিমান চলাচল শুরু হয় ১৯২৭ সনের জুন মাসে। এই বিমান ব্যাটাভিয়ার পথে দমদম হয়ে যায় ২৫-৬-১৯২৭ তারিখে ও ফিরতিপথে দমদম হয়ে যায়, ১০-৭-১৯২৭ তারিখে।

প্রথম জার্মান পাইলট Capt. Otto Koenecke কলোন (Cologne)থেকে টোকিও যাবার পথে কলকাতা পৌছান, ১১-১২-১৯২৮ তারিখে। তিনি দমদম বিমানক্ষেত্র ঠাওর করতে না পেরে দমদমের পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে বিমান সামলাতে না পেরে হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে বিমানসমেত পড়ে যান। তিনি প্রাণে রক্ষা পান বটে, কিন্তু বিমানখানি ধ্বংস হয়ে যায়।

১৬-২-১৯২৮ তারিখে অস্ট্রেলিয়া অথবা নিউজিল্যাণ্ডের পাইলট Bert Hincler অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে দমদমে নামেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব বৈমানিকের কথা বলা হল তাঁরা দমদমে এসেছেন, আবার চলে গেছেন। কেউই কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা (air service) স্থাপন করেন নি। তাঁরা নামতেন দমদমার ঘাসেভরা মাঠে। সেইটেই ছিল তখনকার বিমানক্ষেত্র। তখনো পর্যন্ত কোনো বিমানঘাঁটি (aerodrome) তৈরি হয় নি। বিমানঘাঁটি দমদমে প্রথম কবে তৈরি হল তার সঠিক সন-তারিখ আমি পাই নি। তবে মনে হয়, ১৯২৮-২৯ সন নাগাদ হয়েছিল।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা কংক্রিটের বিমান ওড়ার পথ (runway) তৈরি করার কাজ প্রথমে শুরু হয় ১৯৩০ সনে। এখন আর সেই পথ নেই। তার জায়গায় আরো মজবুত, আরো লম্বা-চওড়া রানওয়ে তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। বর্তমানে দমদম আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটি হওয়ায় ১৯৭২-৭৩ সনের পরে আগেকার রানওয়েগুলোকে ভারি-ভারি জেটবিমান বহনের উপযোগী করা হয়েছে। ভারতের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (International Airport Authority of India) দমদম বিমান বন্দরকে নিজের দখলে এনেছেন এক আইন-বলে, যা কার্যকর হয়েছে ১৯৭২ সনের এপ্রিল মাস থেকে।

সবপ্রথম ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ার যাবার পথে করাচি পর্যন্ত নিযমিত বিমান সার্ভিস শুরু করে ১৯২৯ সনে। ঐ বছরই ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ করাচি থেকে দিল্লি পর্যন্ত ভারতের ভিতরে আঞ্চলিক পরিবহন শুরু করে। পরে এই অভ্যন্তরীণ পরিবহন প্রসারিত হয় কলকাতা পর্যন্ত ১৯৩৩ সনে। ১৯২৯ সনে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ দ্বারা করাচি ও দিল্লির মধ্যে নিয়মিত যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থা শুরু হবার পরেই ঐ ১৯২৯ সনেই লণ্ডন থেকে দিল্লির মধ্যে বিমানযোগে ডাক পরিবহন ব্যবস্থা (air mail service) চালু হয়। ঐ সনেই ভারতে এয়ারমেলের জন্য আলাদা খাম ও টিকিট প্রবর্তন করে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ। ১৯৭৯ সনে তার ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। আর ঐ বছরই হল ভারতে প্রথম পোস্টকার্ড প্রবর্তনের শতবার্ষিকী বৎসর। এই শতবার্ষিকী ও এয়ারমেল টিকিটের অর্ধশত বার্ষিকী একসঙ্গে পালন করার জন্য ভারতের ডাক ও তার বিভাগ নয়াদিল্লিতে ১৯৮০ সনে একটি আন্তর্জাতিক ডাকটিকিট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। সেই প্রদর্শনীর নাম স্থির হয় 'ভারত-১৯৮০'। প্রদর্শনীর সময়—২৫ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি।

আগেই বলা হয়েছে, ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত তার কার্যক্রম (সার্ভিস) প্রসারিত করে ১৯৩৩ সনে। তখন সার্ভিস ছিল সপ্তাহে

একবার। ১৯৩৫ সনে শুরু হয় সপ্তাহে দু'বার, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ১৯৪০ সনে সপ্তাহে ৫ বার। তার মধ্যে দু'টি ছিল স্থল-বিমান। তারা দমদম বিমানঘাটিতে যেত। আর ৩টি ছিল জল বা নৌ-বিমান (sea plane) তারা উইলিংডন পুলের উত্তর পাশ পর্যন্ত আসত। তখন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যারাই যেত, তারাই এই জল-বিমানগুলি দেখতে পেত।

রয়াল ডাচ মেল সার্ভিস (K.L.M, হল্যাণ্ড থেকে জাভা) ১৯৩০ সনে শুরু হয়। এই সার্ভিস প্রথম ছিল পাক্ষিক, ১৯৩১ সনে হয় সাপ্তাহিক ও ১৯৩৭ সনে হয় সপ্তাহে ৩ বার।

এয়ার ফ্রান্স (ফ্রান্স থেকে ইন্দো-চায়না) ১৯৩০ সন থেকে সাপ্তাহিক সার্ভিস শুরু করে। হল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের বিমানও দমদম হয়ে যেত, এখনো যায়।

এই সমস্ত নিয়মিত সার্ভিস চালু হওয়ার আগে আকাশে ওড়াকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ৫-৪-১৯২৭ তারিখে বেসামরিক ব্যোমযানের প্রথম সর্বময় অধিকর্তা (Director-General of Civil Aviation) নিযুক্ত হন। কয়েকজন শিক্ষণপ্রাপ্ত এয়ারোড্রোম-অফিসারও নিযুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে করাচি ও কলকাতায় দু'জন বাঙালি নিযুক্ত হন—করাচিতে ডি. চক্রবর্তী ও কলকাতায় কে. এম. রাগা। এঁরা দু'জনেই পরে Director-General of Civil Aviation হয়েছিলেন। বিমান পরিবহন বিভাগে এটিই সর্বোচ্চ পদ।

২১-৫-১৯২৯ তারিখে বেঙ্গল এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে একটি সার্ভিস চালু করে। ঐ সার্ভিস মাত্র ১ সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল। তারপর বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মতো আরো অনেকগুলি বেসরকারি বিমান পরিবহন কোম্পানির জন্ম হল। যথা—ইণ্ডিয়ান এয়ার-ওয়েজ, এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া), অম্বিকা এয়ারওয়েজ, ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ এয়ার-লাইন্‌স, ভারত এয়ারওয়েজ, ডেকান এয়ারওয়েজ, হিমালয়ান এয়ারওয়েজ, এয়ার সার্ভিসেস অফ ইণ্ডিয়া, কলিঙ্গ এয়ারলাইন্‌স ইত্যাদি।

এতগুলি পরিবহন-সংস্থার আবির্ভাব ভারত সরকারকে ভাবিয়ে তুলল। ১৯৪৭ সনে নয়াদিল্লির অস্থায়ী (interim) ভারত সরকার ও অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী সর্দার আবদার রব নিস্তার একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সদস্য ছিলেন পশ্চিম-ভারত থেকে জে. আর. ডি. টাটা, পূর্ব-ভারত থেকে বীরেন রায়, ডিরেকটার-জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশান, কংগ্রেস দলের দেওয়ান চমনলাল এবং একজন মুসলমান ভদ্রলোক। এই কমিটির ওপর ভার দেওয়া হয় বেসরকারি বিমান পরিবহন-সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের।

কমিটির আলোচনার ফলে ১৯৫৩ সনে ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি আইন পাশ হয়। এই আইনবলে সমস্ত বেসরকারি সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে একটিমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনে পরিণত করা হয়। এই কর্পোরেশনের জন্ম হয় ১৯৫৪ সনের

অক্টোবর মাসে এবং নাম হয় ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন (সংক্ষেপে, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স)। এবং এয়ার ইণ্ডিয়া ও এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল—এই দু'টিকে একত্র ক'রে বহির্ভারতে পরিবহনের জন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পরিণত করা হয়। নাম হয় এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল (সংক্ষেপে, এয়ার ইণ্ডিয়া)।

এয়ার ইণ্ডিয়ার প্রথম থেকে চেয়ারম্যান ছিলেন জে. আর. ডি. টাটা। ১-২-১৯৭৮ থেকে এয়ার ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, দুয়েরই চেয়ারম্যান করা হয়েছে এয়ার চিফ-মার্শাল পি. সি. লালকে। তাঁকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে অন্য লোককে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। ২৮-৫-১৯৭৯ তারিখে জে.আর.ডি টাটা বলেছেন যে ৩৬ টি বিদেশী এয়ারলাইন ভারতে ও ভারতের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করছে। তাদের বিমানের সংখ্যা হবে কয়েকশত। এই কারবারে ভারতের অংশ শতকরা ৪৩ ভাগ। ভারতের মোট বিমানসংখ্যা মাত্র ১৫ খানি, যাতায়াত করে ৩৪টি দেশে।

শ্রীবীরেন রায়ের মতে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লণ্ডন থেকে করাচি সার্ভিস শুরু করে ১৯২৫ সনে। ১৯২৭ সনে এই সার্ভিস কলকাতা (দমদম) পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

দমদম বিমানঘাঁটি প্রসঙ্গে ২টি সংস্থার কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমটির নাম বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব, দ্বিতীয়টির নাম এয়ার টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট।

বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমান চালানো শিক্ষা দিয়ে দক্ষ পাইলট বা বৈমানিক তৈরি করা। ইংল্যাণ্ডে বেসরকারি পাইলট শিক্ষণের কাজ শুরু হয় ১৯২৫ সনে। আর, বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব দমদমে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সনের আগস্ট মাসে। এটি এশিয়ার মধ্যে প্রথম বৈমানিক শিক্ষণ-সংস্থা। বিমান চালনা শিক্ষা দেওয়া শুরু হয় দমদমার মাঠে ৬-২-১৯২৯ তারিখে। এই ক্লাবের নিজস্ব একটি বাড়ি তৈরি হয় দমদমে ১৯৩১ সনের শেষাশেষি। এখন এই বাড়িটি দমদম বিমানঘাঁটির মধ্যে পড়ে গেছে।

বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব দমদমে ছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৪০ সন পর্যন্ত। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে) এই ক্লাবের কাজকর্ম বন্ধ থাকে। ১৯৪৬ সনে নিউ-আলিপুরে আমেরিকার পরিত্যক্ত সামরিক ঘাঁটিতে ক্লাবের কার্যকলাপ আবার চালু করা হয়। ১৯৪৮ সনে ঐ জায়গা ছেড়ে ক্লাবকে ব্যারাকপুরে ভারতীয় সামরিক বিমানবাহিনীর বিমানক্ষেত্রে চলে যেতে হয়। ১৯৬০ সনের মধ্যে ক্লাব গভর্নমেণ্টকে দিয়ে বেহালায় একটি বিমানঘাঁটি তৈরি করায়। উক্ত ১৯৬০ সনে ক্লাব ব্যারাকপুর থেকে বেহালায় চলে আসে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেরা শিক্ষা দিয়ে পাইলট তৈরি করবে, এই কথা বলে

বিমানঘাটিটি দখল করে। ক্লাব গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে মামলা ক'রে গভর্নমেণ্টকে হারিয়ে দিয়ে তার বেহালার নিজস্ব ঘাটি ফিরে পেয়েছে।

১৯২৯ সন থেকে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব অন্ততপক্ষে ১৫৫০ জন বৈমানিক তৈরি করেছে। সেই বৈমানিকদের মধ্যে অনেকে এখনো ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইন্‌স, এয়ার ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে কাজ করছেন।

বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন—স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, জে. পি. গাঙ্গুলি ও বেহালার বীরেন রায়। স্বাধীনতার পূর্বে বীরেন রায় এই ক্লাবের নানাপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনিই এই ক্লাবের সর্বেসর্বা হয়েছেন বলা চলে।

দমদমের এয়ার টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিমান সংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিয়ে বিমান-এঞ্জিনিয়ার তৈরি করা। এই প্রতিষ্ঠানটি এস. সি. মৈত্র ১০-২-১৯৪৮ তারিখে স্থাপন করেন। তিনি ভারত সরকারের বে-সামরিক বিমান পরিচালনা (Civil Aviation) দপ্তরের কাছ থেকে একটি ছোট হ্যাঙ্গার (hanger), একটি ছোট বিমান, ক্লাব করবার জন্য একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে কাজ শুরু করেন। দমদমে এই ইনস্টিটিউটের ৩১-তম প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়েছে। বি কে. ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। অনেক বিদেশী ছাত্র এই ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে চায়। কিন্তু স্থানাভাবে তারা ভর্তি হতে পারছে না।



গঙ্গার ঘাট

আমার বিষয় হচ্ছে গঙ্গার ঘাট। আদি গঙ্গাতেও আগে অনেক ঘাট ছিল, এখনো গোটাকতক আছে। আমি তাদের বাদ দিচ্ছি। উত্তরে কাশীপুর থেকে দক্ষিণে আদি গঙ্গার মুখ (হেস্টিংস) পর্যন্ত যে বড় গঙ্গা, ইংরেজরা যাকে বলত হুগলি নদী, সেই গঙ্গার পূর্বদিকের ঘাটের কথাই এখানে বলছি।

আমার কাছে এই গঙ্গার ঘাটের ছোট-বড় ৮টি তালিকা আছে। এই তালিকাগুলি বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়েছে। কোনো তালিকায় ঘাটের সংখ্যা কম, কোনোটাতে বেশি। বেশির ভাগ তালিকায় উত্তরে বাগবাজারের খাল থেকে দক্ষিণে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত, আবার কয়েকটিতে উত্তরে কাশীপুর থেকে দক্ষিণে হেস্টিংস পর্যন্ত, ঘাটের নাম দেওয়া হয়েছে। একটি তালিকার সঙ্গে আরেকটি তালিকা হুবহু মেলে না, তাদের মধ্যে কিছু কিছু তফাত দেখা যায়। প্রথম তালিকায় ৪টি, দ্বিতীয় তালিকায় ৫টি, তৃতীয় তালিকায় ৮টি, চতুর্থ তালিকায় ১৬টি, পঞ্চম তালিকায় ২৪টি, ষষ্ঠ তালিকায় ২৯টি, সপ্তম তালিকায় ৩৫টি ও অষ্টম তালিকায় ৪০টি ঘাটের নাম আছে।

ঘাটের সংখ্যা কম-বেশি হওয়ার মোটামুটি কারণ তিনটি। প্রথম কারণ, কতকগুলি পুরনো ঘাট ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যাঁদের নিজের খরচে ঘাটগুলি রক্ষা করবার কথা, হয় তাঁরা কর্তব্যে অবহেলা করেছেন, নয় চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারেন নি। দ্বিতীয় কারণ, একদিকে যেমন পুরনো ঘাট ভেঙেছে, অন্যদিকে আবার নতুন নতুন ঘাট তৈরি হয়েছে। তৃতীয় কারণ হল,

ঘাট ঠিকই আছে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাদের নাম পাল্টে গেছে, যেমন বাগবাজারের রঘুমিত্রের ঘাটের নাম পরে হয়েছে অন্নপূর্ণা ঘাট।

সব ঘাট একই উদ্দেশ্যে (স্নানের জন্য) তৈরি হয় নি। বিভিন্ন ঘাট বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে। কতকগুলি ঘাট শ্মশানঘাট, শবদাহের জন্য তৈরি হয়েছে—যেমন কাশীপুর, কাশীমিত্র ও নিমতলা ঘাট। কতকগুলি স্নানঘাট, স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য ধনী লোকেরা তৈরি ক'রে দিয়েছেন। এরকম ঘাটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কতকগুলি ঘাটে মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে স্নান করেন। আবার কতকগুলি ঘাট শুধু পুরুষদের জন্য, কতকগুলি মেয়েদের জন্য—যেমন নিমতলায় রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাট শুধু পুরুষদের স্নানের জন্য ও গিরিশচন্দ্র বসুর ঘাট শুধু মেয়েদের জন্য। আবার কতকগুলি ঘাট বড় বড় কারবারীরা তৈরি করিয়েছেন নিজেদের মালপত্র নৌকোয় বা জাহাজে চাপানো ও তা থেকে খালাস করবার জন্য—যেমন, মদনমোহন দত্তের, শোভারাম বসাকের, বৈষ্ণবচরণ শেঠের, কাশীনাথ বাবুর ও হুজুরিমলের ঘাট। শুধু এদেশী লোকেরাই নয়, সাহেব ব্যবসাদারেরাও পয়সা খরচ ক'রে নিজেদের ব্যবসার খাতিরে ঘাট তৈরি করেছেন, যেমন রসবিবির ঘাট, জ্যাকসন ঘাট, ফোরম্যান ঘাট, ব্লাইথ ঘাট ও স্মিথ ঘাট।

কিন্তু সকলেই তো আর টাকা-পয়সা খরচ ক'রে নিজেদের ব্যবসার জন্য ঘাট তৈরি করতে পারত না! ছোটখাটো ব্যবসাদার ও সাধারণ লোকেদের জন্য ছিল কতকগুলি ঘাট যাদের ঠিকা নিত মাঝিরা। সেই মাঝিদের বলা হতো ঘাটমাঝি। তারা ঘাটেই থাকত, নৌকো চালাত না। ঘাটমাঝিরা লোকেদের চাহিদা অনুযায়ী বজরা, ভড়, কিস্তি, পানসি ইত্যাদি নৌকো এবং মাল বোঝাই ও খালাস করবার জন্য কুলি-মজুর সরবরাহ করত। আবার লোক পারাপারের জন্য খেয়া নৌকো ও দাঁড়ি-মাঝিও সরবরাহ করত। তাদের সাহায্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুসারে তারা মক্কেলদের কাছ থেকে মাশুল আদায় করত। অনেক ঘাটমাঝি এইরকম ক'রে বড়লোক হয়ে গেছে। খিদিরপুরে তো এক ঘাটমাঝির নামে রাস্তাই রয়েছে—নাজির মহম্মদ ঘাটমাঝি লেন, বর্তমানে শুধু নাজির লেন।

আগে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অর্থাৎ হাওড়া-শিবপুরের দিকে জল ছিল গভীর। সব জাহাজ সেইদিকে ভিড়ত। পোর্তুগিজ জাহাজগুলো মালপত্র নিয়ে বেতোড়ে গিয়ে কেনা-বেচা করত এই জন্যই। কিন্তু 'সুমাত্রা' নামে একখানা জাহাজ শিবপুরে ডুবি হাওয়ায় কালক্রমে পশ্চিম পাড়ে চড়া পড়ে জল হয়ে যায় অগভীর ও কলকাতার দিকে জল হয় গভীর। যেখানে সুমাত্রা জাহাজ ডুবি হয় সেই জায়গাটাকে তাই আগে বলা হতো সুমাত্রা পয়েন্ট। পরে কর্নেল রবার্ট কিডের শালিমার বাগ ও শালিমার হাউসের জন্য সুমাত্রা পয়েন্টের নাম হয় শালিমার পয়েন্ট।

কলকাতার দিকে গঙ্গায় এত বেশি জল ছিল যে দক্ষিণে আদিগঙ্গার মুখ (হেস্টিংস) থেকে উত্তরে শোভাবাজার ঘাট পর্যন্ত সমস্ত নদীর ধারটা—যাকে ইংরেজিতে বলে স্ট্র্যাণ্ড রোড—জলের তলায় ছিল। তাই আগে বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রিট থেকে আরম্ভ ক'রে আর্মেনিয়ান স্ট্রিট পর্যন্ত অনেকগুলি জাহাজ তৈরি ও মেরামতের জন্য 'ডক' ও কারখানা ছিল বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর। ঐসব 'ডক' ও কারখানার সামনের দিক ছিল জলমগ্ন স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর এবং তাদের পেছন দিক ছিল ক্লাইভ স্ট্রিটের ওপর।

আন্দাজ ১৮০৮ সন থেকে গঙ্গার জল কলকাতার কোল থেকে কমতে ও হাওড়ার দিকে বাড়তে আরম্ভ করে। কলকাতার রাস্তাঘাট, পুকুর, সরকারি বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করবার জন্য ১৮১৭ সনে যখন লটারি-কমিটি তৈরি হয়, তখন বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোডের জায়গা থেকে জল সরে গেছে। তার ফলে ৬ বছর পরেই লটারি-কমিটির দ্বারা দক্ষিণে চাঁদপাল ঘাট থেকে উত্তরে রথতলা ঘাট পর্যন্ত স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈ'র হতে আরম্ভ হয়। আর, উত্তরে চাঁদপাল ঘাট থেকে দক্ষিণে হেস্টিংস পর্যন্ত গঙ্গার ধার বরাবর স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরি হয় তারও পরে। পুরো স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরির কাজ ১৮২৩ সনে আরম্ভ হয়ে ১৮৩১ সনে শেষ হয়। কিন্তু উত্তরে ১৮২৩ সনে স্ট্র্যাণ্ডরোড তৈরি হতে শুরু হওয়ার ফলে জাহাজ তৈরির ও মেরামতের 'ডক' ও কারখানাগুলো উঠে গেল। জেসপ কোম্পানির মতো এঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোর সামনের দিকটা—স্ট্র্যাণ্ড রোডের দিকটা—হল পিছন দিক, আর পিছন দিকটা—ক্লাইভ স্ট্রিটের দিকটা, হল সামনের দিক। মাত্র ৩ বছর পরে ১৮২৬ সনে দেখা গেল, দু-এক জন নয়, আট-আট জন জাহাজ নির্মাতা কলকাতা থেকে তাদের জাহাজ তৈরির ও মেরামতের ব্যবসা তুলে নিয়ে গিয়ে ওপারে ঘুসুড়ি ও শিবপুরের মধ্যে নতুন নতুন ডক তৈরি করেছে।

তার পরেও কলকাতার দিক থেকে গঙ্গার জল সরে যাওয়া অনেক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারই ফলে স্ট্র্যাণ্ডরোডের পশ্চিমে নতুন ক'রে আর একটা স্ট্র্যাণ্ড রোড হয়েছে। পুরনো স্ট্র্যাণ্ড রোডের থেকে তফাত করবার জন্য এই নতুন স্ট্র্যাণ্ড রোডের নাম হয়েছে স্ট্র্যাণ্ড ব্যাংক রোড।

গঙ্গার দু'পাড়ের ৪২টি ঘাট এখন পোর্ট কমিশনাররা রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তার মধ্যে ১৫টি ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ প্রতিষ্ঠাতাদের দানে চলে। বাকিগুলোর খরচ যোগান পোর্ট কমিশনাররা।

এবারে ঘাটের কথায় আসি। আমি যদিও ৮টি তালিকার কথা বলেছি, কিন্তু আমার আলোচনায় মাত্র ৩টি তালিকার কথা থাকবে। ঘাটের তালিকা তিনটি নিচে দেওয়া হল। প্রথম তালিকায় ১৩টি, দ্বিতীয় তালিকায় ৪০টি এবং তৃতীয় তালিকায় ২৯টি ঘাটের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় তালিকাটি ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত আপজন (Upjohn) সাহেবের ম্যাপের সাহায্যে

সংকলিত। অপর তালিকা দু'টির ঘাটগুলি অন্যান্য সূত্র থেকে সংকলিত। মোট ৮২টি ঘাটের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। এই ঘাটগুলি উত্তরে কাশীপুর থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণে আদিগঙ্গার মুখে দৈ ঘাটে এসে শেষ হয়েছে— আমার আলোচনাও সেই ক্রম অনুসরণ করেছে।

প্রথম তালিকা॥ ১. কাশীপুর প্রমাণিক ঘাট, ২. কাশীপুর শ্মশানঘাট, ৩. রতনবাবুর ঘাট, ৪. রানী দেবেন্দ্রবালার ঘাট, ৫. রুস্তমজীর ঘাট, ৬. প্রাণনাথ চৌধুরীর ঘাট, ৭ হীরালাল শীলের ঘাট, ৮. রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ঘাট, ৯. ব্রহ্মময় দাসের ঘাট, ১০. দেবীপ্রসাদ রায়ের ঘাট, ১১. ধনুঘাট ১২. পরাণ-বাবুর ঘাট, ১৩. চিৎপুরে হরি পোদ্দারের ঘাট।

দ্বিতীয় তালিকা॥ ১. চিৎপুর পুল ঘাট, ২. ওল্ড পাউডার মিল ঘাট, ৩ রঘু মিত্রের ঘাট, ৪. কাশীরাম মিত্রের ঘাট, ৫. বনমালী সরকারের ঘাট, ৬. কেটুয়া ঘাট, ৭. রথতলা ঘাট, ৮ সুতানুটী ঘাট, ৯. আহিরীটোলা ঘাট, ১০. মানিক বসুর ঘাট, ১১ মদনবাবুর ঘাট, ১২. টুন্নবাবুর ঘাট, ১৩. নিমতলা ঘাট, ১৪. জোড়াবাগান ঘাট, ১৫. গোকুলবাবুর ঘাট, ১৬. কাটমার (কতমার) ঘাট, ১৭. পাথুরিয়া ঘাট, ১৮. গিরিবাবুর ঘাট, ১৯. শিবতলা ঘাট, ২০. হরিনাথ দেওয়ানের ঘাট, ২১. শোভারাম বসাকের ঘাট, ২২. নবাবের ঘাট, ২৩ বৈষ্ণব দাসের ঘাট, ২৪. মীরবহর ঘাট, ২৫. কদমতলা ঘাট, ২৬. কাশীনাথ বাবুর ঘাট, ২৭ হুজুরিমলের ঘাট, ২৮. নয়ান মল্লিকের ঘাট, ২৯. বলরাম চন্দ্রের ঘাট, ৩০. গ্রেট বাজার (বড়বাজার) ঘাট, ৩১. রসবিবির ঘাট, ৩২. ব্যারেটো সাহেবের ঘাট, ৩৩ জ্যাকসন ঘাট, ৩৪. ফোরম্যান সাহেবের ঘাট, ৩৫. ব্লাইথ সাহেবের ঘাট, ৩৬. ওল্ড ফোর্ট (পুরাতন কেল্লা) ঘাট, ৩৭. নিউ হোয়ার্ফ (নতুন কাঠের জেটি) ঘাট, ৩৮. নতুন ডক ঘাট, ৩৯. Cuchagoody Ghat, ৪০. চাঁদপাল ঘাট।

তৃতীয় তালিকা॥ ১. বাগবাজার খালের দক্ষিণে রুস্তমজীর ঘাট, ২. দুর্গাচরণ মুখার্জির ঘাট, ৩. রাজা নবকৃষ্ণের ঘাট, ৪. রাজা রাজকৃষ্ণের ঘাট, ৫. প্রমদা-সুন্দরীর ঘাট, ৬. রসিক নিয়োগীর ঘাট, ৭. ঠাকুরবাড়ি ঘাট, ৮. গোলাবাড়ি ঘাট, ৯. থানা-বাড়ি ঘাট, ১০. রাজা রাজবল্লভের ঘাট, ১১. কুমারটুলির ঘাট, ১২. চাঁপাতলার ঘাট, ১৩. বীরু মল্লিকের ঘাট, ১৪. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট, ১৫. আদ্যশ্রাদ্ধ ঘাট, ১৬. শ্রাদ্ধঘাট, ১৭. নিমাই মল্লিকের ঘাট, ১৮. গণপৎ রায় কাঁয়ার ঘাট, ১৯. রামচন্দ্র গোয়েঙ্কার ঘাট, ২০. ছোটেলালের ঘাট, ২১. মতি-শীলের ঘাট, ২২. বাবুঘাট, ২৩ আউট্রাম ঘাট, ২৪. পানিঘাট, ২৫. পাউডার ঘাট, ২৬. প্রিন্সেপ ঘাট, ২৭. বালুঘাট, ২৮. তক্তাঘাট, ২৯. দৈ ঘাট।

ঘাট-পরিচয় : প্রথম তালিকা
[উত্তর থেকে দক্ষিণে]

১. প্রামাণিক ঘাট

কাশীপুরের সর্বোত্তর রাস্তার নাম প্রামাণিক ঘাট রোড।* এই রাস্তা প্রামাণিক ঘাটে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই রাস্তার দু'ধারে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দে-প্রামাণিক উপাধিধারী বৈশ্য গন্ধবণিকগণের বাস। এই বংশেরই একজন উত্তর-পুরুষ ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে বাংলা ১৩২৯ সালে, ইং ১৯২২ সনে নিজ বংশের এক কুলপঞ্জিকা সংকলন ক'রে ছাপান। তিনি পেশায় ছিলেন সিভিল এনজিনিয়ার। বালী ব্রিজ তৈরি হবার সময় তিনি এনজিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর ঠিকানা—প্রামাণিক বাটী, প্রামাণিক ঘাট রোড, বরাহনগর। এই বাড়ির পূর্ব পাশের বাড়িতে থাকেন কলকাতা ৪০এ নং স্ট্র্যাণ্ড রোডের বিখ্যাত হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা শেঠ দে অ্যাণ্ড কোম্পানি-র অন্যতম অংশীদার দে মহাশয়েরা। তাঁরা আমাকে তাঁদের বংশলতিকা দেখতে দিয়ে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই বংশলতিকা থেকে জানা যায়, এই বংশের আদিপুরুষ ৺কামদেব দে আনুমানিক বঙ্গাব্দ ১০ম শতাব্দীতে, অর্থাৎ ইং ১৪৯৪ ও ১৫৯৩খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বর্ধমান জেলায় অন্তর্গত সেলিমপুর গ্রামে বাস করতেন। তাঁর অধস্তন নবম পুরুষ কৃষ্ণদাস দে আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৬৯৪ থেকে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে ব্যবসা উপলক্ষে বরাহনগরে এসে বাস করেন ও প্রামাণিক উপাধি পান। এঁর অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ ৺দুর্গাপ্রসাদদে-র কর্তৃত্বাধীনে ও রামগোপাল দে-র বিশেষ উদ্যোগে ১২৫৯বঙ্গাব্দে (১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে) গঙ্গাতীরে দক্ষিণা কালিকা ৺কৃপাময়ীর প্রস্তরমূর্তি ও তাঁর পাশে মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ দু'জন দে-প্রামাণিকের দ্বারা প্রামাণিক ঘাট তৈরি হয় বলে এঁরা আমাকে জানালেন। এও হতে পারে যে এখানে আগে থাকতেই একটা ঘাট ছিল। দে-প্রামাণিকেরা পরে এসে সেই ঘাটেই নিজেদের ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। ঘাটের উপরেই ৺প্রেমনাথ মল্লিকের অট্টালিকা। এই প্রেমনাথ মল্লিক ১৯৩০ সনে এই ঘাটটির সংস্কার করেন।

২. কাশীপুর শ্মশানঘাট

এই শ্মশানঘাট প্রামাণিক ঘাটের দক্ষিণে। এই শ্মশানের দেওয়ালে লেখা আছে—'কলকাতার শহরতলির মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ হিন্দুসম্প্রদায়ের

* যাঁর নামে প্রামাণিক ঘাট রোড তাঁর নাম হচ্ছে দুর্গাপ্রসাদ (ম্যাপে আছে দুর্গাচরণ) দে প্রামাণিক।

ব্যবহারের জন্য এই শ্মশানঘাট ১৮৭৪-৭৫ সনে তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। নড়ালের জমিদার বাবু চন্দ্রকুমার রায় ও তাঁর ভাই বিনামূল্যে এই জমি দান করেছেন।' লেখাটি ইংরেজিতে। আমি তার বাংলা তর্জমা ক'রে দিলাম।

চন্দ্রকুমার রায় হলেন রতন রায়ের বড় ছেলে। তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম কালীপ্রসন্ন রায়।

এই শ্মশানে কয়েকজন দেশবরেণ্য নর ও নারীকে দাহ করা হয়। তাঁদের স্মৃতিফলক এখানে আছে। সেগুলি এই :

॥ ক ॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।
(সন ১২৪২-১২৯৩)
ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়
কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান
তীর্থ-বন্দনা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি
১৯ ফাল্গুন, ১৩৬৩
৩রা মার্চ, ১৯৫৭
রবিবার

॥ খ ॥ স্বামী অভেদানন্দ
In Memory of
Srimat Swami Abhedananda
Direct disciple of
Sri Ramakrishna Paramahamsa
Advent October 2, 1866, Ascension September 8, 1939
Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta.

॥ গ ॥ Swami Krishnananda
Disciple of
Sri Ma Sarada Devi
(1890-1963)
শ্রীমা সারদাদেবীর শিষ্য
স্বামী কৃষ্ণানন্দ (জঙ্গলীবাবা)
১২৯৭-১৩৭০

॥ ঘ ॥ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
সন্ন্যাসিনী শিষ্যা
গৌরীমাতা
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের উদ্যোগে স্থাপিত — ১৩৪৫

Gouri-Mata
Disciple of Sri Sri Ramakrishna Deva
And
Founder of Saradeshwari Asram
মহাসমাধি
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ সাল, মঙ্গলবার
অমাবস্যা।

॥ ঙ ॥ Durga Mata
Disciple of Sri Sri Saradeshwari Devi
জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর
সন্ন্যাসিনী শিষ্যা
দুর্গামাতা
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের উদ্যোগে স্থাপিত—১৩৭২।
মহাসমাধি
২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৭০ (১৯৬৩)
বৃহস্পতিবার, শ্যামা চতুর্দশী

॥ চ ॥ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা সহচর
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
"শ্রীম" (মাষ্টার মহাশয়)

জন্ম	মহাসমাধি
৩১শে আষাঢ়	২১শে জ্যৈষ্ঠ
১২৬১ সাল	১৩৩৯

'OM'
Sri Mahendra Nath Gupta
"M"
The Evangelist
Apostle of Sri Ramakrishna Avatar
Birth July 14th 1854 Passing Away June 4th 1932

॥ ছ ॥ নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী
স্মৃতিরক্ষা কমিটি নিবেদিত,
সঞ্চারী (নাট্যসংস্থা) আয়োজিত
উন্মোচক—মাননীয় শিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.)
৩০শে জুন ১৯৭৭
—ওঁ নমো নটনাথায়—

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী
জন্ম—২রা অক্টোবর ১৮৮৯। মৃত্যু—৩০শে জুন ১৯৫৯
প্রতিষ্ঠাদিবস ২রা অক্টোবর ১৯৬৯
কলিকাতা পৌরসভা

॥ জ ॥ ৺শিশির আচার্য্যের মহাপ্রয়াণে শেষবাণী—
"মোর যত সাধনা এ জীবনে,
শেষ হল শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে।"
জন্ম ১৮৯৩ মৃত্যু ১৯৭০
রাজসাহী সোদপুর

॥ ঝ ॥ অগ্নিযুগে আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট সভ্য,
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী,
স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্ভীক যোদ্ধা—নিত্যানন্দ অবধূতের
মন্ত্র-শিষ্য বীরবিপ্লবী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে
জন্ম ১২৯৬ সাল মৃত্যু ১৩৪৬ সাল
১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে পৌষ

৮. রতনবাবুর ঘাট

রতনবাবুর ঘাট কাশীপুর শ্মশানঘাটের দক্ষিণে। রতনবাবু রোড শেষ হয়েছে এই ঘাটে এসে। রতনবাবুর পুরো নাম রামরতন দত্তরায়। ইনি যশোর জেলার নড়াইল জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺কালীশঙ্কর দত্তরায়ের পৌত্র এবং রামনারায়ণ দত্তরায়ের পুত্র। সংক্ষেপে লোকে এঁকে রতন রায় বা রতনবাবু বলত। ইনি দুর্দান্ত জমিদার ছিলেন। আয়ুষ্কাল ১৭৮৫-১৮৬০। এঁর নামেই রতনবাবু রোড। এই রোডের উপর উত্তরদিকে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি ও দক্ষিণ দিকে ঠাকুর-বাড়ি। রতনবাবুই গঙ্গায় স্নানের ঘাট তৈরি করিয়ে দেন। কিন্তু কবে তৈরি করেন তা ঘাটের কোথাও লেখা নেই। তবে ১৮৬০ সনে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চয়ই।

রতনবাবুর ঘাটের কাছে রতনবাবু রোডের শেষ প্রান্তে রাস্তার দক্ষিণ দিকে মালদা জেলার চাঁচলের রাজা শিবদাস (বা শিবশঙ্কর) রায়চৌধুরী গঙ্গাবাসের জন্য প্রকাণ্ড বাগান সমেত এক সুন্দর তিনতলা প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। ঝকঝকে দরজা, জানালা, দেওয়াল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর—মার্বেল পাথরের মেঝে—চকমেলানো বাড়ি। চৌহদ্দির মধ্যে তিনটে বড় বড় বাগান—আম, কাঁঠাল ও লিচু। তাছাড়া ডাব নারকেলের গাছ ছিল প্রচুর। পাশের কাশীপুর শ্মশানের দুর্গন্ধে রাজাসাহেব এমন শখের বাগানবাড়িতে টিকতে পারলেন না। বাগান বিক্রি ক'রে দিলেন এক সাহেবকে। তিনি ভিতরের দিকে এক চটকল

বানালেন। পরে সাহেব শুধু চটকলটি রেখে বাকি জমি ও বাড়ি এক মাড়োয়ারিকে বেচে দিলেন। এখন সেই মাড়োয়ারি এই বাগানবাড়ির সামনের অংশের মালিক। এই অংশে ২২ বিঘে জমি। এখন রাজবাড়িতে 'কাশীপুর ইনস্টিটিউশন ফর বয়েজ' নামে ছেলেদের এক স্কুল ও একটা ক্লাব হয়েছে।

চাঁচলের এই রাজাবাহাদুর কলকাতার হ্যারিংটন স্ট্রিটে রাজবাড়ি তৈরি ক'রে বাস করতেন।

৪. রানী দেবেন্দ্রবালার ঘাট

রানী দেবেন্দ্রবালা পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পুত্র রাজা গিরীশচন্দ্র সিংহের পত্নী ছিলেন। কাশীপুরে পাইকপাড়ার রানী কাত্যায়নীর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ির কাছে এই ঘাট।

৫ রুস্তমজীর ঘাট

রুস্তমজী ছিলেন পার্সি। এঁর পুরো নাম—রুস্তমজী কাওয়াসজী বানাজী। জন্ম: বোম্বাই শহরে ১৭৯০ সনে, মৃত্যু কলকাতায় ১৮৫২ সনে। প্রথম পার্সি ভদ্রলোক যিনি ব্যবসা উপলক্ষে বোম্বাই থেকে কলকাতায় আসেন তাঁর নাম দাদাভাই বেহরামজী বানাজী। তিনি এসেছিলেন ১৭৬৭ সনে। দ্বিতীয় পার্সি ভদ্রলোক যিনি বোম্বাই থেকে কলকাতায় আসেন তিনিই হচ্ছেন রুস্তমজী কাওয়াসজী। তিনি ঐ প্রথম পার্সি ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন ১৮০৬ সনে। কিন্তু বেশিদিন এখানে থাকেন নি। কিছুদিন পরে বোম্বাইতে ফিরে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার আসেন ১৮০৯ সনে। এবার এসে কলকাতায় বরাবরের জন্য রয়ে গেলেন। এখানে এসে একটা জাহাজের সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। চীনদেশের সঙ্গে ভারতীয় আফিমের ব্যবসা করতেন। কিন্তু সংকল্প করলেন আফিম চালান দেবেন পরের জাহাজে নয়, নিজের জাহাজে। তাই খিদিরপুরের জাহাজ তৈরির পুরনো ডকটা কিনে ফেললেন। সেই ডকে তাঁর চীনগামী জাহাজ তৈরি হতো। ভারতে বাষ্পীয় জাহাজ ও জীবনবীমা প্রবর্তন বিষয়ে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তিনি। ১৮৩৫ সনে তিনি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৩৮ সনে তাঁর স্ত্রী বোম্বাই থেকে সমুদ্রপথে প্রথম কলকাতায় আসেন। ১৮৩৯ সনে ডোমটুলিতে (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) জমি কিনে পার্সিদের জন্য কলকাতায় প্রথম 'আগিয়ারি' বা অগ্নি-মন্দির তৈরি করেন। এই মন্দিরের দ্বারোদঘাটন হয় ১৬-৯-১৮৩৯ তারিখে। এজরা স্ট্রিটের পাশের গলির নাম এখনো পার্সি চার্চ স্ট্রিট (Parsi Church Street)। এঁর নামে বরাহনগরে একটি রাস্তা আছে, তার নাম—রুস্তমজী পার্সি রোড। সেখানে তাঁর এক

ছোটখাটো বাষ্পীয় জাহাজ তৈরি করবার ডক ছিল। আর একটি রাস্তা আছে কলকাতায় বালিগঞ্জে—রুস্তমজী স্ট্রিট। এই রাস্তাটি গড়িয়াহাট রোড থেকে বেরিয়েছে।

তাঁর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ছিল আপার সার্কুলার রোডে। গৃহপ্রবেশের দিন সেখানে একটা বড় রকমের বলনাচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। সেই জায়গাটার নাম তারপর থেকে হয়েছে 'পার্সিবাগান'। এখন যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ রয়েছে। উত্তর পাশের গলির নাম 'পার্সিবাগান স্ট্রিট'—সেই বাগানবাড়ির স্মৃতি রক্ষা করছে।

রুস্তমজী কাওয়াসজীর পুত্রের নাম—মানেকজী রুস্তমজী (১৮১৫-৯১)। ইনি পিতার মৃত্যুর পর ১৮৫২ সনে 'রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানি' নামে পৈতৃক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়ে চীনের সঙ্গে কারবার বজায় রাখেন। ইনিও পার্সিবাগানের পৈতৃক অট্টালিকায় বাস করতেন। কলকাতার পার্সি সম্প্রদায় দাবি করেন যে এঁরই নামে মানিকতলা অঞ্চলটির নাম হয়েছে—মানিকপীরের নাম থেকে নয়। ইনিও পিতার মতো কলকাতার পার্সি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে ইনিই প্রথম শেরিফ নিযুক্ত হন ১৮৭৪ সনে।

মানেকজী রুস্তমজীর পুত্র হীরজীভাই মানেকজী রুস্তমজী (১৮৪৫-১৯০৪)। ইনিও পিতার মৃত্যুর পর কলকাতার পার্সি সম্প্রদায়ের নেতা, শেরিফ ইত্যাদি হয়েছিলেন। Rumstomjee, Turner and Company নামে রুস্তমজী কাওয়াসজীর এক এজেন্সি হাউস (Agency House) ছিল; কলকাতায় অফিস ছিল ৩নং পোলক স্ট্রিটে।

৬. প্রাণনাথ রায়চৌধুরীর ঘাট

প্রাণনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার জমিদার। কাশীপুরে তাঁর বাড়ি আছে, তাঁর নামে রাস্তাও আছে।

৭. হীরালাল শীলের ঘাট

হীরালাল শীল ছিলেন মতিলাল শীলের বড় ছেলে। কাশীপুরে এঁদের প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি ছিল। কাশীপুরের 'মতিঝিল' মতিলাল শীলের সম্পত্তি। তাঁর নামেই ঝিলের নাম হয়েছে।

৮. রাজা বৈদ্যনাথ রায়বাহাদুরের ঘাট

এই ঘাটের আর এক নাম গান ফাউনড্রি ঘাট। রাজা বৈদ্যনাথ ছিলেন পোস্তার রাজা সুখময় রায়ের তৃতীয় পুত্র। কাশীপুরে এঁর বিরাট বাগান সমেত

বসতবাড়ি এখনো আছে।

৯. ব্রহ্মময় দাসের ঘাট

বিবরণ জানা নেই।

১০. দেবীপ্রসাদ রায়ের ঘাট

দেবীপ্রসাদ রায় 'নাদিরুল কিশ্‌ওয়ার' (বাংলা মানে, 'দেশের দুষ্প্রাপ্য বস্তু') নামে একখানি গ্রন্থ স্কুলের ছাত্রদের জন্য রচনা করেন। বড়বাজার-নিবাসী বসু রামরতন মল্লিকের বেতনভোগী মুনশি ছিলেন।

১১. ধন্নু ঘাট

বিবরণ জানা নেই।

১২. পরাণবাবুর ঘাট

শুধ, পরাণবাবু বলতে মাত্র একটি লোককেই বোঝায়। তিনি হচ্ছেন বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের একাধারে শ্যালক ও শ্বশুর এবং রাজা বনবিহারী কাপুরের পিতা—বাবু পরাণচাঁদ কাপুর। তিনি কলকাতার চিৎপুরে এসে ঘাট তৈরি করিয়ে দেবেন একথা বিশ্বাস হয় না। এ পরাণবাবু হয়তো কোনো স্থানীয় লোক যাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না।

১৩. হরি পোদ্দারের ঘাট

হরিপোদ্দারের পুরো নাম হরিমোহন পোদ্দার। ইনি স্থানীয় বড়লোক ছিলেন। চিৎপুরে এঁর এক বাগানবাড়ি ও বাজার ছিল।

এখানে কাশীপুর-চিৎপুর ঘাট শেষ।

ঘাট-পরিচয় : দ্বিতীয় তালিকা
[উত্তর থেকে দক্ষিণে]

১. চিৎপুর পুল ঘাট

তালিকার প্রথম ঘাট হচ্ছে 'চিৎপুর পুল ঘাট'। এই ঘাটের নাম শুনলেই মনে হতে পারে যে, সার্কুলার খালের ওপর এই পুল ছিল—এখন যেমন আছে।

কিন্তু তা ভাবলে ভুল হবে। তখন সার্কুলার খালের অস্তিত্ব ছিল না। ঐ খাল কাটা হয় অনেক পরে। ঐ পুল ছিল মারাঠা খাতের ওপর।

২. ওল্ড পাউডার মিল ঘাট

পুরনো বারুদ কারখানার ঘাট। ইংরেজদের কলকাতায় বাসের আদিপর্বে এখানে একটা মস্তবড় বাগান ছিল। নাম ছিল পেরিন সাহেবের বাগান। পেরিন সহেব ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন। তাঁর নিজেরও ২-৩টি জাহাজ ছিল। এই বাগানে কোম্পানির বড় সাহেবেরা তাঁদের শ্রীমতীদের নিয়ে সন্ধ্যা-বেলায় কিংবা চাঁদনি রাতে বেড়াতে আসতেন ডিহি বা টাউন কলকাতা থেকে। ১৭৪৬ সন নাগাদ সাহেব-বিবিদের আনাগোনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৫২ সনে এই পরিত্যক্ত বাগানের এমনই হীন দশা হয় যে ঐ সনে বাগানটি নিলামে ওঠে। কলকাতার জমিদার হলওয়েল সাহেব মাত্র ২৫০০ টাকায় বাগানটি কেনেন। তিনি আবার ১৭৫৫ সালে কর্নেল ক্যারোলাইন ফ্রেডারিক স্কটের কাছে বিক্রি ক'রে দেন। এই কর্নেল সাহেব ছিলেন পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সেনাধ্যক্ষ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথম স্ত্রী মেরির পিতা। এই মহিলার প্রথম স্বামী ছিলেন ক্যাপ্টেন জন বুকানন। তিনি 'অন্ধকূপে' মারা গেলে তাঁর বিধবা পত্নী ওয়ারেন হেস্টিংসকে বিবাহ করেন ফলতায়। সেনাপতি স্কট সাহেব এই বাগানের মালিক হয়েই এখানে একটি বারুদ তৈরির কারখানা খোলেন। কর্নেল স্কটের মৃত্যুর পর এই বারুদ কারখানার বাগান কোম্পানির হাতে চলে যায় ১৭৫৫ সনে। ৺হরিদাস সাহার বর্তমান চুনের গুদামের জায়গায় কোম্পানি একটি ছোট কেল্লার মতো আটকোণা বাড়ি (ইংরেজি নাম Redoubt) তৈরি করেন। এতে ৬০ জন সৈন্য ধরত। ১৭৫৬ সনে সিরাজ-উদ্-দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় পেরিনের বাগানের ৬০ জন ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে নবাবের সৈন্যদের যুদ্ধ হয়। ইংরেজ সৈন্য হেরে যায়।

আপজনের ম্যাপে এই ঘাটের সোজা পূর্বদিকে পাউডার মিল রোড ও তার একটু উত্তরে পাউডার মিল বাজার দেখানো হয়েছে। অনেকে পাউডার মিল রোডকে বাগবাজার স্ট্রিট বলেছেন। আপজনের ম্যাপে বাগবাজার আলাদা দেখানো আছে—ওল্ড পাউডার মিল ঘাট ও রঘু মিত্রের ঘাটের মাঝামাঝি, রাস্তার পূর্বদিকে।

বাগানকে ফার্সিতে 'বাগ' বলে। সেযুগে ইংরেজরাও সাধ্যমতো ফার্সি কথা ব্যবহার করত। পেরিনের বাগানকে বলত পেরিনের বাগ। এই পেরিনের বাগ থেকেই বাগবাজার নামের উৎপত্তি। 'বাঘ' এর সঙ্গে 'বাগ'বাজারের কোনো সম্পর্ক নেই।

৩. রঘু মিত্রের ঘাট

রঘু মিত্রের পুরো নাম রঘুনাথ মিত্র। ইনি কালো জমিদার কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র ও দলিল জাল করার অপরাধে যে রাধাচরণ মিত্রের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল তার পিতা। পরে রঘু মিত্রের ঘাটের নাম হয় 'অন্নপূর্ণার ঘাট'। এখনো সেই নাম আছে। রঘু মিত্রকে লোকে ভুলে গেছে।

বাগবাজারের বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে মাসে ৪ টাকা মাইনেতে কলকাতার আমিন নিযুক্ত হন। হেস্টিংস বিলেত যাওয়ার সময় তাঁকে ৫২ বিঘে জমি দান করেন। বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী অন্নপূর্ণা ঘাটে চারটি শিব মন্দির তৈরি করেন ১৭৭৬ সনে। শিবমন্দির তৈরির পর বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী অন্নপূর্ণা দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবীর নামেই ঘাটের নাম হয় অন্নপূর্ণা ঘাট। বিষ্ণুরাম চক্রবর্তীর এক পুত্র ছিলেন, নাম রাধাকান্ত চক্রবর্তী। অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির ১৯৩ নং বাগবাজার স্ট্রিটে আজও আছে।

৪. কাশীরাম মিত্রের ঘাট

ম্যাপে ভুল নাম আছে, হবে কাশীশ্বর মিত্রের ঘাট। টালার বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার ৺নীলমণি মিত্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহের (ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার) নাম রুদ্রেশ্বর মিত্র। এঁরই ছোট ভাই কাশীশ্বর মিত্র। কাশীশ্বর মহা ধনী ছিলেন। তাঁর চার পত্নী, কারোই সন্তান না হওয়ায় তিনি সৎকাজে সব টাকা খরচ করতেন। ১৭৭৪ সনে তিনি গঙ্গার ধারে শবদাহের ঘাট তৈরি করিয়ে দেন, ঘাটের কিছু পুব দিকেই তাঁর খুব বড় বাড়ি ছিল। এর কাছেই একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহারাজা নন্দকুমারের বিচারের সময় কাশীশ্বর মিত্র তাঁর পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। এই কাশীশ্বর মিত্র রাজা রাজবল্লভ সোমের ভাগ্নে নন। তাঁর ভাগ্নের নাম কাশীনাথপ্রসাদ মিত্র।

কাশী মিত্রের শ্মশানের আয়তন গোড়ায় ছিল মাত্র নয় কাঠা। এই শ্মশান একসময় অবস্থাপন্ন হিন্দুরা ব্যবহার করত, কিন্তু এখন গরিবেরাই বেশি ব্যবহার করে। বিভিন্ন হাসপাতালের কাটা-ছেঁড়া মড়াও এখানে আগে পোড়ানো হতো। ১৮৮২-৮৩ সনে বাবু অক্ষয়চন্দ্র গুহ নিজের খরচে একটি গঙ্গাযাত্রীর আবাস তৈরি ক'রে দেন। ১৮৫৪ সনে এই কাশী মিত্রের ঘাট থেকেই ৩৯৮২টি মানুষের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়।

৫. বনমালী সরকারের ঘাট

আত্মারাম সরকার ভদ্রেশ্বর থেকে কলকাতায় এসে বাস করেন। তাঁর দুই পুত্র—বনমালী ও রাধাকৃষ্ণ। এঁরা জাতে সদ্‌গোপ। বনমালী সরকার পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ানি ক'রে অনেক টাকা করেন। পাটনা থেকে

কলকাতায় এসে কিছুদিন কোম্পানির ডেপুটি-ট্রেডার নিযুক্ত হয়েছিলেন। কলকাতা, হুগলি ও ২৪-পরগনায় তাঁর প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। চিৎপুর রোড থেকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত লম্বা এক বিরাট বাড়ি তিনি বসবাসের জন্য তৈরি করান। সে বাড়ি কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তার স্মৃতি আজও প্রবাদবাক্যের মতো হয়ে আছে—'বনমালী সরকারের বাড়ি'। তিনি একটি বিষ্ণুমন্দির ও একটি শিব-মন্দিরও স্থাপন ক'রে গেছেন। তাঁর ঘাট ও মন্দির দু'টি এখনো আছে।

৬. কেটুয়া ঘাট

বড় বড় মোটা কাঠ দিয়ে এই ঘাট তৈরি হয়েছিল বলে নাম কেটুয়া বা কেটো ঘাট।

৭. রথতলা ঘাট

প্রবাদ, নন্দরাম সেন এই ঘাট তৈরি করেন। আরো প্রবাদ, ধোপা রতন সরকার নন্দরামের প্রিয় চাকর ছিল। ১৬৭৯ সনে প্রথম ইংরেজ জাহাজ Falcon যখন কলকাতায় পৌঁছয় তখন তার ক্যাপ্টেন স্ট্র্যাফোর্ড সাহেব একজন 'দুবাস' (দোভাষি বা দালাল) চান। তিনি ধোবা চাইছেন ভেবে নন্দরাম রতন সরকারকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। রতন খুব চালাক-চতুর ছিল, দিব্বি কাজ চালিয়ে নেয়। তার নামে কলকাতায় দু'টি গলি আছে—রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট (মাথাঘসা গলি) ও রতু সরকার লেন (কলুটোলায়)। কেউ কেউ বলেন, রতন সরকার ও রতু সরকার আলাদা লোক। দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধানে বলেছেন, রতন সরকারই প্রথম বাঙালি যে ইংরেজি শেখে।

কিন্তু অন্য বিবরণ অনুসারে রতন সরকারকে ক্যাপ্টেন স্ট্র্যাফোর্ডের কাছে পাঠান নকু ধর বা লক্ষ্মীকান্ত ধর। পোস্তায় তাঁর বাড়ির কাছেই রতন সরকারের কাপড় কাচার জায়গা ছিল, যেটা পরে রতন সরকারের বাগান বা বাগানবাড়ি হয়ে দাঁড়ায়। সেইরকম রথতলার ঘাট সম্বন্ধেও অন্যমত আছে। সেই মত অনুসারে, এই ঘাট তৈরি করেন হরচন্দ্র মল্লিক, যাঁর নামে শোভাবাজার অঞ্চলে এক গলি আছে। বিংবদন্তি, শোভারাম বসাকের রথ এই ঘাটে থাকত, তাই ঘাটের নাম রথতলার ঘাট।

৮. সুতালুটী ঘাট

১৭৮৪-৮৬ সনে তৈরি মার্ক উডের কলকাতার ম্যাপ ১৭৯২ সনে উইলিয়াম বেলি ছাপান। এই ম্যাপে দেখানো হয়েছে উত্তরে চিৎপুর থেকে দক্ষিণে জোড়া-বাগান ঘাট পর্যন্ত জায়গাটা সুতালুটী বা সুতানুটী। এবং ঘাটের নাম দেওয়া

হয়েছে সুতলুটী হাটখোলার ঘাট। ১৭৯৪সনের আপজনের ম্যাপে শেঠ বসাকদের 'হাট সুতালুটী' আলাদা ক'রে দেখানো হয়েছে আহিরীটোলা ঘাটের উত্তরে। খোলা জায়গায় এই হাট বসত বলে এই হাটের জায়গার নাম ছিল হাটখোলা।

৯. আহিরীটোলা ঘাট

সংস্কৃত আভীর থেকে হিন্দি আহির শব্দ হয়েছে। আহিরীটোলা মানে গয়লা পাড়া। গয়লা পাড়াকে গোয়ালপাড়া বা গোয়ালটুলিও বলা হয়। আহিরীটোলা বিখ্যাত জায়গা। এখানে আগে অনেক বিখ্যাত লোকের বাস ছিল—যেমন, জনাই-এর জমিদার অ্যাটর্নি পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, ভোলানাথ চন্দ্র, বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

১০. মানিকবাবুর ঘাট

মানিকবাবুর নাম মানিকরাম বসু। ব্যবসা ক'রে অতুল ঐশ্বর্য করেন। ঢাকা জেলায় তাঁর বিস্তর জমিদারি ছিল। প্রবাদ, মানিকগঞ্জ হয়েছে তাঁরই নামে। তাঁর পৌত্র রামহরি, রামহরির পুত্র শিবনারায়ণ, শিবনারায়ণের চার কন্যা। প্রথম তিন কন্যা অপুত্রক মারা যান। কনিষ্ঠা কন্যা কৈলাসকামিনীর সঙ্গে প্যারীচরণ সরকারের বিয়ে হয়। এই মেয়েই পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ায় প্যারীচরণের পুত্রেরা ঐ সমস্ত সম্পত্তি পান। হাটখোলায় মানিকরাম বসুর বিরাট বাড়ি ও পাঁচ বিঘে জমি ছিল। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ৪৫ হাজার টাকায় ঐ জমি কিনে নেয়। বাঙলা গভর্নমেন্টের রাসায়নিক পরীক্ষক ডাঃ চুণীলাল বসু মানিকরাম বসুর বংশধর। বিখ্যাত ব্যারিস্টার ৺এইচ. ডি. (হরিদাস) বসুও এই বংশের সন্তান। তিনি মানিক বসুর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।

১১. মদন দত্তের ঘাট

মদন দত্তের পুরো নাম মদনমোহন দত্ত। ইনি হাটখোলার দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তেজারতি ক'রে ও মাল সমেত ডুবো জাহাজ কিনে অনেক টাকা করেন। এঁর নিজেরও জাহাজ ছিল। জন্ম ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ১-৪-১৭৮৭ তারিখে, অন্যমতে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে।

রামদুলাল দে (সরকার) এই মদনমোহন দত্তের সংসারে প্রতিপালিত হন। পরে তাঁরই কাছে ৫ টাকা মাইনের বিল সরকার ও আরো পরে ১০ টাকা মাইনের শিপ সরকারের চাকুরি করেন। তিনি যে শেষপর্যন্ত ধনকুবের হয়েছিলেন তা এই মদনমোহন দত্তের কৃপায়।

এই দত্ত পরিবারের আদিবাস ছিল বালীতে। সেখান থেকে তাঁরা যান

আন্দুলে। আন্দুল থেকে আসেন গড় গোবিন্দপুরে, সেখান থেকে হাটখোলায়। মদনমোহন দত্ত পুরনো বাড়িতে ও তাঁর খুড়তুতো ভাই জগৎরাম দত্ত ৭৮ নং নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে ১৭৯৪ সনে নতুন বাড়ি তৈরি ক'রে বাস করেন। জগৎরামের পুত্র কাশীনাথ দত্ত। তাঁর বংশধরেরা নিমতলার বাড়িতে এখনো বাস করছেন। জগৎরাম দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র হরসুন্দর দত্ত কোন্নগরে দ্বাদশ শিবমন্দির ও ঘাট তৈরি করেন ১৮২১ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে।

১২. টুনুবাবুর ঘাট

টুনুবাবুর আসল নাম রামতনু দত্ত। ইনি মদনমোহন দত্তের বড় ছেলে। আঠারো শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতায় যে বিখ্যাত ৮ বাবু ছিলেন তাঁদের মধ্যে ইনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। এঁর বাবুগিরির কথা আষাঢ়ে গল্পের মতো শোনায়। প্রত্যহ এঁর বাড়ি ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত গোলাপজল ও আতর দিয়ে ধোয়া হতো, প্রত্যহ এঁর বাড়িতে ১০০টির বেশি সোনারুপোর থালা ব্যবহার হতো। পেতল বা কাঁসার বাসন বাড়িতে ঢুকতে পেত না। টুনুবাবু ৪০-৫০ টাকা দামের ঢাকাই কাপড় পরতেন, একবার পরেই ফেলে দিতেন। কোমরে লাগবার ভয়ে সেখানকার পাড় কেটে ফেলে পরতেন, ইত্যাদি।

আপজনের ম্যাপে না থাকলেও এই ঘাটের পাশেই বর্তমানে একটা ঘাট আছে। তার নাম লেখা আছে 'মোহনটুনির ঘাট'। এই ঘাটের নাম নানা জনে নানাভাবে লিখেছেন—মোহনটুনের ঘাট, মোহনটুলির ঘাট, মোহন্তর ঘাট। এগুলো সবই বিকৃত নাম। বর্তমানে মদনমোহন দত্তের ঘাট লুপ্ত হয়েছে, রামতনু দত্তের ঘাটও নেই। তাই পাশাপাশি দু'টো লুপ্ত ঘাটকে এক ক'রে দেখাবার জন্য মদনমোহন দত্তের মধ্য অংশ 'মোহন' নিয়ে ও রামতনু দত্তের নামের মধ্য অংশ 'তনু' নিয়ে 'মোহন তনুর ঘাট' নাম রাখা হয়েছে। 'মোহন তনু' লোকমুখে ক্রমশ বিকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মোহনটুন' 'মোহনট্যান', 'মোহনটুলি' ও 'মোহন্ত' ইত্যাদি।

১৩. নিমতলা ঘাট

এখন যেখানে আনন্দময়ী কালীর মন্দির আছে, আগে নিমতলা শ্মশানঘাট সেইখানে ছিল, তখন মন্দির তৈরি হয় নি। শ্মশানের মধ্যেই কালী ছিলেন, এই জন্য ইনি শ্মশানকালী। শ্মশানের পাশেই ছিল গঙ্গা। তখনো স্ট্র্যাণ্ড রোড হয় নি। স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর দিয়ে গঙ্গা বইত।

তারপর স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরি হলে শ্মশান উঠে গেল কালীমন্দিরের সোজা পশ্চিমে গঙ্গার ধারে—বর্তমান নিমতলা শ্মশানের দক্ষিণে।

১৬০ ফুট লম্বা ও ৯০ ফুট চওড়া জায়গা তিনদিকে ১৫ ফুট উঁচু পাচিল

দিয়ে ঘেরা, শুধু নদীর দিকটা খোলা—এই ছিল শ্মশান। এই শ্মশান তৈরি হয় ১৮২৮ সনের মার্চ মাসে। ১৭-৩-১৮২৮ তারিখ থেকে এখানে মড়া পোড়ানো আরম্ভ হয়।

রানী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস এই শ্মশানের দক্ষিণে গঙ্গাযাত্রীদের থাকবার জন্য একটি পাকা ঘর তৈরি ক'রে দেন। সেযুগে পারতপক্ষে কোনো মুমূর্ষুকে নিজের বাড়িতে মরতে দেওয়া হতো না। বাড়িতে মরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা ও অধর্মের কাজ বলে মনে করা হতো। যে বাড়িতে মরত লোকে ধরে নিত যে সে পাপী, সে মরলে তার আত্মার সদ্গতি হবে না। তাই মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করানো, অর্থাৎ ঘটা ক'রে তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে যাওয়া হতো। এই রকম মৃতপ্রায় লোককে বলা হতো গঙ্গাযাত্রী। এদের আশ্রয়ের জন্য গঙ্গার ধারে যদি কোনো ঘর থাকত তাহলে সেই ঘরে তাদের রাখা হতো যতদিন না তাদের মৃত্যু হয়। এই ঘরকে বলা হত গঙ্গাযাত্রীর ঘর। অনেক পুণ্যলোভী বড়লোক গঙ্গার ধারে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য ঘর তৈরি ক'রে দিতেন।

প্রতিদিন জোয়ারের সময় মুমূর্ষুকে তার আত্মীয়-স্বজনেরা ঘর থেকে বার ক'রে গঙ্গার জলের ভেতর তার দেহের অনেকখানি ডুবিয়ে রেখে দিত। একে বলা হতো অন্তর্জলী করা। এই অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হতো তাহলে মনে করা হতো সে সোজা স্বর্গে যাবে। এইরকম ভাবে দিনের পর দিন অন্তর্জলী করার ফলে ও রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কষ্ট পেয়ে একদিন বেচারা মারা যেত। তখন তার একটু মুখাগ্নি ক'রে তাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাও করতে হতো না। জোয়ারের জল তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তখন বেশির ভাগ লোক এত গরিব ছিল যে মড়া পোড়াবার জন্য সামান্য কাঠ, তেল কেনাও তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। তারা মুখে আগুন না ছুঁইয়েই নিজেদের মড়া গঙ্গায় ভাসিয়ে দিত। এইরকম ক'রে গাদা-গাদা মৃতদেহ কাশীমিত্তির ও নিমতলা ঘাট থেকে রোজ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হতো।

এইজন্য এক সময়ে চাঁদা তুলে গরিবদের মড়া পোড়াবার জন্য একটা ফাণ্ড তৈরি করবার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। হিসেব ক'রে দেখানো হয়েছিল যে মাত্র দু' টাকায় একটা মড়া স্বচ্ছন্দেই পোড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সে প্রস্তাবে কোনো ফল হয় নি।

শবদাহ সাধারণভাবে শাস্ত্রসম্মত হলেও কয়েক শ্রেণীর লোক ও সম্প্রদায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। সেগুলি এই: ক. মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ কিংবা দু'বছরের কম বয়সের শিশু, খ. কুষ্ঠ ইত্যাদি কতকগুলি রোগগ্রস্ত লোক, গ. আত্মহত্যাকারী, ঘ. সর্প দংশনে মৃত ব্যক্তি, ঙ. কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় অপরাধে অপরাধী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি, চ. বৈষ্ণব (বোষ্টম) প্রভৃতি কতকগুলি ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, ছ. সন্ন্যাসী এবং জ. যুগী নামধারী অনুন্নত

হিন্দু তাঁতি সম্প্রদায়ের লোক।

ক. চ. জ.-চিহ্নিত ব্যক্তিদের মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। এই জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে ৩টি হিন্দু সমাধিস্থান আছে। খ. গ. ঘ ও ঙ-চিহ্নিত লোকেদের মৃতদেহ সৎকার না ক'রে বনে বা নদীতে নিক্ষেপ করাই শাস্ত্র-সংগত। ছ. -চিহ্নিত ব্যক্তিদের মৃতদেহ একটি পাথরের বা কাঠের বাক্সে ভরে, কিংবা মাটিভরা দু'টি কলসির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর মধ্যখানে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়াই বিধেয়।

মোট কথা, সব মিলিয়ে শত-শত মানুষের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হতো। বাংলা প্রদেশের স্যানিটারি কমিশনের প্রেসিডেণ্ট জন স্ট্র্যাচি ৫-৩-১৮৬৪ তারিখে লেখেন : 'যে নদী কলিকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রন্ধন ইত্যাদি গৃহকার্যের জন্য জল যোগায় সেই নদীতে প্রতি বছর ৫ হাজারের ওপর মানুষের মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয়। মাত্র সরকারি হাসপাতালগুলি থেকেই এক বছরে ১৫০০ মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

১৮৫৪ সনে বাংলা প্রদেশের সরকার এই প্রথা বন্ধ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার দরুণ অকৃতকার্য হয়। তখন সরকার কলকাতার পুলিশ কমিশনারের অধীনে কতকগুলি নৌকো ও ডোম রাখল। তাদের কাজ হল কলকাতার গঙ্গায় টহল দেওয়া ও মানুষের মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখলেই সেগুলিকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া। কিন্তুএতে বিশেষ কাজ হয় নি। অনেক শবদেহ পুলিশের নজর এড়িয়ে যেত। এইসব মৃতদেহ পচে গলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে নদী-নালায় ভেসে বেড়াত। কতকগুলি শবদেহকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে শব ব্যবচ্ছেদের জন্য দিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু ব্যবচ্ছেদের পরেসেগুলিও আবার শ্মশানেই ফিরে আসত কাটা-ছেঁড়া অবস্থায়, আর সেই অবস্থাতেই তাদের জলে ফেলে দেওয়া হতো।

শুধু মানুষেরই মৃতদেহ নয়, জন্তু-জানোয়ারের মৃতদেহ কম সমস্যার বিষয় ছিল না। ১৮৩৭ সন থেকে কলকাতার প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটি ক'রে ডোম নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা জন্তু-জানোয়ারদের মৃতদেহ নিজের নিজের এলাকা থেকে গোরুর গাড়িতে তুলে গঙ্গার ধারে নিয়ে যেত। গঙ্গার ধার থেকে সব মৃত-দেহকে নিমতলা শ্মশানঘাটের সামনে এনে জড়ো করা হতো। সেখানে একজন চামড়াওয়ালা কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের (জাস্টিসেস্ অব দি পিস্) কাছ থেকে ঠিকা নিয়ে মরা জন্তুদের ছাল ছাড়িয়ে মুচিদের কাছে বিক্রি করত। আর ছাল ছাড়ানো দেহটা বা দেহের টুকরো টুকরো অংশগুলো সামনে ফেলে দিত। নিমতলা শ্মশানের পাঁচিলের উপর বসা অসংখ্য শকুনি ও নিচে অসংখ্য হাড়গিলে, শেয়াল ও কুকুর সেগুলোকে টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে খেত।

১৮৫৬ সনে নিমতলা ঘাটের উত্তরে গোলাবাড়ি ঘাট তৈরি করা হয় ৩২৬৩

টাকা খরচ ক'রে। এই সন থেকে নিমতলা ঘাটের পরিবর্তে এই ঘাটে সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মৃতদেহ জড়ো করা হতে লাগল। এই ঘাটটা মৃত জন্তু-জানোয়ার-দের ডিপো। একজন লোককে এই ঘাট ঠিকা দেওয়া হতো এই শর্তে যে,সে এই মরা জানোয়ারদের একটা ন্যায্য সময়ের মধ্যে এখান থেকে শহরের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাবে ও সেখানে গিয়ে তাদের ছাল ছাড়াবে। দশ বছর এই ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৬৭ সনে মিউনিসিপ্যালিটির রেল লাইন খোলবার পর এই ঘাটের কাজকর্ম বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, আর ঘাটটা পোর্ট-কমিশনারদের বিক্রি ক'রে দেওয়া হয় ১৮৭৪ সনে। ১৮৭০ থেকে সমস্ত মরা জন্তুদের ধাপায় ফেলা হচ্ছে।

১৮৫৭ সনে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা ৬১৮০ টাকা খরচ ক'রে নিমতলা শ্মশানঘাটের অনেক উন্নতি করেন। ঐ টাকার মধ্যে বাবু রাজনারায়ণ দত্ত দেন ২৫০০ টাকা।

কিন্তু মানুষের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলার সমস্যা তখনো রয়ে গেল। বাংলার ছোটলাট স্যার সিসিল বীডন নিমতলা ও কাশী মিত্রের শ্মশান দু'টিকে টালির নালার ধারে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ১৮৬৪ সনে তাঁর গভর্নমেণ্ট জাস্টিস অফ দি পিস্‌দের (তাঁরা তখন মিউনিসিপ্যালিটির কাজ চালাতেন) দৃষ্টি এই সমস্যার দিকে আকর্ষণ করেন। এই বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য তাঁদের এক সভা ডাকা হয়। সেই সভার সদস্য বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এমন যুক্তিপূর্ণ এবং ওজস্বী বক্তৃতা করেন যে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। তখন জাস্টিসেরা নিরুপায় হয়ে এক কমিটি নিয়োগ করেন, কী উপায় অবলম্বন করলে নদীর ধারে শবদাহকে যথাসম্ভব কম আপত্তিজনক করা যায় তা উদ্ভাবন করবার জন্য। রামগোপাল ঘোষ এই কমিটিরও সদস্য নির্বাচিত হন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় কমিটি ১৮৬৫ সনের মধ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা তুলে জাস্টিসদের চেয়ারম্যানের হাতে দেন। এই টাকা দিয়ে নিমতলা শ্মশানকে আরো বড় করা হয়, নদীর দিকটা একটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হয়, আর এর চৌহদ্দির ভেতরেই ডোমদের থাকবার ঘর তৈরি ক'রে দেওয়া হয়।

১৮৭৫ সনে পোর্ট-কমিশনাররা নালিশ করেন যে নিমতলা ঘাট থাকার জন্য তাদের রেল চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই বছরই পোর্ট-কমিশনারদের রেলপথের প্রথম অংশ তৈরি হয় বাগবাজার থেকে মীরবহর ঘাট পর্যন্ত। এই নালিশের ফলে বর্তমান জায়গায় নতুন নিমতলা শ্মশান তৈরি করা হয় ম্যাকিনটশ-বার্ন কোম্পানিকে দিয়ে ৩০ হাজার টাকা খরচ ক'রে। এই টাকার মধ্যে ২৫ হাজার টাকা পোর্ট-কমিশনাররা দেন ও বাকি ৫ হাজার টাকা দেন জাস্টিসেরা। এটি তাহলে তৃতীয় নিমতলার শ্মশান। তারপর কয়েকবার এই ঘাটের উন্নতি হয়েছে, যথা, ১৮৯১-৯২, ১৮৯২-৯৩, ১৮৯৪-৯৫, ১৯০৫-০৬, ১৯১২-১৩ ও ১৯১৩-১৪ সনে। এই কয়েকবারে মোট খরচ হয়েছে ১৭ হাজার টাকা। এখন শ্মশানের

আয়তন এক বিঘে।

বর্তমান নিমতলা শ্মশান ঘাটের দক্ষিণে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য একটা দোতলা বাড়ি ক'রে দেওয়া হয়েছে ১৮৯৫ সনে। এর খরচ দিয়েছেন দর্মাহাটা স্ট্রিটের এক কাঠের ব্যবসায়ী বাবু গিরীশচন্দ্র বসু। বর্তমান ঘাটের দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড পাথর লাগিয়ে রাখা হয়েছে। তাতে কৃতজ্ঞতাভরে লেখা আছে যে বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের চেষ্টাতেই নিমতলা শ্মশানঘাট স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয় নি। এই পাথরটা আগেকার শ্মশানের দেওয়ালে লাগানো ছিল, সেখান থেকে তুলে বর্তমান শ্মশানের গায়ে লাগানো হয়েছে।

নিমতলা ও কাশীমিত্রের শ্মশান থেকে ছাই সরিয়ে ফেলাও এক সমস্যা। এই কাজের জন্য একখানি নৌকো রাখা আছে। তাতে ক'রে দুই শ্মশানের ছাই নদীর অনেকখানি ভাঁটিতে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হয়।

এতই যখন বলা হল তখন এই জায়গায় আর একটা কথা বলে রাখি, নিমতলা ঘাটের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও। তা থেকে বোঝা যাবে পলতা-টালার জলের কল হবার আগে যে গঙ্গার জল আমাদের পূর্বপুরুষেরা পান করতেন সেই জল কত অস্বাস্থ্যকর ছিল।

মাত্র বড়লোকদের বাড়িতেই নিজেদের পায়খানা থাকত। বস্তিবাসী গরিব লোকেরা হয় চার-পাঁচ ঘর মিলে একটা পায়খানা ব্যবহার করত, আর নয় 'মেথরটাট্টি'তে যেত। হিন্দি শব্দ 'টাট্টি' মানে পায়খানা। এই 'মেথরটাট্টি'গুলি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি ছিল না। যাদের সামান্য টাকা-পয়সা আছে এমনি কতকগুলি মেথর এই 'টাট্টিগুলি' তৈরি করত সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। যারা ব্যবহার করত তারা একবার গেলে কয়েকটা কড়ি থেকে দু' পয়সা পর্যন্ত তাদের দিতে হতো 'টাট্টি'র মালিককে। আর মাসকাবারি রেট ছিল দু'আনা থেকে চার আনা। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে এখন যে মাঠটা আছে, হিন্দু কলেজের আমলে সেখানে একটা নোংরা বস্তি ও বস্তিবাসীদের জন্য একটা 'মেথরটাট্টি' ছিল। যখন পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে হাওয়া বইত তখন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা দুর্গন্ধে টিকতে পারত না।

বাবুদের বাড়ির পায়খানা পরিষ্কার করত মেথররা। তার দরুণ তারা বাড়ির কর্তাদের কাছ থেকে মাইনে পেত। তারা এইসব পায়খানা পরিষ্কার ক'রে কতকগুলি ডিপোতে নিয়ে যেত। ডিপোগুলোকে বলা হতো 'টোলা মেথর ডিপো'। সেকালে নানা জায়গায় এইরকম 'টোলা মেথর ডিপো' ছিল। তারপর এইসব ডিপোর বিষ্ঠা নিয়ে যাওয়া হতো গঙ্গার ধারের এক ঘাটে, যার নাম ছিল 'বিষ্ঠা ঘাট' (Night soil Ghat)। এই ঘাটটি ছিল পুরনো মিণ্টের কাছে। মিউনিসিপ্যালিটি কতকগুলো নৌকা ভাড়া ক'রে রেখেছিল। সেই নৌকো ক'রে সব বিষ্ঠা ভাঁটিতে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হতো।

এইভাবে টন টন বিষ্ঠা প্রতিদিন গঙ্গায় পড়ত।

'মেথর টাট্টি'র মালিকেরা যেখানে খুশি তাদের পায়খানার বিষ্ঠা ফেলত—মাঠে ঘাটে, পুকুরে, নর্দমায়। তারাও মাঝে মাঝে গিয়ে 'বিষ্ঠা ঘাটে' বিষ্ঠা ফেলে আসত। এই ছিল আমাদের অতীত কলকাতার গঙ্গার জল। তাই যখন কল বসিয়ে কলকাতার পানীয় জল সরবরাহের প্রস্তাব হয় তখন খাস কলকাতার মধ্যে সে কল না বসিয়ে কলকাতা থেকে ১৬-১৭ মাইল উজানে পলতায় বসানো হল, সেখানে গঙ্গা থেকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাবে বলে।

১৪. জোড়াবাগান ঘাট

আজ থেকে দেড়শো বছরেরও আগে বৈষ্ণবদাস ওরফে বৈষ্ণবচরণ শেঠের এখানে পাশাপাশি দু'টো বাগান থাকায় এই জায়গাটার নাম হয়—জোড়াবাগান।

বর্তমান জোড়াবাগান স্কোয়ারের জায়গায় একটা মস্ত ঘিঞ্জি নোংরা বস্তি ছিল। সেই বস্তি উচ্ছেদ ক'রে সেই জায়গায় কলকাতা কর্পোরেশন জোড়াবাগান স্কোয়ার তৈরি করেছে ১৯০১ থেকে ১৯১১ সনের মধ্যে। এই জোড়াবাগান স্কোয়ারের পশ্চিমে জোড়াবাগান ঘাট।

১৫. গোকুলবাবুর ঘাট

গোকুলবাবুর নাম গোকুলচন্দ্র মিত্র। জন্ম ১৭২৪সনে, মৃত্যু ৮-৪-১৮০৮ তারিখে। পিতা সীতারাম মিত্র, মাতা রুক্মিণীমণি। পৈতৃক নিবাস ছিল বালী গ্রামে, সেখানে প্রায় ৮ বিঘে জমির উপর এঁদের বাস্তুভিটের ধ্বংস কয়েক বছর আগেও ছিল, এখনো আছে কিনা জানি না। জায়গাটার নাম 'মিত্রডাঙা'।

গোকুলচন্দ্র ১৭৪২ সনে বর্গীর হাঙ্গামার প্রথম বছরে পিতার সঙ্গে বালী থেকে কলকাতায় আসেন। তিনি কখনো কারো চাকরি করেন নি। স্বাধীন-ভাবে নুনের একচেটে ব্যবসা করেছেন। আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতি ও ঘোড়ার খোরাক ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করবার ঠিকাদার ছিলেন।

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার প্রথম লটারিতে গোকুল মিত্র টিকিট কিনে 'চাঁদনি চক' পান। তাঁর প্রপৌত্র বিহারীলাল মিত্রের বংশধররা এখন চাঁদনি বাজারের বেশি অংশের মালিক। গোকুল মিত্রের দেবত্র সম্পত্তির আয় বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা। তিনি পাইকপাড়ায় ২৫ বিঘের ফুলবাগান ঠাকুরকে দেন। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এই বাগান ৫,৮৮,৬০০ টাকায় খরিদ করে। ১৯১৯ সনে গোকুল মিত্রের বংশধরদের মধ্যে পারিবারিক মামলা হয়। দেবত্র-এস্টেট কমিটি ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৩২-৩৩ সনে সেবায়েৎ বোর্ড গঠন করেন।

বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ দেনার দায়ে তাঁর গৃহদেবতা মদনমোহন

বিগ্রহকে বন্ধক রেখে গোকুল মিত্রের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ধার করেন। গোকুল মিত্র এই বিগ্রহের মতো আর একটি বিগ্রহ তৈরি করান। চৈতন্য সিংহ যখন কর্জের টাকা শোধ ক'রে বিগ্রহ নিতে আসেন তখন গোকুল মিত্র দু'টি বিগ্রহই সামনে রেখে তাঁর বিগ্রহটি রাজাকে বেছে নিতে বলেন। রাজা নাকি নকল বিগ্রহটি বেছে নেন, আসল ঠাকুর গোকুল মিত্রের কাছেই থেকে যায়। অন্যমতে চৈতন্য সিংহ দেনা শোধ করতে না পারায় মদনমোহন ঠাকুর গোকুল মিত্রেরই সম্পত্তি হয়ে যায়। তৃতীয় মতে, চৈতন্য সিংহ আসল ঠাকুরটিকে নিয়ে যান, গোকুল মিত্রের কাছে নকল মদনমোহনটি থেকে যায়। সত্য যাই হোক, গোকুল মিত্র তাঁর ঠাকুরের জন্য বিরাট মন্দির, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ ইত্যাদি তৈরি করিয়ে দেন। তাঁর নাটমন্দিরের মতো এতবড় নাটমন্দির নাকি কলকাতার অন্য কোনো ঠাকুরবাড়িতে নেই।

গোকুল মিত্রের প্রপৌত্র ৺বিহারীলাল মিত্র (১৮৬০—৭-২-১৯৩৩) স্ত্রীশিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মাসিক ৪ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি দান ক'রে যান। সেই টাকা দিয়ে আলিপুরে হেস্টিংস হাউসের পাশে (মূলত হেস্টিংস হাউসের এক অংশে) বিহারীলাল হোম সায়েন্স-এর কলেজ হয়েছে। বিহারী-লাল মিত্র ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ি (যা ৺নগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক তৈরি করিয়েছিলেন কয়েক লক্ষ টাকা খরচ ক'রে) কেনেন। এই বাড়ির জায়গায় আগে ডিরোজিওর বাড়ি ছিল। বিহারীলালের পুত্র না থাকায় তিনি অনিরুদ্ধকে পোষ্যপুত্র নেন। অনিরুদ্ধবাবু গত হয়েছেন। এখন তাঁর পোষ্যপুত্র শ্রীঅরবিন্দ মিত্র ঐ বাড়িতে বাস করছেন।

গোকুল মিত্রের ঘাটের কাছেই তাঁর ৫ বিঘে জমি ও নুনের আড়ৎ ছিল। এখনো লোকে জায়গাটাকে নুনগোলা বলে। উত্তরে আনন্দময়ী কালীমন্দির ও দক্ষিণে ৺শিবনারায়ণ ঘোষের বাড়ির মাঝ বরাবর ঐ নুনের আড়ৎ ছিল। গোকুল মিত্র বিলেত থেকে নুন আমদানি ক'রে এখানেই রাখতেন।

১৬. কাটমার (কতমার) ঘাট

কে কতমা তা জানি না। তবে অনেকে কতমা (ইংরেজিতে লেখা হয় কাটমা) কথাটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। তাঁরা ঠিক করতে পারেন নি কতমা কোনো লোকের নাম না বংশগত উপাধি। এখন আর কতমা কথাটা বড় দেখা বা শোনা যায় না। কতমা তাঁতিদের উপাধি।

১৭. পাথুরিয়া ঘাট

আমাদের পাথুরেঘাটা। পাথরে তৈরি হয়েছিল বলে ঘাটের এই নাম। আবার একজন বলেছেন তা নয়। হিন্দি ভাষায় 'পাথুরিয়া' মানে বেশ্যা (অহল্যা

পাষাণী থেকে)। সুতরাং পাথুরিয়া ঘাট মানে বেশ্যাপল্লী বা বেশ্যার ঘাট।

১৮. গিরিবাবুর ঘাট

এই গিরিবাবু কে জানি না। বৌবাজারে গিরিবাবুর নামে একটি গলি আছে। যাঁর নামে গলি বোধ হয় সেই গিরিবাবুই এই ঘাট তৈরি ক'রে দেন।

১৯. শিবতলা ঘাট

হয়ত এই ঘাটের ওপরেই বা কাছেই শিবঠাকুর ছিলেন, তাই এই নাম। তবে কে এই ঘাট তৈরি ক'রে দেন জানি না।

২০. হরিনাথ দেওয়ানের ঘাট

হরিনাথ দেওয়ানের নাম হরিনাথ রায়। তাঁর নামে শুধু এই ঘাটটিই ছিল না, একটি রাস্তাও ছিল, নাম—হরিনাথ দেওয়ান স্ট্রিট। রাস্তাটি ঘাট থেকে আরম্ভ হয়ে প্রথমে পূর্ব-দক্ষিণে ও পরে সোজা দক্ষিণে গিয়ে শোভারাম বসাক স্ট্রিটের সঙ্গে মিলত। যাঁর নামে একটি ঘাট ও রাস্তা ছিল, সেই হরিনাথ দেওয়ানের কোথাও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কাশিমবাজার রাজবংশে এক হরিনাথ রায় ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল প্রথমে 'কুমার' পরে 'রাজা'। তিনি কারো দেওয়ান হতে যাবেন কেন? তাছাড়া, ১৭৯৪ সনে যখন আপজনের ম্যাপ—যাতে ঐ ঘাট ও রাস্তার নাম আছে—ছাপা হয়ে বেরোয়, তখন কুমার হরিনাথ রায়ের জন্ম হয় নি। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮০৩ সনে—৯ বছর পরে। সুতরাং কুমার বা রাজা হরিনাথ রায় দেওয়ান হরিনাথ রায় হতে পারেন না।

২১. শোভারাম বসাকের ঘাট

শোভারাম বসাক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়। নানা রকম গল্পই বেশি প্রচলিত। জন্ম মুর্শিদাবাদে ১৬৯০খ্রীস্টাব্দে। তখন মুর্শিদাবাদের নাম ছিল মকসুদাবাদ। তারপর তিনি পিতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে সপ্তগ্রামের হলদিপুরে এসে বাস করেন। জাতিতে তন্তুবায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সুতো ও কাপড়ের ব্যবসা ক'রে ক্রোড়পতি হন। সপরিবারে হলদিপুর থেকে উঠে এসে গোবিন্দপুরে শেঠেদের কাছে বাস করতে থাকেন। গোবিন্দপুরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দপুরে দুর্গ তৈরি করবার জন্য জমি দরকার হলে তিনি জগন্নাথ দেব ও পরিবারবর্গকে নিয়ে সেখান থেকে উঠে এসে বড়বাজারে বাস করতে আরম্ভ করেন। বড়বাজারে তাঁর বসতবাড়ির সামনের রাস্তাটির নাম শোভারাম বসাক স্ট্রিট। মেডিকেল কলেজের উল্টো-

দিকে তাঁর নামে দু'টি গলি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল। একটির নাম হয়েছে রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট।

শোভারাম নিজের বাড়ির পশ্চিমে গঙ্গাতীরে মন্দির তৈরি ক'রে জগন্নাথ দেবকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরের পাশেই যে স্নানের ঘাট তৈরি ক'রে দেন তা জগন্নাথ ঘাট নামে পরিচিত। অনেকে বলেন এই মন্দির ও জগন্নাথ ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের (লালা বাবুর)। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। তবে মন্দির ও ঠাকুর এখন শোভারামের বংশধরদের হাতে নেই, সেবায়েতের সম্পত্তি। শোভারামের মৃত্যু হয় ১৭৭৩ সালে।

তারপর তাঁর সম্বন্ধে যা-কিছু সবই গাল-গল্প। জগন্নাথ ঠাকুর থাকলেই রথ থাকতে হবে। তাঁর জীবনী থেকে তুলে দিচ্ছি :

বৈঠকখানার সরল পথে (বর্তমান বৌবাজার স্ট্রিটে—রা. মি.) তাঁহার রথযাত্রা হইত এবং চৈতন্যচরণ বসাকের বাগানে রথখানি যাইয়া অবস্থান করিত। শোভারামের বংশধর জনৈক ধনশালী বধূ-মাতার তথায় একটি বাজার ছিল। উহা তাঁহার নামানুসারে বৌবাজার নামে খ্যাত হয়। সারা বৎসর ঐ রথখানি বৈঠকখানার বটবৃক্ষতলে অবস্থান করিত। …তৎকালীন প্রথানুযায়ী তথায় (বড়বাজার—রা. মি.) ব্রাহ্মণের বসতি করান। বাসভবনের উত্তরাংশে তাঁহার পুরোহিত রামরতন ঠাকুরকে বসবাসের জন্য একটি বাটী দান করেন।… কাশীপুরে তাঁহার উদ্যানে গোপাললাল জীউ ঠাকুর স্থাপন করেন। অদ্যাবধি ঐ বাগান গোপাললাল জীউর নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন তথায় বহু দেব-দেবী ছিল।…শোভারামের শ্যামচাঁদ ঠাকুরের নামানুসারে শ্যামবাজার হয়। হলওয়েল সাহেব উহার নাম পরিবর্তন করিয়া চার্লস বাজার রাখেন। পরে শোভারামের অনুরোধে তাঁহার আত্মীয় শ্যামচাঁদ বসাকের নামানুসারে শ্যামবাজার ও শ্যামপুকুর নামকরণ হয়। গঙ্গাতীরে রথযাত্রা হইয়া রথতলা ঘাটে রথখানি অবস্থান করিত বলিয়া উহা রথতলা ঘাট নামে বিদিত। উহা শোভারামের সুতানুটি ঘাট নামে পূর্বে বিদিত ছিল। বর্তমান শোভাবাজার রাজবাটীর স্থানে পূর্বে শোভারামের উদ্যান ছিল। ঐ জলজ জমির উপযোগী শাকসবজি উৎপন্ন হইয়া তথায় বিক্রয় হইত। কাল সহকারে উহা বাজারের আকার ধারণ করে এবং শোভারামের নামানুসারে শোভাবাজার নামে খ্যাত হয়। কালক্রমে সমগ্র স্থানের নাম শোভাবাজার হয়।…বস্ত্রাদির একদর রাখিবার জন্য সুতানুটির বাজারের এবং শোভাবাজারের ব্যবসা বাণিজ্য শোভারামের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ·· ১১৭৪ সালে ২৪ পরগনা এবং ডিহি ৫৫ গ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য শোভারাম প্রমুখ শেঠ বসাকগণ বৎসর সালিয়ানা দশ লক্ষ টাকা জমা দিতে স্বীকার হন। কোম্পানি বাহাদুর ১২ লক্ষ টাকা না পাওয়ায়, নিজ খাসে রাখিয়া কালেক্টর নিযুক্ত করেন।

একটি কথা জীবনীকার ঠিক লিখেছেন : '১৭৫৭ অব্দে সিরাজদ্দৌল্লার নিকট হইতে কলিকাতা পুনরুদ্ধার হইলে, নবাব মীরজাফর দেশী প্রজাদিগের ক্ষতি-পূরণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন তন্মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা হিন্দুরা পাইয়াছিলেন। ঐ টাকা বিভাগোপলক্ষে তের জন কমিশনার নিযুক্ত হন। তন্মধ্যে শোভারাম অন্যতম। তিনি আপন অংশে ৪ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন।'

টাকার হিসেব ঠিক নয়, তিনি যে একজন কমিশনার ছিলেন সেকথা ঠিক। তিনি চেয়েছিলেন ৪,৪১,২৭৮ টাকা ৯ আনা ৭ পাই, পেয়েছিলেন ৩,৭৫,০০০ টাকা। মাত্র গোবিন্দরাম মিত্র ও রঘু মিত্র দু'জনে এই পরিমাণ টাকা পেয়েছিলেন। আর কোনো কমিশনার এত বেশি টাকা পান নি। তাছাড়া শোভারামের নয় জন আশ্রিত লোক পেয়েছিল কয়েক হাজার টাকা। গোবিন্দরাম মিত্রের আশ্রিতের সংখ্যা ছিল বার জন এবং রতু সরকারের তিন জন। আর কারো আশ্রিত কিছু পায় নি।

কিন্তু যে কথাটা জীবনীকার বলেন নি সেটা হচ্ছে এই যে রামকৃষ্ণ শেঠ এবং কলকাতার আরো অনেক দেশী বাসিন্দা গভর্নমেন্টের কাছে হিন্দু কমিশনারদের বিরুদ্ধে এই বলে নালিশ করেন যে তাঁদের হিসেব পাশ করাতে কমিশনাররা খুব অবিচার করেছেন। ৩-৭-১৭৫৮ তারিখে বোর্ড রাইডার, জনস্টন ও সিনিয়র নামে তিনজন সাহেবকে অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধান ক'রে রিপোর্ট দিতে আদেশ করেন। অনুসন্ধানের পর তাঁরা যে রিপোর্ট দেন তাতে বলা হয় যে তাঁরা এমন একজনও গরিব লোক দেখতে পান নি যার হিন্দু কমিশনারদের বিরুদ্ধে নালিশ ছিল না। তাঁরা আরো বলেন যে শোভারাম বসাক কোনো হিসেব দাখিল না করেই অনেক টাকা পেয়েছেন। শোভারাম বলেছেন, গরিবদের চাওয়া সব টাকাই যদি দিয়ে দেওয়া হয়, তা থেকে যদি কিছু কাটা না হয়, তাহলে তাঁদের মতো বড়লোকদের কি থাকবে?

২২. নবাবের ঘাট

টাঁকশালের উত্তরদিক দিয়ে একটি গলি ছিল, তার নাম নবাব লেন। এরই নিচে গঙ্গাতীরে নবাব ঘাট ছিল। নবাব মীরজাফর এই ঘাট তৈরি করিয়েছিলেন বলে প্রবাদ। কিন্তু তিনি এই ঘাট তৈরি করাতে যাবেন কেন? তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, খুব সম্ভবত এই ঘাটে নেমেছিলেন তাই এই নাম। কোম্পানি নবাবের আগমন উপলক্ষে এই ঘাট তৈরি করিয়েছিলেন। তবে মুর্শিদাবাদের পরবর্তী নবাবেরা এই ঘাট রক্ষা করবার জন্য খরচ দিতেন।

২৩. বৈষ্ণব দাসের ঘাট

বৈষ্ণব দাসের প্রকৃত নাম বৈষ্ণবচরণ শেঠ, তবে তিনি বৈষ্ণবদাস নামেও

পরিচিত। জাতিতে তন্তুবায়। জন্ম গোবিন্দপুর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দালাল ছিলেন উমিচাঁদের ভাই দীপচাঁদ ভাল্লা।* তারপর দালাল হন জনার্দন শেঠের প্রথম পুত্র। তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে কাপড় যুগিয়ে ও অন্য নানা রকম ব্যবসা ক'রে কোটিপতি হন। গোবিন্দপুরে নতুন দুর্গের জন্য দরকার হলে তিনি তাঁর গোবিন্দজী ঠাকুরকে নিয়ে সেখান থেকে উঠে এসে বড়বাজারে বাস করেন। তাঁর বসত বাড়ি ৮ নম্বর দর্মাহাটা স্ট্রিট (বর্তমানে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড) ও তাঁর গোবিন্দজীর মন্দির ১৮।১ নম্বর দর্মাহাটা স্ট্রিট। বৈষ্ণবচরণের বংশধরেরা বলেন, তাঁদের গোবিন্দজী ঠাকুরের নামেই গোবিন্দপুরের নাম হয়েছে। বৈষ্ণব-চরণের পাশাপাশি দু'টি বাগান থাকায় ঐ জায়গাটার নাম হয়েছে জোড়াবাগান। বর্তমান জোড়াবাগানের পূর্বদিকের রাস্তার নাম বৈষ্ণবচরণ শেঠ স্ট্রিট ও আর দু'টি গলিরও নাম বৈষ্ণবচরণ শেঠ লেন। বৈষ্ণবচরণ নীলমণি ঠাকুরকে জোড়াসাঁকোয় বসবাসের জন্য কয়েক কাঠা জমি দান করেন।

আমিনচাঁদ বা আমিরচাঁদ (ইংরেজি ওমি চাঁদ, বাংলা উমিচাঁম) নামে এক শিখ পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসে বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছে কাজ করতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজের গুণপনায় বৈষ্ণবচরণের কারবারের প্রধান পরিচালক হয়ে ওঠেন ও অনেক টাকা রোজগার করেন। শেষে তিনি আলাদা হয়ে ব্যবসা করতে থাকেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাপড় ও অন্যান্য মালের সবচেয়ে বড় সরবরাহকার হয়ে ওঠেন।

গৌরী সেন হুগলির বালীপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। এখনো তাঁর বংশধরেরা সেখানে বাস করছেন। গৌরী সেন আনুমানিক ১৭৩২ সনে হুগলি থেকে কলকাতায় এসে বাস করেন। তিনি থাকতেন একমতে ৩৫ ও ৩৬ নম্বর কলুটোলা স্ট্রিট, অন্যমতে বড়বাজারে। তিনি বৈষ্ণবচরণ শেঠের অংশীদার ছিলেন। প্রবাদ, একবার বৈষ্ণবচরণ গৌরী সেনের নামে কিছু দস্তা কেনেন। দস্তার মধ্যে প্রচুর রুপো পাওয়া যায়। এটা তাঁর অংশীদারের সৌভাগ্যের ফলে ঘটেছে ভেবে তার যা কিছু মুনাফা বৈষ্ণবচরণ গৌরী সেনকে দেন। ব্যবসায়ে সাধুতার জন্য বৈষ্ণবচরণের খুব সুনাম ছিল। সেটা যে মিথ্যা ছিল না,এই ঘটনাই তার প্রমাণ। গৌরী সেন সেই টাকা সৎ কাজে ব্যয় করতেন। দেনার দায়ে যারা জেলে যেত, তিনি তাদের দেনা শোধ ক'রে দিয়ে জেল থেকে খালাস ক'রে আনতেন। তাই থেকে 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এই প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বৈষ্ণবচরণ বিষ্ণুর পা ধোয়াবার ও শিবের মাথায় ঢালবার জন্য গঙ্গার জল পাত্রে ভরে তাতে নিজের সিলমোহর ক'রে সোমনাথে, দ্বারকা তীর্থে ও রামনাদের রাজার কাছে পাঠাতেন। পাত্রে তাঁর সিলমোহর দেখে তাঁরা বুঝতেন সে জল

* শ্রীনারায়ণ দত্তের জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী, পৃ ১১৮।

খাঁটি গঙ্গার জল। গঙ্গার জল পাঠানো তাঁর প্রপৌত্রদের সময় পর্যন্ত চালু ছিল।

২৪. মীরবহর ঘাট

মীরবহর ফার্সি শব্দ। পুরো কথাটা হচ্ছে আমির-আল্-বহর। আমির মানে অধ্যক্ষ (Commander) ও বহরের দু'টো মানে—একটা নৌবহর (fleet) ও আর একটি নদী বা সমুদ্র। তাহলে কথাটার মানে হল নৌবহরের অধ্যক্ষ (Admiral of the fleet)। Admiral কথাটাও এসেছে আমির—আল্ (বহর) থেকে।

নবাব মীরজাফর জলপথে কলকাতায় এসেছিলেন, সুতরাং নিজের নৌবহর নিয়ে এসেছিলেন। নবাবের ঘাটে তাঁর কর্মচারি নৌবহরের কর্তা থাকতে পারেন না। তাই তার পাশের ঘাটেই তিনি নোঙর ফেলেছিলেন। সেইজন্য সেই ঘাটের নাম হয়েছে মীরবহর ঘাট।

২৫. কদমতলা ঘাট

শেঠ বসাকেরা এই ঘাট থেকেই মাল আমদানি ও রপ্তানি করতেন। এই ঘাটের ওপরেই বৈষ্ণবচরণ শেঠের বাড়ি ছিল। ঘাটের ধারে কদম গাছ থাকায় ঘাটের নাম হয়েছিল কদমতলা ঘাট।

২৬. কাশীনাথবাবুর ঘাট

কাশীনাথবাবু (১৭২১-এপ্রিল ১৭৯২) বাঙালি নন, পাঞ্জাবি হিন্দু। এঁদের কুলোপাধি ট্যাণ্ডন। এঁরা লাহোর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। কাশীনাথ ট্যাণ্ডন ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কাশীনাথবাবু সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিকের নানা মত।

লঙ্ সাহেব লিখেছেন: দেওয়ান কাশীনাথ ভুঁইফোঁড় ছিলেন। শাহ্ জুম্মা নামে একজন ফকির বড়বাজারের কাছে গঙ্গার ধারে একটা উলুখাগড়ার ঝোপের ভিতর বাস করতেন। কাশীনাথের বিধবা মা এই ফকিরের সেবা করতেন। এইরকম প্রবাদ যে ফকিরের মৃত্যুর পর ফকিরের আশীর্বাদে কাশীনাথের কিছুটা ভাগ্যোন্নতি হয়। পরে কাশীজোড়ার রাজার কাছে চাকুরি ক'রে তাঁর ভাগ্য একেবারে ফিরে যায়। বৈষ্ণবচরণ শেঠ কাশীনাথকে কাশীজোড়ার রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

৺প্রমথনাথ মল্লিক লিখেছেন: দেওয়ান কাশীনাথবাবু ১২-৩-১৭৯২ তারিখে মারা যান। ইনি কলকাতার জরিপের সময় বড়লোক হন ও হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র হন। প্রবাদ যে ফকির জুম্মা শাহের কৃপায় তাঁর উন্নতি ও দেওয়ানি পদ

লাভ হয়। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁর সমাধি কাশীনাথের বাসভবনের সামনে আছে।

তিনি আরো লিখেছেন: ফ্রাংকল্যাণ্ড সাহেব কলকাতার জরিপ করিয়েছিলেন। তিনি ঐ কাজ একমাত্র কাশীনাথ ট্যাণ্ডনের তত্ত্বাবধানে করাতে আপত্তি করেছিলেন। তাঁর চিঠিতে তার কারণ উল্লেখ ছিল। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে কিছুদিন আগে সেই লোকই মাণিকচাঁদের সাহায্য ক'রে ইংরাজ কোম্পানির পরম শত্রুতা করেছিল। বিলেত থেকে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল তাঁর আপত্তির সম্পূর্ণ অনুমোদনপত্র এসেছিল, কিন্তু কাশীনাথ পাকে-প্রকারে কলকাতার যত ভালো ভালো বাজার উপযোগী জায়গা সমস্তই হস্তগত ক'রে নিয়েছিলেন। তিনি জুয়াখেলায় বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে মূল্যবান চকবাজার জিতে নিয়েছিলেন।

তিনি আরো লিখেছেন: কলকাতায় তাঁর [নবকৃষ্ণ মুনশির—রা. মি.] মতো আরও চারজন লোক কোম্পানির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁদের নাম কৃষ্ণকান্ত বাবু, কাশীনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ ও দেবী সিং। এঁরা কেউই পলাশী যুদ্ধের দু-এক বছর পরেও কলকাতায় নামকরা ব্যক্তি ছিলেন না। শেষে সৌভাগ্যবলে ও ইংরাজ কোম্পানির উঁচু কর্মচারীদের অনুগ্রহে তাঁরা সকলেই বাংলার প্রধান জমিদার ও উঁচু পদবীর লোক হন ও কলকাতায় সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য লাভ করেন। মল্লিক মশাই এই পাঁচজনকে পঞ্চ পাণ্ডব আখ্যা দিয়েছেন।

৺হরিহর শেঠ লিখেছেন: কাশীনাথ একজন সামান্য ব্যবসায়ী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে সুতানুটিতে দোকানপাট করতেন। তিনি একদিন হুগলি ও বাঁশবেড়ে থেকে মালপত্র নিয়ে কলকাতায় আসবার সময় এক ফকিরের অনুরোধে নৌকোয় ক'রে তাঁকে নিয়ে আসেন ও তাঁর যথাসাধ্য সেবা করেন। কাশীনাথ লেখাপড়া জানতেন না। সেই সময় লর্ড কর্নওয়ালিসের দপ্তরে একটি দেওয়ানি পদ খালি হয়। জুম্মা শাহের উপদেশে তিনি এই পদ পাবার জন্য দরখাস্ত ক'রে তা পান এবং তার দ্বারা প্রচুর ধনসম্পত্তি উপার্জন করেন। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ান কাশীনাথ জুম্মা পীরের সমাধির উপর এক অট্টালিকা ক'রে দেন।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: কাশীনাথ ট্যাণ্ডন নামে একজন সামান্য ব্যবসায়ী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে সুতানুটিতে দোকান করতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে হুগলি ও বাঁশবেড়ে থেকে মালপত্র কিনে আনতেন। একবার কাশীনাথ হুগলি থেকে কলকাতায় আসছিলেন। এক ফকির তাঁকে কলকাতায় পৌঁছে দিতে বললে তিনি তাঁকে নৌকোয় তুলে নিয়ে কলকাতায় আসেন ও তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন। সেই থেকে ফকির কাশীনাথের দোকানের পাশেই থেকে যান। তখন লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল। এই ফকির পরে 'জুম্মা শাহ' বলে পরিচিত হন। একসময় লর্ড কর্নওয়ালিসের দপ্তরে একটি দেওয়ানি পদ খালি হয়। জুম্মা শাহের

উপদেশে কাশীনাথ এই পদের জন্য দরখাস্ত করেন ও লেখাপড়া না জানলেও এই পদ পান এবং এ থেকে প্রচুর ধনী হন। পরে তিনি দেওয়ান কাশীনাথ নামে পরিচিত হন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তিনি জুম্মা শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি-স্থানে একটি সুন্দর অট্টালিকা ক'রে দেন ১৮০৮খ্রীস্টাব্দে। তিনি গুমন শাহ নামে এক ফকিরকে এই দরগার মতয়ালি নিযুক্ত করেন ও এর খরচের জন্য প্রচুর পীরোত্তর সম্পত্তি দান করেন।

স্যার ইভান কটন ক্লাইভ স্ট্রিটে জুম্মা পীরের কবরের সূত্রে লিখেছেন: এই দরগা যে জায়গায় এখন রয়েছে সেখানে আগে কাশীনাথের দোকান ছিল। কাশীনাথ ছিলেন একজন মুদী ও উত্তর-পশ্চিমের নিরক্ষর লোক। কাশীনাথ মালপত্র খরিদ করবার জন্য প্রতিদিন নৌকো ক'রে হুগলি ও বাঁশবেড়েয় যেতেন। তিনি এই পীরকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। পীর আমরণ কাশীনাথের দোকানেই থেকে যান। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে বা ওরই কাছাকাছি সময়ে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে রাজস্ব দপ্তরে কতকগুলি পদে দেশী লোকদের নিয়োগ করা হচ্ছিল। পীর জুম্মা শা কাশীনাথকে একটি পদের জন্য দরখাস্ত করতে বলেন। কাশীনাথ তাঁর উপদেশ মতো দরখাস্ত ক'রে একটি পদ পান একেবারে নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও। এই পদ ছিল দেওয়ানের পদ। তাই তিনি দেওয়ান কাশীনাথ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। ঐ পীরের প্রতি তাঁর এরকম ভক্তি ছিল যে তিনি ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে কিংবা তারই কাছাকাছি কোনো সময়ে নিজের খরচায় এই দরগা তৈরি ক'রে দেন। তিনি পীরের জীবিতাবস্থায় তাঁকে সেবা করার জন্য একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান খুঁজতে খুঁজতে গুমন শাহ নামে একজনকে পান ও তাঁকে ঐ কাজে বহাল করেন। গুমন শাহ ছিলেন জুট্টি শাহের দাদা। জুম্মা শাহের মৃত্যুর পর গুমন শাহের জায়গায় জুট্টি শাহ সেবায়েৎ হন।

হরিহর শেঠ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বা কটন সাহেব কারোই এ খেয়াল হয় নি যে ১৮০৫ কিংবা ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ান কাশীনাথ বর্তমান ছিলেন না। তার অনেক আগেই ১৭৯২ সনে তিনি মারা যান। সুতরাং ১৮০৫ সনে চাকুরির জন্য দরখাস্ত করা ও ১৮০৮ সনে জুম্মা শাহের কবর তৈরি করা কাশীনাথের পক্ষে অসম্ভব।

জুম্মা শাহের দরগা ক্লাইভ স্ট্রিটে দেওয়ান কাশীনাথের বাড়ির সামনে। এখনো সে দরগা আছে। ১৯২৬ কি ১৯৪৬ সনের কিংবা অন্য কোনো হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় এ দরগা আক্রান্ত হয় নি। মুসলমান সেবায়েৎরা বরাবরই এখানে থেকেছেন—ঘোর দাঙ্গার সময়েও তাঁদের স্থানত্যাগ করতে হয় নি।

কাশীনাথ ট্যাণ্ডন নিজের বাড়ির কাছে নোঙ্গরেশ্বর শিবের মন্দির তৈরি ক'রে দেন, একথা প্রায় সকলেই লিখেছেন। তার আগে নোঙ্গরেশ্বর কোথায় ছিলেন, সে সম্বন্ধে দু'টি মত প্রচলিত আছে। এক মতে, এই শিব ছিলেন সুতানুটি হাটের

কাছে এক চালাঘরে। সুতানুটির ঘাটে যেসব হাটুরে ব্যবসাদার নৌকো লাগাত বা নোঙর করত তারা এই শিবের পুজো দিত। তারা এই শিবের নোঙরেশ্বর নাম দেয়। দেওয়ান কাশীনাথ এই শিবকে নিজের বাড়ির কাছে নিয়ে এসে পাকা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। উড়িয়া পাণ্ডারা এই শিবের পূজারী।

দ্বিতীয় মতে, বর্তমান নোঙরেশ্বরের মন্দির যেখানে আছে সেইখানেই মাল খালাস করবার জন্য আগে একটি ঘাট ছিল। শিবঠাকুর একটা নোঙরের তলায় ছিলেন। নোঙর তোলা হলে শিবঠাকুর বেরিয়ে পড়েন। তখন তাঁকে তুলে কাশীনাথবাবু তীরে মন্দির তৈরি ক'রে তাতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তেমনি, দেওয়ান কাশীনাথ তাঁর নিজের বাড়ির সংলগ্ন এক মন্দিরে শ্যামলিয়া-লালজী নামে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর পুত্র শ্যামলদাসের নাম থেকেই ঠাকুরের নাম হয়েছে শ্যামলিয়ালাল। কিন্তু সেকথা ঠিক বলে মনে হয় না, বরং ঠাকুরের নামেই পুত্রের নাম হওয়া স্বাভাবিক। মন্দিরের নম্বর ৭৬-বি ক্লাইভ স্ট্রিট।

কাশীনাথবাবুর বাড়ির ঠিক সামনেই তাঁর বাজার বা কাটরা। বর্ধমানের রাজার রাজাকাটরা, ও কাশীনাথবাবুর কাটরা পাশাপাশি, মধ্যে ফাঁক নেই। উত্তরে রাজা কাটরা, দক্ষিণে কাশীনাথবাবুর কাটরা। রাজা কাটরায় একটি ঘর ভাড়া ক'রে লালবিহারী দে-র পিতা থাকতেন।

কিন্তু কাশীনাথবাবুর সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের দেওয়া বিবরণ যা আমি আগে উল্লেখ করেছি তাদের সঙ্গে কাশীনাথবাবুর বংশধরদের লেখা পারিবারিক বিবরণের অনেক ক্ষেত্রেই মিল নেই। এখানে আমি সংক্ষেপে এই পারিবারিক বিবরণ দিচ্ছি :

লাহোরের দেওয়ান পরিবা'র মুঘল সম্রাটগণের একান্ত অনুগত ছিলেন। দেওয়ান ঘাসিরাম ট্যাণ্ডনের পূর্বপুরুষেরা সম্রাট শাহজাহানের দরবারে মীরমুন্সী ছিলেন। দেওয়ান ঘাসিরাম নিজে সম্রাট মহম্মদ শার দরবারে দেওয়ান ছিলেন। তিনি লাহোরের মচ্ছিহাট্টা মহল্লার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পর থেকে এই বংশে দেওয়ান উপাধি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। [তাহলে দেখা যাচ্ছে, কাশীনাথ ট্যাণ্ডন কারো দেওয়ানি ক'রে দেওয়ান উপাধি পান নি। এটা তাঁর বংশগত উপাধি ছিল। —রা. মি.]

যখন নাদির শা ভারত আক্রমণ ক'রে লাহোরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন দেওয়ান ঘাসিরামের পরিবার দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর নিহালচাঁদ ও মুলুকচাঁদ নামে দুই পুত্র ছিল। মুলুকচাঁদ সেই সময়ে আম্বালায় তাঁর শ্বশুর-বাড়িতে ছিলেন। ঘাসিরাম নিহত হন, নিহালচাঁদ তাঁর মাকে নিয়ে পালিয়ে যান, কিন্তু পরে তাঁদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। মুলুকচাঁদকে তাঁর শ্বশুর আর লাহোরে ফিরে যেতে দিলেন না। তাঁরা দু'জনে পাঞ্জাব ত্যাগ

ক'রে মুর্শিদাবাদে এসে বসবাস করতে লাগলেন। মুর্শিদাবাদ তখন বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। এ ঘটনা ঘটে ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে এলে লালা দেবীদাস জামাতা মুলুকচাঁদকে নিয়ে সপরিবারে সুতানুটিতে আসেন। ধর্মপ্রাণ হিন্দু হওয়ায় তিনি বাসের জন্য গঙ্গাতীরে একখণ্ড জমি কেনেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে অসাধারণ ব্যবসা-বুদ্ধি বলে প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করেন। বাংলা ও অন্যান্য ভাষার সঙ্গে তিনি সংস্কৃত শেখেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি অসাধারণ ছিল। লালা দেবীদাস সুন্দরবন থেকে কুচিলা, হর্তুকী, মধু, মোম ও কাঠ এনে বিক্রি করতেন। লালা দেবীদাস ১৭৮৫ সম্বতে [ইং১৭২৮ সনে—রা. মি.] মারা যান। [এই পারিবারিক ইতিহাসে সন-তারিখের অনেক গণ্ডগোল আছে, তার মধ্যে এটি একটি। —রা. মি.)। মরবার সময়ে তাঁর কন্যার দুই পুত্রের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ ক'রে দিতে চান। কিন্তু এক নাতি, দেওয়ান কাশীনাথ, মাতামহের অন্য কোনো বিষয়-সম্পত্তি না নিয়ে মাত্র চার দেবতাকে চেয়ে নেন। সেই চার দেবতা হচ্ছেন—শ্যামলিয়ালাল, শালিগ্রাম, গণেশ ও শ্রীদুর্গা।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর জামাই মুলুকচাঁদ [কাশীনাথের পিতা—রা. মি.] শ্বশুরের ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন ও তাঁর দ্বারা যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি করেন। একবার মুলুকচাঁদ শীতকালে সুন্দরবনে যান। সেখানে দৈবক্রমে এক শাহ সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এই শাহ সাহেব পরে জুম্মা পীর নামে বিখ্যাত হন। শাহ সাহেব মুলুকচাঁদের সঙ্গে কলকাতায় আসতে চান, মুলুকচাঁদও নিয়ে আসতে রাজি হন। কিন্তু আসবার সময়ে তিনি তাঁকে সঙ্গে নিতে ভুলে যান। যখন তাঁর নৌকো কলকাতার ঘাটে এসে নঙ্গর করল, মুলুকচাঁদ দেখে অবাক হলেন যে শাহ সাহেব তাঁর আগেই এসে গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে আছেন। ফকিরের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তিনি ফকিরকে তাঁর কাছে থেকে যেতে মিনতি করেন। ফকির তাতে রাজি হন। [তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দেওয়ান কাশীনাথ ফকিরকে হুগলি বাঁশবেড়ে থেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন, পারিবারিক ইতিহাস একথা সমর্থন করে না। —রা. মি.]

দেওয়ান কাশীনাথের জন্ম হয় ১৭২১ খ্রীস্টাব্দে। তিনি পিতার সঞ্চিত সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি পান। [তাহলে তিনি খুব গরিব ছিলেন একথা পারিবারিক ইতিহাস বলে না।—রা. মি.]। তিনি কর্নেল [পরে লর্ড] ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন এবং যথেষ্ট সময় ও অসাধারণ যোগ্যতা থাকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকজন রাজা ও মহারাজার এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন। ১৭৮০ সাল নাগাদ তাঁকে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে কাশীজোড়ার মহারাজার বিরুদ্ধে নালিশ করতে হয়, কিন্তু গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস মহারাজার পক্ষ

অবলম্বন করেন। কোনো পক্ষই [সুপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কাউন্সিল—রা.মি.] অপর পক্ষকে মানতে রাজি না হওয়ায় মোকদ্দমার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীরা তখন পার্লামেণ্টে আবেদন করে। তার ফলে পার্লামেণ্ট একটা আইন পাশ ক'রে সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার খর্ব করে। কাশীনাথের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি-বলে অল্পদিনের মধ্যেই সে ক্ষতি তিনি পূরণ ক'রে ফেলেন।

নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও কাশীনাথ সংস্কৃত, ফার্সি ও বাংলাভাষা খুব ভালো জানতেন এবং ইংরাজি ভাষাযও তাঁর ভাল জ্ঞান ছিল। [দেখা যাচ্ছে কাশীনাথ যে নিরক্ষর ছিলেন একথা পারিবারিক ইতিহাস বলে না।—রা. মি.]। তিনি নিজের আবাসের সংলগ্ন শ্যামলিয়ালালজীর বড় মন্দির তৈরি ক'রে দেন এবং তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ ঠাকুরের সেবার জন্য দেবোত্তর ক'রে দেন। বড়বাজারে নেপঙ্গরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও তিনি তৈরি করিয়ে দেন। তাঁর জীবদ্দশায় ফকির জুম্মা পীর জীবন্তে সমাধিস্থ হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু দেওয়ানজী কিছুতেই সে কাজে মত দেন নি। বরপ্রার্থীরা দলে দলে এসে তাঁকে দিবারাত্র জ্বালাতন ক'রে মারত বলে তিনি একদিন তাঁর এক শিষ্যকে তাঁকে জীবন্তে কবর দিতে বলেন। শিষ্য গুরুর আদেশ পালন করেন। দেওয়ানজী ফকিরের কবরের উপর একটি পাকা দালান তৈরি ক'রে দেন। বড়বাজারে তাঁর সমাধিস্থানে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই লোক এসে ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে যায়।

দেওয়ানজী বিশাল ভূ-সম্পত্তি অর্জন করেন। তার মধ্যে কলকাতায় পোস্তা-বাজার [যাকে সাধারণত রাজাকাটরা বলা হয়], নতুন বাজার ও ফুলবাগান। তাছাড়া মেদিনীপুর জেলায়, ২৪ পরগনায় এবং কলকাতার উপকণ্ঠে জমিদারী খরিদ করেন। লর্ড ক্লাইভের কাছ থেকে কলকাতার উত্তরে কাশীপুরে একশো বিঘে জমি দানস্বরূপ পান। কাশীপুরের নাম দেওয়ান কাশীনাথের নাম থেকেই হয়েছে। তাঁর ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে বাহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় শ্যামলদাস ও শ্যামাচরণ নামে দুই পুত্র রেখে যান।

এইখানেই দেওয়ান কাশীনাথের পারিবারিক ইতিহাস শেষ।

কাশীনাথের মৃত্যুসংবাদ ১২-৪-১৭৯২ তারিখের কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। তাঁকে তাঁর নিজের ঘাটে মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় দাহ করা হয়। তিনি মরবার সময় ৬০ লক্ষের বেশি টাকা রেখে যান। এই টাকা তিনি উইল ক'রে চার ছেলের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়ে গেছেন। তাঁর চার পুত্র ছিল—কলকাতা গেজেটের এই খবর ভুল। তাঁর মাত্র দুই পুত্র ছিল।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: ১২-১৪-১৭৯২ তারিখে কাশীনাথবাবু মারা যান। সন্ধ্যাকালে তাঁর নিজের গঙ্গাতীরস্থ ঘাটে চন্দন কাঠ দিয়ে চিতা

তৈরি ক'রে মৃতদেহ দাহ করা হয়। তাঁর চার স্ত্রীর মধ্যে কেউই সহমৃতা হন নি। লোকের বিশ্বাস, মৃত্যুকালে তিনি ৬০ লক্ষ টাকা রেখে গেছেন ও উইল ক'রে ছেলেদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ ক'রে দিয়ে গেছেন। ইনি নন্দকুমারের মোকদ্দমায় একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন।

হরিসাধনবাবু চারজন ছেলের কথা বলেন নি, কিন্তু চারজন স্ত্রীর কথা বলেছেন। আর বলেছেন নন্দকুমারের মোকদ্দমায় কাশীনাথ একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন। এ দু'টি নতুন কথা—পারিবারিক ইতিহাসে বা অন্য কোথাও নেই। কথা দু'টো কতদূর সত্য জানি না।

কাশীনাথবাবুর বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর প্রপৌত্র দামোদর দাস। এঁর ডাকনাম ছিল 'রাজা বাবু'। জন্ম ১৮৪২ সনে, মৃত্যু ১৬-৬-১৯২৩ তারিখে। ইনি বংশের ট্যাণ্ডন উপাধি ত্যাগ ক'রে বর্মণ উপাধি গ্রহণ করেন। তার দ্বারা অনেকের মনেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। লোকে ভাবে এঁরা বোধ হয় একবংশের নয়, বিভিন্ন বংশের লোক। বৈশ্যের উপাধি ট্যাণ্ডন, ক্ষত্রিয়ের উপাধি বর্মণ। এই বর্মণ বংশের সঙ্গে বর্মণ স্ট্রিটের যে বর্মণ অর্থাৎ মদনমোহন বর্মণের কোনো সম্পর্ক নেই। এঁরা আলাদা বংশের লোক।

এখন দেওয়ান বংশের পারিবারিক ইতিহাসে যে কাশীজোড়া মামলার কথা উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলে কাশীনাথ পর্ব শেষ করব।

১৭৭৩ সনে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট (আদালত) ও গভর্নর-জেনারেলের একটি সুপ্রিম কাউন্সিল (শাসন-পরিষদ) স্থাপিত হয়। এই নতুন কাউন্সিল ও কোর্টের কাজ আরম্ভ হয় ২৬-১০-১৭৭৪ তারিখ থেকে। সুপ্রিম কোর্টের জজেদের যখন বিলেত থেকে পাঠানো হয় তখন তাঁদের বলা হয় যে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী ও প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে। সুতরাং জজেরা যেন তাদের সংযত রাখেন। গল্প আছে যে চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নেমেই জজেরা দেখলেন এদেশী লোকেরা জুতো না পরেই খালি পায়ে হাঁটছে। তখন তাঁদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে সরকারি কর্মচারিদের শোষণের ফলেই প্রজারা জুতো কিনতে পারে না। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন, ছয় মাসের মধ্যেই তাঁরা এ অবস্থার প্রতিকার করবেন। গল্পটা বানানো হতে পারে। কিন্তু এ থেকে বোঝা যায় যে প্রথম দিন থেকেই সুপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কাউন্সিলের মধ্যে মন কষাকষি আরম্ভ হয়। ক্রমেই এই মনোমালিন্য সংঘর্ষে পরিণত হয়। পরপর পাঁচটা মোকদ্দমায় এই সংঘর্ষ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। সেই পাঁচটি মামলা এই—ক. কামালউদ্দিনের মোকদ্দমা (১৭৭৫), খ. বর্ধমানের রাজস্ব কাউন্সিল বনাম বর্ধমানের রানীর মোকদ্দমা, গ. স্বরূপচাঁদের হেবিয়াস কর্পাস মামলা, ঘ. দত্ত বনাম হোসিয়া-র (Hosea) মামলা ও ঙ. পাটনা মামলা। এরপর ১৭৭৯ সনে আসে সবচেয়ে

বিখ্যাত কাশীজোড়া মামলা। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কাউন্সিলের মধ্যে বিরোধ এমন চরমে ওঠে যে কোম্পানির রাজত্ব যায়-যায় হয়।

একজন প্রধান জজ ও তিনজন সাধারণ জজ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট। এটা কোম্পানির আদালত ছিল না, ইংল্যাণ্ডের রাজার আদালত, ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী এখানে বিচার হতো। মাত্র ব্রিটিশ প্রজারাই এ আদালতের বিচারাধীন ছিল। কিন্তু কার্যত এই আদালত ব্রিটিশ ও অ-ব্রিটিশ সমস্ত লোকের ওপরই এক্তিয়ার দাবি করত। কোম্পানির আদালতগুলোকে তো এঁরা গ্রাহ্যই করতেন না, এমনকি ঐসব আদালতের জজেরা ও কর্মচারিরা সরকারিভাবে যেসব কাজ করতেন সেইসব কাজের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা নিতেন। সুপ্রিম কোর্টের দাবি চরমে ওঠে কাশীজোড়া মোকদ্দমায়।

মেদিনীপুর জেলার কাশীজোড়া নামক জমিদারির রাজা-উপাধিধারী মালিকেরাও ছিলেন দেওয়ান কাশীনাথবাবুর মতো অবাঙালি। তাঁরাও পাঞ্জাবের সিরহিন্দ থেকে বাংলায় এসেছিলেন। তাঁদের বংশগত উপাধি ছিল সিং। পরে এঁরা 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন। কাশীনাথবাবু কাশীজোড়ার রাজার দেওয়ান নিযুক্ত হন ও রাজাকে অনেক টাকা কর্জ দেন। রাজা ঐ দেনা শোধ করতে পারেন না। কলকাতার রাজস্ব বোর্ডের মারফৎ ঐ টাকা আদায়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন কাশীনাথবাবু কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করবার সিদ্ধান্ত করেন। কাশীজোড়ার রাজা যে সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত তা দেখাবার জন্য কাশীনাথবাবু ১৩-৮-১৭৭৯ তারিখে একটি এফিডেভিট ক'রে বলেন যে কাশী-জোড়ার রাজা কোম্পানির কর্মচারি। তাঁর কাজ সরকারের খাজনা (রাজস্ব) আদায় করা। তখনকার অ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার জনডে-র মত নিয়ে গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল সমস্ত জমিদারের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে তাঁদের জানান, যদি তাঁরা কোম্পানির কর্মচারি না হন কিংবা স্বেচ্ছায় নিজেদের সুপ্রিম কোর্টের অধীন না ক'রে থাকেন তাহলে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের কোনো আদেশ মানবেন না। কাশীজোড়ার রাজাকে এই মর্মে একটি বিশেষ নোটিশ পাঠানো হয়। এই নোটিশের ফল এই হল যে সুপ্রিম কোর্টের শেরিফ যখন কাশী-জোড়ায় এলেন ঐ কোর্টের লিখিত আদেশবলে রাজাকে গ্রেপ্তার করতে, তখন রাজা ও রাজার দলবল শেরিফকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এর ফলে কোর্ট আরো চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করল। প্রায় ৬০-৭০ জন লোক, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই জাহাজের নাবিক, সঙ্গে নিয়ে শেরিফ কলকাতা থেকে কাশী-জোড়ায় মার্চ ক'রে গিয়ে রাজাকে বন্দী করলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর রটল যে ইংরেজরা রাজার গৃহদেবতার মন্দিরে ঢুকে মন্দির অপবিত্র করেছে ও জোর ক'রে রাজ-অন্তঃপুরে ঢুকেছে। এদিকে গভর্নর-জেনারেল ও তার কাউন্সিলের হুকুমে কর্নেল আমুটি (Ahmuty) মেদিনীপুরে যে কোম্পানির সৈন্যেরা ছিল তাদের

নিয়ে কাশীজোড়ার দিকে রওনা হলেন এবং শেরিফ যখন বন্দী রাজাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরছিলেন তখন পথের মধ্যে তাঁকে ঘেরাও ক'রে রাজাকে শেরিফের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন।

এই ব্যাপারের পর কাশীনাথবাবু সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ আনলেন সুপ্রিম কোর্টে। প্রথমে গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যগণ কোর্টে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা বুঝলেন যে তাঁদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হয়েছে এমন একটা কাজের জন্য যা তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে নয় সমবেতভাবে করেছেন, তখন বারওয়েল ভিন্ন আর সকলেই আদালত থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এর ফলে সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদ ও সর্বোচ্চ বিচারালয়ের মধ্যে প্রায় প্রকাশ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতির উদ্ভব হল। কিন্তু হেস্টিংসের বুদ্ধিকৌশলে চরম সংকট এড়ানো গেল। সদর দেওয়ানি আদালতের জজ ছিলেন গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যগণ। এঁরা সরে গেলেন। এঁদের জায়গায় হেস্টিংস সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পেকে মোটা মাইনে দিয়ে সদর দেওয়ানি আদালতের একমাত্র জজ নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব বিবাদের অবসান হল।

কিন্তু এর জন্য ইম্পেকে পরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। ৩-৫-১৭৮২ তারিখে হাউস অফ কমন্স এক প্রস্তাব পাশ ক'রে কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করবার জন্য ইম্পেকে ভারত থেকে ডেকে পাঠান। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ছ'টি। নন্দকুমারের ফাঁসি প্রথম অভিযোগ, আর হেস্টিংসের কাছ থেকে সদর-দেওয়ানি আদালতের জজিয়তি নেওয়া পঞ্চম অভিযোগ। পঞ্চম অভিযোগের মর্ম এই ছিল: ইম্পে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিদের কাছ থেকে এমন একটা চাকরি নিয়েছেন যার স্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ঐ কর্মচারীদের মর্জির ওপর নির্ভর করে এবং যাদের কার্যকলাপকে শাসনে রাখবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সৃষ্টি হয়েছিল; তাদেরই হাত থেকে চাকরি নিয়ে ইম্পে সুপ্রিম কোর্টকে সম্পূর্ণভাবে তাদের ওপর নির্ভরশীল ক'রে তুলছেন।

১২-১২-১৭৮৭ তারিখে হাউস অফ লর্ডস্-এ ইম্পের বিচার আরম্ভ হয়। শেষ-পর্যন্ত খালাস পেলেও, সদর দেওয়ানি আদালতের জজ হয়ে তিনি যত টাকা মাইনে নিয়েছিলেন সব টাকাই তাঁকে ফেরত দিতে হয়।

১৭৮১ সনে পার্লামেণ্টে একটা নতুন আইন পাশ হল। সে আইনে সুপ্রিম কোর্টের অধিকার পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হল। গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের সরকারি কার্যকলাপকে আর জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের সমস্ত ব্যাপারকে সেই অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হল।

এই রকমভাবে কাশীজোড়া মামলার ওপর যবনিকা পাত হয়।

২৭. হুজুরিমলের ঘাট

হুজুরিমল ছিলেন পাঞ্জাবি শিখ, উমিচাঁদের শ্যালক ও জগৎশেঠের মুৎসুদ্দি (এজেন্ট)। সে সময়ে জগৎশেঠ ও উমিচাঁদের পর হুজুরিমলের মতো এত ধনী বাংলাদেশে কেউ ছিলেন না। তিনি বড়বাজারে বাস করতেন। তাঁর গদিতে অনেক মুহুরি নিযুক্ত ছিল। তাছাড়া ষোলদল গায়ক ও বাদকও ছিল যারা 'সৎশ্রী আকাল'এর বন্দনা গান করত। ১৭৬৭ সনে উমিচাঁদের মৃত্যুর পর হুজুরিমল তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৭৬৪ সনে বক্সারের যুদ্ধের সময় তিনি কোম্পানির খুব উপকার করেন। গভর্নর ভেরেলেস্ট সাহেব তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি অন্য কোনো পুরস্কার না নিয়ে কালীঘাটের মধ্যে ১২ বিঘে জমি চান। ভেরেলেস্ট সাহেব কালীঘাটের সেবায়েতদের কাছ থেকে ১২ বিঘে দেবোত্তর জমি নিয়ে তাঁদের তার বদলে সাহানগরে ১২ বিঘে নিষ্কর জমি দেন। হুজুরিমল মন্দির ইত্যাদি তৈরি করবার জন্য এই জমি চেয়েছিলেন। কিন্তু দানের জমিতে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করলে অশাস্ত্রীয় কাজ হবে ভেবে তিনি নিজের খরচে গঙ্গার ঘাট, চাঁদনি ও শিব-মন্দির তৈরি ক'রে দেন।

হুজুরিমল বৌবাজার-বৈঠকখানা অঞ্চলে ৫৫ বিঘে জমির উপর একটি প্রকাণ্ড পুকুর কাটিয়ে দেন। নাম হয় পদ্মপুকুর। এই পুকুরের দক্ষিণ-পূর্বে আগে একটি থানা ছিল, নাম ছিল পদ্মপুকুর থানা। এখন সেই থানা রয়েছে বোঁজানো পুকুরেব পশ্চিমে, নাম মুচিপাড়া থানা।

পদ্মপুকুর থানার পাশে ছিল পুরনো বৈঠকখানা বাজার। এখন আর সে বাজার নেই, তার পরিবর্তে শিয়ালদহ বাজার হয়েছে। সে বাজার যেখানে ছিল সেখানে এখন গোটা কযেক সামান্য দোকান আছে, আর খানিকটা ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে। দেখলে বোঝা যায় এক সময়ে সেখানে বাজার ছিল। তার সামনে দিয়ে একটা রাস্তা বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ক্রমাগত উত্তর মুখে গিয়ে মেছোবাজার স্ট্রিটে পড়েছে। এখন এই লম্বা আঁকা-বাঁকা রাস্তাটার নাম বৈঠকখানা রোড। কিন্তু রাস্তাটার অসল নাম এ নয়, আসল নাম বৈঠকখানা বাজার রোড।

এখন যেখানে কোলে বাজার সেখানে আগে ঘোড়ায় টানা ট্রামের স্টেশন ও ঘোড়া বদলের আস্তাবল ছিল। এই কোলে বাজারের পিছন দিক সার্পেনটাইন লেনে বাজারের সামান্য পশ্চিমে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা খানিকটা জায়গার উপর একটি তেতলা বাড়ি আছে। আগে এই বাড়িতে চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের জেনানা মিশন ছিল। সে মিশন অনেকদিন হল কাশীপুর চিড়িয়াখানা মোড়ের কাছে ব্যারাকপুর ট্রাংকরোডের ধারে নিজস্ব বাড়িতে উঠে গেছে। সার্পেনটাইন লেনের সেই বাড়িতে এখন সেন্ট পল্‌স হোম রয়েছে। ওয়ারেন সেস্টিংস ১৭৮০ সনের

অক্টোবর মাসে কলকাতার মুসলমান নেতদের অনুরোধে তাঁদের সন্তানদের ইসলামী আইন শিখিয়ে তাদের কোম্পানির নিজস্ব আদালতগুলিতে নিয়োগ করবার জন্য এই অঞ্চলে এক ভাড়াবাড়িতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি এই সেণ্ট পল্‌স হোমের জমিটা, যার আয়তন ৩ বিঘা ১২ কাঠা, ৫৬৪১ টাকায় কিনে মাদ্রাসার নিজস্ব বাড়ি তৈরি করান ৭৫,৭৪১ টাকা খরচ ক'রে। সে জায়গাটার বর্তমান নম্বর ৭৩ সার্পেনটাইন লেন। ১৭৮২ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেই মাদ্রাসার সমস্ত খরচ চালান। এমনকি জমি কেনবার ও বাড়ি তৈরি করবার খরচও নিজের পকেট থেকে দেন। ১৭৮২ সনের মে মাস থেকে গভর্নমেণ্ট মাদ্রাসার দায়িত্বভার নিজেরা নেন ও ওয়ারেন হেস্টিংসকে মাদ্রাসা বাবদ সমস্ত টাকা ফেরত দেন। এখানকার পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় মাদ্রাসা ১৮২৭ সনের আগস্ট মাসে এই বাড়ি থেকে ওয়েলেসলি স্কোয়ারের উত্তরের বাড়িতে উঠে যায়। ঐ বাড়ির ভিত্তি স্থাপন হয় ১৫-৭-১৮২৪ তারিখে। এর কয়েক মাস আগে ঐ সনেরই ২৫ ফেব্রুয়ারি গোলদীঘির উত্তরে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

আবার হুজুরিমলের পদ্মপুকুরে ফিরে আসা যাক। এই পুকুর হুজুরিমল কাটান মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বছরেই—১৭৮০ সনে। এই পুকুরের পূর্বে একটা গলি আছে, তার নাম হুজুরিমল ট্যাংক লেন (হুজুরিমলের পুকুরে যাবার গলি)। পরে পুকুরটা বুঁজিয়ে ফেলে সেখানে একটা বাগান করা হয়। সেই বাগানে কোম্পানির পোর্তুগিজ বংশধর ফিরিঙ্গি কেরানিরা বাস করত। তাই সেই বাগানের নাম হয় 'কেরানি বাগান'। এই বাগানের উত্তরে 'কোম্পানি বাগান লেন' নামে এখনো একটা গলি আছে। এদেশী লোকেরা ইংরেজি শেখবার আগে পর্যন্ত ফিরিঙ্গিরাই কোম্পানির কেরানি হতো, ইংরেজ রাইটারদের বাদ দিলে।

কলকাতার প্রথম বিশপ টমাস ফ্যানশ' মিডলটন ১৮১৪ সনে কলকাতায় এসে দেখলেন যে তখন এই শহরে মাত্র দু'টি চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের গির্জা আছে—একটি ওল্ড বা মিশন গির্জা, দ্বিতীয়টি সেণ্ট জন্‌স গির্জা। দু'টিই বর্তমান ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকায়। সুতরাং তিনি ড্যালহৌসি স্কোয়ার থেকে দূরে বৌবাজার অঞ্চলে, যেখানে তখন অনেক খ্রীস্টান থাকত, আর একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে সাধারণের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন ফিরিঙ্গি মিঃ রবার্ট ল্যাজেরাস ড' অলিভিয়েরা, যিনি এই কেরানি বাগানের মালিক ছিলেন, তিনি বাগানটিকে গির্জা তৈরি করবার জন্য বিশপকে দান করলেন। এই ভদ্রলোক আগে রোমান ক্যাথলিক ছিলেন, পরে প্রোটেস্টাণ্ট হন। তাঁর মা শ্রীমতী জোয়ান ড' অলিভিয়েরার মৃত্যু হয় ১৭৬৫ সনে। মুর্গিহাটার রোমান ক্যাথলিক ক্যাথিড্রালে তাঁর কবর আছে।

বিশপ মিডলটন এই জমিতে ১৪-১১-১৮২০ তারিখে গির্জার ভিত্তি স্থাপন করেন। গির্জা উন্মুক্ত হয় ১১-১১-১৮১৩ তারিখে। গির্জা'র নাম হয় সেণ্ট জেম্‌স গির্জা। এই গির্জার পশ্চিম পাশে একটি ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল তৈরি হয় ১৮২৪ সনে। গির্জা তৈরি করবার সময়েই দেখা গেল যে পুকুর বোঁজানো জমি ক্রমশ বসে যাচ্ছে। সুতরাং এই গির্জার আর চুড়ো তৈরি করা হল না। এইজন্য লোকেরা এই গির্জাকে বলত 'নেড়া গির্জা'। পরে গির্জার কড়ি-বরগাতে উই ধরল। ২২-৮-১৮৫৮ তারিখে গির্জার ছাদ প্রচণ্ড শব্দ ক'রে ভেঙে পড়ল।

এই জায়গায় আবার গির্জা তৈরি না ক'রে ১৬৭ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে জমি কিনে আর একটি সেণ্ট জেম্‌স গির্জা তৈরি করা হল। এর ভিত্তি স্থাপিত হয় ৭-৬-১৮৬২ তারিখে ও এটি উন্মুক্ত হয় ২৫-৭-১৮৬৩ তারিখে। এই গির্জার হাতার মধ্যেই নতুন সেণ্ট জেম্‌স স্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হয় ঐ একই দিনে ৭-৬-১৮৬২ তারিখে ও বাড়ি তৈরি শেষ হয় ১৮৬৪ সনের মার্চ মাসে। এই গির্জার দক্ষিণেই প্র্যাট মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও তার দক্ষিণে ইহুদি গাব্বে সাহেবের বাড়ি 'ব্যাম্বুভিলা'। এই গাব্বে সাহেবের নামেই আলিপুর চিড়িয়াখানায় জন্তুদের একটি ঘর আছে—গাব্বে হাউস। উত্তরে সেণ্ট জেম্‌স স্কুল থেকে আরম্ভ ক'রে দক্ষিণে 'ব্যাম্বু ভিলা' পর্যন্ত সমস্ত জমিটা চিৎপুরের নবাব মহম্মদ রেজা খাঁর বংশধর নবাব সৌলৎজঙ্গের বাগানবাড়ি ছিল।

আগেকার সেণ্ট জেম্‌স গির্জার একটিও চূড়া ছিল না। নতুন সেণ্ট জেম্‌স গির্জায় একটা নয়, দু-দু'টো চূড়া লাগানো হল। তাই আগেকার গির্জাটির যেমন নাম ছিল 'নেড়া গির্জা' নতুন গির্জাটির নাম হল 'জোড়া গির্জা'। এটি কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রোটেস্টাণ্ট গির্জা। ছ'শো জন লোক বসতে পারে এর ভিতর। সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রালও এত বড় নয়।

পুরনো সেণ্ট জেম্‌স গির্জা ভেঙে পড়ার পর মিঃ রবার্ট ল্যাজেরাস ড' অলিভিয়েরা, যিনি গির্জার জন্য জমি দিয়েছিলেন, তাঁর নাতি মিঃ এইচ. এ. এলিয়ট জমির খানিকটা কিনে নেন। বাদবাকি অংশ কেনেন একজন বাঙালি ভদ্রলোক বাজার বসাবার জন্য। এখনো সে বাজার আছে, নাম নেবুতলা বা নেড়াগির্জের বাজার। আর এলিয়ট সাহেবের কেনা জায়গাটার নাম প্রথমে হয়েছিল সেণ্ট জেম্‌স স্কোয়ার, এখন হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। পশ্চিম দিকের রাস্তাটার নাম আগে ছিল সেণ্ট জেম্‌স স্ট্রিট, পরে নাম হয় নেবুতলা স্ট্রিট, বর্তমান নাম শশিভূষণ দে স্ট্রিট।

২৮. নয়ান মল্লিকের ঘাট

নয়ান মল্লিক রাজারাম মল্লিকের পৌত্র ও দর্পনারায়ণ মল্লিকের পুত্র। পুরো নাম কমলনয়ান চাঁদ মল্লিক। জন্ম ১৭১০, মৃত্যু ১৭৭৭ সনে। বড়বাজারে যেখানে এঁর

বার্স ছিল তার নাম এখন মল্লিক স্ট্রিট। আগের নাম 'কমলনয়ানের বেড়'। স্বনামধন্য গৌরচরণ ও নিমাইচরণ মল্লিক এঁরই পুত্র। নিমাইচরণ ৩ কোটি টাকার মালিক ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার আক্রমণের ফলে কলকাতার দেশী লোকদের যে ক্ষতিপূরণের টাকা নবাব মীরজাফর দিয়েছিলেন তা বিলি করবার জন্য যেসব কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন নয়ানচাঁদ মল্লিক। ইনি জাতিতে সুবর্ণবণিক।

২৯. বলরামচন্দ্রের ঘাট

এই বলরামচন্দ্র কে বলতে পারলাম না।

৩০. গ্রেট বাজার (বড়বাজার) ঘাট

এখন হাওড়া পুলের মুখ থেকে চিৎপুর রোড পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা ও তার আশেপাশের গলিকে বড়বাজার বলে। আগে কিন্তু বড়বাজার এত বড় ছিল না। প্রথম থেকেই বড়বাজার ছিল 'বাজার কলকাতা' ও ড্যালহৌসি স্কোয়ারের আশপাশ 'ডিহি কলকাতা'। তখন মনোহরদাসের কাটরাই নাকি ছিল বড়বাজার। অন্তত মনোহরদাসের বংশধরদের এই দাবি। কিন্তু আঠারো শতকের গোড়ায় মনোহর দাসের কাটরা কি হয়েছিল? যাই হোক এখনো মনোহর দাসের কাটরা আছে, আর মনোহরদাসের নামে একটা রাস্তাও আছে। এঁর নাম মনোহরদাস সাহা। পিতার নাম গোপালদাস সাহা। এই মনোহরদাস কাশীর লোক ছিলেন। তিনি গড়ের মাঠে লিণ্ডসে স্ট্রিটের সামনে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে একটি বড় পুকুর গোরুদের জল খাবার জন্য কাটিয়ে দেন ও তার চার কোণে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা ও গণেশ এই চার দেবতার মন্দির তৈরি করিয়ে দেন। এই পুকুরের চার পাশে ১০০ বিঘে জমি কিনে এক বড় গো-চারণের মাঠও ক'রে দেন। শূন্য মন্দিরগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কোনোটাতেই দরজা-জানালা বা দেবতা নেই। মনোহরদাসের বংশধর কাশীর বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত লালা ভগবান দাস ও তাঁর পুত্র মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী শ্রীপ্রকাশ।

৩১. রসবিবির ঘাট

এই ইংরাজ মহিলা সম্বন্ধে কিছু জানি না।

৩২. ব্যারেটো সাহেবের ঘাট

এঁর নাম জোসেফ ব্যারেটো। ইনি এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পোর্তুগিজ বংশের সন্তান। এঁর এক পূর্বপুরুষ ১৫৫৮খ্রীস্টাব্দে গোয়ায় পোর্তুগিজ ভারতের শাসনকর্তা

(ভাইসরয়) ছিলেন। জোসেফ ব্যারেটো গোয়া থেকে কলকাতায় আসেন ও মহাজনী ব্যবসার দ্বারা ক্রোড়পতি হন। ২৫নং ম্যাঙ্গো লেনে তাঁর ব্যাংক ও হৌস ছিল। এই ব্যাংকে সোনা, জহরৎ ইত্যাদি মূল্যবান সামগ্রী গচ্ছিত রাখার জন্য মাটির তলায় কুঠুরি (ভল্ট) ছিল। এরকম কুঠুরি তখন নাকি কলকাতার অন্য কোনো ব্যাংকেই ছিল না।

ব্যারেটো খুব ভাল ফার্সি জানতেন। তিনি বড় দাতা ছিলেন। মুর্গিহাটায় এখন যে বিরাট রোমান ক্যাথলিক গির্জা আছে, যাকে লোকে পোর্তুগিজ গির্জা বলে, আর যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে, সেই গির্জা প্রধানত জোসেফ ব্যারেটোর টাকাতেই তৈরি হয়। শেয়ালদা স্টেশনের পাশেই যে রোমান ক্যাথলিক গোরস্থান আছে তা জোসেফ ব্যারেটোর দান। তিনি ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে এই জমি ৮ হাজার টাকায় কিনে ৮-২-১৭৮৬ তারিখে কলকাতার রোমান ক্যাথলিক অধিবাসীদের দান করেন।

তিনি প্রথম থেকেই হিন্দু কলেজের খাজাঞ্চি ছিলেন। কলেজ ৭০হাজার টাকা ব্যারেটোর ব্যাংকে গচ্ছিত রাখে। ব্যারেটো সাহেব ১৮২৪ সনে মারা যান। তিন বছর পরে ১৮২৭ সনে ব্যারেটোর ব্যাংক ও কারবার ফেল হয়। অনেকদিন পরে ব্যারেটোর বংশধরেরা মাত্র ১৭ হাজার টাকা হিন্দু কলেজকে ফেরত দেন।

একটা সরু গলি উত্তরে ম্যাঙ্গো লেনকে দক্ষিণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রিটের সঙ্গে যোগ করেছে। আগে এ গলির নাম ছিল ব্যারেটো লেন। পরে নাম হয় ক্রস স্ট্রিট। গলিটি এখনো আছে। আর একটা একফালি গলি, যা খুব কমলোকেই ব্যবহার করে এবং যার অস্তিত্ব আরো কম লোকে জানে—সেটা ৩৯নং স্ট্র্যাণ্ড রোডের ভেতর দিয়ে পূর্ব মুখে সামান্য কিছুদূর গেছে। এই গলির নাম এখন ব্যারেটো লেন, খুব সম্ভবত ব্যারেটো সাহেবের স্মৃতি রক্ষা করবার জন্য। কারণ এখন আর ব্যারেটোর ঘাট নেই, পাশের আর্মেনিয়ান ঘাটই এখন ব্যারেটোর ঘাটের স্থান দখল করেছে।

এই ঘাটকে আর্মেনিয়ান ঘাট বলবার কারণ কি? একটু দূরে আর্মেনিয়ান গির্জা ও আর্মেনিয়ান স্ট্রিট থাকার দরুণ? তা নয়। ম্যানুয়েল হাজারমালিয়াঁ নামে একজন আর্মেনিয়ান যিনি ১৭৩৪ সনে আর্মেনিয়ান গির্জার মাথায় ঘণ্টাঘর ও চূড়া তৈরি করিয়ে দেন তিনিই এই ঘাটও তৈরি করেন। তাই এই ঘাটের নাম আর্মেনিয়ান ঘাট। এই অপরিচিত হাজারমালিয়াঁকে আমাদের অতি পরিচিত হুজুরিমলে পরিণত করা খুবই সহজ। অনেক ঐতিহাসিক তাই করেছেন। তাঁদের মধ্যে এ. কে. (অতুলকৃষ্ণ) রায়ও আছেন। এ. কে. রায় প্রথম বাঙালি যিনি ১৯০১ সনের কলকাতার আদমসুমারির ভার পান এবং ঐ আদমসুমারির ভিত্তিতে কলকাতার ইতিহাস লেখেন। এইসব ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন হুজুরিমল আর্মেনিয়ান গির্জার ঘণ্টাঘর ও চূড়া তৈরি ক'রে দিয়েছেন ও তিনিই

এই আর্মেনিয়ান ঘাট তৈরি করেছেন। অপূর্ব ভ্রান্তিবিলাস! এই লেখকেরা ভুলে যান যে হুজুরিমলের ঘাট হচ্ছে এই ঘাটের উত্তরে। আর হুজুরিমল ছিলেন শিখ ধর্মাবলম্বী, তিনি ক্রিশ্চান আর্মেনিয়ানদের গির্জার চূড়া ও ঘণ্টাঘর তৈরি করিয়ে দিতে যাবেন কেন?

এই আর্মেনিয়ান ঘাটে ১৮৫৪ থেকে ১৮৭৪ সন পর্যন্ত ২০ বছর ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের কলকাতা স্টেশন ও টিকিট-ঘর ছিল। এখানেই রেলযাত্রীরা টিকিট কিনত ও সঙ্গের মালপত্র ওজন করিয়ে মাশুল দিত। তারপর রেল কোম্পানির লঞ্চ যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে ওপারে হাওড়ার ঘাটে পৌঁছে দিত। সেখান থেকে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে রেলগাড়িতে চাপত। ১৭-১০-১৮৭৪ তারিখে হাওড়ার পুল খোলবার পর কলকাতা স্টেশন হাওড়ায় চলে যায়।

কিন্তু চলে যাবার অল্প কিছুদিন আগে আর একটা ঘটনা ঘটল। ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার রাস্তায় প্রথম ট্রাম চলল। এই ট্রাম গাড়ি টানত ঘোড়ায়। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের শেয়ালদা স্টেশন থেকে রওনা হয়ে এই ট্রাম বৈঠকখানা, বৌবাজার স্ট্রিট, ডালহৌসি স্কোয়ার, সেখান থেকে সোজা তখনকার কাস্টম হাউসের ভেতর দিয়ে গিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে আর্মেনিয়ান ঘাটে ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের কলকাতা স্টেশনে গিয়ে শেষ হতো। গোড়ায় বলা হয়েছিল যে এই ট্রাম এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশন পর্যন্ত শুধু মাল বইবে—যাত্রী বইবে না। কিন্তু আসল কারণ কি জানি না, প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এই ট্রাম মালপত্র নয়, শুধু যাত্রী বহন করেছে। যে কারণ বলা হয় তা ধোপে টেঁকে না। এই ট্রাম চালিয়েছিল কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা লোকসান দিয়ে ৯ মাস পরে তারা লাইন তুলে দেয়। ট্রাম চলেছিল ২৪ ২ ১৮৭৩ থেকে ২০-১১-১৮৭৩ তারিখ পর্যন্ত। এখন আর্মেনিয়ান ঘাট পোর্ট-কমিশনারদের গুদামে পরিণত হয়েছে।

৩৩. জ্যাকসন সাহেবের ঘাট

এই জ্যাকসন সাহেব কে সঠিক বলা শক্ত। একজন জ্যাকসন ছিলেন ধর্মতলা নেটিভ হাসপাতালের ডাক্তার। এই হাসপাতালের অধীনে সার্কুলার রোডের পূর্বদিকে কুষ্ঠরোগীদের এক হাসপাতাল ছিল। ডাক্তার জ্যাকসন সেই হাসপাতালের পরিচালক ছিলেন।

আর এক জ্যাকসন ছিলেন ব্যবসাদার। তিনি একসময়ে ধর্মতলা বাজারের মালিক হয়েছিলেন। মতিলাল শীল এই জ্যাকসন সাহেবের কাছ থেকে ধর্মতলার বাজার কেনেন। খুব সম্ভবত এই জ্যাকসনই ঘাট তৈরি করিয়েছিলেন।

এখন আর জ্যাকসন ঘাট নেই, কিন্তু জ্যাকসন লেন এখনো এই অজ্ঞাত জ্যাকসন সাহেবের স্মৃতি রক্ষা করছে। এই গলিটি ক্যানিং স্ট্রিট থেকে বেরিয়েছে।

আগে এই গলি জ্যাকসন ঘাটে গিয়ে শেষ হতো।

৩৪. ফোরম্যান সাহেবের ঘাট

এই ফোরম্যান সাহেব কে ছিলেন বলতে পারি না।

৩৫. ব্লাইথ সাহেবের ঘাট

এই ব্লাইথ সাহেব জাহাজ তৈরি করতেন। ব্লাইথ ঘাটের পরে নাম হয় ক্লাইভ ঘাট। কিন্তু ক্লাইভ ঘাট নামটা ভুল। ক্লাইভ সাহেব কোনো ঘাট তৈরি করেন নি। আসল নামটা হচ্ছে ক্লাইভ স্ট্রিট ঘাট। সেইটে বিকৃত বা সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে ক্লাইভ ঘাট।

ক্লাইভ ঘাটের আর একটা নাম ছিল 'স্মিথ সাহেবের ঘাট'। এই স্মিথ সাহেবের নাম ছিল ম্যাথিয়াস বা ম্যাথু স্মিথ। তিনি কোম্পানির নৌবিভাগে কাজ করতেন। দক্ষিণ পার্ক স্ট্রিট সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁর সমাধি আছে।

আগেই বলেছি যে ১৮২৩ সনে স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরি হওয়াতে ক্লাইভ স্ট্রিটের জাহাজ তৈরির ও মেরামতের ডকগুলোর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল, আর তাদের মালিকরা গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় চলে গেলেন। প্রথমে গেলেন ব্ল্যাকমোর সাহেব। তিনি সেখানে গিয়ে 'নিচের ডক' (Lower Dock) তৈরি করলেন। তারপর গেলেন ম্যাথিয়াস বা ম্যাথু স্মিথ সাহেব। তিনি সেখানে 'ওপরের ডক' (Upper Dock) ও 'মাঝের ডক' (Middle Dock) তৈরি করলেন। এর পরে দু'জনে মিলে যৌথ মূলধনে এক কারবার খুললেন। সেই কারবারের নাম দিলেন কলকাতা ডকিং কোম্পানি।

৩৬. ওল্ড ফোর্ট (পুরনো কেল্লা) ঘাট

পুরনো কেল্লার উত্তর গা দিয়ে পুব থেকে একটি পথ এসে শেষ হয়েছিল পুরনো কেল্লা ঘাটে। সেই জন্য পথটিকে বলা হতো ওল্ড ফোর্ট ঘাট স্ট্রিট। এখন সেই রাস্তার নাম হয়েছে ফেয়ার্লি প্লেস। উইলসন ফেয়ার্লি এক সওদাগর ছিলেন। তিনি ফেয়ার্লি গিলমোর নামে এক সওদাগরি কুঠির প্রধান (সিনিয়র) অংশীদার ছিলেন। তিনি সরকারি পিলখানার ঠিকাদার ছিলেন, অর্থাৎ সরকারি সেনা বিভাগের যেসব হাতি ও উট থাকত তিনি তাদের খোরাক যোগাবার ঠিকা নিয়েছিলেন। পরে ফেয়ার্লি সাহেব গিলমোরকে ছেড়ে দিয়ে ফারগুসন নামে আর এক অংশীদার নিয়েফেয়ার্লি ফারগুসন নাম দিয়ে আর একটি সওদাগরি কুঠি খোলেন। রামদুলাল দে (সরকার) এই কুঠির বেনিয়ান ছিলেন ও তাঁর প্রতিবেশী ও বন্ধু কাশীনাথ ঘোষ এই হৌসে কাজ করতেন।

ফেয়ার্লি প্লেসের উত্তর দিকে কিলবার্ন কোম্পানির বাড়ি ফেয়ার্লি হাউস এবং

আর গায়েই ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির বাড়ি। পুরনো কেল্লার এই সমস্ত উত্তর দিকটা জুড়ে ১৭৫৬ সনে ক্রুটেনডেন সাহেবের প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ছিল। সিরাজদ্দৌলার আক্রমণে সেই বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে ফেয়ার্লি প্লেসের সমস্ত দক্ষিণ দিকটা জুড়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানির (এখন ইস্টার্ন রেলের) প্রধান অফিস রয়েছে পুরনো কেল্লার হাতার মধ্যে।

৩৭. নিউ হোয়ার্ফ (নতুন কাঠের জেটি) ঘাট

এই ঘাটের বর্তমান নাম কয়লা ঘাট। পুরনো কেল্লার ঠিক উত্তরে যেমন ওল্ড ফোর্ট ঘাট ছিল, তেমনি ঐ কেল্লার ঠিক দক্ষিণে এই ঘাট ছিল। ঘাটের ওপরেই ছিল পুরনো কাস্টম হাউস। কেল্লা ঘাট বিকৃত হয়ে হয়েছে কয়লা ঘাট।

৩৮. নিউ ডক (নতুন ডক) ঘাট

এই ঘাটের আর একটা নাম ছিল ব্যাংকশাল ঘাট। ১৭৯০ সনে এখানে পাইলট জাহাজ মেরামত করবার জন্য একটি নতুন ডক তৈরি করা হয়। এই ডক থেকে এই ঘাটের নাম হয় নতুন ডক ঘাট। এই ডক ১৮০৮ সনে বুঁজিয়ে ফেলা হয়। কারণ তখন অন্য জায়গায় কয়েকটি ডক তৈরি হয়ে গেছে। এই নতুন ডক ঘাট ছিল রাস্তার উত্তর দিকে, এখন যেখানে আগেকার ছোট আদালত-বাড়ি রয়েছে। আর ঐ রাস্তার দক্ষিণ দিকে আর একটি ঘাট ছিল—নাম পুলিশ ঘাট। রাস্তাটির বর্তমান নাম হচ্ছে হেয়ার স্ট্রিট।

৩৯. Cuchagoody Ghat

এই ঘাটের নামের আর একটা বানান হচ্ছে Kuchagudy। এ. কে. রায় লিখেছেন Kutchagoodee।

অনেকদিন আগে প্রায় চাঁদপাল ঘাটের কাছ থেকে একটা খাল গঙ্গা থেকে বেরিয়ে বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রিটের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে ক্রমাগত পূর্বদিকে গিয়ে বাদা বা লবণ হ্রদে গিয়ে পড়ত। হেস্টিংস স্ট্রিটে ঢোকবার মুখে এই ঘাটটি ছিল।

ইংরেজি বানান দেখে বোঝবার উপায় নেই নামটা আসলে কি ছিল—কুচাগদি, কুচাগুড়ি না কাঁচাগুড়ি। তা বুঝতে না পারা গেলেও যাঁরা এই ঘাটের কথা লিখেছেন তাঁরা সকলেই—এ. কে. রায়ও বাদ যান না—একবাক্যে বলেছেন এটা সেই ঘাট যেখানে দেশী নৌকোগুলোকে জল থেকে পাড়ে তুলে উল্টো ক'রে ফেলে তাদের তলা মেরামত করা হতো। ইংরেজিতে এই কাজকে বলে Careening।

কথাটা আসলে কুচাগদিও নয়, কুচাগুড়িও নয় বা কাঁচাগুড়িও নয়—

কাঁচাগদি। এই ঘাটে একটি মাটির ঘরে ঘাটমাঝি বাস করত। যারা এই খালে নৌকো চালাত তাদের ঐ কাঁচা ঘরে গিয়ে ঘাটমাঝির গদিতে মাশুল দিয়ে আসতে হতো। তাই থেকে এদেশের মাঝি মাল্লারা এই ঘাটকে বলত কাঁচা-গদির ঘাট। ইংরেজরা, ও তাদের দেখাদেখি বাঙালিরাও মানে বুঝতে না পেরে কথাটার কদর্থ করেছেন।*

এই ঘাটের নাম পরে হয় 'কলভিন ঘাট'। খাল বুঁজোনো হয়ে গেলে ১০ নং হেস্টিংস স্ট্রিটে ইংরেজ সওদাগর কলভিন সাহেবের কুঠি হয়। ঐ কুঠির নাম ছিল কলভিন, এন্‌স্লি, কাউই অ্যাণ্ড কোম্পানি। কলভিন সাহেবের অংশীদারদের নাম ছিল হেনরি কাউই, ডেভিড কাউই, উইলিয়াম এন্‌স্লি ও হেনরি ব্লাণ্ট। অন্য সাহেবদের নাম না জানলেও আমরা কলভিন সাহেবের নাম খুব জানি নিচের সংস্কৃত শ্লোক থেকে :

হেয়ার, কলভিন, পামরশ্চ কেরি মার্শম্যানস্তথা
পঞ্চ গোরা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্॥

রাজনারায়ণ বসু কলভিন সাহেবের পরিচয় এইভাবে দিয়েছেন : 'কল্বিন সাহেব এই কলিকাতা নগরে একজন প্রধান সওদাগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র [ভুল; ভ্রাতুষ্পুত্র—রা.মি.] উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফটেনাণ্ট-গবর্নর হইয়াছিলেন। তিনি সিপাইদের বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি দয়াশীল ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্দেশীয়দের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ছিল।'

কলভিন সাহেবের নাম ছিল আলেকজাণ্ডার কলভিন। তাঁর কারবার ছিল ৪ নং হেস্টিংস স্ট্রিটে। তাঁর জন্ম হয় ১১-৪-১৭৫৬ তারিখে, মৃত্যু ১৫-১২-১৮১৮ তারিখে। কলকাতার সেণ্ট জন গির্জায় ২৮-১-১৭৮৬তারিখে ইনি কুমারী মারিয়া মার্গারেট প্যাটারসনকে বিবাহ করেন। এঁর ছোটভাই জেমস কলভিন সামরিক নৌবিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি পরে সে কাজ ত্যাগ ক'রে দাদার ব্যবসায়ে যোগ দেন। জেমস কলভিনের পুত্র জন রাসেল কলভিন। তাঁর জন্ম হয় ৪ নং হেস্টিংস স্ট্রিটের বাড়িতে। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 'গভর্নর' ছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় আগ্রা দুর্গে তিনি মারা যান। জন রাসেল কলভিনের পুত্র স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর ছিলেন ১৮৮৭ থেকে ১৮৯২ সন পর্যন্ত। তিনি তাঁর পিতার

---

* অধ্যাপক ৺চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণীবিজ্ঞানবিদ শ্রীরবি ভট্টাচার্য মশাই আমাকে জানিয়েছেন যে এটি মালয়ালাম শব্দ—'কাচ্চামগাড়', মানে Careening। আমার মনে হয় যেসব ইংরেজ সিভিলিয়ান সে সময় মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় কাজ করতে আসতেন, তাঁরাই এই শব্দটি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আমদানি ক'রে থাকবেন।

মতো দয়ালু ও সদাশয় ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় মত ছিল যে ভারতীয়দের কিছুতেই সিবিল সার্ভিসের মতো উঁচুপদ দেওয়া যেতে পারে না।

৪০. চাঁদপাল ঘাট

চন্দ্রনাথ পাল নামে এক মুদির দোকান এই ঘাটের ওপর ছিল বলে ঘাটের এই নাম। এদেশের পথিকেরা ও মাঝিমাল্লারা এই দোকানে খাবার কিনত। চাঁদ পাল বিকৃত হয়ে চাঁদপল হয়েছে। ১৭৫৬ সনের ম্যাপে এই ঘাটের নাম নেই, ১৭৭৪ সনের ম্যাপে আছে।

১৭৭৩ সনে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সনদ অনুসারে একটি গভর্নর-জেনারেলের সুপ্রিম কাউন্সিল ও একটি সুপ্রিম কোর্ট কলকাতায় স্থাপিত হয়। সুপ্রিম কাউন্সিলের তিনজন সদস্য (চতুর্থ সদস্য রিচার্ড বারওয়েল কলকাতাতেই ছিলেন) —স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, লে জে. ক্লাভারিং ও কর্নেল মনসন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ সার এলিজা ইম্পে ও তিনজন সহকারি—জজ জন হাইড, রবার্ট চেম্বার্স ও স্টিফেন সিজার লেমেস্তার ১৯-১০-১৭৭৪ তারিখে দুপুর বারোটার সময় চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নামেন।

এরপর থেকে যত বড়লাট, যত সেনাপতি, যত বিশপ, যত জজ বিলেত থেকে কলকাতায় এসেছেন সব নেমেছেন চাঁদপাল ঘাটে এবং যত জন এখান থেকে গেছেন সব জাহাজে চেপেছেন এই চাঁদপাল ঘাট থেকেই।

অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারততত্ত্ববিদ জেমস প্রিন্সেপ মারা গেলে তাঁর স্মৃতি-রক্ষার জন্য কলিকাতাবাসীদের অর্থে চাঁদপাল ঘাটের খানিকটা দক্ষিণে 'প্রিন্সেপ ঘাট' তৈরি হয়। তৈরি হবার তারিখ কোনো ইতিহাসেই লেখা নেই। তবে ১৮৪৩ সনের মধ্যে যে তৈরি হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বড়লাট লর্ড এলেনবরা ১৮৪৪ সনের জুলাই মাসে যখন এদেশ ত্যাগ করেন তখন চাঁদপাল ঘাট থেকে জাহাজে না চেপে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে চেপেছিলেন। তারপর থেকে যত রাজা, রাজপুরুষ ও রাজপ্রতিনিধি এসেছেন ও গেছেন সকলেই এই নতুন ঘাটে নেমেছেন ও এই ঘাট থেকে বিদেয় হয়েছেন।

লর্ড কার্জনই প্রথম রাজ-প্রতিনিধি যিনি প্রিন্সেপ ঘাট থেকে জাহাজ না নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে রেলে চেপে বোম্বাই যান ১৯০৫ সনের নভেম্বর মাসে। তখন নতুন হাওড়া স্টেশন তৈরির কাজ সবে শেষ হয়েছে। কার্জন সাহেবের যাবার কয়েকমাস পরেই ১৯০৬ সনে নতুন তৈরি হাওড়া স্টেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। তারপর থেকে সকল রাজপুরুষই রেলপথেই যাতায়াত করেছেন। আর জলপথে যাবেনই বা কি ক'রে? ইত্যবসরে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে গঙ্গা দূরে সরে গেছে ও তার সামনে নতুন স্ট্র্যাণ্ড রোড হয়েছে। পুরনো স্ট্র্যাণ্ড রোড ঐ ঘাটের পিছনে পড়ে আছে। নতুন স্ট্র্যাণ্ড রোডকে পুরনো স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে

তফাত করবার জন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে স্ট্র্যাণ্ড ব্যাংক রোড।

চাঁদপাল ঘাট সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা বাকি আছে। শহরের গোটাকতক পাড়ায় জলসরবরাহ করবার জন্য ১৮২০ সনে এই ঘাটের পাশে এক ছোট বাষ্পীয় পাম্প বসানো হয়। এই পাম্পে ক'রে গঙ্গা থেকে জল তুলে রাস্তার পূর্ব দিকে তৈরি করা এক প্রকাণ্ড পাকা হোসে বা চৌবাচ্চায় সেই জল ভরা হতো। সেখান থেকে পাকা নালা দিয়ে গড়িয়ে সেই জল ঐ পাড়ায় যেত। লোকেরা বালতি ক'রে সেই জল তুলে যে যার কাজে ব্যবহার করত। জেসপ কোম্পানি মাসে ৪০০ টাকায় এই পাম্প চালাবার ঠিকা নিয়েছিল। চুক্তি অনুসারে ঐ কোম্পানি দৈনিক সাত ঘণ্টা ক'রে বছরে আট মাস ঐ পাম্প চালাত। বর্ষাকালের চারমাস পাম্প বন্ধ থাকত।

ঐ যে প্রকাণ্ড পাকা চৌবাচ্চার কথা বললাম, সেটা আসলে এত বড় যে তাকে চৌবাচ্চা না বলে একটা পুকুর বললেই ঠিক হয়। সেই পুকুরটা এখনো আছে, কিন্তু অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছে। এখানে শহরের ধনী বিলাসীদের একটা সাঁতারের ক্লাব হয়েছে। তারা ঐ পুকুরে সাঁতার দেয়। আজ ক'টা লোক জানে যে ঐ পুকুরটা কবে ও কিসের জন্য তৈরি হয়েছিল ?

ঘাট-পরিচয় : তৃতীয় তালিকা
[উত্তর থেকে দক্ষিণে]

১. বাগবাজার খালের দক্ষিণে রুস্তমজীর ঘাট

রুস্তমজী সম্পর্কে আগেই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাগবাজার খালের দক্ষিণে রুস্তমজীর নামে আর একটি ঘাট আছে। এটি চিৎপুর পুল ঘাটেরও দক্ষিণে।

২. দুর্গাচরণ মুখার্জির ঘাট

এই ঘাটটি বাগবাজার খালের ও রুস্তমজীর ঘাটের দক্ষিণে। দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় বাগবাজারে বাস করতেন। ঘাট ছাড়াও এঁর নামে বাগবাজারে একটি রাস্তা আছে—দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিট। এই রাস্তা এঁর ঘাটের সামনে চিৎপুর রোডে এসে পড়েছে। ইনি রাজশাহির কালেক্টার রো সাহেবের, কলকাতা টাঁকশালের অধ্যক্ষ (Mint Master) হ্যারিস সাহেবের এবং আফিমের এজেন্ট অ্যাডিসন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রেখে ৩১-৫-১৮১৪ তারিখে তিনি মারা যান। এঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাস্টম হাউসের দেওয়ান ও

বাগবাজারের পক্ষীর দলের (গাঁজাখোরদের) প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় ১৭৮৩ সনে, মৃত্যু ১-২-১৮১৯ তারিখে ৩৬ বছর বয়সে, দুই স্ত্রী ও এক কন্যা রেখে। দুর্গাচরণের মধ্যমপুত্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠপুত্র রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। রামনারায়ণও অল্পবয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। দুর্গাচরণের কন্যার বিবাহ হয় একজন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর একমাত্র পুত্র ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। পুত্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দৌহিত্র ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় দুর্গাচরণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

জেলা যশোরের অন্তর্গত চাঁচড়ার রাজা ৺শ্রীকণ্ঠ রায় আপন জমিদারির মধ্যে মলাই নামে এক পরগনা দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বন্ধক রেখে ৫২ হাজার টাকা কর্জ নিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ বন্ধকি সম্পত্তি জুয়াচুরি ক'রে কলকাতার শেরিফকে দিয়ে বিক্রি করিয়ে দুর্গাচরণ নিজের বড়ছেলে শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে কিনে কিছুকাল ভোগদখল ক'রে সাতক্ষীরার জমিদার রাধামোহন চৌধুরী ও প্রাণনাথ চৌধুরীকে ২½ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেন। পরে রাজা শ্রীকণ্ঠের নাতি রাজা বরদাকণ্ঠ রায় ঐ সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্যে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করলে সুপ্রিম কোর্ট ঐ সম্পত্তি কেনা প্রতারণামূলক, অতএব বেআইনি, বলে রায় দেন ও ঐ সম্পত্তির ৪০ বছরের আয় ও আদালতের খরচ-খরচা ধরে সবসুদ্ধ ৩৮ লক্ষ টাকা ও সম্পত্তির মূল্য ২½ লক্ষ টাকা হিসেব ক'রে একুনে ৪০½ লক্ষ টাকা মুখুজ্যেদের বিরুদ্ধে ডিক্রি দেন। দুর্গাচরণের উত্তরাধিকারী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে আপিল করেন। ১৮৩৮ সনের ২৬শে মে প্রিভি কাউনসিল সে আপিল নাকচ ক'রে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের রায় বজায় রাখেন।

এই সংবাদটি ২০-১০-১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৪-৩-১৮৫৪ তারিখের 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছিল আমি নিচে তার পুরোটাই উদ্ধৃত করছি :

> এক সময় ৺দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দম্ভে কলিকাতা সহর হতভম্ব প্রায় হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যের অহংকারে কলিকাতার এমন কোন ধনী নাই যাহাকে তিরস্কার করেন নাই। তাঁর পুত্র ৺বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও সেই সময় পিতৃ অর্থে ঘোর বাবু হইয়া উঠেন। সে সময় কলিকাতার পারমিট ঘর [কাস্টম্‌স হাউস—রা. মি.] লুঠঘর ছিল। শিবচন্দ্র বাবুও ঐ ঘরের দেওয়ানি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যথাসাধ্য লুণ্ঠন করিয়াছেন। সে ধনের অধিকাংশই লাম্পট্যে নষ্ট করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সৎকর্ম্মেও ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দান করিতেন। দুর্গাচরণের মৃত্যুর পর শিবচন্দ্রও পরলোকগত হন। তাঁহার দুই পত্নী ও এক কন্যা জীবিতা রহিল। দুর্গাচরণ

মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বাবু সম্পত্তি রক্ষক হইয়া কিয়দ্দিবস সকল বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার অধ্যক্ষতা কালেই অল্পে অল্পে সকল বিষয় হস্তান্তরিত হইল। কেবল হাবিলি সহর পরগণা এবং বাগবাজারের বিশাল অট্টালিকা অবশিষ্ট রহিল। গঙ্গোপাধ্যায় বাবুর পরলোক প্রাপ্তির পর গৃহবিবাদে বিস্তর সম্পত্তি পূর্ব্বেই গিয়াছিল, গত বৃহস্পতিবার বাস্তভিটা অবধি সরিফ নিলামে গিয়াছে। বাবু মতিলাল শীল ১১২০৲ টাকায় দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাটী ক্রয় করিয়াছেন। দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান থাকিতেও ভিটামাটি উৎসন্ন হইল। বিষ্ণুসুন্দরী দেবী বুঝি নাসিকায় সর্ষপ তৈল নিষেক করিয়া এমত ভরসায় নিদ্রা যাইতে ছিলেন যে ব্রাহ্মণের বাটী কেহ সরিফ সেলে ক্রয় করিবে না।

বিষ্ণুসুন্দরী দেবী যে ঠিক কে তা বলতে পারলাম না। মনে হয় ইনি বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা।

৩. বাগবাজারে রাজা নবকৃষ্ণের ঘাট

মহারাজা নবকৃষ্ণ (দে) দেব শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর জন্ম ১৭৩২ সনে, মৃত্যু ২২-১১-১৭৯৭ তারিখে। পৈতৃক নিবাস দক্ষিণ ২৪-পরগনার মুড়াগাছা পরগনার পঞ্চগ্রাম বা পাঁচ গাঁয়ে। এখনো সেখানে মহারাজার জ্ঞাতিরা বাস করছেন। কিন্তু তাঁদের অবস্থা তত ভাল নয়। এই মুড়াগাছা পরগনাকে অনেকেই নদীয়া জেলার মুড়াগাছা গ্রাম ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপিতামহ রুক্মিণীকান্ত দেব বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাই তাঁর উপাধি হয় 'ব্যবহর্তা'। নবকৃষ্ণের পিতা রামচরণ দেব পাঁচগাঁ থেকে উঠে এসে গোবিন্দপুরে বাস করেন। তিনি কটক যাবার পথে পিণ্ডারি দস্যুদের হাতে নিহত হন। তাঁর বিধবা পত্নী গোবিন্দপুরের পরিবর্তে আড়পুলিতে জমি পান। কিন্তু তাঁর বড় ছেলে রামসুন্দর দেব (ইনি পরে পঞ্চকোটের রাজার দেওয়ান হন) ঐ জমি বিক্রি ক'রে শোভাবাজারে জমি কিনে বাড়ি করেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণ উর্দু ও ফার্সি ভাষা খুব ভালো জানতেন। তাই তাঁকে লোকে নবকৃষ্ণ 'মুন্সী' বলত। পরে তিনি আরবী ও ইংরেজি ভাষাও শিখেছিলেন। ১৭৫০ সনে ওয়ারেন হেস্টিংসের ফার্সি শিক্ষক নিযুক্ত হন। কর্নেল ক্লাইভেরও ইনি ফার্সি মুন্সী ছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রের মধ্যে ইনিও ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৬ সনে কলকাতা আক্রমণ করলে গভর্নর ড্রেক থেকে আরম্ভ ক'রে বেশির ভাগ ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষ কলকাতার দুর্গ থেকে পালিয়ে ফলতায় আশ্রয় নেন। নবকৃষ্ণ সেখানে তাঁদের গোপনে খাবার ও খবর দুই যোগাতেন। ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য লর্ড

ক্লাইভের চেষ্টায় দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে ১৭৬৬ সনে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও ছয়হাজারি মনসবদারি পদ পান। ১৭৭৬ সনে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে সুতানুটির তালুকদারি দেন। তাঁর অধীনে জাতিমালা কাছারি, আরজবেগী দপ্তর, মালখানা, ২৪ পরগনার মাল আদালত ও তহশিল দপ্তর ছিল।

১৭৬৬ সনে তিনি নিজের বাড়িতে গোবিন্দ ও গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মাতৃশ্রাদ্ধে ইনি ৯ লক্ষ টাকা খরচ করেন। বেহালা থেকে কুলপি পর্যন্ত ৩২ মাইল রাস্তা ও কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট নিজের খরচায় তৈরি করিয়ে দেন। গ্রে স্ট্রিটে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এনে জমিজমা দিয়ে বসবাস করান। সেইজন্য আগে ঐ রাস্তায় অনেক সংস্কৃত টোল ছিল। এখনো সেখানে কয়েকজন জ্যোতির্ষী ও কবিরাজের বাস। সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও স্মৃতির টোল উঠে গেছে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি যাত্রা, কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই সংগীত ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলকাতায় উড়িয়া রাঁধুনি বামুন ও পালকি বেয়ারার প্রচলন তিনিই করেন বলে প্রবাদ। সেণ্ট জন্‌স গির্জার জমি তিনিই ওয়ারেন হেস্টিংসকে দান করেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণের সাত পত্নী ছিলেন। কিন্তু কারো গর্ভেই পুত্র না হওয়ায় তিনি তাঁর দাদা রামসুন্দর দেবের পুত্র গোপীমোহন দেবকে পোষ্যপুত্র নেন। পোষ্যপুত্র নেবার অনেক পরে পঞ্চাশ বছর বয়সে নবকৃষ্ণের এক স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র হয় তিনিই রাজা রাজকৃষ্ণ দেব! এঁর নামে গ্রে স্ট্রিটের দক্ষিণে একটি রাস্তা আছে। রাজকৃষ্ণের জন্ম ১৭৮২ সনে, মৃত্যু ১৯-৮-১৮২৩ তারিখে। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারি ও বিষয়সম্পত্তি রাজা গোপীমোহন দেব ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের সমস্ত দক্ষিণ ভাগ রাজা রাজকৃষ্ণ পান ও সমস্ত উত্তর ভাগ রাজা গোপীমোহন দেব পান।

রাজা রাজকৃষ্ণের ৮ পুত্র, যথা—রাজা শিবকৃষ্ণ, রাজাবাহাদুর কালীকৃষ্ণ, রাজা দেবীকৃষ্ণ, রাজা অপূর্বকৃষ্ণ, রাজা মাধবকৃষ্ণ, মহারাজা কমলকৃষ্ণ, মহারাজা বাহাদুর স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ, কে. সি. এস. আই. ও রাজা যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র রাজা গোপীমোহন দেবের একমাত্র পুত্র বহুগুণান্বিত রাজা রাধাকান্ত দেব—এতবড় পণ্ডিত এ বংশে আর দ্বিতীয় জন্মান নি। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, ফার্সি, আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় এঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত 'শব্দকল্পদ্রুম' এঁকে অমর করেছে। ভারতীয়দের মধ্যে ইনিই প্রথম কে. সি. এস. আই. উপাধি পান। ইনি তখন বৃন্দাবনে বাস করছেন। আগ্রায় এঁর জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট বিশেষ দরবার ক'রে এই উপাধি এঁকে দেন। শোভাবাজার রাজা রাধাকান্ত দেবের ও শ্যামবাজার মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সম্পত্তি। রাজা রাধাকান্ত দেবের জন্ম ১০-৩-১৭৮৩

ও মৃত্যু ১৯-৪-১৮৬৭ তারিখে বৃন্দাবনে।

রাজা রাজকৃষ্ণের মুসলমানি পোশাক-আশাক ও চালচলন ছিল। তিনি সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। সর্বদাই মুসলমান গাইয়ে, বাজিয়ে ও বাইজিদের নিয়ে থাকতেন। কালীপ্রসাদ দত্তের মতো তাঁরও যবনীদোষ ছিল। তাঁর মুসলমান রক্ষিতার জন্য রাজবাড়ির কাছেই এক মসজিদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। সে মসজিদ এখনো আছে। তিনি মহরম ইত্যাদি মুসলমান পর্বে গোঁয়ার'র সঙ্গে বেরোতেন, আবার হিন্দুদের পর্বেও তাদের মিছিলে যোগ দিতেন।

৫-৪-১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণ'-এ সংবাদ বেরিয়েছিল যে কলকাতার কোনো লোক নান্নিজান, সুপনজান ও নিক্তি প্রভৃতি যবনী বাইজিদের সঙ্গে বারো বছরেরও বেশিকাল একান্নভুক্ত থেকে নগরকীর্তন উপলক্ষে আবার হিন্দুদের মধ্যে গৃহীত হন। অনেকের মতে এই ব্যক্তি রাজা রাজকৃষ্ণ দেব।

গল্প আছে, একবার কোনো হিন্দুপর্বে রাজা রাজকৃষ্ণকে মিছিলের সঙ্গে যেতে দেখে দ্বারকানাথ ঠাকুর (ইনি রাজা রাজকৃষ্ণের চেয়ে ১২ বছরের ছোট ছিলেন) তাঁকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন : 'রাজা আপনি ত দেখছি হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দু, মুসলমানদের দলে মুসলমান।' এই কথা শুনে রাজা রাজকৃষ্ণ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বলেন : ঠাকুর, আমি নয় দুইই, তুমি ত একটাও নও।' দ্বারকানাথ পিরালী ছিলেন, অর্থাৎ না হিন্দু না মুসলমান। রাজকৃষ্ণের জবাবে তারই ইঙ্গিত ছিল।

৪. রাজা রাজকৃষ্ণের ঘাট

এঁর কথা এইমাত্র বললাম।

৫. প্রমদাসুন্দরীর ঘাট

প্রমদাসুন্দরী ছিলেন নাড়াজোলের স্বর্গীয় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁর কন্যা ও বাগবাজারের ৺কবি হরিশচন্দ্র নিয়োগীর জ্যেষ্ঠপুত্র অ্যাটর্নি সুশীলচন্দ্র নিয়োগীর পত্নী। ঘাটের উপর প্রমদাসুন্দরীর একটি আবক্ষ মর্মর-মূর্তি আছে। সেই মূর্তির তলায় ইংরেজিতে লেখা আছে—জন্ম ৫-১২-১৮৮৮, বিবাহ ১৭-৬-১৮৯৯, মৃত্যু ৩-১১-১৯২২।

৬. রসিক নিয়োগীর ঘাট

রসিকলাল নিয়োগী ছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগীর পিতামহ। রসিকলালের পুত্র রাজেন্দ্রলাল ভুবনমোহনের পিতা। বাংলা রঙ্গমঞ্চের যাঁরা খবর রাখেন তাঁদের মধ্যে বোধ করি এমন কেউ নেই যিনি ভুবনমোহন নিয়োগীর নাম শোনেন নি। ভুবনমোহন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। বাগবাজারে

কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রিটে ভুবন নিয়োগীর বাড়ি ছিল। সে বাড়ি এখনো আছে। সেই স্ট্রিটের আরো একটু পূর্বদিকে ভুবনমোহনের প্রতিবেশী ছিলেন তখনকার নাট্যজগতের দুই দিকপাল—ধর্মদাস সুর ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। ধর্মদাস ও ভুবনমোহন ছিলেন জাতিতে সদ্গোপ ও অর্ধেন্দুশেখর পিরালী ব্রাহ্মণ। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর পিতা ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির শাখা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু শ্যামবাজার এ. ভি. (অ্যাংলো ভার্নাকুলার) স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ও ধর্মদাস সুর তিনজনেই এক সময়ে এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

ভুবনমোহন নিয়োগী খুব ধনী লোক ছিলেন। তাঁর অর্থে বর্তমান ৬নং বিডন স্ট্রিটে মহেন্দ্রনাথ দাসের জমি ভাড়া নিয়ে, এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার আছে সেখানে, গড়ের মাঠের ল্যুইস (Lewis) থিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য এক কাঠের বাড়ি তৈরি করা হয়। এই নাট্যশালার ভিত্তি স্থাপিত হয় ২৯-৯-১৮৭৩ তারিখে ও এবং সেখানে প্রথম অভিনয় হয় ৩১-১২-১৮৭৩ তারিখের রাত্রে।

বাগবাজারের বর্তমান অন্নপূর্ণা ঘাটের পাশেই ছিল রসিক নিয়োগীর ঘাট। তখন কলকাতার কোনো ঘাটই এই ঘাটের মতো সুন্দর ছিল না। এই ঘাটের ওপর একটা চাঁদনি ছিল। সেই চাঁদনির ওপর একটা প্রকাণ্ড হলঘর ছিল। রসিক নিয়োগীর মৃত্যুর পর ভুবন নিয়োগী এই হলঘরের মালিক হন। তিনি ১৮৭২ সনে এই হলঘরটি অমৃতলাল বসু প্রমুখকে ছেড়ে দেন 'নীলদর্পণ' নাটক মহড়া দেবার জন্য। এই 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়েই চিৎপুর রোডে মধুসূদন সান্যালের (বর্তমানে মল্লিকদের) ঘড়িওয়ালা বাড়ির বাইরের উঠোন মাসে ৪০ টাকায় ভাড়া নিয়ে ৭-১২-১৮৭২ তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। তিনবছর বাদে ১৮৭৫ সনে কলকাতার পোর্ট কমিশনাররা গঙ্গাতীরের অনেকগুলি গঙ্গাযাত্রীর ঘর ও রসিক নিয়োগীর সেই দোতলা হলঘর ভেঙে দিয়ে পোর্ট ট্রাস্ট রেলপথ তৈরি করেন।

৭. ঠাকুরবাড়ি ঘাট

পাশেই পূর্বদিকে ঠাকুরবাড়ি আছে।

৮. গোলাবাড়ি ঘাট

আগে এখানে ধানের গোলা ছিল।

৯. থানাবাড়ি ঘাট

নাম থেকেই বোঝা যায়, আগে এর কাছেই একটা থানা ছিল।

১০. রাজা রাজবল্লভের ঘাট

রাজা রাজবল্লভের বংশগত উপাধি সোম, সরকারি উপাধি রায়। এঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার বাগাটি গ্রামে, যে গ্রামে বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের বাড়ি ছিল। বাগাটি থেকে এঁরা আসেন চন্দননগরে। সেখান থেকে যান চুঁচুড়ায়। তাই এই বংশ চুঁচড়োর সোমবংশ বলে পরিচিত।

কৃষ্ণবল্লভ সোম (১৬৬৬-১৭৩৬)—এঁর পুত্র মহারাজা জানকীরাম সোম (১৬৮৮-১৭৫৩)। আলিবর্দি খাঁ যখন বিহারের নায়েব-সুবেদার, তখন তিনি জানকীরামকে সুবে-বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বাংলার সুবেদার হওয়ার পর আলিবর্দি জানকীরামকে মুর্শিদাবাদে তাঁর নায়েব-দেওয়ান সুবা বা উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৭৪৯ সনে নবাব তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিহারের নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করেন। দিল্লির সম্রাট তাঁকে মহারাজা বাহাদুর উপাধি দেন।

মহারাজা মাহিন্দ্রবাহাদুর দুর্লভরাম বা রায়দুর্লভ (১৭১০-১৭৭০) মহারাজা জানকীরামের পুত্র। মহারাজা দুর্লভরাম নবাব সিরাজদ্দৌলার ও মীরজাফরের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এঁকে নবাব আলিবর্দি খাঁ প্রথমে উড়িষ্যার নায়েব-সুবেদার পদে নিয়োগ করেন। ১৭৪৯ সনে এঁকে রাজা উপাধি দিয়ে উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করেন। পলাশি যুদ্ধের পর দুর্লভরাম মহারাজা বাহাদুর উপাধি পান। ১৭৬৫ সনে লর্ড ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে এঁকে মহারাজা মাহিন্দ্রবাহাদুর উপাধি পাইয়ে দেন। ১৭৬৬ সনে দুর্লভরাম নবাব সৈফউদ্দৌলার খালসা-দেওয়ান বা রাজস্বমন্ত্রী হন। পলাশি যুদ্ধের সময় ও তার আগেও দুর্লভরাম নবাব সিরাজদ্দৌলার, মীরজাফরের মতো, সেনাপতি ছিলেন। নবাবের বিরুদ্ধে ক্লাইভকে সাহায্য করার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর-সভা ১৭৬৮ সনে তাঁকে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা মাইনে দেন। ১৭৭৫ সনে গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, ভ্যান্সিটার্ট ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কারনাক অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন: 'আমরা বাইবেল চুম্বনপূর্বক বলিতেছি এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফে অঙ্গীকার করিতেছি যে যতদিন রাজা দুর্লভরামের পরিবারের একজনও জীবিত থাকিবে, ততদিন আমরা তাহাদের বংশপরম্পরায় সম্মান ও ভরণপোষণে সম্যক যত্ন পাইব।'

মহারাজা দুর্লভরামের পুত্র রাজা রাজবল্লভ (১৭৩১-৯৮) নবাব মীরজাফরের 'হুজুর নবীশ' অর্থাৎ প্রাধান সেক্রেটারি ছিলেন। নবাব মোবারকউদ্দৌলার রায় রায়াঁ বা খালসা-দেওয়ান (রাজস্বমন্ত্রী) ছিলেন।

পলাশি যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলা-বিহারের নবাব হলেন বটে, কিন্তু এক বছর যেতে না যেতে তাঁর মনে সন্দেহ হয় যে মহারাজা দুর্লভরাম তাঁকে গদিচ্যুত করবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করছেন। সেইজন্য তিনি দুর্লভরামকে হত্যা করবার

সংকল্প করেন। ক্লাইভের সাহায্যে দুর্লভরাম বেঁচে যান ও প্রাণভয়ে পিতাপুত্রে পালিয়ে জলপথে কলকাতায় এসে ইংরেজদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। কলকাতায় তাঁরা আসেন ১৭৫৮ সনের জুন-জুলাই মাস নাগাদ। নবাব মীরজাফর তাঁদের পরিবারবর্গকে মুর্শিদাবাদে আটক করেন। ক্লাইভের হস্তক্ষেপে তাঁরা ছাড়া পান ও ১৭৫৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা কলকাতায় এসে স্বামী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হন।

মহারাজা দুর্লভরাম বাগবাজার অঞ্চলে এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তৈরি ক'রে বাস করেন। তাঁর পুত্র রাজা রাজবল্লভও পিতার সঙ্গে এই বাড়িতে বাস করতেন। কাছেই রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিট রয়েছে। আগে রাজাপাড়া লেন নামে গলিও ছিল। এখন নেই। মহারাজা দুর্লভরাম ও রাজা রাজবল্লভের বাড়িও আর নেই। সে বাড়ি ভেঙে ফেলে তার জায়গায় প্রকাণ্ড 'নববৃন্দাবন মন্দির' হয়েছে ১৯৪১ সনে; তার নম্বর ১৪ রামকান্ত বোসের স্ট্রিট।

রাজা রাজবল্লভের এক পুত্র ও এক ভগ্নী ছিলেন। পুত্রের নাম কুমার মুকুন্দবল্লভ (১৭৯০)। ভগ্নীর নাম রুক্মিণী। তাঁর বিবাহ হয় মদনমোহন মিত্রের সঙ্গে। তাঁর ৪ পুত্র হয়—জগন্নাথপ্রসাদ, কাশীনাথপ্রসাদ, গোলোকনাথ-প্রসাদ, গোপীনাথপ্রসাদ। কুমার মুকুন্দবল্লভের সন্তানাদি না হওয়ায় এঁর বিধবা পত্নী গৌরবল্লভ নামে এক শিশুকে পোষ্যপুত্র নেন। জগন্নাথপ্রসাদ মিত্র পোষ্য-পুত্র গ্রহণ নাকচ করবার জন্য মোকদ্দমা করেন। তিনি প্রথমে জেতেন ও মামাতো ভাই মুকুন্দবল্লভের সম্পত্তির অধিকারী হন। পরে গৌরবল্লভ সোম আপিল ক'রে জেতেন ও সমস্ত সম্পত্তি ফিরে পান। গৌরবল্লভ সোমেরও কোনো সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি রুক্মিণীবল্লভকে পোষ্যপুত্র নেন। কুমার রুক্মিণীবল্লভ রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। রাজা রুক্মিণীবল্লভে এসেই মহারাজা জানকীরামের ধারা বোধহয় শেষ হয় তারপর আর কোনো নাম পাওয়া যায় না।

১১. কুমারটুলির ঘাট

কুমারটুলি বিখ্যাত জায়গা। এখনো এখানে অনেক ঘর কুমোর বাস করে ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করে। কলকাতার কালা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের, বনমালী সরকারের, বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও মহামহো-পাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের বাস ছিল কুমারটুলিতে।

১২. চাঁপাতলার ঘাট

কাছেই চাঁপা গাছ থাকায় এই নাম।

১৩ বীরু মল্লিকের ঘাট

বীরু মল্লিকের ভালো নাম বীর নৃসিংহ মল্লিক। ইনি বৈষ্ণবদাস মল্লিকের (৮-১০-১৭৭৫—১০-৩-১৮৪১) পুত্র। এঁর মৃত্যুর তারিখ ২৩-৭-১৮৪৯।

ইনি দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটে পৈতৃক বাড়ির সামনে এক দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। এই বাড়ির নিচের তলায় ছিল তার আস্তাবল ও ওপরে বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানা বাড়ির পাশে তাঁর বাগান ছিল, তার নাম 'প্রমোদ কানন'। সেই বাগান রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট (বর্তমানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট) গ্রাস করেছে। মনে থাকতে পারে, ১৯০৫ সনের ৩১শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিন রবীন্দ্রনাথ সদলবলে গঙ্গা থেকে স্নান ক'রে আসবার সময় পথে বীরু মল্লিকের আস্তাবলে তাঁর মুসলমান সহিস ও কোচোয়ানদের হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন।

১৪. প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট

এ ঘাটের তত্ত্বাবধান ঠাকুর এস্টেটের অছিরা করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জন্ম ২১-১২-১৮০১ ও মৃত্যু ৩০-৮-১৮৬৮ তারিখে। ইনি পাথুরেঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের (১৭৩১-৯৩) পৌত্র ও গোপীমোহন ঠাকুরের (১৭৬১—১৬-৯-১৮১৮) কনিষ্ঠ পুত্র। গোপীমোহন ঠাকুরের ৬ পুত্র—সূর্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। গোপীমোহন ঠাকুর মৃত্যুকালে নগদ ৮০ লক্ষ টাকা রেখে যান। এই ঠাকুর বংশের নিয়ম—এক পুরুষের নাম হবে 'মোহন' শব্দ দিয়ে, তার পরের পুরুষের নাম হবে 'কুমার' শব্দ দিয়ে। প্রসন্নকুমার শেরবারন সাহেবের স্কুলে ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা পান। ১৮৩১ সনে 'রিফর্মার' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই নিজের নারকেলডাঙ্গা বা শুঁড়ার বাগানে 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। এইটিই ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের প্রথম নাট্যশালা। ২৮-১২-১৮৩১ তারিখে এই থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় শেক্সপিয়ারের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের নির্বাচিত কয়েকটি অংশ ও ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের উইলসন সাহেবের কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজের গভর্নর ছিলেন ১৮৩২ থেকে ১৮৫৪ সন পর্যন্ত। আইন জানা থাকায় সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করেন। অল্পদিনে ঐ আদালতের সরকারী উকিলও হন। ওকালতিতে বছরে ২ লক্ষ টাকা আয় ছিল। ১৮৫০ সনে ওকালতি ত্যাগ করেন। ১৮৫৪ সনে গভর্নর জেনারেলের সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপক সভার সহকারি কেরানি (Asst. clerk) নিযুক্ত হন, মাসে ১২৫০ টাকা মাইনেয়। আইনের অধ্যাপক নিয়োগ করবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে যান। এখনো ঐ টাকার সুদে 'ঠাকুর

আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হচ্ছেন।

কে. সি. এস আই. উপাধি পাবার পর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৈঠকখানা বা কাছারি বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে 'টেগোর কাস্‌ল' তৈরি করেন ইংরেজ ও ইয়োরোপীয় রাজপুরুষ ও এদেশীয় রাজা, মহারাজাদের অতিথিশালারূপে ব্যবহারের জন্য।

প্রসন্নকুমারের স্ত্রী উমাতারার মৃত্যু হয় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর গর্ভে প্রসন্নকুমারের দুই কন্যা সুরসুন্দরী ও মায়াসুন্দরী ও এক পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮২৬-১৮৮৯) জন্মান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন হিন্দু কলেজে মাইকেলের সহপাঠী ছিলেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী বলসুন্দরী (১৮৩৩-৫২) মারা গেলে তিনি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমণিকে (১৮৩৭-৬৯) বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দুই পুত্র প্রসন্নকুমার ও বরেন্দ্রমোহন এবং তিন কন্যা—নিত্যেন্দ্রবালা, নগেন্দ্রবালা (ডাক নাম 'বালা') ও সত্যেন্দ্রবালা (ডাক নাম 'সতু') জন্মান। পুত্র দু'টি ও প্রথম কন্যা অকালে মারা যান। বেঁচে থাকেন শেষ দুই কন্যা।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন বেশির ভাগ সময় বিলেতে থাকতেন। সেখানে থাকতেই তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার। ১৮৬০ সনের মার্চ মাসে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে নাম লেখান। কিন্তু এদেশের আদালতে কখনো ব্যারিস্টারি করেন নি। ইংল্যাণ্ডে করতেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক ছিলেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে খ্রীস্টান হবার পর উইল ক'রে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন ও ভ্রাতুষ্পুত্র (দাদা হরকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে (১৬-৫-১৮৩১—১০-৯-১৯০৮) সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যান। পিতার মৃত্যুর পর জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত লড়ে পিতার উইল অংশত নাকচ করতে সমর্থ হন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালত স্বীকার করেন যে পৈতৃক সম্পত্তিতে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অধিকার আছে, কিন্তু এই অধিকার তিনি বা তাঁর ওয়ারিশানরা ভোগ করতে পারবেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর। জ্ঞানেন্দ্রমোহন যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর ১৯ বছর আগে মারা যান। তাঁর দুই জীবিত কন্যা তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে থাকতেন। তাঁরাও আর পিতৃসম্পত্তি ভোগ করতে পেলেন না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও পোষ্যপুত্র (রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র) মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর।

১৫. আদ্যশ্রাদ্ধ ঘাট

শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছিল এই ঘাটে।

১৬. শ্রাদ্ধ ঘাট

রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বর লাল হরগোবিন্দের শ্রাদ্ধ হয়েছিল এই ঘাটে।

১৭. নিমাই মল্লিকের ঘাট

নিমাইচরণ মল্লিকের জন্ম ১৭৩৬ সনে, মৃত্যু ২৪-১০-১৮০৭ তারিখে। বড়বাজারের নয়ানচাঁদ মল্লিকের ৩ পুত্র—গৌরচরণ, নিমাইচরণ ও রাধাচরণ। নিমাইচরণের ৮ পুত্র—রামগোপাল, রামরতন, রামতনু, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল, স্বরূপচন্দ্র, মতিলাল মল্লিক।

রামগোপাল মল্লিক সিঁদুরিয়াপটিতে বিরাট বাড়ি তৈরি করেন। এঁর বাড়িতেই হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ ও মেট্রোপলিটান থিয়েটার হয়। এই থিয়েটারে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক কেশবচন্দ্র সেনের দল অভিনয় করেন। মতিলাল মল্লিক পাথুরেঘাটায় বিশাল বাড়ি করেন। এঁরই দত্তকপুত্র যদুলাল মল্লিক। স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে রাজারাজেন্দ্রমল্লিকের বাড়ির পূর্বে বাড়ি করেন। রামমোহন মল্লিক বাড়ি করেন বড়বাজার ক্রস স্ট্রিটে।

নিমাইচরণ মল্লিক নুনের ও জমিজমার ফাটকা খেলে ৩ কোটি টাকা রেখে মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেদের মধ্যে দীর্ঘকাল মামলা-মোকদ্দমা হয়। নিমাইচরণ মল্লিকের কথা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথায় (memoirs-এ) ও প্রমথনাথ মল্লিকের 'কলিকাতার কথা', মধ্যকাণ্ডের পরিশিষ্টে অনেক আছে। নিমাই মল্লিকের ছেলেদের মধ্যে রামমোহন মল্লিকই সবশেষে মারা যান। তিনি ৮৫ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৮৫৫ সনে তিনি পিতার নামে গঙ্গায় এই ঘাট তৈরি করিয়ে দেন। নিমাই মল্লিকের ঘাটকে লোকে সাধারণত শুধু মল্লিকঘাট বলে। মল্লিক ঘাটে কলকাতা কর্পোরেশনের অপরিশোধিত গঙ্গাজলের একটি পাম্পিং স্টেশন আছে। প্রথম হাওড়াপুল তৈরি করবার সময়ে মল্লিক ঘাটকে খানিকটা দক্ষিণে সরিয়ে আনতে হয়।

১৮. গণপৎ রায় কাঁয়ার ঘাট

মাড়ওয়ারি জৈনদের কাঁয়া বলে। 'কাঁয়া' চলতি বাংলায় হয়েছে 'কেঁইয়া'। গণপৎ রায় কেঁইয়া ছিলেন কলকাতা শেয়ার বাজারের একজন প্রসিদ্ধ দালাল।

১৯. রামচন্দ্র গোয়েঙ্কার ঘাট

রামচন্দ্র গোয়েঙ্কা স্যার হরিরাম ও স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার পিতা। কালীঘাটে ইনি একটি যাত্রীনিবাস তৈরি করেন। পরে এটিকে কলকাতা কর্পোরেশনের হাতে দেওয়া হয়। এটি এখন মাদার টেরেসার 'নির্মল হৃদয়'—অনাথ মুমূর্ষুদের শেষ বিশ্রামস্থল।

২০. ছোটেলালের ঘাট

ছোটেলালের ঘাট সম্বন্ধে কিছু জানি না।

২১. মতিশীলের ঘাট

আর্মেনিয়ান ঘাটের ঠিক দক্ষিণে মতিশীলের ঘাট। আগে এই ঘাট আরো উত্তরে ছিল। কোম্পানি একে দক্ষিণে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। হীরালাল শীল দীর্ঘকাল গভর্নমেণ্টের সঙ্গে মামলা ক'রে শেষপর্যন্ত পোর্ট কমিশনারদের কাছ থেকে মোটা খেসারত আদায় করেন।

মতিলাল শীলের জন্ম ১৭৯২ সনে ও মৃত্যু ২৯-৫-১৮৫৪ তারিখে। পিতা চৈতন্যচরণ শীলের চীনেবাজারে একটি কাপড়ের দোকান ছিল। মতিলাল পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। সামান্য ইংরেজি শিখে ২৫ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লায় কেরানি ও গুদাম-সরকারের কাজ পান। এই কাজ করতে করতে শিশি, বোতল ও ছিপির ব্যবসা আরম্ভ করেন ১৮১৯ সনে। তাতে তিনি অনেক টাকা রোজগার করেন। সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তিনি জাহাজের কাপ্তেনের মুৎসুদ্দির কাজ ক'রে বহু অর্থ উপার্জন করেন। তারপর কয়েকটি ইয়োরোপীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরো ধনশালী হন। শেষে জাহাজী কারবারে নেমে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে ধনকুবের হন ও কলকাতায় অনেক ভূসম্পত্তি করেন। কলুটোলা স্ট্রিটে তাঁর বিরাট বাড়ি। তিনি ধর্মতলা বাজার কিনেনেন। মেডিক্যাল কলেজের হাতার মধ্যে তাঁর অনেক জমি ছিল। তিনি যেমন বড়লোক ছিলেন তেমনি দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ অবৈতনিক 'শীলস্ ফ্রি কলেজ' স্থাপন করেন। বহুকাল যাবৎ এটি স্কুলে পরিণত হয়েছে। ১৮৪৬ সনে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় (হিন্দু চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন) ও ১৮৫৩ সনে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রচুর অর্থ ও সাহায্যদান করেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য তিনি অনেক জমি দিয়েছিলেন। বেলঘরিয়ায় ও বেহালায় ঠাকুরবাড়ি ও অতিথিশালা তৈরি করিয়ে দেন। গঙ্গার এই স্নান-ঘাট তো আছেই।

মতিলাল শীলের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী সুরতিবাগানের মোহনচাঁদ দে-র কন্যা নাগরী দাসী। এঁর পুত্র-সন্তান হয় নি—একটি মাত্র কন্যা। দ্বিতীয়বার হুগলিতে গৌরী সেনের বংশের কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজরাণীর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর শ্যামলাল মল্লিকের বিয়ে হয়। শ্যামলাল মল্লিককে ভারতীয় রথচাইল্ড বলা হতো। সাত-পুকুরের বিখ্যাত বাগানবাড়ি ইনি কেনেন। তৃতীয়া কন্যা গোপালমণির সঙ্গে লালমোহন মল্লিকের বিয়ে হয়। আর এক কন্যার বিয়ে হয় অদ্বৈতচরণ মল্লিকের সঙ্গে। অদ্বৈত মল্লিকও অগাধ ধনী ছিলেন।

মতিলালের ৫ পুত্রের নাম— হীরালাল, চুনীলাল, পান্নালাল, গোবিন্দলাল ও কানাইলাল। প্রত্যেক পুত্রই বিপুল সম্পত্তির অধিকারি ছিলেন।

২২. বাবু ঘাট

জানবাজারের বাবু রাজচন্দ্র দাস (১৭৮৯-১৮৩৬)১৮৩০সনে এই ঘাট তৈরি করিয়ে দেন। লোকে এই ঘাটকে নির্মাতার নাম বাদ দিয়ে শুধু 'বাবু ঘাট' বলে। রাজচন্দ্র দাসের জন্ম ১৭৮৮ সনে ও মৃত্যু ৯-৬-১৮৩৬ তারিখে। রাজচন্দ্র দাস ছিলেন জাতিতে মাহিষ্য, প্রীতিরাম দাসের (১৭৫৩-১৮১৭) দ্বিতীয় পুত্র ও রানী রাসমণির (২৭-৯-১৭৯৩—২৪-২-১৮৬১) স্বামী।

রাজচন্দ্র দাসের ঠাকুরদা কৃষ্ণরাম দাস বাঁশের ব্যবসা করতেন বলে তাঁর উপাধি হয় 'মাড়'। পিতা প্রীতিরাম দাস কাস্টমস হাউসে কাজ ও চালের ব্যবসা করতেন। সোনাই বাজার, বেলেঘাটা বাজার ও ভবানীপুরের বাজার রানী রাসমণির সম্পত্তি।

এই বংশের আদি বাস হাওড়া জেলার খোসালপুর গ্রামে। কৃষ্ণরাম দাসের ভগ্নী বিন্দুবালা দাসী জানবাজারের জমিদার মান্না বাবুদের বাড়ির বৌ—অক্রূর খান্নার স্ত্রী। সেই সূত্রে প্রীতিরাম দাস ঘোষালপুর থেকে ১৭৬৭ সনে ছোট দুই ভাই রামতনু ও কালীপ্রসাদকে নিয়ে কলকাতায় এসে জানবাজারে পিসীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৭৭৭ সনে যুগল মান্নার এগারো বছরের মেয়েকে বিয়ে ক'রে জানবাজারের কয়েকখানি বাড়ি ও ১৬ বিঘে জমি যৌতুক পান। প্রীতিরামের প্রথম পুত্র হরচন্দ্র দাসের জন্ম ১৭৭৯, মৃত্যু ১৮০২ সনে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

প্রীতিরাম দাস জানবাজারে ৭১নং ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে প্রথম বাড়ি তৈরি করেন। জানবাজারের বর্তমান বিরাট সাতমহলা বাড়ি—তাতে ঘর আছে তিনশ—প্রীতিরাম আরম্ভ করেন ১৮১৩ সনে। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র রাজচন্দ্র দাস ১৮২১ সনে তা শেষ করেন। বাড়ি তৈরি করতে মোট খরচ পড়েছিল ৫ লক্ষ টাকা।

রাজচন্দ্র দাসের তিন বিয়ে। প্রথম বিয়ে হয় ১৮০১ সনে। সে স্ত্রী মারা যেতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন পরের বছর (১৮০২)। সে স্ত্রীও অল্পদিন পরে মারা যান। তখন তৃতীয়বার বিয়ে করেন রাসমণিকে ২৩-৪-১৮০৪ তারিখে। রাসমণির গর্ভে রাজচন্দ্রের ৪ কন্যা হয়— পদ্মমণি দাসী (জন্ম ১৮০৬), কুমারী দাসী (জন্ম ১৮১১), করুণাময়ী দাসী (১৮১৬-১৮৩১) ও জগদম্বা দাসী (জন্ম ১৮২৩, বিবাহ ১৮৩২)। প্রথম কন্যার বিবাহ হয় রামচন্দ্র দাসের সঙ্গে। এঁর বাড়ি সাউথ রোড, এণ্টালিতে (এখন সুরেশ সরকার রোড)। দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে হয় প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে। এঁর বাড়ি ট্যাংরায়। তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যার বিয়ে হয় মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে। তিনি রানী রাসমণির

এস্টেটের ম্যানেজার ও তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। সেইজন্য তিনি এঁদের ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন। এখনো সে বাড়িতে তাঁর বংশধরেরা বাস করেন।

রানী রাসমণি ১৮৩৮ সনে ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা খরচ ক'রে রুপোর রথ তৈরি করান। ৯ লক্ষ টাকা দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে কালী ও দ্বাদশ শিবমন্দির তৈরি করেন। মন্দিরের উদ্বোধন হয় ৩১-৫-১৮৫৫ তারিখে। উদ্বোধনের দিনই ২ লক্ষ টাকা খরচ হয়। রাসমণির ছোট মেয়ে জগদম্বার বিয়ে হয় ১৮৩২ সনে। তিনি টিটাগড়ে ৩ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে এক অন্নপূর্ণার মন্দির তৈরি করেন ১৮৭৪ সনে।

বাবু রাজচন্দ্র দাস চৌরঙ্গি থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত একটি পাকা চওড়া রাস্তা তৈরি করিয়ে দেন। প্রথমে সে রাস্তার নাম ছিল বাবু রাজচন্দ্র দাস রোড। তার পর হয় অকল্যাণ্ড রোড। এখন হয়েছে রানী রাসমণি রোড। রাজচন্দ্র দাস গঙ্গায় দু'টি স্নান ঘাট তৈরি করিয়ে দেন—একটি বাবু ঘাট, দ্বিতীয়টি হাটখোলার ঘাট। ১৮৩৪ সালে তিনি ৬৫।২ নং স্ট্র্যাণ্ড রোডে (নিমতলা শ্মশানের ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে) গঙ্গাযাত্রীদের জন্য একটি ঘর তৈরি করিয়ে দেন। আর চানক বা ব্যারাকপুরে একটি পুকুর কাটিয়ে দেন যার নাম তাল-পুকুর। মৃত্যুকালে রাজচন্দ্র বিশাল জমিদারি ও নগদ ৬৮ লক্ষ টাকা রেখে যান। এছাড়া বেঙ্গল ব্যাংকের শেয়ার ছিল ৮ লক্ষ টাকার ও লোকেদের ধার দেওয়া ছিল ৩ লক্ষ টাকা।

রানী রাসমণি ভবানীপুরের বাজার তাঁর দ্বিতীয় কন্যার পুত্র যদুনাথ চৌধুরীকে দিয়ে যান। তাই থেকে ও বাজারের নাম হয়েছে যদুবাবুর বাজার। হিন্দুস্থানিরা ও তাদের দেখাদেখি বাঙালিরাও বলে জগুবাবুর বাজার।

রাসমণি গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে 'রানী' উপাধি পান নি। তাঁর মা তাঁকে আদর ক'রে রানী বলে ডাকতেন, তাই তিনি 'রানী'।

২৩. আউট্রাম ঘাট

এই নামকরণ General Sir James Outram (১৮০৩-৬৩)-এর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার জন্য। আউট্রাম ঘাট বাবুঘাটের দক্ষিণে। রেঙ্গুনের জাহাজ এই ঘাট থেকে ছাড়ত, আবার এই ঘাটে ভিড়ত। দোতলায় একটি রেস্টুরেণ্ট ছিল। সেখানে চা, কফি, কেক ইত্যাদি পাওয়া যেত। বহুলোক বিকেলে এই রেস্টুরেণ্ট বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাত।

ব্রিটিশ সেনাপতি Sir James Outram-এর জন্ম হয় স্কটল্যাণ্ডে, ২৯-১-১৮০৩ তারিখে। Aberdeen-এর Marischal College-এ শিক্ষা পান। ১৬ বছর বয়সে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৮২০ সনে

বোম্বাই রেজিমেণ্টের অস্থায়ী অ্যাডজুটাণ্ট (Adjutant) হন। ১৮২২ সন থেকে খুব বড় শিকারী হন। অনেক বাঘ ও বড় বড় হিংস্র জন্তু মারেন। কয়েক বছর খান্দেশে কাটান। সেই সময়ে ভিল বাহিনী গঠন ক'রে দুর্ধর্ষ ভিলদের দমন করেন। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সন পর্যন্ত গুজরাটে থেকে বিদ্রোহী সর্দারদের শায়েস্তা করেন। তারপর মাহীকনের Political Agent নিযুক্ত হন। ১৮৩৮ সনে বোম্বাইয়ের সৈন্যদলের অধিনায়ক হয়ে সেই সৈন্যদলকে কান্দাহার ও গজনীর মধ্য দিয়ে কাবুলে নিয়ে যান। সেই সময় তিনি Sir John (Lord) Keane-এর staff-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাবুল থেকে তিনি আমির দোস্ত মহম্মদের পিছু ধাওয়া ক'রে তাঁকে হিন্দুকুশ পর্বতের ওপারে তাড়িয়ে দেন ১৮৩৯ সনে। দক্ষিণ আফগানিস্থানের যুদ্ধবিগ্রহে তিনি বিশেষ নাম করেন। ১৮৩৯ সনে সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ শহরে পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত হন এবং ১৮৪১ সনে নিযুক্ত হন উত্তর-সিন্ধুপ্রদেশের পলিটিক্যাল এজেণ্ট। এই সময়ে তিনি সিন্ধুর আমিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। সিন্ধুপ্রদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে প্রধান সেনাপতি Sir Charles Napier ও গভর্নর-জেনারেল Lord Ellenborough-র সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়। তিনি সিন্ধুদেশকে গ্রাস করবার বিরোধী ছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে তর্কবিতর্ক চলে। তিনি সিন্ধুর আমিরদের হয়ে যেমন ভারতে, তেমনি ইংল্যাণ্ডে জোর লড়াই করেন। ১৫-২-১৮৪৩ তারিখে প্রচণ্ড লড়াই ক'রে ৮ হাজার বালুচি আক্রমণকারীর হাত থেকে হায়দ্রাবাদ রেসিডেন্সি রক্ষা করেন। তারপর Lieutenant-Colonel হন ও C. B. (Companion of the Order of the Bath) উপাধি পান। ১৮৪৫ সনে সাতারায় Resident থাকেন ও ১৮৪৭ সনে বরোদায় থাকাকালে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে ঘুষ নেওয়া ও অন্যান্য দুর্নীতি ধরিয়ে দেন। সেইজন্য বোম্বাই গভর্নমেণ্ট সে পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেন, কিন্তু Lord Dalhousie তাঁকে পূর্বপদে আবার বহাল করেন। আর ১৮৫৪ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে লখনৌ-এর রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন। পরে আউট্রামের সুপারিশে অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিশরা অধিকার করলে তাঁকে অযোধ্যা প্রদেশের প্রথম Chief Commissioner নিযুক্ত করা হয় ও K.C.B. (Knight Commander of the Bath) উপাধি দেওয়া হয়। তাঁকে ১৮৫৬-৫৭ সনের পারস্যের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং যুদ্ধ শেষ হলে G. C. B. (Knight Grand Cross of the Bath) উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৫৭-৫৮ সনের সিপাহি বিদ্রোহে বেঙ্গল আর্মির দু'টি ডিভিশন তিনি পরিচালনা করেন। ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অবরুদ্ধ লখনৌ শহরকে অবরোধ-মুক্ত করবার জন্য যে সেনাদল পাঠানো হয়। তিনি নিজে সেই সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ না ক'রে উদারতা-বশে নেতৃত্ব

দেন Sir Henry Havelock-কে এবং নিজে একজন সামান্য স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক হিসেবে সেই সেনাদলের সঙ্গে যান। পরে অবশ্য তিনি হ্যাভেলকের উর্ধ্বতম সেনানায়ক রূপে নিজের পদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার অযোধ্যার চিফ-কমিশনার হন। ১৮৫৭ সনের নভেম্বর মাসে লখনৌকে দ্বিতীয়বার অবরোধ থেকে মুক্ত করার জন্য সেনাদল পাঠানো হলে আউট্রাম আলমবাগে আশ্রয় নেন এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার বিদ্রোহী সিপাহির আক্রমণ থেকে, ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে চূড়ান্তভাবে লখনৌকে পুনর্দখল করা পর্যন্ত, আলমবাগকে রক্ষা করেন। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ সন পর্যন্ত Viceroy-এর Supreme Court-এর সামরিক সদস্য ছিলেন। ১৮৬০ সনে তিনি অবসর নেন। শেষপর্যন্ত তিনি Lt. General হয়েছিলেন। ১৮৬১ সনে তাঁকে K. C. S. D. (Knight Commander of the Order of the Star of India) এবং D. C. L. (Doctor of Civil Law) উপাধি দেওয়া হয়। সিপাহি বিদ্রোহের পর তাঁকে Baronet (বংশানুক্রমে Knight) করা হয়। ১১-৩-১৮৬৩ তারিখে তিনি ইংল্যাণ্ডে মারা যান। Westminster Abbey-তে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়।

ইংরেজরা আউট্রামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর মূর্তি লণ্ডনে ও কলকাতায় স্থাপন করা হয়। কলকাতার মূর্তিটি ছিল পার্ক স্ট্রিট ও চৌরঙ্গি রোডের মোড়ে—এক অশ্বারূঢ় তেজোদৃপ্ত সৈনিকের ব্রোঞ্জমূর্তি। সমস্ত গড়ের মাঠে ব্রিটিশ রাজ-পুরুষ কিংবা সেনাপতির যত মূর্তি ছিল, তাদের মধ্যে কেউই এই আউট্রামের মূর্তির ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারত না। স্বাধীনতার পরে সেই জায়গায় বিখ্যাত ভাস্কর ৺দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর নির্মিত মহাত্মা গান্ধির মূর্তি বসানো হয়েছিল। সেটিও আবার সম্প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে নির্মীয়মান পাতাল রেলের কাজের।

২৪. পানিঘাট

কেল্লার ওয়াটার গেটের কাছেই এই ঘাট।

২৫. পাউডার ঘাট বা বারুদ ঘাট

বিবরণ জানা নেই।

২৬. প্রিন্সেপ ঘাট

জেমস প্রিন্সেপের নামে এই ঘাট। প্রিন্সেপের জন্ম ইংল্যাণ্ডে ২০-৮-১৭৯৯ তারিখে, মৃত্যু কলকাতায় ২২-৪-১৮৩০ তারিখে মাত্র ৪১ বছর বয়সে। পিতা জন প্রিন্সেপ। জন প্রিন্সেপের ৮ পুত্র। সকল পুত্রই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতী।

প্রিন্সেপের পুত্রদের মধ্যে জেমস সপ্তম এবং সবচেয়ে বেশি কীর্তিমান। তিনি ১৮১৯ সনে ২০ বছর বয়সে ভারতবর্ষে আসেন কলকাতা টাঁকশালের সহকারি ধাতু-পরীক্ষক (Assay-Master) হয়ে। ১৮২০ থেকে ১৮৩০ সন পর্যন্ত ১০বছর কাশীর টাঁকশালের ধাতু-পরীক্ষক বা অ্যাসে-মাস্টার ছিলেন। ১৮৩০ সনে কলকাতা টাঁকশালের ডেপুটি অ্যাসে-মাস্টার ও ১৮৩২ সনে অ্যাসে-মাস্টার হন। এই পদে তিনি ১৮৩৮ সন পর্যন্ত কাজ করেন। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে অকালে মারা যান।

কাশীতে তিনি একটি নতুন টাঁকশাল ও গির্জা তৈরি করেন। কর্মনাশা নদীর ওপর তিনি একটি সেতু নির্মাণ করেন। তিনি বারাণসী শহর উন্নয়ন কমিটির সদস্য ও সম্পাদক ছিলেন। সেখানে একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। ১৮৫০ সনে 'Views and Illustrations of Benares' নামে একখানি বই প্রকাশ করেন। কলকাতায় থাকাকালে 'Gleanings of Science'নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এটিই পরে বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটি-র জার্নাল (মুখপত্র) হয়ে দাঁড়ায়। প্রিন্সেপ ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ সন পর্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। আর, কলকাতায় থাকবার সময়েই তাঁর ছোটভাই বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ার্সদের ক্যাপ্টেন টমাস প্রিন্সেপ হুগলি নদীকে সুন্দরবনের সঙ্গে যোগ করবার জন্য যে খাল কাটতে আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁর আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, জেমস প্রিন্সেপ সেই খাল কাটার কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই খালটি হচ্ছে সার্কুলার খাল।

এছাড়া প্রিন্সেপ অনেক রকমের বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন; যেমন—রসায়নশাস্ত্র, খণিজবিদ্যা, আবহবিজ্ঞান, ভারতীয় লিপিমালা, মুদ্রাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব। আরো অনেক রকমের কাজ তিনি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে—প্রস্তরস্তম্ভে ও পর্বতগাত্রে খোদিত সম্রাট অশোকের অনুশাসনের পাঠোদ্ধার। তাঁর পূর্বে কোনো ভারতীয় বা বিদেশী পণ্ডিত এই লিপি পড়তে পারেন নি। তাঁর অন্যান্য কাজ বাদ দিলেও, এই একটি মাত্র কাজের দ্বারা তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

২৭. বা'লু ঘাট

বিবরণ জানা নেই।

২৮ তক্তা ঘাট

সত্যি এখানে কোনো বাঁধানো ঘাট ছিল না। মহারাজা নামে জাহাজ এই ঘাট থেকে মাসে একবার দ্বীপান্তরিত কয়েদিদের আন্দামানে নিয়ে যেত ও সাজা--

কাটা, ছাড়-পাওয়া বন্দীদের আন্দামান থেকে এই ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে আসত। পায়ে বেড়ি-পরা কয়েদিদের জন্য গঙ্গার পাড় থেকে জাহাজ পর্যন্ত গোটাকতক তক্তা পেতে দেওয়া হতো। কয়েদিদের নিজেদের মোটঘাট নিয়ে সেই তক্তার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজে চড়তে হতো। তাই ঘাটের নাম হয়েছে তক্তা ঘাট।

২৯. দৈ ঘাট

কেন এই নাম জানি না। এই ঘাটে কি কোনো সময়ে দৈ বিক্রি হতো, তাই এই নাম? না কোনো বিদেশী শব্দ বিকৃত হয়ে দৈ-এ পরিণত হয়েছে!

ঘাটের কথা এইখানেই শেষ হল। আমি সবসুদ্ধ ৮২ টি ঘাটের উল্লেখ করেছি।*

* শ্রদ্ধেয় ড. অতুলকৃষ্ণ সুর আমাকে প্রমদাসুন্দরী ও গণপৎ রায় কাঁহার পরিচয় দিয়ে বিশেষ বাধিত করেছেন।—লেখক

১৩

ক'লকাতা গোড়ায় ক'লকাতায় ছিল কি ?

এই শিরোনামে শ্রদ্ধেয় ডকটর সুকুমার সেন 'উত্তরসূরি' পত্রিকার ২৬শ বর্ষ ১৩৮৬/১ম-২য় সংখ্যায় (১৩৮৫-৮৬) একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের শিরোনামটি আপাতদৃষ্টিতে ঠাট্টা বা হেঁয়ালি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধটি ঠাট্টা বা হেঁয়ালি মোটেই নয়, প্রাচীন কলকাতা সম্বন্ধে একটি গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ। ডকটর সেন চিরজীবনই নানা বিষয়ে গবেষণা ক'রে এসেছেন—বিশেষত ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে। এই প্রবন্ধে গবেষণা করেছেন প্রাচীন কলকাতার ওপর। এটি তাঁর অতি সাম্প্রতিকতম গবেষণা।

এই প্রবন্ধেরই এক জায়গায় ডকটর সেন লিখেছেন : "সুনীতিবাবু 'কলিকাতা' নামের অর্থ নিয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অনেক কাল পরে শ্রীরাধারমণ মিত্র মহাশয় সুনীতিবাবুর প্রবন্ধ নিয়ে প্রচুর জল ঘোলা করেছিলেন। কৌতূহলী পাঠক 'এক্ষণ' পত্রিকার পুরোনো সংখ্যায় তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন।"

সুনীতিবাবুর প্রবন্ধটি ছিল 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি' নিয়ে। এটি আমি 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রায় বছর দশেক আগে সমালোচনা করেছিলাম। [বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়-রূপে সেটি পুনঃপ্রকাশিত। —রা. মি. ।] এই সমালোচনার দ্বারা আমি প্রচুর জল ঘোলা করেছিলাম কিনা তা আমার বলা সাজে না। যাঁরা সুনীতিবাবুর সেই প্রবন্ধ ও আমার সমালোচনা দুইই পড়েছেন, তাঁরাই তার বিচার করবেন। এখানে ড. সেনকে আমি ধন্যবাদ দিই এই কারণে যে, এতদিনেও তিনি এই অধমকে ভোলেন নি—দয়া ক'রে মনে রেখেছেন।

সুনীতিবাবুর প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল দু'টি—১. কলিকাতা নামটি হয়েছে দু'টি বাংলা শব্দ 'কলিচুন' ও 'কাতা' থেকে, এবং ২. কলিকাতা নামে যে এক মৌজা বা গ্রাম ছিল তার প্রমাণ আগে না হলেও অন্তত ইং ১৪৯৫ সন থেকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন গ্রাম কলিকাতা।

সুনীতিকুমারের শিষ্য ড.সেন গুরুর এই দু'টি বক্তব্যকেই এক কলমের খোঁচায় নস্যাৎ ক'রে দিয়েছেন। ড. সেন লিখেছেন: "সুনীতিবাবু ধরে নিয়েছিলেন নামটি ['কলিকাতা'—রা. মি.) বাংলা শব্দে গড়া। আমার অনুমান নামটি আরবী (এবং ফারসীতে ব্যবহৃত) শব্দে গড়া। (সুতরাং গুরু-শিষ্য আমরা ভিন্নবাদী হলেও বিবাদী নই।) আরবী শব্দ 'কলি' (qali) মানে নির্বোধ, আর কত্তা (qatte) মানে দস্যু, হত্যাকারী (বহুবচন)। তাহলে স্থান নামটির মানে হয়—বোকা বজ্জাতের আড্ডা।"

এ বিষয়ে আমার যা বলবার আছে তা পরে বলছি। এখানে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, শিষ্য গুরুর মত সম্পূর্ণ খণ্ডন করেও কি ক'রে বিবাদী হন না তা আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য। একজনের গালে চড় মেরেও যদি বলা যায় যে আমি তার গালে চড় মারি নি, গালে একটা মশা বসেছিল তাকে মারতে চেয়েছিলাম—ড. সেনের যুক্তি অনেকটা সেই রকমের।

কলিকাতা গ্রামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ড. সেন লিখেছেন: "লণ্ডের রেকর্ডে সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের পর কলকাতার যে উল্লেখ সে কোন গ্রামের বা অঞ্চলের নাম বলে নয়, পরগণার নাম বলে।" তারপর লিখেছেন: "কলিকাতা পরগণার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে প্রশ্ন জাগে, এ নামে কোথাও কোন বিশেষ মৌজা (বা গ্রাম) ছিল কি না।" এবং সবশেষে লিখেছেন: "আশা করি এটুকু সকলে স্বীকার করবেন যে কলিকাতা (ক'লকাতা) নামে কোন মৌজা (বা গ্রাম) সুতানুটী-গোবিন্দপুরের সংলগ্ন ছিল না।"

আমি ড. সেনের এই দু'টি মূল বক্তব্যের প্রথমে আলোচনা ক'রে তিনি আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে যা বলেছেন তার আলোচনা পরে করব।

আমি নিজে আরবি (ও ফারসি) অভিধান দেখেছি—কোথাও Qali মানে নির্বোধ আর Qatte মানে দস্যু বা হত্যাকারী পাই নি। তাছাড়া, ভালো আরবি জানেন এমন পাঁচজন মৌলবি সাহেবকেও জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁদের মধ্যে কলকাতা মাদ্রাসার মাননীয় অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফারসি বিভাগের প্রধান অধ্যাপকও আছেন। তাঁরা সকলেই ভালো ক'রে আরবি অভিধান দেখে বলেছেন, ঐ দু'টি শব্দের যে মানে ড. সেন করেছেন সে মানে কোনো অভিধানে পাওয়া যায় না এবং তাঁরা নিজেরাও জানেন না। শেষোক্ত দু'জন লিখে জানিয়েছেন: "Qali means Tin (from the mine Qal, where it is .found), white washing, gilding,

varnish, gloss, plating, a coating of tin given to culinary vessels, such as pots, kettles etc. ।" এই থেকে বাংলায় ধাতুপাত্র 'কলাই করা' এসেছে। Qali হিন্দিতে হয়েছে Kali। তার একটাই মানে—কলিচুন, কলি ফেরানো। আর Qatte শব্দ নেই, আছে Qati—মানে বাংলায় 'কাটা', ইংরেজিতে to cut।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, Qali Qatte-র ডঃ সেন যে 'বোকা বজ্জাতের আড্ডা' মানে করেছেন সে মানে কোনো রকমেই হয় না। তাছাড়া, ড. সেনের ব্যুৎপত্তি অনুসারে শব্দ দু'টির মানে তো বোকা দস্যু বা হত্যাকারী হয়, বোকা বজ্জাত হয় না। বজ্জাত ফারসি শব্দ, মানে—যার খারাপ বা নীচকুলে জন্ম (বদ্+জাদ)। বাংলায় কিন্তু বজ্জাতের মানে 'বদমাস' বা 'পাজি'। দস্যু বা হত্যাকারীকে মাত্র বজ্জাত বললে কিছুই বলা হয় না। ডাকাত বা খুনে, বজ্জাতের অনেকগুণ বাড়া। তাছাড়া, ডাকাতি বা খুন করা যাদের পেশা তারা বোকা হয় না, খুব চালাক-চতুর হয়। নয়তো ডাকাতি বা খুনখারাবি করতে পারে না। বোকা লোক রাগের মাথায় হঠাৎ কাউকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু তাকে 'খুনে' বলা যায় না। পেশাদার খুনেকেই 'খুনে' বলে।

কলকাতা নামে এক পরগনা ছিল নিশ্চয়ই। কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। আমি নিজেই সুনীতিবাবুর প্রবন্ধের সমালোচনায় [প্রথম অধ্যায়ে] সে কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে 'কলকাতা' নামে গ্রাম ছিল না বা সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের সংলগ্ন ছিল না।

একথা সকলেই জানে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে সাবর্ণ চৌধুরী বংশের কয়েকজন জমিদারের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কিনেছিল। এই কেনার অনুমতি দিয়েছিলেন সুবেদার আজিম-উন্-সাম ইংরেজদের কাছ থেকে ১৬ হাজার টাকা সেলামি বা নজরানা নিয়ে। আর যে সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারেরা বিক্রি করেছিলেন, তাঁরা পেয়েছিলেন মূল্যস্বরূপ মাত্র ১৩০০ টাকা।

ফারসি ভাষায় লিখিত মূল বিক্রয়ের দলিলটি (বয়নামা) আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। তাতে কাজির সিলমোহর আছে, জমিদারদের স্বাক্ষর আছে। বিক্রয়ের তারিখ হিজরি সন ১১১০-এর প্রথম জামাদি মাসের ১৫ তারিখ—ইংরেজি ১০ নভেম্বর, ১৬৯৮ (পুরনো স্টাইল)। এই দলিলটির নম্বর হচ্ছে—৩৯, যে অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপিতে আছে তার নম্বর হচ্ছে—২৪০৩৯। এই দলিলটি ফারসি ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মি. ডব্লিউ আরভিন, আই. সি. এস. (অবসরপ্রাপ্ত)। দলিলটি নেহাৎ ছোট নয়। আমি নিচে মাত্র প্রাসঙ্গিক অংশ তা থেকে উদ্ধৃত করলাম :

We submissive to Islam, declaring our names and descents

(viz.) Monohar Dat, son of Bas Deo, the son of Raghu; and Ram Chand, the son of Bidyadhar, son of Jagadis; and Ram Bhadar, the son of Ram Deo, son of Kisen; and Pran, the son of Kaleswar, the son of Gouri; and Monohar Singh, the son of Gandarb, the son of...avow and declare upon this wise; that we conjointly have sold and made a true and legal conveyance of the villages Dihi Kalkata, and Sutaluti within the jurisdiction of Parganah Amirabad and village Gobindapur under the jurisdiction of Parganas Paequan and Kalkata, to the English Company with rents and uncultivated lands and ponds and groves and rights over fishing and woodlands and dues from resident artisans, together with the lands as pertaining thereto, bounded by the accustomed, notorious and usual boundaries, the same being owned and possessed by us etc. etc.

উল্লিখিত মনোহর ডাট সম্ভবত মনোহর দেও। রামভদর=রামভদ্র। গন্ধর্বের পর যে কতকগুলি ফুটকি আছে তার মানে ঐ (ditto), অর্থাৎ গৌরী। ডিহি মানে বসতি (বস্তি) বা গ্রাম। দ্রষ্টব্য: প্রথমেই আছে কলকাতার নাম, তারপর সুতালুটি, তারপর গোবিন্দপুর।

এই তিনটি গ্রামের খাজনা দিতে হতো এইরকম:

(গ্রাম)	(টাকা-আনা-পাই)
ডিহি কলকাতা	৪৬৮—৯— ৯
সুতালুটি	৫০১—১৫— ৬
গোবিন্দপুর (পরগনা পাইকান)	১২৩—১৫—
গোবিন্দপুর (পরগনা কলিকাতা)	১০০— ৫—১১
তিন মৌজার মোট	১১৯৪—১৪— ৫

সুতালুটি মৌজার খাজনা সবচেয়ে বেশি ছিল। তারপরেই ছিল ডিহি কলকাতার।

ঐ তিন গ্রামের আয়তন ছিল এইরকম

সুতালুটি	১৬৯২ বিঘা
গোবিন্দপুর	১১৭৮ „
ডিহি কলকাতা	২২০৬ „
মোট	৫০৭৬ বিঘা
	(১৬৯২ একর)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা নামে গ্রাম শুধু যে ছিল তাই নয়, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের সংলগ্ন ছিল এবং আয়তনে সবচেয়ে বড় ছিল। দেয় খাজনার দিক থেকে এর স্থান ছিল দ্বিতীয়।

কলকাতা গ্রামের অস্তিত্ব দেখালাম ১৬৯৮ সনের তিনটি গ্রাম বিক্রির দলিল থেকে। কিন্তু এই দলিলের ১০ বছর আগে ১৬৮৮ সনেও কলকাতা গ্রামের অস্তিত্বের প্রমাণ আছে সেই 'হবসন-জবসন' গ্রন্থেই—যার ওপর ড. সেন খুব বেশি নির্ভর করেছেন। ঐ গ্রন্থের ১৪৬ পৃষ্ঠায় Calcutta শব্দের নিচে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। সেটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি :

[1688.—Soe myself accompanyed with Capt. Haddock and the 120 soldiers we carryed from hence embarked, and about the 20th September arrived at Calcutta.—*Hedges, Diary*, Hak. Soc. ii lxxix.]

এই প্রবন্ধ লেখার সময় ড. সেন হবসন-জবসন-এ Chuttanutty ও Kidderpore সম্বন্ধে যা লেখা আছে খুঁটিয়ে পড়েছেন। আর যখন কলকাতা সম্বন্ধে লিখেছেন তখন Calcutta সম্বন্ধে যা লেখা আছে ঐ বইয়ে তা নিশ্চয়ই সবার আগে ও মন দিয়ে পড়েছেন। তাহলে হেজেস্ ডায়েরির উপরে উদ্ধৃত অংশটি ড. সেনের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে যাবে—এটা কি সম্ভব? যদি এড়িয়ে গিয়ে না থাকে তাহলে তিনি তাঁর প্রবন্ধে এর উল্লেখ করলেন না কেন? তাঁর থিওরির বিরুদ্ধে যায় বলে? ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়।

উপরের দু'টি প্রমাণের পর ড. সেনের বক্তব্য যে কলকাতা নামে কোনো গ্রাম ছিল না—তা একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে।

তা সত্ত্বেও দেখা যাক, তিনি কতরকমে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে কলকাতা নামে গ্রাম ছিল না, মাত্র এক পরগনা ছিল। তিনি লিখেছেন : "মৌজার (বা গ্রামের) নাম ধরেই যে পরগণার নাম হয় এমন কথা নেই। 'হাবেলী' নামে পরগণা আছে বর্ধমান জেলায় একাধিক। কিন্তু ও নামে কোন গ্রাম নেই। অথবা থাকবার কোন প্রমাণ নেই। 'গোপভূম' 'সেনভূম' পরগণার নাম, কিন্তু ও কোন বিশেষ মৌজার (বা গ্রামের) নাম নয়।"

"মৌজার (বা গ্রামের) নাম ধরেই যে পরগনার নাম হয় এমন কথা নেই"—ড. সেনের এই উক্তির জবাবে বলতে চাই যে মৌজার নাম ধরে পরগনার (বা উল্টোটা, পরগনার নাম ধরে মৌজার) নাম হয় না বা হতে পারে না, এমন কথাও নেই। বর্ধমান জেলায় 'হাবেলী' পরগনায় 'হাবেলী' নামে গ্রাম না থাকতে পারে, কিন্তু ২৪ পরগনা জেলায় 'হাবেলী সহর' আছে, যা থেকে 'হালিসহর' গ্রামের নাম হয়েছে। সেইরকম মোমিনসাহী বা ময়মনসিং পরগনায় ময়মনসিং গ্রাম বা শহর আছে, নদীয়া পরগনায় নদীয়া নামে গ্রাম বা শহর আছে—

যাকে আমরা সাধুভাষায় নবদ্বীপ বলে থাকি। ২৪ পরগনা জেলায় বারিদহাট পরগনায় বারিদহাটি (লোকের মুখে বিকৃত হয়ে 'বরিজহাটি' হয়েছে) গ্রাম আছে, মুড়াগাছা পরগনায় মুড়াগাছা গ্রাম আছে, আনোয়ারপুর বা আনারপুর পরগনায় আনারপুর গ্রাম আছে—যে গ্রামের তামাক এককালে খুব বিখ্যাত ছিল। পরগনাও আছে, গ্রামও আছে একই নামে—এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে থাকাটাই নিয়ম, না থাকাটাই ব্যতিক্রম।

ডঃ সেন লিখেছেন: "১৭০০খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুনের আগে কোন দলিলে হস্তলিখিত অথবা ছাপা—কলিকাতা (ক'লকাতা) এই মৌজা বা গ্রাম নামটি এই প্রসঙ্গে [৩টি গ্রাম খরিদ প্রসঙ্গে—রা. মি.] কেন পাই না?" প্রশ্নটি মিথ্যা। ইং ১৯০১ সনের কলকাতার আদমসুমারির ভিত্তিতে পরলোকগত এ. কে. রায় (অতুলকৃষ্ণ রায়) *A Short History of Calcutta* লিখে প্রকাশ করেন ১৯০২ সনে। তাতে কলকাতা গ্রাম বিক্রি বা খরিদের বিবরণ দেওয়া আছে—যা থেকে আমি আগে খানিকটা উদ্ধৃতি দিয়েছি। যদি ড. সেন সে খবর না রাখেন বা না জানেন তো দোষ তাঁরই। ঐ বই পড়লেই জানতে পারতেন, কলকাতা গ্রাম ছিল কিনা।

আবার লিখেছেন: "ইংরেজ কোম্পানির বিলেতে লেখা চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ পর্যন্ত তাদের কলকাতার কার্যালয় ছিল Chuttanuttee-তে। এর মাস আড়াইয়েক পরে ৮ই জুন থেকে ইংরেজ কোম্পানির কার্যালয়ের ঠিকানা Chuttanuttee-র পরিবর্তে হচ্ছে Calcutta-য়।"

এটি একেবারেই ভুল। ২৭শে মার্চ পর্যন্ত তাদের কার্যালয় Chuttauuttee-তে থাকে নি, আর তারপর ৮ই জুন থেকে কলকাতায় উঠে যায় নি। জোব চার্নকের মৃত্যুর পর থেকে তো নিশ্চয়ই, এমনকি তার আগে থেকেও হতে পারে—ইংরেজ কোম্পানির কার্যালয় ছিল কলকাতাতেই। কিন্তু ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুনের আগে পর্যন্ত চিঠির মাথায় লেখা হতো 'সুতানুটি'। তার কারণ কোম্পানির বিলেতের কর্তারা 'সুতানুটি' নামের সঙ্গেই ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। জোব চার্নক যে তিনবার কলকাতায় এসেছেন সেই তিনবারই তিনি সুতানুটিতে ছিলেন। সুতানুটি থেকেই তাঁর চিঠিপত্র বিলেতে লিখতেন। তাছাড়া ১৭০০ সনের আগে 'সুতানুটি' নাম বন্ধ ক'রে 'কলকাতা' লেখার তেমন কোনো জোর কারণ ঘটে নি। শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে ইং ১৬৯৭ সনের জানুয়ারি মাসে মাত্র একটি কেল্লা বানাবার গোড়াপত্তন হয়েছে, অর্থাৎ মাত্র খানিকটা জায়গা মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়েছে এবং তার উত্তর-পূর্ব কোণে মাত্র একটি বুরুজ (bastion) তৈরি করা হয়েছে। আর বিদ্রোহীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এই কেল্লার গোড়াপত্তন করা হয়েছে যে জমির উপর, সে জমিও

ইংরেজদের নিজেদের নয়। পরের বছর ১০ই নভেম্বর সবে কলকাতা কেনা হল সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে। তার পরের বছর (১৬৯৯ সনে) ২০শে ডিসেম্বর তারিখে বাংলা মুলুক মাদ্রাজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন ক'রে নিজেই এক স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি হয়ে দাঁড়াল। আর ১৭০০ সনের ৮ই আগস্ট অসম্পূর্ণ কেল্লার নাম রাখা হল ফোর্ট উইলিয়াম, তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের রাজার নাম অনুসারে। তাই শেষ দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময় থেকেই চিঠিপত্রের মাথায় 'কলকাতা' নাম লেখা শুরু হল। তার আগে 'কলকাতা' নাম ব্যবহার করাটা কোম্পানির পক্ষে সমীচীন হতো না।

ড. সেন পাদরি লঙের *Selections from Unpublished Records of Government (Fort William) for the years 1748-67* থেকে ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের এক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, হুগলির ফৌজদার ঐ সনের জানুয়ারি থেকে ৪ মাসের খাজনা চেয়েছেন এই ক'টি গ্রামের—

	Rs.	a.	p.
Sootaloota, Calcutta	325	0	0
Govindpur, Picar	70	0	0
Govindpur, Calcutta	33	0	0

তারপর ড. সেন 'গোবিন্দপুর,পাইকার' নিয়ে খুই খানিকটা পণ্ডিতসুলভ গবেষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন: "এখন বিচার্য হচ্ছে—গোবিন্দপুর Picar-এর মানে কী? শব্দটি বাংলা নয়, ইংরেজীও নয়। সুতরাং মনে হয় ফারসী। ফারসীতে 'পই, পয়' শব্দের মানে হলো পিছন, পশ্চাদ্‌ভাগ। 'পই (পয়) করদন্' মানে হল পিছনে ফেলে রাখা, পিছনে গাঁথা (to hamstring)। এর থেকে Picar শব্দটির মানে হয় পিছনের স্থান। অর্থাৎ Govindpoor Picar মানে গোবিন্দপুরের পিছনে সংলগ্ন চক বা মৌজা। [হয়তো বা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত পাইকস্তা মানে বাইরের লোককে পাট্টা দেওয়া জমি (land let to non-resident tenants) শব্দটির অনুরূপ ছিল।]"

হুগলির ফৌজদার ১৭৫৩ সনে যে ক'টি গ্রামের খাজনা দাবি করেছেন তার মধ্যে প্রথমেই আছে—Sootaloota, Calcutta। এখানে যে কলকাতা আছে তা পরগনা না গ্রাম? ড. সেন মনে করেন পরগনা, আমি মনে করি গ্রাম। কেননা, এই গ্রাম ক'টির মূল বিক্রয়-দলিলে লেখা আছে—ডিহি কলকাতা ও সুতালুটি, দু'টি গ্রামই পরগনা আমিরাবাদে, কলকাতায় নয়। অন্তত, সুতালুটি যে কলকাতা পরগনার মধ্যে নয় তা নিঃসন্দেহ। তাই দুই বসতিপূর্ণ গ্রামের কাছ থেকে খাজনা চাওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি—৩২৫ টাকা। আর ঐ দলিলেই দেখেছি গোবিন্দপুর গ্রামের একটা অংশ কলকাতা পরগনায়। এখানে ঠিক তাই লেখা হয়েছে। এই অংশের খাজনা মাত্র ৩৩ টাকা। আর গোবিন্দপুর

গ্রামের আর একটি অংশের খাজনা মাত্র ৭০ টাকা। এই থেকে প্রসঙ্গত বোঝা যায়, সমস্ত গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি কত কম ছিল। কিন্তু গোবিন্দপুরের যে অংশের খাজনা ৭০ টাকা, সেই গোবিন্দপুরের পাশে লেখা আছে—Picar, অর্থাৎ পাইকার পরগনা। এই 'পাইকার' শব্দটি নিয়ে ড. সেন কতরকমই না ধানাই-পানাই করেছেন। অর্থাৎ ড. সেন এই মামুলি কথাটা জানেন না যে 'পাইকার' বলে কোনো পরগনা কস্মিনকালে বাংলাদেশে ছিল না। এটি ছাপার ভুল। পরগনাটির নাম 'পাইকান'। মূল বয়নামা বা বিক্রয়-দলিল দেখুন। ১৭১৭ সনে সম্রাট ফারুখশিয়ার ইংরেজ কোম্পানিকে যে ৩৮টি গ্রাম কেনার অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলির বেশির ভাগ 'পাইকান' পরগনায় পড়ে। সুতরাং একটা ছোট ছেলেও জানে যে পরগনাটির নাম 'পাইকান'—পাইকার নয়। যে কথাটি সবাই জানে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে ড. সেনের মতো এতবড় এক পণ্ডিত তা জানেন না!

ড. সেন লিখেছেন: "গোবিন্দপুর ও সুতানুটীর মাঝখানে, অথবা গোবিন্দপুরের পাশে কলিকাতা (ক'লকাতা) বলে কোন স্থানেরই উল্লেখ নেই সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য কোন দলিলে।"

এটা যে ড. সেনের ভুল ধারণা, আর দলিলের অস্তিত্ব না জানার ফলেই যে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, সেকথা আমি আগেই দু'টি দলিল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছি।

উপরের ঐ উক্তির পরেই ড. সেন লিখেছেন: "এমন কি ফোর্ট উইলিয়ম স্থাপনের পরেও যখন কলিকাতা (ক'লকাতা) নাম কোম্পানির ঠিকানা হয়েছে তখনও পাইলটদের চার্টে এই স্থানের নাম নেই। এ অনুল্লেখ বিস্ময়জনক। হবসন্-জবসনে (পৃ. ৪৮৩) ১৭১১ সালের *English Pilot* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে গঙ্গা ধারে খিদিরপুর ('Kitherepore') গোবিন্দপুরের ('Govin Napore') অব্যবহিত ভাটিতে। এ অংশটি এখানে উদ্ধৃত করি…'Then keep Rounding CHITTI POE(Chitpore)Rite down to CHITTY NUTTY Point (now Chuttanutty),...The Rite below GOVER NAGARE (Govind-pur) is Shoal, and below the Shoal is an Eddy, therefore from Gover Nagore you must stand over to the Starboard Shore and keep it aboard till you come up almost with the Point opposite to Kitherepore, but no longer'...The English Pilot (of 1711) p. 65."

উদ্ধৃতি দেবার আগে যে গোবিন্দপুরের পরে বন্ধনীর মধ্যে Govin Napore লিখেছেন, সেটি ভুল, হবে (Gover Napore)। আর উদ্ধৃতিটি তো ভুলে ভরা। হবসন-জবসনে উদ্ধৃতিটি এইরকম আছে, পাঠক দু'টিকে

মিলিয়ে পড়বেন: 1711.—"...then keep Rounding *Chitti Poe* (Chitpore) Bite down to *Chitty Nutty* Point(see CHUTTA-NUTTY),...The Bite below *Gover Napore* (*Govindpur*) is Shoal,and below the Shoal is an Eddy; therefore fromGover Napore, you must stand over to the Starboard-Shore, and keep it aboard till you come up almost with the Point opposite to **Kiddery-pore,** but no longer..."—*The English Pilot*, p. 65."

মূল এবং ড. সেনের উদ্ধৃতি মিলিয়ে পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে যে ড. সেন হুবহু মূলকে উদ্ধৃত করেন নি। মূলের অনেক পরিবর্তন করেছেন। ছোটখাটো পরিবর্তনকে ধরছি না, বড়গুলিকেই ধরছি। তিনি Bite-কে Right করেছেন, Gover Napore-কে একবার Gover Nagare, আর একবার Gover Nagore করেছেন,Kiddery-pore-কে করেছেন Kitherepore। অবশ্য মূলে ভুল আছে এই মনে ক'রে তিনি যদি পরিবর্তনগুলি ক'রে থাকেন, তাহলে আলাদা কথা। যদি তাই হয় তাহলে 'গোবিন্দপুর'কে 'গোবিন্দ নগর' করলেন কোন যুক্তিতে? 'গোবিন্দপুর' কি ভুল, আর 'গোবিন্দ নগর'ই ঠিক?

যেমন তাঁর ইংরেজি উদ্ধৃতি, তেমনি তাঁর বাংলা তর্জমা। 'Bite' পুরনো বানান, এখনকার বানান—'Bight', মানে বাঁক। ড. সেন 'Bite'কে 'Rite' ধরে অনুবাদ করেছেন 'ঠিক' শব্দ দিয়ে। তা নয় বোঝা গেল। কিন্তু 'shoal' শব্দের অনুবাদ 'চটান' শব্দ দিয়ে করলেন কেন বোঝা গেল না। চটানের মানে তো অন্য। 'shoal' এর বাংলা 'চড়া' করলে কি দোষ হতো?

এসব অবান্তর কথা বাদ দিয়ে আসল কথায় এখন ফিরে আসা যাক। *English Pilot* থেকে উদ্ধৃতিটি ড. সেন দিয়েছেন এইটি প্রমাণ করবার জন্য যে সেখানে চিৎপুর, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও খিদিরপুরের উল্লেখ আছে—উল্লেখ নেই শুধু কলকাতার। সুতরাং কলকাতা গ্রাম ছিল না। কিন্তু Pilot-এর উদ্ধৃতি থেকে তা প্রমাণ হয় না। ড. সেন খুব সম্ভবত লক্ষ করেন নি যে সুতানুটির পরে ও গোবিন্দপুরের আগে Pilot থেকে খানিকটা অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছেড়ে দেওয়া যে হয়েছে সেকথা কতকগুলি বিন্দু বা ফুটকি বসিয়ে বোঝানো হয়েছে। খানিকটা জায়গা বাদ দেওয়া হয়েছে এটা বোঝাবার এই হচ্ছে সনাতন রীতি। এই বাদ দেওয়া অংশেই 'কলকাতা'র উল্লেখ ছিল। এই বাদটা ইচ্ছে করেই দেওয়া হয়েছে।

কেন বাদ দেওয়া হয়েছে এখন দেখা যাক। *English Pilot* থেকে ঐ উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে 'খিদিরপুর' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে। লিখেছেন হেনরি ইউল—হবসন্-জবসনের দু'জন সম্পাদকের বা সংকলকের অন্যতম। ড. ইউলের

সামনে ও ড. সেনের সামনে সমস্যা এক নয়। ড. সেনের সমস্যা গ্রাম কলকাতার অস্তিত্ব নিয়ে। ড. ইউলের সমস্যা কলকাতা নিয়ে নয়। আমরা সকলেই যেমন জানি, তিনিও জানেন যে কলকাতা আছে। তাঁর সমস্যা খিদিরপুর নিয়ে। ড. ইউল নিজেই বলছেন যে খিদিরপুরে গভর্নমেণ্ট ডকইয়ার্ড আছে। ১৮শ শতাব্দীতে এই ডকইয়ার্ড জেনারেল কিড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার বলছে যে এই জেনারেল 'কিড'-এর নামেই এই স্থানের বা গ্রামের নাম হয়েছে 'খিদিরপুর'। ড. হেনরি ইউল বলছেন, এইটিই হচ্ছে সাধারণের বিশ্বাস এবং তাঁরওএই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সম্প্রতি *English Pilot* দেখে তাঁর সেই বিশ্বাস দূর হয়েছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন ১৭১১ সনেও, অর্থাৎ জেনারেল কিড কর্তৃক গভর্নমেণ্ট ডকইয়ার্ড স্থাপনের অনেক আগেই ঐ জায়গার নাম ছিল 'খিদিরপুর'। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি খিদিরপুর নিবন্ধটি লিখেছেন, 'কলকাতা' দেখাবার উদ্দেশ্যে নয়। ড. সেন লিখেছেন: "হবসন্-জবসনে (পৃ ৪৮৩) ১৭১১ সনের *English Pilot* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে গঙ্গার ধারে খিদিরপুর গোবিন্দপুরের অব্যবহিত ভাটিতে।"

ড. সেনের লেখা পড়লে মনে হয় যেন তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন এই জেনে যে খিদিরপুর গোবিন্দপুরের ঠিক দক্ষিণে, আর এ কথাটা যেন নতুন কথা, অন্য কেউ জানত না। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? কে না জানে যে খিদিরপুর গোবিন্দপুরের দক্ষিণে?

যাই হোক, ড. সেন এই সমস্ত উদ্ধৃতি ও যুক্তিতর্কের উপসংহার টেনেছেন একটি পিলে-চমকানো কথা বলে। তিনি লিখেছেন: "গোবিন্দপুরের সংলগ্ন এই shoal টিই এখনকার গড়ের মাঠে পরিণত হয়েছে।"

গোবিন্দপুরের সংলগ্ন নয়, ঠিক পরেই, মানে দক্ষিণে। 'পাইলট' উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে। যাচ্ছে নদী দিয়ে। নদীতেই চড়া থাকে, ডাঙায় চড়া থাকে না। চড়ার পরে ঘূর্ণি—নদীতেই ঘূর্ণি থাকে, ডাঙায় থাকে না। গোবিন্দপুর আছে, গোবিন্দপুর নদীতে নয়, ডাঙায়। শুধু গড়ের মাঠটা নেই, তার ওপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। ১৭১১ সনেও গড়ের মাঠ নেই। তাহলে চড়াটা গড়ের মাঠ হল কি ১৭১১ সনের পরে? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই অনেক পরে হয়েছে। কারণ একটা নদীর চড়ায় গড়ের মাঠের মতো একটা তেপান্তর মাঠে পরিণত হতে অনেক সময় লাগবেই লাগবে। তাহলে ইংরেজরা যখন কলকাতায় এসেছিল তখন তারা, কিংবা তাদেরও আগে শেঠ-বসাকরা, গড়ের মাঠ দেখে নি। কেননা, সে সময় গড়ের মাঠের ওপর দিয়ে গঙ্গানদী বইছে! এই আজগুবি কথা তো কেউ কখনো শোনে নি। সকলেই জানে যে গড়ের মাঠটাই হচ্ছে গোবিন্দপুর। এখনো লোকে বলে 'গড় গোবিন্দপুর'। আর, গোবিন্দপুরের গড় বা কেল্লা থেকেই মাঠের নাম হয়েছে গড়ের মাঠ। গোবিন্দপুর গ্রাম গোড়া

থেকেই ছিল। ড. সেন কলকাতা গ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু গোবিন্দপুর গ্রামের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। তাহলে মানতে হয়, তাঁর মতে গোবিন্দপুর ছিল গড়ের মাঠে নয়, অন্যত্র। সে জায়গাটা কোথায়? তিনি স্পষ্ট ক'রে কি গোবিন্দপুর কি সুতামুটি, কোনো গ্রামেরই সীমা নির্দেশ করেন নি। সব গণ্ডগোলের মূল তো এইখানেই। প্রকারান্তরে এবং অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন: "গোবিন্দপুরে যে অ-বাস্তুভূমি যথেষ্ট ছিল তার প্রমাণ এখনকার মধ্য কলকাতা অংশে বাশতলা আর পটলডাঙার মতো নামের অস্তিত্ব। এই অঞ্চল প্রায় প'ড়ো ছিল বলেই অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ধনী বাঙালীরা এইখানে জমি কিনে বড়ো বড়ো বাড়ি তুলে আর বাগানবাড়ি ফেঁদে বসবাস শুরু করেছিলেন।"

তাহলে ড. সেনের মতে মধ্য কলকাতার বাঁশতলা আর পটলডাঙা অঞ্চলে গোবিন্দপুর ছিল। আর এই অঞ্চলটা পোড়ো বা ফাঁকা ছিল—বসাত ছিল না। অথচ ঠিক এর পরেই উল্টোকথা বলেছেন: "সুতানুটী বসতিময় গ্রাম ছিল, গোবিন্দপুরেও বসতি ছিল। গোবিন্দপুরের বসতি কিছু কিছু উঠিয়ে দিয়ে ইংরেজ কোম্পানি দুর্গ ও আপিস গড়েছিলেন।" এই দুর্গ গড় গোবিন্দপুরের বা গড়ের মাঠের নতুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নয়—ডিহি বা টাউন কলকাতার পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। কেননা, 'আপিস গড়েছিলেন' এই কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ড্যালহাউসি স্কোয়ার অঞ্চলকে বোঝাচ্ছেন। তবে, কোম্পানি সেখানকার বসাত কিছু কিছু উঠিয়ে দিয়ে দুর্গ ও আপিস তৈরি করেছিলেন—ড. সেনের এই উক্তি ভিত্তিহীন, অন্তত তার কোনো প্রমাণ নেই। যদি ড. সেনের উক্তি দু'টির মধ্যে স্ববিরোধ না ধরা যায়, তাহলে বুঝতে হবে তিনি একই গোবিন্দপুর গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলকে—উত্তর ও দক্ষিণ—বোঝাচ্ছেন। উত্তর অঞ্চলে বসতি ছিল না, দক্ষিণ অঞ্চলে ছিল। কিন্তু তাহলে বুঝতে হবে তাঁর গোবিন্দপুর গ্রামটা পেল্লায় বড় গ্রাম ছিল। উত্তরে মধ্য কলকাতা থেকে দক্ষিণে ড্যালহাউসি স্কোয়ার পর্যন্ত ছিল এর বিস্তার। কিন্তু মধ্য কলকাতার বাঁশতলা অঞ্চল সুতানুটি গ্রামের মধ্যে ছিল, আর পটলডাঙা অঞ্চল কলকাতা গ্রামের মধ্যে। কোনোটাই গোবিন্দপুরে ছিল না।

যে হবসন-জবসন গ্রন্থকে ড. সেন মূলধন হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সেই গ্রন্থেই তো ২২১ পৃষ্ঠায় সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের অবস্থান নির্দেশ করা আছে। লেখা আছে: "According to Major Ralph Smyth, Chatanati occupied 'the site of the present native town,' i.e. the northern quarter of the city. Calcutta stood on what is now the European commercial part; and Govindpur on the present site of Fort William." (Statistical and Geo-

graphical Report of the 24 Pergunnahs District, Calcutta, 1857, p. 57)। এই পৃষ্ঠাটি ড. সেন দেখেন নি তা নয়। তিনি দেখেছেন ও ঐ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। তবে ৩টি গ্রামের অবস্থান দেখেও চেপে গেছেন, কেননা তা স্বীকার করলে তাঁর থিওরির মূলোচ্ছেদ হয়।

কলকাতা কর্পোরেশনের 'পুরশ্রী' পত্রিকায় ঐ কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব পুরপ্রশাসক (Administrator) শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার মশাই লিখেছেন: "অতীতের ঐ এলাকা [গোবিন্দপুর গ্রাম—রা. মি.] বর্তমানে হেস্টিংস থেকে এসপ্লানেড। ঠিক উত্তরে, এসপ্লানেড থেকে বড়বাজার পর্যন্ত ছিল কলকাতা গ্রাম। বড়বাজার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত সুতানুটি।" সমাদ্দার মশাই অনেকদিন কলকাতা কর্পোরেশনের Administrator ছিলেন এবং কলকাতা সম্বন্ধে পড়াশোনা ও গবেষণাও করেছেন। তিনি সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের যে উত্তর ও দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করেছেন, আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে তিনি না জেনেই করেছেন, এমন কি ড. সেনও না। সমাদ্দার মশাই তো কলকাতার উত্তরসীমা টেনেছেন কমসম ক'রে বড়বাজার পর্যন্ত। কিন্তু বহুমত হচ্ছে যে এসপ্লানেড থেকে পুরনো টাঁকশালের উত্তর-গা পর্যন্ত হচ্ছে কলকাতা।

ইংরেজরা কলকাতা নিজের হাতে গড়েছে। তাদের মধ্যে অসংখ্য বড় বড় পণ্ডিত কলকাতার নাড়িনক্ষত্র তন্নতন্ন ক'রে অনুসন্ধান ও আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে ড. সেন কি এমন একজন লোকেরও নাম করতে পারেন যিনি বলেছেন—কলকাতা নামে গ্রাম ছিল না, বা ইংরেজরা সে গ্রাম খরিদ করে নি। ইংরেজদের পরে এই শতাব্দীর গোড়া থেকে বহু বাঙালি ইতিহাসবিদ্ কলকাতা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তাঁদেরও কেউ ড. সেন যা বলেছেন তা বলেন নি সুতরাং গোড়াপত্তনের প্রায় ৩০০ বছর পরে কলকাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে সম্পূর্ণ নতুন কিছু তথ্য আবিষ্কার করবার সুযোগ আদৌ নেই। সে চেষ্টা করতে গেলে পূর্ববর্তী গবেষকদের চর্বিত-চর্বণ করা, বা ড. সেনের নিজের ভাষায় 'উচ্ছিষ্ট ভোজন করা' ছাড়া আর কিছু হবে না। ড. সেন এই প্রবন্ধ লেখবার সময় নিজেও তো তাই করেছেন। Yule ও Burnell-এর *Hobson Jobson*, ও পাদরী লঙের *Selections from Unpublished Records* না থাকলে ড. সেন কি তাঁর এই প্রবন্ধ লিখতে পারতেন? ড. সেনের বোঝা উচিত ছিল যে ইংরেজেরই শিলনোড়া দিয়ে ইংরেজদেরই দাঁতভাঙা যাবে না। সেটা হবে অপচেষ্টা মাত্র।

ড. সেন লিখেছেন: "ইংরেজ কোম্পানি বঙ্গদেশে তিনখানি মৌজা জমিদারী নেবার অনুমতি পেয়েছিলেন তখনকার সুবেদার আজিম্-উস-সানের কাছে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি তখন ছিলেন বর্ধমান শহরে—শোভা সিং-রহিম খাঁর

বিদ্রোহের সময়ে।"

"শোভা সিং-রহিম খাঁর বিদ্রোহের সময়ে" বলা একেবারেই ভুল। শোভা সিং বিদ্রোহ করে ১৬৯৬ সনে, নিহত হয়ও ঐ সনে। রহিম খাঁ তারপর কিছুদিন বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। সেও নিহত হয় ১৬৯৭ সনে। বিদ্রোহের সময় বাংলার সুবেদার ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ। তিনি ছিলেন যুদ্ধ-ভীরু অপদার্থ শাসনকর্তা। তাই তাঁকে সরিয়ে ঔরঙ্গজেব তাঁর নাতি আজিম-উস-সানকে বিদ্রোহ দমন করার জন্য বাংলাদেশে পাঠান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ দমন করেন ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁ। তিনি ছিলেন পিতার বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তি। নামেও জবরদস্ত, কাজেও জবরদস্ত। রহিম খাঁ নিহত হওয়ার ও বিদ্রোহ দমনের পর আজিম-উস-সান বর্ধমানে ছিলেন—বিদ্রোহের সময় নয়।

ড. সেন লিখেছেন: "১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি গোবিন্দপুরে ইংরেজ কোম্পানি দুর্গ নির্মাণ করেছিল।"

ইংরেজ কোম্পানি গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্মাণ করেন নি—করেছিলেন কলকাতায়। আর ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি দুর্গনির্মাণ হয় নি, দুর্গনির্মাণ আরম্ভ হয় ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, আর শেষ হয় ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে। নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল ২০ বছর।

ড. সেন লিখেছেন: "আমাদের কলকাতার উজানে ও ভাটিতে দুটি কলকাতা স্থানের উল্লেখ রয়েছে ভ্যান ডেন ব্রুকের (Van den Broucke) ম্যাপে (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে)। উজানে স্থানটির নাম দেওয়া আছে Collecatta (অর্থাৎ 'কলিকাতা')। দ্বিতীয় নামটি আছে Calcuta (অর্থাৎ 'কলকাতা')। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রথম স্থানটিই প্রাচীনতর। এটি নিমতেরই কাছাকাছি।"

অনুমান যা খুশি করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না। প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে যা ইচ্ছা অনুমান করবার। তবু অনুমান অনুমানই, প্রমাণ নয়। কথা হচ্ছে, অনুমানের পেছনে যুক্তিসংগত কারণ থাকা চাই। তবেই সে অনুমান গ্রাহ্য হতে পারে। 'কলিকাতা' প্রাচীনতর, কেননা তা নিমতের কাছাকাছি, এটা কি একটা যুক্তি হল? কে প্রাচীনতর, কে প্রাচীনতর নয়, এ তর্ক বা বিচার অবান্তর। আসল কথা হচ্ছে 'কলিকাতা' ও 'কলকাতা'—এই দুই নামের রহস্য কি? দু'টো নাম কি এক জায়গারই? তাহলে তাদের অবস্থান ভিন্ন ও নামের বানানই বা আলাদা হবে কেন? আর যদি দু'টো ভিন্ন জায়গা হয়, তাহলে 'কলিকাতা' কি পরগনার নাম? মনে হয়, ড. সেন তাই মনে করেন। তাহলে 'কলকাতা' কার নাম? এটাও কি পরগনার নাম, না গ্রামের নাম? যদি পরগনার নাম হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত হয় দুই পরগনা ছিল—এক 'কলিকাতা' আর এক 'কলকাতা'। ড. সেন কোথাও সেকথা

বলেন নি। তাহলে 'কলকাতা' কি গ্রামের নাম? ড. সেনের এই বিষয়টি আলোচনা করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা করেন নি। করেন নি এইজন্য যে, করলে তাঁকে নিজের মুখেই স্বীকার করতে হতো 'কলকাতা' গ্রামের নাম। আর, কলকাতা গ্রাম আছে ১৬৮৮ সন থেকে কেন—১৬৬০ সন থেকে। অন্য কোনো ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারতেন না। তাই তিনি এ বিষয়টি স্রেফ ধামাচাপা দিয়ে গেছেন।

ড. সেন ভ্যান ডেন ব্রুকের ম্যাপের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু ভ্যান ডেন ব্রুকের ম্যাপ একেবারেই বাজে ম্যাপ, মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। প্রথমত—বাংলাদেশের স্থান-নাম বিদেশীদের একেবারে অপরিচিত। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নামগুলিকে বিকৃত ক'রে উচ্চারণ করে ও লেখে। যে ইংরেজরা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশিদিন বাস করেছে তারাও একাজ করেছে, সেকথা আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। দ্বিতীয়ত—এই ম্যাপে স্থান-নামগুলি ডাচ ভাষায় বানান করা হয়েছে, যা আমাদের পক্ষে প্রায় অপাঠ্য। তৃতীয়ত—এই ম্যাপে কোনো scale ব্যবহার করা হয় নি। স্থানগুলির অবস্থান আন্দাজমতো দেখানো হয়েছে। এক স্থান থেকে আর এক স্থানের দূরত্ব বোঝবার কোনোই উপায় নেই। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিই: Cangnerre, Honenheek, Sandrors dorp (dorp মানে গ্রাম এইটে বোঝা যায়), Barrenger, Spelarall, Parhens Spryt ইত্যাদি কোন কোন জায়গা? একটি জায়গা আছে—Oegli। এটা বোধহয় হুগলি, কিন্তু তার দক্ষিণে আছে Bandel, এটা কি ক'রে হয়? ব্যাণ্ডেল তো হুগলির উত্তরে। একটা জায়গায় নাম লেখা আছে Isjannok—এটা বোধহয় চানক বা ব্যারাকপুর। তার দক্ষিণে দু'টো জায়গা ছেড়ে দিয়ে আছে Barrenger; এটা কি বরানগর? বরানগর ডাচেদের ছিল। সুতরাং ডাচ ম্যাপে বরানগর দেখানো হবে না, এটা হতেই পারে না। Barrenger যদি বরানগর হয়, তার দক্ষিণে দু'টো জায়গার পরেই বড় বড় ক'রে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে Chandernagor। এটা যে চন্দরনগর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বরানগরের দক্ষিণে চন্দরনগর হয় কি ক'রে? চন্দরনগরের দক্ষিণেই একটা আছে Iannungad (কি একটা গড়)। তার দক্ষিণে Collecatta। আবার Collecatta-র দক্ষিণে একটা জায়গা Deen fe Logio। তার দক্ষিণেই Calcutta। Calcutta-র দক্ষিণে একটা নদী বা নালা গঙ্গা থেকে বেরিয়ে পূর্বদিকে চলে গেছে। প্রায় সকলেই অনুমান করেছেন এইটিই আদিগঙ্গা। আর তার তীরে যে Calcutta দেখানো হয়েছে সেটি আমাদের কালীঘাট এবং Collecatta হচ্ছে আমাদের কলকাতা। মোটকথা, এই অপদার্থ ম্যাপের নজির মূল্যহীন। এ থেকে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং এ ম্যাপকে পরিত্যাগ

করাই উচিত।

ড. সেন লিখেছেন: "ভ্যান ডেন ব্রুকের ম্যাপে যেখানে Collecatte (=কলিকাতা) দেখানো আছে সেখানে একদা Rogues Reach (অর্থাৎ বদমায়েসের টঁ্যাক) বলে পরিচিত ছিল।"

প্রথমত—ভ্যান ডেন ব্রুকের ম্যাপে Collecatte দেখানো নেই, Collecatta দেখানো আছে। দ্বিতীয়ত—"সেখানে একদা Rogues Reach বলে পরিচিত ছিল"—এটা কিরকম বাংলা হল? লেখা উচিত ছিল না কি "যেখানটা একদা Rogues Reach বলে পরিচিত ছিল"? ভাষার কথা ছেড়ে দিলেও ড. সেন যা লিখেছেন তা একেবারেই ভুল। হবসন্-জবসনে Rogues Reach নেই, Devil's Reach আছে। এর পরেই ড. সেন Rogues River-এর কথা লিখেছেন। ড. সেনের অবচেতন মনে ক্রমাগত Rogue কথাটা ঘুরছিল বলেই তাঁর কলম থেকে তাঁর অজ্ঞাতে Devil's Reach-এর জায়গায় Rogue's Reach বেরিয়েছে। সেকথা যাক। হবসন্-জবসনে জায়গাটাকে Devil's Reach বলবার কারণও লেখা আছে। হবসন্-জবসনের ৩০৮ পৃষ্ঠায় যা লেখা আছে তা নিচে উদ্ধৃত করছি:

> **Devil's Reach**. n. p. This was the old name of a reach on the Hoogly R. a little above Pulta (and about 15 miles above Calcutta). On that reach are several groups of **dewals**, or idol-temples, which probably gave the name.

Dewal-কে অনায়াসেই Devil করা যায়। তাছাড়া হিন্দুদের দেব-বিগ্রহ ক্রিশ্চানদের চোখে তো শয়তান হবেই। ভ্যান ডেন ব্রুকের ম্যাপে 'কলিকাতা' দেখানো আছে, ড. সেনের মতে নিমতের কাছে। আর Devil's Reach হচ্ছে পলতারও উত্তরে—কলকাতা থেকে ১৫ মাইলের চেয়েও বেশি দূরে। তাহলে Devil's Reach Collecatta বা নিমতের কাছে কি ক'রে হয়?

এর পরেই ড. সেন লিখেছেন: "ইংরেজ কোম্পানি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে তার কাজেই Rogues River ধরণের খাড়ি বা খাল ছিল।

"শিয়ালদহ(ক'লকাতার বিশিষ্ট উচ্চারণে'শ্যাল্দা',—শ্যাওলা দ'থেকে,শিয়াল দ' থেকে নয়—) এই অঞ্চল এবং ক্রীক রো (Creek Row) এই রাস্তা নামটি অতীত দিনের সেই Rogues River-এর স্মৃতির জের টেনে এসেছে।"

ওপরের উদ্ধৃতিতে দু'টো ভুল আছে। প্রথম—'কাছেই' ছাপা হয়েছে 'কাজেই', দ্বিতীয়—Rogue's স্থলে Rogues হয়েছে।

ড. সেন বলেছেন, শিয়ালদহ বা শ্যালদা শ্যাওলা দ'থেকে হয়েছে—শিয়াল দ' থেকে নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কথাটা শেয়াল না শ্যাওলা? ড. সেন বলেন শ্যাওলা, আমি বলি শেয়াল। এখানে যে 'দহ' শব্দ আছে তা আমাদের অতি সুপরিচিত

'দহ' শব্দ নয়—যার অভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'অতলস্পর্শ স্থান', 'অগাধ জল', 'গভীর গর্ত', 'আবর্ত বা ঘূর্ণিজল' এবং যার উদাহরণ হচ্ছে—'কালীদহ', 'দ'য়ে মজা' ইত্যাদি। এটি ফারসি Dih বা Dehশব্দ থেকে হয়েছে, যার মানে হচ্ছে—গ্রাম, উঁচু বাস্তুজমি বা ডাঙা। এই Dih শব্দ থেকে হয়েছে 'ডিহি', যেমন 'ডিহি কলিকাতা', 'ডিহি শ্রীরামপুর', 'ডিহি এণ্টালি'। আর Deh শব্দ থেকে হয়েছে 'দেহাত'—যার এক মানে পাড়াগাঁ (ইংরেজিতে country) এবং অন্য মানে 'একাধিক গ্রাম' (বহুবচন)। 'ডিহি' শব্দেরও আর একটি মানে আছে—'অনেকগুলি গ্রাম', যেমন 'ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম', 'ডিহিদার'।

এখন 'শিয়ালদহ' বা 'শিয়ালদা'য় আসা যাক। ফারসি ভাষায় ব্যুৎপন্ন মুসলমানেরা বলেন Shoghul Deh থেকে বাংলায় শিয়ালদহ হয়েছে। ফারসি ভাষায় Shoghul মানে শৃগাল বা শেয়াল, আর Deh মানে গ্রাম। তাহলে Shoghul Deh-র মানে দাঁড়ায় 'শেয়ালডাঙা'—যেখানে শেয়ালরা বাস করে। কথায় বলে 'বন দেশে শেয়াল রাজা'। 'দহ' শব্দ সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে 'দ' বা 'দা'। পূর্ববঙ্গবাসীরা বলেন 'শিয়ালদ', পশ্চিমবঙ্গবাসীরা বলেন শিয়ালদা', যেমন তাঁরা 'খড়দহ'কে বলেন 'খড়দা', 'চক্রদহ'কে বলেন 'চাকদা', এড়িয়াদহকে বলেন 'এঁড়েদা'।

এবার ড. সেনের উল্লিখিত Rogue's River-এর ব্যাপারটা কি দেখা যাক। ড. সেন তাঁর প্রবন্ধের ৭ম পাদটীকায় লিখেছেন: "হবসন্-জবসনে এই প্রসঙ্গ [অর্থাৎ Rogue's River প্রসঙ্গ—রা. মি.] দ্রষ্টব্য।" ড. সেনের নির্দেশ মেনে দেখা যাক হবসন্-জবসনে এ সম্বন্ধে কি লেখা আছে। লেখাটা বড়। কাটছাঁট করবার উপায় নেই। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাকে পুরোটাই উদ্ধৃত করতে হচ্ছে। ঐ গ্রন্থের ৭৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে:

> **Rogue's River**, n. p. The name given by Europeans in the 17th and 18th centuries to one of the Sunderbund channels joining the Lower Hoogly R. from the eastward. It was so called from being frequented by the Arakan Rovers, sometimes Portuguese vagabonds, sometimes native **Muggs**, whose vessels lay in this creek watching their opportunity to plunder craft going up and down the Hoogly.
>
> Mr. R. Barlow, who has partially annotated *Hedges' Diary* for the Hakluyt Society, identifies Rogue's River with ChannelCreek, which is the channel between Saugor Island and the Delta. Mr. Barlow was, I believe, a mem-

ber of the Bengal Pilot service, and this, therefore, must have been the application of the name in recent tradi- tion. But I cannot reconcile this with the sailing direc- tions in the *English Pilot* (1711), or the indications in Hamilton, quoted below.

The *English Pilot* has a sketch chart of the river, which shows, just opposite Buffalo Point, *R. Theeves'*, then, as we descend, the *R. Rangafula*, and, close below that *'Rogues'* (without the word *River*), and still further below, *Channel Creek* or *R. Jesoose* Rangafula R. and Channel Creek we still have in the charts

After a careful comparison of all the notices, and of the old and modern charts, I come to the conclusion that the R. of Rogues must have been either what is now called*Chingri Khal*,entering immediately below **Diamond Harbour**, or *Kalpi* creek, about 6m. further down, but the preponderance of argument is in favour of *Chingri Khal*. The position of this quite corresponds with the *R. Theeves* of the old English chart ; it corresponds in distance from Saugor (the *Gunga Saugor* of those days, which forms the extreme S. of what is styled *Saugor Island* now) with that stated by Hamilton, and also in being close to the 'first safe anchoring place in the River,' viz. Diamond Harbour. The Rogue's River was apparently a little 'above the head of the Grand Middle Ground' or great shoals of the Hoogly, whose upper termination is now some 7½ m. below Chingri Khal. One of the extracts from the *English Pilot* speaks of the 'R. of Rogues, commonly called by the Country People, *Adegom*.' Now there is a town on the Chingri Khal, a few miles from its entrance into the Hoogly, which is called in Rennell's Map *Ottogunge*, and in the *Atlas of India* Sheet *Huttoogum*. Further, in the tracing of an old Dutch chart of the 17th century, in the India Office, I

find in a position corresponding with Chingri Khal, *D. Roevers Spruit,* which I take to be 'Robber's (or **Rogue's River.'**

উপরের উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে Rogue's River এই নাম হয়েছে ফিরিঙ্গি (পোর্তুগিজ) ও মগ জলদস্যুদের ঘাঁটি এই নদীতে ছিল বলে। একজন ইংরেজ পাইলট সুন্দরবনের একেবারে দক্ষিণে সাগরদ্বীপের পূর্বে channel creek (যার দেশী নাম বড়তলা নদী) তাকেই Rogue's River বলেছেন। কিন্তু ইউল সাহেব এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি অনেকের লেখা ও চার্ট ইত্যাদি মিলিয়ে দেখে ও সবকিছু বিবেচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ডায়মণ্ড হারবারের ঠিক দক্ষিণে চিংড়িখালি নামে যে খাল পূর্বদিক থেকে এসে গঙ্গানদীতে পড়েছে ও যার ধারে হটুগঞ্জ নামে একটি গ্রাম আছে, সেই চিংড়িখালিই Rogue's বা Robber's River। ডায়মণ্ড হারবারের ৬ মাইল দক্ষিণে কুলাপ খালের কথাও তিনি ভেবেছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও বাদ দিয়েছেন।

কিন্তু ডঃ সেন বলছেন, এই Rogue's River ছিল কলকাতার পুরনো দুর্গ যেখানে ছিল তার কাছে এবং ক্রীক রো তার স্মৃতি আজও রক্ষা করছে। কলকাতা সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন যে চাঁদপাল ঘাটের একটু উত্তর থেকে এক খাল (creek বা canal) গঙ্গা থেকে বেরিয়ে পরবর্তীকালের হেস্টিংস স্ট্রিটের মধ্য দিয়ে পূর্বমুখে গিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রীক রো, লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে Canal Street (এই canal ও ঐ creek বা খালকে বোঝাচ্ছে) দিয়ে গিয়ে বেলেঘাটায়, এবং বেলেঘাটা থেকে ধাপায় পড়ত। বর্তমান বেলেঘাটা খাল সেই প্রাচীন খালেরই অংশ মাত্র। এই খালের কলকাতার দিকটা সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে গেছে। ধাপা থেকে এই খাল আরো পূর্বে যেত। কিন্তু খুব সম্প্রতি খালের সে অংশও ভরাট ক'রে ফেলা হয়েছে। কোথায় ডায়মণ্ড হারবারের দক্ষিণে Rogue's River, আর কোথায় বেলেঘাটার ধাপার খাল! এরই নাম গবেষণা! চমৎকার!!

আমি ভেবে পাইনে কী সাহসে ড. সেন হবসন্-জবসনে Rogue's River প্রসঙ্গ দেখতে বললেন। তাঁর কি একবারও একথা মনে হয় নি যে, যে-কেউ ঐ লেখাটি পড়বে সেই ধরে ফেলবে যে তাতে যা লেখা আছে তা ড. সেনের ধারণাকে মোটেই সমর্থন করে না, বরং ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে!

ড. সেনের সমস্ত লেখাটির মধ্যে কোথাও বাস্তব বা সত্যের লেশমাত্র নেই। আছে শুধু উদ্ভট, উদ্দাম, উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা, আর নতুন কিছু বলে লোককে তাক লাগাবার—চমকে দেবার চেষ্টা।

আশি বছর বয়সের মুখে একটা নতুন-কিছু করতে গিয়ে ড. সেন তাঁর

পাণ্ডিত্যের খ্যাতিকে নষ্ট করেছেন এবং নিজেকে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করেছেন।

গোলদীঘি ও হেদো

১৯২৫ সনের ১৮ অক্টোবর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের নাম বদলে বিদ্যাসাগর-উদ্যান রাখা হয়। সেই উপলক্ষে কলেজ স্কোয়ারে একটি প্রকাশ্য সভা হয়। সেই সভার উদ্বোধন করেন ড. সুকুমার সেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেন যে কলেজ স্কোয়ার নামটি অর্বাচীন। এর প্রাচীন নাম 'গোলদীঘি'। তিনি বলেন, দীঘিটা গোল ছিল বলে এর গোলদীঘি নাম হয় নি। এই দীঘিতে গোলপাতা জন্মাত বলে দীঘির এ নাম হয়েছে। 'হেদো' সম্বন্ধেও ঐ রকম কি একটা উক্তি করেন, যা আমি ঠিক ধরতে পারি নি, কিন্তু যা আমার ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে।

কিন্তু সংশয়ের অবসান হল অতি সম্প্রতি প্রকাশিত শারদীয় যুগান্তর (১৩৮৭) পত্রিকায় তাঁর রচনা 'বহুবিচিত্র'-তে তাঁর বক্তব্যের মুদ্রিত রূপ দেখে। ড. সেন লিখেছেন :

> গোলদীঘির 'গোল' অংশটি বিশেষণ নয়, বিশেষ্য। 'গোল' হল হোগলার মতো একরকম আগাছা, হোগলার নামান্তরও হতে পারে। এই পুকুরের ধারে 'গোল' আগাছার জঙ্গল ছিল।···
>
> 'হেদো' কথাটির মানে মজাপুকুর। বর্ধমান জেলায় কোন কোন গ্রামে এই নামে পুকুর ও দীঘি আছে।

যাই হোক, এ বিষয়ে অধিক বাগ্‌বিস্তার না ক'রে সংক্ষেপে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা যাক্। শিশির ভাদুড়ি মশাই মঞ্চজগৎ থেকে অবসর নেবার পর ৬নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিটের বাড়িতে এক বইয়ের দোকানঘরে প্রায়ই আসতেন এবং নাটক, মঞ্চ ও অভিনয় ছাড়াও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়—গোলদীঘিকে গোলদীঘি বলা হয় কেন, ওটা তো চৌকো। ভাদুড়ি মশাই হেসে বলেন,"দীঘি তো আগে গোলই ছিল। ১৯১২-১৩ সনে মাটি ফেলে বুজিয়ে চৌকো করেফেলেছে। ওখানে আমরা আড্ডা মেরেছি। গোলদীঘির ধারে আমরা কিৎকিৎ খেলতুম।' —(দ্রঃ ড. রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু : 'শিশির সান্নিধ্যে,' পৃ ১৯)।

১৮২৫ সনে ছাপা Major Schalch-এর ম্যাপে Cornwallis Street, College Street, Wellington Street ও Wellesley Street-এর উল্লেখ আছে। প্রত্যেক Street-এর ধারে একটি ক'রে square ও tank

(পুকুর) দেখানো আছে। Cornwallis Street-এর ধারে যে square তার নাম Cornwallis Square, College Street-এর ধারে যে square তার নাম College Square, Wellington Street-এর ধারে যে square তার নাম Wellington Square ও Wellesley Street-এর ধারে যে square তার নাম Wellesley Square লেখা আছে। Wellesley Square-এর পুকুর চৌকো, Wellington Square-এর পুকুর elliptical বা oval (ডিম্বাকৃতি)। Cornwallis Square-এর পুকুরও ডিম্বাকৃতি। একমাত্র College Square-এর পুকুরটি সম্পূর্ণ গোল দেখানো আছে। বড় বড় ক'রে পূর্বদিকে College Square লেখা আছে। সমস্ত উত্তর দিকটায় লেখা আছে Hindu College।

সুতরাং গোলপাতা গন্বাত বলে দীঘিটির নাম গোলদীঘি নয়, দীঘিটি সত্যিই গোল ছিল বলে এই নাম। আর গোলদীঘি নাম প্রাচীন ও College Square নাম অর্বাচীন, একথাও ঠিক নয়। যেদিন থেকে লোকমুখে এর বাংলা নাম হয়েছে গোলদীঘি,সেইদিন থেকেই সরকারিভাবে ইংরেজিতে এর নাম College Square।

১৮৩৩ সনে ছাপা Tassin-এর ম্যাপেও দীঘিগুলির আকার Major Schalch-এর ম্যাপের অনুরূপ দেখানো আছে। তাতেও দেখা যায়, গোলদীঘির আকার সম্পূর্ণ গোল।

ইংরেজি নাম Cornwallis Square, বাংলা আটপৌরে নাম হেদো বা হেঁদো, পোশাকি নাম হেদুয়া : এসেছে 'হ্রদ' শব্দ থেকে।

গ্রন্থ-পরিচিতি

বর্তমান গ্রন্থের শেষ দু'টি অধ্যায় ছাড়া সবগুলি অধ্যায়ই প্রথমে 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'গঙ্গার ঘাট' নামে ১২শ অধ্যায়টি 'ঐতিহাসিক' পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। সর্বশেষ, অর্থাৎ ১৩শ অধ্যায়টি কোথাও প্রকাশিত হয় নি—একটি বক্তৃতা হিসাবে পঠিত হয়েছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, প্রতিটি রচনাই বর্তমান গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময়ে আমূল পরিমার্জিত হয়েছে। নিচে প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথম প্রকাশের হদিশ দেওয়া হল।

১ 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে

ঐ নামেই প্রকাশিত। দ্র. এক্ষণ, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬। এই প্রবন্ধ উপলক্ষে এক্ষণ পত্রিকায় নানা উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে থাকে। পত্রিকার ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৬) প্রকাশিত হয়: ক. 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি—কৈফিয়ৎ॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; খ. পত্র॥ সুকুমার সেন; গ. পত্র॥ কার্তিক লাহিড়ী; ঘ. পত্র॥ তারাপদ সাঁতরা; ঙ প্রত্যুত্তর॥ রাধারমণ মিত্র।

এর বেশ কিছুদিন পরে নতুন ক'রে এই জের চলতে থাকে এবং পত্রিকার ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় (পৌষ-মাঘ ১৩৭৭) প্রকাশিত হয়: ক. প্রতিবাদ-পত্র ১॥ পাঁচুগোপাল রায়; খ. প্রত্যুত্তর॥ রাধারমণ মিত্র; গ. প্রতিবাদ-পত্র ২॥ অনিলকুমার কাঞ্জিলাল; ঘ. প্রত্যুত্তর॥ রাধারমণ মিত্র।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পর্বে এসব বিতর্ক বর্জন করা হয়েছে। পরবর্তী পর্বে শ্রীরাধারমণ মিত্রের প্রত্যুত্তরগুলি স্থান পাবে। সেগুলি নানা নতুন তথ্যের আকর ও প্রতিটি প্রত্যুত্তরই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

২ কলকাতার নানা এলাকা

'কলকাতার টুকিটাকি' নামে প্রকাশিত। দ্র. এক্ষণ, ১১শ বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, শারদীয় ১৩৮২।

৩ মন্দির মসজিদ গির্জা ও অন্য প্রসঙ্গ

'কলকাতার টুকিটাকি'; দ্র. এক্ষণ, ১২শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৩৮৩।

৪ পূর্বানুস্মৃতি ও পরিপূরণ

'কলকাতার টুকিটাকি' শীর্ষক ৪৬ পৃষ্ঠাব্যাপী রচনার প্রথম ১০ পৃষ্ঠা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে; দ্র. এক্ষণ, ১২শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, শারদীয় ১৩৮৩।

৫ পথ-পরিক্রমা: একটি অঞ্চল

পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধের পরবর্তী ১৬ পৃষ্ঠা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে; দ্র. এক্ষণ, ঐ।

৬ কয়েকটি প্রশ্ন ও জোব চার্নক

পূর্বোল্লিখিত নিবন্ধের শেষ ২০ পৃষ্ঠার ভিত্তিতে গঠিত ; দ্র. এক্ষণ, ঐ।

৭ সামাধ্যায়ী, রাহা ও কিছু প্রশ্নোত্তর

'কলকাতার টুকিটাকি' ; দ্র. এক্ষণ, ১২শ বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৩।

৮ যোগাযোগ-ব্যবস্থা : জলপথ

'কলকাতার টুকিটাকি' ; দ্র. এক্ষণ, ১৩শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, শারদীয় ১৩৮৪।

৯ যোগাযোগ-ব্যবস্থা : স্থলপথ

'কলকাতার টুকিটাকি' ; দ্র. এক্ষণ, ১৩শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জুন ১৯৭৮। এই অধ্যায়ের পরিশেষে 'সংযোজন'টি গৃহীত হয়েছে এর পরবর্তী সংখ্যা এক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলকাতার টুকিটাকি'-শীর্ষক রচনার প্রথম ৬ পৃষ্ঠা থেকে।

১০ যোগাযোগ-ব্যবস্থা : রেলপথ

'কলকাতার টুকিটাকি' ; দ্র. এক্ষণ, ১৩শ বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, শারদীয় ১৩৮৫। এই নিবন্ধের শেষ ১৯ পৃষ্ঠা ও এক্ষণ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত 'কলকাতার টুকিটাকি' নিবন্ধের কিয়দংশ বর্তমান অধ্যায়ের ভিত্তি।

১১ যোগাযোগ-ব্যবস্থা : বিমান-পরিবহন

'কলকাতার টুকিটাকি' ; দ্র. এক্ষণ, ১৪শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, শারদীয় ১৩৮৬। কেবল 'আকাশপথ' অংশটি অবলম্বনে গঠিত।

১২ গঙ্গার ঘাট

ঐ নামেই প্রকাশিত ; দ্র. ঐতিহাসিক, ৪, জানুয়ারি। প্রথম প্রকাশের সময় একটি শুদ্ধিপত্রসহ সামান্য সংখ্যক পুস্তিকাও প্রচারিত হয়েছিল।

১৩ ক'লকাতা গোড়ায় ক'লকাতায় ছিল কি ?

মূলত ঐ নামে প্রকাশিত ড. সুকুমার সেনের প্রবন্ধের (দ্র. উত্তরসূরি, ২৬ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, ১৩৮৫-৮৬) সমালোচনা। ইতিপূর্বে অমুদ্রিত এই অধ্যায়টি ১৯৮০-র ২২ মার্চ তারিখে কলকাতায় ফেডারেশন হল সোসাইটি আয়োজিত সভায় পঠিত হয়। পরিশেষে সংযোজিত হয়েছে ড. সুকুমার সেনের অপর বক্তব্যের ('গোলদীঘি' ও 'হেদো' সম্পর্কে) প্রতিবাদ।

নির্ঘণ্ট

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত